

Jagannath University Journal of Arts

Volume 13, Number 1, January–June 2023

ISSN 2519-5816



Jagannath University

Jagannath University Journal of Arts

Volume 13, Number 1, January–June 2023

Published in : July, 2023

All views and ideas expressed in articles published in the journal are solely belong to the author(s). The Editor, the Editorial Board and the Publisher have no responsibility or liability in such cases.

Published by: Dean, Faculty of Arts
Jagannath University
Dhaka-1100, Bangladesh

Printed at : DS Printing and Packaging
234/D New Elephant Road, Dhaka-1205
Cell : 01817078796

Subscription : BDT 300/- (Three Hundred Taka) per issue

ISSN : 2519-5816

Chief Editor
Professor Dr. Md. Rais Uddin

Faculty of Arts
Jagannath University, Dhaka-1100
www.jnu.ac.bd

Advisory Board

1. **Professor Dr. A.K.M Yakub Ali**
Professor Emeritus
Department of Islamic History and Culture
Rajshahi University, Rajshahi
2. **Professor Dr. Fakrul Alam**
UGC Professor & Director
Bangabandhu Sheikh Mujib Research Institute
University of Dhaka, Dhaka-1000
3. **Professor Dr. Sharif Uddin Ahmed**
Department of History
University of Dhaka, Dhaka-1000
4. **Professor Dr. Syed Azizul Haque**
Department of Bangla
University of Dhaka, Dhaka-1000
5. **Professor Dr. Rashidunnabi**
Department of Music
Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University
Trishal, Mymensingh.
6. **Professor Nisar Hossain**
Dean, Faculty of Fine Arts
University of Dhaka, Dhaka-1000
7. **Professor Dr. Lutfur Rahman**
Department of Drama & Dramatics
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka
8. **Professor Dr. M. Matiur Rahman**
Department of Philosophy
University of Dhaka, Dhaka-1000
9. **Professor Dr. Anirudha Kahaly**
Department of Bangla
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka
10. **Professor Dr. Muhammad Shafiq Ahmad**
Department of Islamic Studies
University of Dhaka, Dhaka-1000

Editorial Board

- Chief Editor** : **Professor Dr. Md. Rais Uddin**
Dean
Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka
- Associate Editor** : **Fazle Elahi Chawdhury**
Professor, Dept. of Bangla
Jagannath University, Dhaka
- Dr. Musarrat Shameem**
Associate Professor, Dept. of English
Jagannath University, Dhaka
- Members** : **Professor Dr. Milton Biswas**
Chairman
Department of Bangla, Jagannath University, Dhaka
- Professor Dr. Md. Momin Uddin**
Chairman
Department of English, Jagannath University, Dhaka
- Professor Dr. Shamsun Nahar**
Chairman
Department of Hisroty, Jagannath University, Dhaka
- Professor Dr. Md. Atiar Rahman**
Chairman
Department of Islamic History and Culture
Jagannath University, Dhaka
- Professor Dr. Muhammad Abdul Wadud**
Chairman
Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka
- Professor Dr. Mohammad Hafizul Islam**
Chairman
Department of Philosophy, Jagannath University, Dhaka
- Dr. Jhumur Ahmed**
Chairman
Department of Music, Jagannath University, Dhaka
- Professor Md. Aloptogin**
Chairman
Department of Fine Arts, Jagannath University, Dhaka
- Katharin Purification**
Chairman
Department of Theatre, Jagannath University, Dhaka
- Editorial Assistant** : **S.M.Enamul Haque**
Assistant Registrar
Faculty of Arts, Jagannath University, Dhaka

সম্পাদকীয়

Jagannath University Journal of Arts (Volume 13, Number 1) প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কাকতালীয়ভাবে বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারীগণের অধিক না-বাচকতায় অনেক লেখাই এ সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না।

নিরন্তর সম্পাদনার মধ্য দিয়ে যতটা সংবর্ধিত হয়ে উঠতে পারে কোনো গবেষণাধর্মী রচনা, সুনির্দিষ্ট কালসীমায় প্রকাশের চাপে তার ততটা নিখুঁত সৌষ্ঠবপ্রাপ্তি সম্ভব হয়ে ওঠে না- এটা প্রকৃতপক্ষে জার্নাল অব আর্টসের প্রতিটি সংখ্যারই সীমাবদ্ধতা।

যথারীতি এ সংখ্যাও বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে গ্রন্থিত হলো। আশা করি প্রাবন্ধিকগণের চিন্তার সৌরভময় গবেষণা নিষ্ঠাবান পাঠক-গবেষকদের চেতনায় অভিনব-কিছু যুক্ত করতে পারবে।



(অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদদীন)

প্রধান সম্পাদক

Jagannath University Journal of Arts

Volume 13, Number 1, January–June 2023

Jagannath University

Dhaka-1100

সূচি

১. সেলিম আল দীনের চাকা: পাশ্চাত্যের কাউন্টার ডিসকোর্স ও প্রাচ্যের পাঠ- বিশ্লেষণমূলক শেকড় সন্ধান কৃপাকণা তালুকদার	১
২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অন্য ঘরে অন্য স্বর: আত্মপরিচয়ের সংকট জান্নাতুল কানন বনি	১৩
৩. রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদিস চর্চা: বিকাশধারার একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ	২৭
৪. কুরআন-হাদিস ও বিজ্ঞানে মানবসৃষ্টিতত্ত্ব মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, আবু তৈয়ব মোঃ নাজমুছছাকিব ভূঁইয়া	৫১
৫. পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে ইসলামের নির্দেশনা: একটি পর্যালোচনা মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম, তানবীর হোসাইন	৬৭
৬. ভূমি ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় ইসলামি নির্দেশনা: বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দিন	৮৩
৭. ইসলামে মতানৈক্যের পদ্ধতি: পরিপ্রেক্ষিত তুলনামূলক ফিক্হ মুহাম্মদ তাজামুল হক	১০৪
৮. মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদের কবিতা ও গানে ইসলামি ভাবধারা: একটি পর্যালোচনা মোহাম্মদ ওমর ফারুক, ফাতেহা বেগম	১২২
৯. ইসলামি দৃষ্টিকোণে ব্যবসায় ক্রেতা-বিক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য: একটি পর্যালোচনা মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসাইন রাসেল	১৩৪
১০. সৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব: ইসলামি দৃষ্টিকোণ মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন, মনজুর আহমদ	১৪৯
১১. জিহাদ ও সম্ভ্রাসবাদ সম্পর্কে মুসলিম শিক্ষার্থীদের ভাবনা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ মোঃ ইব্রাহীম খলিল	১৬৪
১২. মিথের বিনির্মাণ: চাঁদ বণিকের পালা সান্জীদা মাসুদ	১৮২
১৩. Environmental Management Accounting Practices in Manufacturing Sectors of Bangladesh: An Empirical Analysis Din Islam, Muhammad Shahidullah Tasfiq	১৯৭
১৪. Exploring Information and Technological Impacts on Young Generation: A Study on Public University Students in Bangladesh K. M. Sujauddin, Md. Touhiduzzaman	২১৩

১৫.	Perceived Threat to the Livelihood of Female Garment Workers during COVID 19 Pandemic: A Study in a Globalized City in Bangladesh	২২৬
	Md. Aminul Islam, Mst. Afroza Yasmin Munni	
১৬.	Joyeeta: A New Platform of Women Empowerment	২৪৫
	Md. Ershadul Islam, Muhammad Bayezid Husain	
১৭.	Social Media, Advertising, and Consumer's Lifestyle: A Study of the False Needs and Moral Confrontations of Consumers in Dhaka City	২৫৬
	Mohammad Hafizul Islam, Md. Shawn Sheikh, Md. Moinul Islam	
১৮.	The Contributions of National and International Islamic NGOs to Social Business Development in Bangladesh	২৬৮
	Mohammad Nurullah	
১৯.	Past and Present of Acquisition Laws in Bangladesh: Finding the Equity and Efficacy Consideration in Determining Compensation and Land Valuation	২৮৭
	Nasrin Akter	
২০.	The Transformation in Rural Power Structure and Justice (Shalish) Delivery System: A Study of Two Villages in Bangladesh	৩০০
	Nurunnahar Mazumder, Azmira Sultana, Mohammed Moniruzzaman Khan	
২১.	Women's Agency Regarding Choice to Work: The Lived Experience of Women Garment Workers in Bangladesh	৩১৩
	Shamali Shill	
২২.	A Contextual Analysis of Financial Social Work in the Light of Islam	৩২৯
	Tareq Muhammad Shamsul Arefin, Mohammad Sajjad Hossain	

সেলিম আল দীনের চাকা: পাশ্চাত্যের কাউন্টার ডিসকোর্স ও প্রাচ্যের পাঠ-বিশ্লেষণমূলক শেকড় সন্ধান

কৃপাকণা তালুকদার*

Abstract

Selim Al Deen, considered one of the foremost playwrights of independent Bangladesh, defied the oppressive legacy of colonial control, which had deeply influenced Bengali identity for more than 200 years. Through his plays, he sought to carve out a unique theatrical language that resonated with the soul of the Bengali people. Against the meta narrative that have been derived from oriental literature, Selim al Deen presented his *Chaka* play as a counter-discourse. This play could be analyzed through Selim's own theatrical theory and South Asian narratology, as demonstrated by K. Ayyappa Paniker's South Asian narratology. Hence, this research article delves into the genesis of Bengali's unique theatrical language through an analytical methodology inspired by Selim Al Deen's *Chaka* play, and illustrates how Bengali's own theatrical language has been created as a counter discourse to the occident.

চাবিশব্দ: উত্তর উপনিবেশ, নিজস্ব নাট্যভাষা, শেকড় সন্ধান, কাউন্টার ডিসকোর্স, দক্ষিণ এশীয় আখ্যান

ভূমিকা

১৯৯০ সালের বসন্ত কালে মাত্র পঞ্চদশবছর বয়সে রচিত সেলিম আল দীনের *চাকা* নাটক মূলত আখ্যান ভিত্তিক নাটক। সেলিম আল দীন নিজে তাঁর এই নাটককে বলছেন ‘রক্তিমাত নাট্যকথামালা’। অর্থাৎ এই নাটকে কথার মধ্যে দিয়ে আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। নাটকে গতানুগতিকতার ভেতর দিয়ে সেলিম উপন্যাসবিশিষ্ট নাট্যচর্চাকে নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি উত্তর-উপন্যাসবিশিষ্ট নাট্যচর্চার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের নিজস্ব নাট্যভাষা নির্মাণ করেছেন যা হাজার বছরের বাঙালির ঐতিহ্যকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছে। বাঙলা নাটকের ইতিহাসে এই নাট্য আখ্যানের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ দিনের উপন্যাসবিশিষ্ট শাসনের প্রভাবে যে পাশ্চাত্য কেন্দ্রিক ডিসকোর্সের জন্ম হয়েছে আমাদের সংস্কৃতিতে তার কাউন্টার ডিসকোর্স হিসেবেই সেলিম আল দীন এ অঞ্চলের নিজস্ব নাট্যভাষা নির্মাণের মধ্যে দিয়ে প্রাচ্যের শেকড় সন্ধানের প্রয়াস পেয়েছেন। যা এই আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাসে যেমন সেলিম আল দীন গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হিসেবে বিবেচিত হন একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ নাটক হিসেবে বিবেচিত হয় তাঁর রচিত নাটক *চাকা*। সেলিম আল দীনের নাট্য রচনাকে অরুণ সেন কর্তৃক যে মূল চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে এর মধ্যে দ্বিতীয় ভাগের সবচেয়ে আলোচিত নাটক *চাকা*। সেলিম রচিত প্রথম ধাপের নাটকগুলো কিছুটা পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত ভিত্তিক নাটক হলেও মূলত দ্বিতীয় ভাগের নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি যে উত্তর-উপন্যাসবিশিষ্ট

* প্রভাষক, নাট্যকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

নাট্যভাষা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন তার প্রকাশ ঘটে। তাই চাকা নাটকের আলোকে রচিত এই গবেষণা প্রবন্ধটির লক্ষ ও উদ্দেশ্য হল সেলিম আল দীন বর্ণিত উত্তর-ঔপন্যবেশিক নিজস্ব নাট্য বিশ্লেষণের তত্ত্ব ও দক্ষিণ এশীয় আখ্যানকে বিশ্লেষণের যে তত্ত্ব পাওয়া যায় এর আলোকে নাটককে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করা যে, সেলিম আল দীনের নাটক উত্তর-ঔপন্যবেশিক এবং একই সাথে চাকা নাটকের মধ্য দিয়ে কিভাবে পাশ্চাত্যের কাউন্টার ডিসকোর্স হিসেবে বাঙালির নিজস্ব শেকড় সন্ধানের নাট্যভাষা নির্মিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত একটি গুণগত পদ্ধতির গবেষণা (Qualitative Research)। এখানে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্মটিকে দুটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে সেলিম আল দীন বর্ণিত উত্তর-ঔপন্যবেশিক নিজস্ব নাট্য বিশ্লেষণের তত্ত্ব এবং দ্বিতীয় ধাপে হাজার বছরের প্রাচীন দক্ষিণ এশীয় আখ্যান বিশ্লেষণের তত্ত্ব দিয়ে নাটকটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার মৌলিক উৎস হিসেবে সেলিম আল দীন রচিত চাকা নাটকের পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

প্রাচ্য তাত্ত্বিক যে জ্ঞান তা সর্বদাই প্রকাশ পেয়েছে টেক্সট (Text) এর মধ্যে দিয়ে। আজব এক ‘অপর’ হিসেবে যে প্রাচ্যের নির্মাণ ঘটেছে তার সর্বদাই বিরোধিতা করেছেন সেলিম আল দীন। প্রাচ্যকে নির্মাণের প্রক্রিয়ায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে যে দাবি পাশ্চাত্য করে এসেছে তাঁর সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে তার পাল্টা জবাব উঠে এসেছে সেলিম আল দীন প্রণীত কথানাট্য ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব ধারণার মধ্য দিয়ে এবং একই সাথে হাজার বছরের দক্ষিণ এশীয় আখ্যান ব্যাখ্যার ধরনের মধ্যে দিয়ে বাঙালির নিজস্ব নাট্যভাষা নির্মাণের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাই এই গবেষণা প্রবন্ধের তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে সেলিম আল দীন প্রণীত কথানাট্য ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব এবং কে আয়াল্লা পাণিকর এর দক্ষিণ এশীয় আখ্যানকে বিশ্লেষণের যে তাত্ত্বিক ১০টি উপাদান রয়েছে সেটাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা-প্রশ্ন

প্রাচ্যকে বিশ্লেষণের যে পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এর বিপরীতে গিয়ে সেলিম আল দীনের চাকা নাটক কাউন্টার ডিসকোর্স নির্মাণের মধ্যে দিয়ে শেকড় সন্ধানী নিজস্ব নাট্যভাষা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন তার স্বরূপ কী?

গবেষণা-গুরুত্ব

জ্যাক দেরিদা যে টেক্সট (Text) এর ধারণা দেন এই ধারণার মধ্যে দিয়েই নিম্নবর্ণকে বোঝা যায়। তবে সেটা উচ্চবর্ণের দৃষ্টিতে নিম্নবর্ণ। তেমনি পাশ্চাত্য যেভাবে দক্ষিণ এশীয় আখ্যানকে উপস্থাপন করে সেটাও পাশ্চাত্যের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সেলিম আল দীন তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে নিজেদের টেক্সট (Text) রচনা করেছেন যা সেলিম আল দীন প্রণীত কথানাট্য, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব ও হাজার বছরের দক্ষিণ এশীয় আখ্যানের তাত্ত্বিক কাঠামো দিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তাই বাঙালির

নিজস্ব নাট্যভাষা নির্মাণের প্রক্রিয়ার আলোকে পরিচালিত এই গবেষণা প্রবন্ধটি সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণা-সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণা প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা হল ঔপন্যাসিক উত্তরকালে সেলিম আল দীন যে অন্যতম একজন উত্তর-ঔপন্যাসিক নাট্যকার এই ধারণা নতুন নয়। একই সাথে নিজস্ব নাট্যভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে সেলিম আল দীন এর ২য় পর্বের তিনটি নাটক অর্থাৎ *চাকা*, *যৈবতী কন্যার মন* ও *হরগজ* এর মধ্যে থেকে এই গবেষণায় শুধুমাত্র একটি নাটক নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নিজস্ব নাট্যভাষা ও *চাকা* নাটক

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সম্পর্কের মূলে হল অপর (Other) আর নিজ (Self) এর সম্পর্ক। তাই উত্তর-ঔপন্যাসিক নাট্যকার সেলিম তাঁর নাটকে তুলে এনেছেন নিজকে (Self)। একই ভাবে জ্যা লাঁকা যে আয়না স্তরের কথা বলেন অর্থাৎ অপরকে দেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে চেনা। “লাকার মতে, ব্যক্তি মানুষ কেবলমাত্র নিজের বিপরীতে ‘অপরে’ অস্তিত্বের সাপেক্ষেই নিজের ভিতর ‘আমি’র অস্তিত্ব নির্মাণ করতে পারে। সাইদ এই একই যুক্তি প্রয়োগ করে দেখান যে, আধিপত্যশীল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রাচ্য সংস্কৃতির অপরাধের মধ্যে দিয়ে নিজের পরিচয় নির্মাণ করেছে।”^১ একইভাবে সেলিম আল দীনের নাটক ঔপন্যাসিক চিহ্ন মুছে দিয়ে হয়ে উঠেছে অদ্বৈত। ফলে খুব সহজেই সেলিম বর্ণিত উত্তর-ঔপন্যাসিক নিজস্ব তত্ত্বের আলোকে তাঁর *চাকা* নাটকটি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে সেলিম আল দীন তাঁর ‘মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

অন্যদিকে, বাঙলা নাটকের অভিনয়রীতিও পাশ্চাত্যের অনুকরণ সম্বৃত অভিনয়রীতি থেকে পৃথক। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় অভিনয়রীতি কাব্যিক সুষমাপূর্ণ (Poetic art) এবং তা জীবনের ব্যাখ্যা (An interpretation of life), অন্যদিকে ইউরোপীয় অভিনয় ‘প্রশ্নাতীতভাবে গদ্য’ অথবা শুধু ‘অনুকৃতি’ (Prose or imitation) কথাটা বাংলা-অভিনয়রীতি সম্পর্কেও প্রযোজ্য।^২

চাকা নাটকের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের দাসত্বের মুক্তি ঘটেছে কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত লম্বক ও তরঙ্গ ধারণার মাধ্যমে। যেখানে বিরাম চিহ্নের বিলুপ্তি ঘটেছে, বিলুপ্তি ঘটেছে দৃশ্য, অঙ্ক বিভাজনেরও। সেলিমের নাটকের ভাষা আত্মীকৃত পাশ্চাত্যের ভাষার অনুকরণে নয় বরং তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন সেই বাংলা ভাষাকে যেখানে বিরাম চিহ্নের শাসন নয় বরং হাজার বছরের বাংলা ভাষার নিজস্ব পয়ার ছন্দ, গীতলতা উঠে এসেছে। বাংলা ভাষার অন্তর্গত স্বকীয়তাই তার অর্থ প্রকাশে সক্ষম। ফলে এই আখ্যানে কোথাও পাশ্চাত্যের গদ্য কিংবা পদ্য রীতি অনুসৃত হয়নি। “আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো ‘ন্যারেটিভ’ ও ‘রিচুয়াল’ থেকে পৃথকীকৃত সুনির্দিষ্ট চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়।”^৩ ফলে *চাকা* নাটকে একই সাথে কখনো বর্ণনা এসেছে আবার কখনো তা হয়ে উঠেছে চরিত্র। কোন পাশ্চাত্যের রীতির মধ্যে একে আটকে রাখা যায়নি। কখনো ধরম ঠাকুর বর্ণনাকারী রূপে সাঁওতাল আখ্যান তুলে এনেছে আবার কখনো পইরাতের মুখে ইমাম হোসেনের কারবালায় পুঁথি উঠে এসেছে। ফ্রাঞ্জ ফানো এর মতে,

দেশীয় বুদ্ধিজীবীগণ আসলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গিলেছে। অবস্থাটা অনেকটা পোষ্য-সন্তান যেমন নতুন পারিবারিক কাঠামোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে, দেশীয় বুদ্ধিজীবীগণও তেমন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে

নিজের করতে চায়। তাঁরা রেবালে, দিদেয়ো, শেক্সপীয়র এবং এডগার এলেন পোর সন্ধান পেয়েই সন্তুষ্ট নয়, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাঁদেরকে তাঁরা যথাসাধ্য আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে।^৪

সেলিম এই সকল দেশীয় বুদ্ধিজীবীর বদলে হয়ে উঠেছেন সেই ভূমিপুত্র যিনি নিজেকে (Self) তুলে ধরেছেন অপরের (Other) সাপেক্ষে। অর্থাৎ অন্যকে জানার মধ্যে দিয়ে নিজের নাট্যভাষা নির্মিত হয়েছে। আবার যেমন সেলিম নিজে বলছেন,

গ্রীক দিওনিসুস উৎসবে (১৩শত খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি) পরিবেশিত সঙ্গীত ও নৃত্য; ক্রমবিবর্তনের ধারায় গ্রীক ট্রাজেডিতে রূপান্তরিত হল। কিন্তু নৃত্য-গীত-বাদ্যের যে ধারা সহস্র বৎসর পূর্বে ওড্রুমাগথী-রীতিতে প্রত্যক্ষ করি, তা প্রাচীন ও মধ্যযুগে অতিক্রম করে আজও বাঙলা নাট্যের মুখ্য অবলম্বন হিসেবে টিকে আছে।^৫

অর্থাৎ পাশ্চাত্যের যে কৃত্য থেকে পাশ্চাত্যের ট্রাজেডির জন্ম হয়েছে সেই একই কৃত্য হতে প্রাচ্যের নাটকের জন্ম হতে পারে না। তাই সেলিম খুঁজে এনেছেন প্রাচ্যের সেই ওড্রুমাগথী^৬ প্রবৃত্তি যার আওতাধীন ছিল বঙ্গ অঞ্চল। যেখানে প্রাচীন কাল থেকেই চর্চিত হয়ে আসছে 'চর্যাপদ'। যেখানে পাশ্চাত্যের ডিওনাইসিস নয় বরং প্রাচ্যের শিব, পার্বতী, ব্রহ্মা, মনসা, গাজীকালু, নাথ, বনবিবি, মানিকপীরের মত আরো লৌকিক ঈশ্বরের হাত ধরে নাট্যের সৃষ্টি ঘটেছে। তাই পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে নয় পাশ্চাত্যের কাউন্টার হিসেবেই নিজেদের নাট্যভাষা নির্মাণ করেছেন সেলিম আল দীন।

কথানাট্য ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব

গুস্তাব ফেইত্রাগের নাটক বিশ্লেষণের যে পিরামিড কাঠামো সেই দ্বন্দ্ব ভিত্তিক পাশ্চাত্য পন্থা অবলম্বনের বদলে সেলিম বেছে নিয়েছেন বাঙালির হাজার বছরের নাট্য আঙ্গিককে। যাকে সেলিম নামকরণ করেছেন কথানাট্য। অর্থাৎ হাজার বছরের দক্ষিণ এশীয় আখ্যানের যে পয়ার হৃন্দ ও গীতলতা তা সেলিম তুলে এনেছেন তাঁর কথানাট্যের মধ্যে দিয়ে। সেলিম বলেন, “আমি কথার শাসনে নাটক নির্মাণ করেছি। তাই এর নাম কথানাট্য।”^৭ কথানাট্যের আঙ্গিকে বর্ণনা ও সংলাপ অদ্বৈতরূপে গৃহীত হয়েছে। পাশ্চাত্য রীতিতে নাটক মাত্রই সংলাপ ভিত্তিক এবং সেখানে বর্ণনার কোনো অবকাশ রচিত হয় না। কথানাট্য এমন ধরনের এক নাট্য আঙ্গিক যেখানে কথক বা গায়ন গীত, পদ্য বা কথার মাধ্যমে কাহিনি উপস্থাপন করেন। ঠিক যেমন এই নাটকে বাহের গাড়োয়ান, ধরম কিংবা লাশ নিজে। একেকবার একেক জন কথক হয়ে উঠেছেন।

হে দর্শক শ্রোতামন্ডলী।।

কাকেশ্বরীর পারাপার সম্পর্কে বলি* আদি কাল থেকে এখন যাবত সকল নদীর পারাপারের কাজ কারবার প্রায় এক*^৮

নিদিষ্ট চরিত্র থেকে বেড়িয়ে এসে যেকোনো সময় যে কেউ হয়ে উঠতে পারেন কথক।

আবার সেলিম আল দীনের নাটক হয়ে উঠেছে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পআঙ্গিকে। পাশ্চাত্যের ডিওনাইসিসের ধর্মীয় যে কৃত্যমূলক পরিবেশনা থেকে নাট্যের সৃষ্টি বলে প্রচলিত ডিসকোর্স আছে তার কাউন্টার হিসেবে সেলিম দেখাতে চাইলেন আমাদের অঞ্চলে নাট্য এসেছে শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণবতত্ত্ব ও ইরানের সুফিতত্ত্বের আদলে। এখানে নাট্য হয়ে উঠেছে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। যেখানে একের মধ্যেই বহু আবার বহুর মধ্যেই একের অবস্থান। “এই শিল্পতত্ত্বে একের মধ্যে বহু এবং বহুর

^১ প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে চার রীতির অন্যতম আঞ্চলিক রীতি

মধ্যে একের লীন হবার দৃষ্টান্ত রূপে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য থেকে প্রভূত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়।^{১৮} সেলিম আল দীন এখানে ধর্মতত্ত্বকে শিল্পতত্ত্বে রূপান্তর করেছেন।

নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গভরণ -তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে^{১৯}

ঠিক যেমন চাকা নাটকে একই দেহের মধ্যে উঠে এসেছে গীত, নৃত্য কিংবা কাব্য। নাটকের কথাপুচ্ছ অংশে সেলিম বলেন যে,

চাকাকে কেউ যদি কাব্য বলেন আপত্তি করব না-গল্প বললেও অখুশী হব না। আমি সব সময় চেয়েছি আমার লেখা নাটকগুলো নাটকের বন্ধন ভেঙ্গে অন্য সব শিল্পতীর্থগামী হোক। কারণ শিল্পে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।^{২০}

যে কারণে চাকা নাটকে গান, সংলাপ, বর্ণনা, নৃত্য সকল কিছুই মেলবন্ধন ঘটেছে। চাইলে পাঠক একে পদ্য, গদ্য কিংবা সংলাপ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই পাঠ করতে পারেন।

জ্ঞান সর্বদাই ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচ্যকে কেন্দ্র করে যে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রাচ্যবাদী ডিসকোর্স পাশ্চাত্য নির্মাণ করেছে সেখানে প্রাচ্য উঠে এসেছে নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতির শেকড়বিহীন এক জাতি হিসেবে। পশ্চিম তার আইন ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক সহিংসতার (Epistemological Violence) যে মিথ নির্মাণ করেছে তার বিরোধিতা করেন ফ্রাঙ্ক ফেনো। ঠিক একই ভাবে সেলিম বিরোধিতা করেন তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে। যার পাল্টা জবাব হিসেবে সেলিম আল দীন নিজেকে তুলে ধরেছেন শেকড়সন্ধানী নাট্যকার হিসেবে। পুনরুজ্জীবন বাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনেছেন। যেখানে তাঁর নাটক কথানাট্য কিংবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের আলোকে নির্মিত একই সাথে হাজার বছরের নিজস্ব আখ্যানকে বিশ্লেষণের পদ্ধতি দ্বারাও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়ে উঠেছে।

কে আয়াল্লা পাণিকর ও ভারতীয় আখ্যানতত্ত্ব

প্রচলিত জীবন্ত সংস্কৃতির অংশ হিসেবে দক্ষিণ এশীয় যে সব আখ্যান পরিবেশিত হয় কে আয়াল্লা পাণিকর তাঁর তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করেছেন। পাণিকর তাঁর গবেষণার প্রাচীন কাল হতে শুরু করে আধুনিক কাল অবধি প্রচলিত লিখিত বা শ্রুতিবাহিত যে সকল দক্ষিণ এশীয় আখ্যান পরিবেশিত হয় তার মধ্যে এমন কিছু উপাদান খুঁজে এনেছেন যা সেই সকল আখ্যানকে পাশ্চাত্য ভিত্তিক আখ্যানের ধারণা থেকে আলাদা করে তুলেছে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের কোনোরূপ প্রভাব ছাড়াই ভারতীয় আখ্যান বিশ্লেষণে যে ১০টি প্রধান উপাদানের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল—

১. অন্তর্ভবন (Interiorisation)
২. ক্রমিকায়ণ (Serialisation)
৩. উৎকল্পনা (Fantasisation)
৪. চক্রীয়করণ (Cyclicalisation)

৫. রূপককরণ (Allegorisation)
৬. অজ্ঞাতনামা (Anonymisation)
৭. কালের স্থিতিস্থাপকায়ন (Elasticisation of Time)
৮. স্থানায়ন Spatialisation
৯. শৈলীকরণ (Stylisation)
১০. তাৎক্ষণিক অভিনয় (Improvisation)

ফ্রাঙ্ক ফেনো তাঁর *জগতের লাক্ষিত গ্রহের* জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনায় উল্লেখ করেন,

যে উপনিবেশিত লেখক জনগণের পক্ষে কলম ধরবেন, তাঁর উচিত ভবিষ্যতের দুয়ার খুলে দেবার জন্য অতীতকে ব্যবহার করা, তাঁর লেখা হবে কর্মের আহ্বান এবং আশা ভরসার ভিত্তি। যে উপনিবেশিত লেখক জনগণের পক্ষে কলম ধরবেন, তাঁর উচিত ভবিষ্যতের দুয়ার খুলে দেবার জন্য অতীতকে ব্যবহার করা, তাঁর লেখা হবে কর্মের আহ্বান এবং আশা ভরসার ভিত্তি।^{২১}

ঠিক সেলিম যেমনটা করেছেন। তিনি ফিরে গেছেন অতীতের কাছে। হাজার বছরের প্রাচীন দক্ষিণ এশীয় আখ্যানের ধরনকে তুলে এনেছেন। তাই কে আয়াক্সা পাণিকরের আখ্যান তত্ত্বের ১০টি বৈশিষ্ট্য আলোকে *চাকা* নাটক নিচে বিশ্লেষণ করা হল—

১. অন্তর্ভবন (Interiorisation)

এটি একটি বিশেষ স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া। একটি বর্ণনাত্মক আখ্যানের সাধারণত দুটি দিক থাকে। একটি আখ্যানের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য অন্যটি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। তবে অনেকক্ষেত্রেই এই দুই বৈশিষ্ট্য বিপরীত হতে পারে, অর্থাৎ একটা সাংঘর্ষিক দিক থাকে। আবার কিছু ক্ষেত্রে এই বাহ্যিক ও ভেতরগত কাঠামো একই সমান্তরালে চলতে পারে। আখ্যানের বাহ্যিক কাঠামো যখন পাঠক কে সম্মোহিত করে তখন অনেক ক্ষেত্রেই ভেতরগত অর্থ পাঠকের বোধগম্য নাও হতে পারে। অর্থাৎ বাহ্যিকতার ভেতরে যে স্তর তারও একটা অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে দক্ষিণ এশীয় আখ্যানের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। অর্থাৎ আখ্যানের ভেতর থাকে উপাখ্যান। যেমন: এই নাটকে চাকার অন্তরালে আছে লাশ, গাড়ি, চাকার আবর্তে আবর্তে জীবনের আখ্যান। জন্ম মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনের যে আবর্তন তাকেই তুলে ধরেছে এই আখ্যান। আবার সেলিম নিজে বলেন,

১৯৮৬-৮৭ সালের গণঅভ্যুত্থান আকস্মিকভাবে শুরু হলে অন্য সবার সঙ্গে আমিও সমান বিচলিত হই।। রাজনৈতিক দলের বাদানুবাদের আবর্তে শহীদদের শব নাম পরিচয়হীন দিগন্তের দিকে ভেসে যায়- এ রকম বেদনা চাকা নাটকের মূলে আছে।^{২২}

অর্থাৎ চাকার আবর্তে রাজনৈতিক বাদানুবাদে এক নাম পরিচয়হীন, ঠিকানাবিহীন লাশ কীভাবে হয়ে ওঠে মানব জীবনের প্রতীক সেই আখ্যানই ব্যাখ্যা করে এই নাটক। নাটকের কথাপুছ অংশে সেলিম আল দীন বলেন, “রাজনৈতিক অভিপ্রায় নাটকের শরীরে নেই—শিরায় হয়ত আছে।”^{২৩} অর্থাৎ আখ্যানের ভেতরগত বয়ান আর বাহ্যিক অর্থ এক নয়। অর্থাৎ বাইরে থেকে শুধুমাত্র একটি লাশের গল্প বলে মনে হলেও এই গল্পের ভেতরের স্তরে রয়েছে একের পর এক আখ্যান। এক নামহীন লাশের গল্পের আড়ালে জীবন উঠে এসছে ভিন্নভাবে। আবার একই সাথে নৈসর্গিক

প্রকৃতি, পইরাতদের গল্প, সাঁওতালি উপাখ্যান উঠে আসে। একের ভিতর দিয়ে এক নতুন গল্প উঠে আসে। কিন্তু শেষ অবধি সব কিছুই গিয়ে মেলে চাকার শরীরে।

২. ক্রমিকায়ণ (Serialisation)

আখ্যানের গঠনকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ক্রমিকায়ণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি আপেক্ষিক ভাবে শিথিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি উপাদানের ভেতরেই রয়েছে ক্রমিকায়ণ। এই ক্রমিকায়ণ অর্থ একের পর এক হলেও তা পাশ্চাত্য আখ্যানের মত চূড়ান্ত জটিল অবস্থামুখী নয়। বরং এ অঞ্চলের আখ্যানে একের পর এক নতুন উপাখ্যান উঠে আসে। আবার ফিরে যায় পেছনে পূর্বের সেই গল্পের কাছেই। যেমন: চাকা নাটক লম্বক তরঙ্গে বিভক্ত। নাটকের পর্বের মধ্যেই শিথিলতা রয়েছে। যা নাটকের নিজস্ব শৈলীতে পরিণত হয়েছে।

শুকুর চান: একটু খানি পায়ের পাতা দেখা যায় গো চাচা।^{১৪}

মূল লাশের গল্প হতে অন্য নতুন গল্পে চলে আসে। এপিসোড তৈরি হয় গল্পের মধ্যে দিয়ে। অন্যান্য আখ্যানের মত শুরু, মধ্য, শেষ নেই। গঠন শৈলী শুধুমাত্র এক রৈখিক নয় তবুও মূল গল্প হারায় না। শিথিলতা রয়েছে। একদিকে এলংজানি হাসপাতালের বর্ণনা অন্যদিকে ধরম ঠাকুরের উপাখ্যান। একের পর কাহিনি এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মাঝে সময়ের ব্যবধান অনেক। এক কাল থেকে চলে যায় অন্য কোনো কালে। তবুও আবার ফিরে আসে মূল গল্পে। আবার এক সময় উঠে আসে কারবালায় গল্প কিংবা বিয়ে বাড়ির উপাখ্যান এক নতুন গল্পের আভাস দেয়। গল্পের পর গল্প এগিয়ে যায় আবার ফিরে আসে সেই লাশের কাছেই। পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব ভিত্তিক কোনো একরৈখিক (Linear) কাঠামো নয় বরং এই নাটকে ক্রমিকায়ণ ঘটে শিথিলতার মধ্যে দিয়ে।

৩. উৎকল্পনা (Fantasisation)

কল্পনা কঠিন বাস্তবকে সহিতে পারার এক রাস্তা হিসেবে সব সময় পাঠক ও লেখকের কাছে উঠে এসেছে। ইতিহাসের শুরু হতে প্রশ্ন এসেছে বাস্তব কী? বাস্তবের স্বভাবটা কী? বাস্তব হল বাহ্যিক। যা উপর তল হতেই দেখা যায়। উৎকল্পনা মানুষকে অ্যাবসার্ড রিয়েলিটি থেকে অনুভূত বাস্তবতার দিকে নিয়ে গেছে। বাহ্যিক অর্থাৎ উপরের যে বাস্তবতা তা রূপান্তরিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পুরাণে পরিণত হয়েছে। জনস্মৃতি বা মিথ তৈরি হয়েছে যা দুর্দান্ত একটা Inter play নির্মাণ করেছে। মিথের যে স্থিতিস্থাপকতা তা গড়ে উঠেছে। এর কারণে কল্পনা এত বৃহৎ ভাবে উঠে এসেছে।

এই উপমহাদেশীয় আখ্যানে কল্পনা একটা কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। লেখকের কল্পনা থেকে পাঠকের কল্পনা ভিন্ন হয়ে ওঠে। আর এটা তখনই সম্ভব হয় যখন কল্পনাকে ছাড়িয়ে উৎকল্পনা (ফ্যান্টাসি) চলে আসে। পর্যবেক্ষণকৃত বাস্তবতা থেকে অনুভূত বাস্তবতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ অঞ্চলের মানুষ পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করেছে সংশ্লেষিত কল্পনা শক্তি হিসেবে। এটা একটা পৌরাণিক ফ্রেম ওয়ার্ক। এটি একটি সমন্বিত মনোভঙ্গি। এই আখ্যানগুলো পৌরাণিক কাঠামো দেয়। পর্যবেক্ষণ কৃত বাস্তবতার বিপরীতে অনুভূত বাস্তবতার সম্পর্কে একটি সমন্বিত মনোভঙ্গি তুলে ধরে।

সেই খেজুর চাটাই মোড়া লাশকে ঘিরে যেসব গল্প ও কল্পনা তাৎক্ষণিক ভাবে তৈরী হয় লোকপুராণ ও বৈদিক কথকতা সকল ভুবনে ভুবনে প্রায় সে ভাবেই তৈরী হয়। উপস্থিত লোকদের কথাকে ধ্যে

সোনাকরের ছাই ধোয়া যে স্বর্ণকণা পাই তা হল এই দৈত্য যুবক শ্রমজীবর বুকে নখ ফুটিয়ে প্রথমে রক্ত ও পরে গিলা কলজে খেয়ে নিয়েছিল^{২৫}

আবার প্রথম লম্বক চতুর্থ তরঙ্গে বলতে শুনি, “এক অতিকায় দৈত্য এই যুবক শ্রমজীবর বুকে নখ ফুটিয়ে প্রথমে রক্ত ও পরে গিলা কলিজা খেয়ে গিয়েছিল।”^{২৬} রাজনৈতিক দলের বাদানুবাদে রাষ্ট্রীয় প্রধান এখানে অতিকায় দৈত্যের রূপে উঠে এসেছে। কিংবা আবার যখন শুনি, “কাল সন্ধ্যায় কপিশবর্ণ মেঘ বান্দর নাচানীর ডমরু বাজিয়েছে। ঈশানে ধূসর মেঘ ক্রমে কপিশ হল^{২৭}” এখানে লেখকের কল্পনা আর পাঠকের ব্যাখ্যা মিলেমিশে একাকার।

৪. চক্রীয়করণ (Cyclicalisation)

যেকোনো কাহিনি একটি মানসিক গঠন মাত্র। বর্ণনার শিল্প এমন একটা ধারণা যা একটি প্রচেষ্টা মাত্র। যে প্রচেষ্টা গল্প তৈরি করে। তরল, প্রবাহমান একটা গল্প। অর্থাৎ গল্পের গতি একবার এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে। গল্পগুলো গঠিত হচ্ছে একবার এগোনোর গতিতে আবার পেছনোর গতিতে। এটি প্রবাহমান। এ অঞ্চলের গল্প একটি মাত্র দ্বন্দ্ব নিয়ে চলে না। তরল ধারণার বোধ দেয়। পাশ্চাত্যের মত একটি নির্দিষ্ট দ্বন্দ্ব নয় বরং এখানে গল্প বহমান।

দিন ও রাতের যে আবর্তন। দিন হতে রাত আবার কালের আবর্তে রাতের পর দিন। জন্ম, মৃত্যু, বেড়ে ওঠা, ঋতুচক্র আবর্তিত হচ্ছে। মানুষ যে সভ্যতার সৃষ্টি করেছে তাঁর বাইরে কিছু ধাবমান এক অক্লান্ত চক্র আছে। ঘূর্ণায়মান চক্রাকার যে জীবন চক্র। পুনর্জন্মের যে ইতিহাস অর্থাৎ চক্রীয়করণ ঘটে। এক অবিনাশিতা আছে এই প্রাকৃতিক পৃথিবীতে। জন্ম-যাপন-মৃত্যু (Order of life) এর আবর্তনেই মানব জীবন। কিংবা মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এই চক্রের সমাপ্তি নয় তাইতো চাকার আবর্তে যে লাশ বহমান এই লাশ কেবল মাত্র একটি লাশ নয়।

আবার এই অঞ্চলে ঈশ্বর আসেন অবতার রূপে। তাঁর পূর্ণজন্ম ঘটে। ভালো মানুষের যেমন জন্ম হয় আবার খারাপ ও আসে। ফলে ঈশ্বর আবার পুনরায় আবর্তিত হচ্ছে। সূর অসূরের পূর্ণ চক্রীয়করণ। জন্ম মৃত্যুর চক্রের মধ্যে দিয়ে যে চক্র তা এই চাকা আখ্যানে পাওয়া যায়। হতে পারে এটা একটি দার্শনিক ধারণা কিন্তু দক্ষিণ এশীয় আখ্যানে এটা একটি হাতিয়ার। গল্প পৃথিবীতে একটাই। যা বারবার পঠিত হয়। বহুমাত্রিক চক্রীয়করণ।

মৃত্যুর পর মৃতের সঙ্গে জীবিতের পরিচয় একক ও প্রত্যুত্তরবিহীন^{২৮} তবু কি আশ্চর্য ওদের তিনজন এরই মধ্যে ভুল ঠিকানায় লাশটিকে নিজেদের সঙ্গী করে তুলেছে।। মাইলের পর মাইল এক সঙ্গে চলেছে ওরা কাজেই এই মৃতকে আর অপরিচিত ঠেকেনা^{২৯} চাকার আবর্তনে আবর্তনে অপরিচিত থেকে পরিচয় ক্রমে গাঢ় ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে।।^{৩০}

চাকা লাশ বহন করে চলেছে শেষ পর্যন্ত। দিন রাতের আবর্তে চক্রীয়করণের মধ্যে দিয়ে। শেষমেশ লাশ বহন করে নিয়ে গেছে। রাষ্ট্র যেখানে এই লাশের দায় নিতে ব্যর্থ কিন্তু তিনজন অতি সাধারণ মানুষ এই দায় বহন করেছে। মনুষ্যত্ব জয় যুক্ত হয়েছে। রাস্তার উপর চাকা ও গরুর খুরের দাগ রেখে গেছে।

৫. রূপককরণ (Allegorisation)

দক্ষিণ এশীয় আখ্যানে রূপক অর্থে উঠে আসে জীবনের নানা গল্প। যেমন এ অঞ্চলের পৌরাণিক গল্পে কোনো পশু পাখির গল্পের আদলে পাই নৈতিকতার আভাস। পাণিকর তাঁর লেখায় যেমন

পঞ্চতন্ত্রের উল্লেখ করেন তেমনি চাকার রূপকে বহমান জীবনের চলমানতা কীভাবে মৃত্যুকে বহন করে এবং মানবিক দায়ে নিষ্পত্তি ঘটে তাই এই নাটকে রূপক হিসেবে উঠে এসেছে।

চাকা চলছে লাশ বয়ে নিয়ে। চক্রাকারে। দিন শেষ হয়ে রাত নেমেছে, চাঁদ উঠেছে। সাঁওতালদের জনকথা উঠে এসেছে। জন্ম মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবন বয়ে চলেছে চক্রাকারে। তাই চাকা এসেছে রূপক হিসেবে। গল্পটা শেষমেশ কী? পুরো নাটক এক রূপক হয়ে উঠেছে। এই রূপক হচ্ছে কয়েকজন মানব সভা একটি গরুর গাড়িতে করে লাশ নিয়ে যাচ্ছে। চাকা যেমন ঘূর্ণায়মান ঠিক তেমনি চাকার মত ঘূর্ণায়মান এ মানব সমাজে জীবন চলছে। এবং একই সাথে মৃত্যুও চলছে। জীবন ও মৃত্যু চাকার রূপকে উঠে এসেছে। আবর্তনশীল চাকা লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মৃতের মৃত্যু উঠে আসে। তাইতো জিরো পয়েন্টের নূর হোসেন হয়ে ওঠে নবীনপুর বা নয়নপুরের হোসেন আলী কিংবা হোসেনালি। রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার দ্বায় তাই শেষ পর্যন্ত রূপকায়িত হয়ে উঠেছে লাশের জবানে—

আমার শরীলটা গোরে ছেপে না দিলে শান্তি পাই না* পচন ধইরেছে গো হামাকের সঙ্গীগণের বমি আসে
তোমাকের পচা গন্ধে মোর পচাগন্ধে মোরই বমি আসতেছে ^{১৬}

৬. অজ্ঞাতনামা (Anonymisation)

কাহিনির রচয়িতা কে? দক্ষিণ এশীয় অনেক আখ্যানের রচয়িতা ঠিক কে ছিল? নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত ভারতের শতপুত্র কারা? —তারা একক কেউ ছিলেন কি না তা জানা যায় না। এ অঞ্চলের আখ্যানের রচয়িতা সামষ্টিক অর্থাৎ অনেকে মিলে রচনা করা। বিশেষত অপৌরুষেয়। গল্পের উৎস কী তা জানা যায় না। আখ্যান ব্যক্তির অধীনে নয় সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ সবার অধীনে।

নাটক হিসেবে চাকা সেলিম আল দীন রচনা করেন। প্রাগ-আধুনিক আখ্যানগুলো যেহেতু অপৌরুষেয়। এখানে ব্যক্তি সেলিম পৌরুষেয় হলেও চাকার যে রচনাইশলী তা অপৌরুষেয়। উপস্থাপনের ধরন বর্ণনাত্মক। দর্শক এর সাথে অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যখন একজন কথক কথা বলে তখন তাঁর যে কর্তাব্যাক আত্মসত্তা তা ছাপিয়ে যারা শুনবে বা দেখবে সবাই কর্তা হয়ে ওঠে। সামষ্টিক নেতৃত্ব তৈরি হয়। সামষ্টিক পাঠময়তা নির্মিত হয়।

সেলিম রচিত নাটক পৌরুষেয় কিন্তু এর ব্যাখ্যা অপৌরুষেয়। বর্ণনাত্মক আখ্যানে দর্শক ও কথক এক হয়ে ওঠে। আবার একজন কথক কখনো হয়ে ওঠেন গাড়োয়ান বাহের কিংবা ধরম ঠাকুর। কিংবা মৃত লাশ যখন নিজেই হয়ে ওঠে কথক।

৭. কালের স্থিতিস্থাপকায়ন (Elasticisation of Time)

দক্ষিণ এশীয় আখ্যানে সবসময়ই সময়কে টেনে ধরে আবার ছেড়ে দেয়া হয়। এক কথায় হয়তো বার বছর কেটে যায় কিংবা বলা হয় একদা এক দেশে ছিল এক রাজা। কোন দেশে, কোন কালে তা এখানে আপেক্ষিক। বহু পুরোন অতীত এক কথায় চলে আসে। ফলে এ অঞ্চলের আখ্যানে কালের ধারণা স্থিতিস্থাপক। এ অঞ্চলের আখ্যানে সময় ঘড়িতে আটকে নেই। সময় চলমান। সময় থেমে থাকে না। চরিত্রগুলোর মধ্যে যে সময় সংক্রান্ত আখ্যান যা মনস্তাত্ত্বিক ভাবে জড়িত। ১৯ শতকের পাশ্চাত্য কাহিনির সাথে ঐতিহ্যবাহী দক্ষিণ এশীয় আখ্যানের অন্যতম প্রধান পার্থক্য হল তা মনস্তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় না।

হয়তো আখ্যানগুলো কখনো সংকলিত তা হয়তো পাওয়া যেতে পারে কিন্তু মূল গল্প কবে, কার তা পাওয়া সম্ভব না। টাইম ফ্রেমের মধ্যে একটা টাইমলেস ব্যাপার থাকে। সময়ের মধ্যে দিয়ে তরলতা (ফ্লুয়িডিটি) পাই যা অনৈতিহাসিকতার ধারণা দেয়। ফলে এ অঞ্চলের আখ্যান ইতিহাস সম্মত না বরং পুরাণ-সম্মত। অর্থাৎ জীবনের সত্য যেকোনো সময় প্রযোজ্য।

৯০ এর গণ অভ্যুত্থান চাকা নাটকের মূল আখ্যান হলেও সমকালীন সময়েও এই পটভূমি একই সাথে সময় উত্তীর্ণ। সময়কে অতিক্রম করে যায়। সময়টা কনসেপ্টচুয়াল ইলাস্ট্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এমন এক সর্বজনীন আখ্যান রচিত হয়েছে যা যুগে যুগে কালে কালে আবর্তিত হবে এক রূপে। এমন এক লাশ যা এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কাঁটাতার ডিঙিয়ে হয়ে উঠেছে সর্ব দেশের, সর্ব কালের। ধর্ম যখন সাঁওতালের চোখ দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস বলে। তখন মনে হয় অনেক আগের কথা বলা হচ্ছে।

হো হো ধর্ম ঠাকুর
মো দেয়াসী তুর।।
ধর্ম ঠাকুর ঢাককুরাকুর
ধর্ম ঠাকুর ঢাককুরাকুর।^{২০}

আবার যখন কথক প্রশ্ন করে, “নাচানাচি করেন ক্যা* লাশে গুণা দিবু হ* জলদি গাঙ পাড়ি দিয়ে চলেন।”^{২১} তখন মনে হয় এটা এই মুহূর্তের ঘটনা। অর্থাৎ সময়কে অতিক্রম করে যায় আখ্যান।

৮. স্থানায়ন (Spatialisation)

দক্ষিণ এশীয় আখ্যান গুলোতে স্থান গুরুত্বপূর্ণ। সময় নির্দিষ্ট থাকে না কিন্তু স্থান নির্দিষ্ট থাকে। আখ্যানের ধারণাগুলো এমনই। ২য় তরঙ্গের ১ম লাইনে পাই, “একদিন বৈশাখের কোন এক কালে কাকেশ্বরী নাম গাঙের পারে একটি গঞ্জ। এলংজানি।”^{২২} অর্থাৎ সময় অনির্দিষ্ট কিন্তু স্থান নির্দিষ্ট। কোন বছরের বৈশাখ মাস তা নির্দিষ্ট নয় কিন্তু নদী নির্দিষ্ট, নির্দিষ্ট গাঙের নামও। আবার কাকেশ্বরীর ভাঙ্গা পাঁড়ে যে বটগাছটি ত্রিভঙ্গ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাও নির্দিষ্ট। অজ্ঞাতনাম মৃতের উদ্দেশ্যে গাড়েয়ানকে বলতে শুনি, “এইতো সামনের গাঁও নয়ানপুর এইতো আপনি নেমে যাবেন*”^{২৩} লাশের ঠিকানা নবীনপুর বা নয়নপুর সে যে ঠিকানাই হোক না কেন তার একটা নির্দিষ্টতা আছে।

৯. শৈলীকরণ (Stylisation)

দক্ষিণ এশীয় আখ্যানে সব কিছুর মধ্যে দিয়ে একটা বিশেষ শৈলী নির্মিত হয়। কাব্যময়তা, উপমা, কল্পনা সব মিলিয়ে একটা শৈলী নির্মিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের হুবহু রূপকায়ণ নয়, বিশেষায়িত নয়। লম্বক, তরঙ্গ, বর্ণনা, কথানাট্য সব মিলিয়ে একটা শৈলী তৈরি হয়। এই নাট্যশৈলী পাশ্চাত্য নাট্য থেকে একদম ভিন্ন। এখানে একই সাথে গান, কথা, বর্ণনা উঠে এসেছে। যেমন: দ্বিতীয় লম্বক প্রথম তরঙ্গে পুতুল নাচের গান পাই,

দেখ দেখ সহচরী
দেখলো নয়ন ভরি
খেলিছে তোমার হরি এসে যমুনায়।।
এমন চাঁদের ছবি
গগনে উদয় রবি

কাল মেঘ লুকে বেড়ায় এসে যমুনায়ে।^{২৪}

আবার হুট করেই উঠে আসে কথকের বর্ণনা। এরমধ্যে দিয়ে নিজস্ব নাট্যশৈলী নির্মিত হয়েছে।

১০. তাৎক্ষণিক অভিনয় (Improvisation)

যেকোনো থিয়েটারে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন ঘটে। তাৎক্ষণিকতা দক্ষিণ এশীয় আখ্যানের বৈশিষ্ট্য। আখ্যানগুলো তাৎক্ষণিক ভাবে স্মৃতি ও শ্রুতিবাহিত হয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন ঘটায়। যখন পরিবেশিত হবে তখন নতুন কিছু যুক্ত হবে। পাণিকর এর মতে, “Stylisation is discipline, improvisation is freedom.”^{২৫} অর্থাৎ নিজস্ব নাট্যশৈলীর মধ্যে দিয়ে শৃঙ্খলা নির্মিত হয়েছে তার উত্তরণ ঘটেছে এই তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে।

চাকাকে সেলিম কথানাট্য বলছেন। কথা বলে বলে এই নাটক। আবার একই সাথে বর্ণনাত্মক হবার ফলে কথকই কখনো হয়ে ওঠে চরিত্র আবার যেকোনো চরিত্র যেকোনো সময় কথক হয়ে উঠতে পারেন। ফলে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন আছে পুরো নাটক জুড়েই।

উপসংহার

১৯৮৬-৮৭ সালের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠা এই আখ্যানের মূল চরিত্র কোনো-এক নবীনপুর, নয়নপুর বা নাম না-জানা কোনো-এক অচেনা গাঁয়ের হোসেন আলী, হোসেনালী বা অন্য কেউ। রাষ্ট্র নামক যন্ত্রের রাজনৈতিক দ্বন্দের শিকার এই যুবকের মৃত্যু দায় আসলে কার? জীবনের আবর্তে যেমন জন্মের পর মৃত্যু আসে তেমনি চাকার ঘূর্ণায়নের রূপকে এই আখ্যান তুলে আনেন জীবন থেকে জীবনের পটভূমি। রাষ্ট্রযন্ত্র যখন এই লাশের দায় নিতে ব্যর্থ তখন তিনজন অতি সাধারণ ভূমিপুত্র এই দায় তুলে নিয়েছেন নিজেদের কাঁধে। রাষ্ট্র যদি এখানে অপর (Other) হয় তাহলে এই তিনজন ভূমিপুত্র হয়ে উঠেছেন সেই নিজ (Self) যারা সাহস রাখে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব রক্ষার। ঠিক যেভাবে সেলিম তুলে নিয়েছেন প্রাচ্যের দায়। ফলে এক অতি সাধারণ ভূমিপুত্র হয়েও তিনি স্পর্ধা করেছেন পাশ্চাত্যের মহাবয়ানকে নাকচ করবার। একই সাথে তিনি ফিরে গেছেন হাজার বছরের বাঙালির শেকড়ের কাছে। ১৮ বা ১৯ শতকের পাশ্চাত্যের নির্মাণ নয় বরং এই অঞ্চলের নাট্যভাষা হাজার বছরের প্রাচীন। তাই সেলিম বর্ণিত বাঙালির নিজস্ব নাট্যতত্ত্ব ও হাজার বছরের দক্ষিণ এশীয় আখ্যান তত্ত্ব প্রয়োগ করে চাকা নাটক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্পষ্টতই এই ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, পাশ্চাত্যের একরৈখিক ডিসকোর্সের বিপরীতে শেষ-অবধি পাশ্চাত্যের কাউন্টার ডিসকোর্স হিসেবেই তিনি তুলে এনেছেন শেকড় সন্ধানী নিজস্ব নাট্যভাষাকে।

তথ্যসূত্র

১. মাসউদ ইমরান, রহমান জর্জি, ‘প্রাচ্যবাদ’, মাসউদ ইমরান (সম্পাদিত) *ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০), পৃ. ৩৩৫
২. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৪
৩. তদেব, পৃ. ০৪

৪. ফ্রাঞ্জ ফেনো, আমিনুল ইসলাম ভূইয়া অনুদিত *জগতের লাঞ্ছিত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ১৭৫
৫. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২
৬. সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র-৪* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯), পৃ. ১৬৩
৭. তদেব, পৃ. ১৩২
৮. সেলিম আল দীন, “বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের পূর্বাপর”, *থিয়েটার স্টাডিজ*, ৩য় সংখ্যা, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৯৫, পৃ. ৯
৯. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
১০. সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪
১১. ফ্রাঞ্জ ফেনো, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯
১২. সেলিম আল দীন, *রচনাসমগ্র-৪*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২
১৩. তদেব, পৃ. ১৬২
১৪. তদেব, পৃ. ১৩৬
১৫. তদেব, পৃ. ১৩৩
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৩
১৭. তদেব, পৃ. ১২৬
১৮. তদেব, পৃ. ১৫৫
১৯. তদেব, পৃ. ১৫৩
২০. তদেব, পৃ. ১৩৪
২১. তদেব, পৃ. ১৩৪
২২. তদেব, পৃ. ১২৫
২৩. তদেব, পৃ. ১৪৫
২৪. তদেব, পৃ. ১৩৯
২৫. K.Ayyappa Paniker, *indian narratology* (New Delhi: Indira Gandhi National Center for the Arts, 2003), p. 16

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অন্য ঘরে অন্য স্বর : আত্মপরিচয়ের সংকট

জান্নাতুল কানন বনি*

Abstract

Akhtaruzzaman Ilyas (1943-1997), is considered as the greatest writer of the time. His first storybook 'Annya Ghare Annya Swaar' was published in 1976. Akhtaruzzaman Ilyas's 'Annya Ghare Annya Swaar' is an attempt to know oneself in one's own light, one's own ability by breaking the invisible web of inferiority in an unequal social reality. The crisis that takes its most pronounced shape in a person who grows up in a contradictory, bloody, sham national history and bourgeois society is the 'crisis of self-identity'. This crisis is a frustrating experience even for the free-spirited writer. Akhtaruzzaman Ilyas is a biographical writer in post-partition Bengali fiction who has felt this experience himself and presented it in the pages of literature in his own style. His first storybook 'Annya Ghare Annya Swaar' is the pasture of new idioms and mannerisms; documenting the origins of skepticism, hesitation and compassion. The subject of the article is the author's self-realization under the cover of the harsh reality of the stories included in the book and the analysis of the individual's self-identity crisis and willingness to overcome this.

সারসংক্ষেপ

সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে অভিহিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। এক অসম সমাজবাস্তবতায় দাঁড়িয়ে হীনম্মন্যতার অদৃশ্য জাল ছিন্ন করে নিজের আলোয়, নিজের সামর্থ্যে, নিজেকে চেনার প্রচেষ্টা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'। স্ববিরোধী, রক্তাক্ত, ছলাকলাপূর্ণ জাতীয় ইতিহাস ও বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা ব্যক্তির মধ্যে সবচেয়ে প্রকট আকার ধারণ করে যে সংকট তাহলো 'আত্মপরিচয়ের সংকট'। এই সংকট মুক্তমনের অধিকারী লেখকের জন্যও এক হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা। বিভাগান্তর বাংলা কথাসাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এমন এক জীবনবাদী লেখক যিনি নিজে এই অভিজ্ঞতা অনুভব করেছেন এবং সাহিত্যের পাতায় তা তুলে ধরেছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিমায়। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' সেই নতুন বাকভঙ্গিমা ও আঙ্গিকের মুখপত্র; সংশয়, দ্বিধা ও করুণার মূলোৎপাটনের দলিল। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলোর রূঢ় বাস্তবতার প্রচ্ছন্নে লেখকের আত্মোপলব্ধি এবং প্রত্যক্ষে ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের সংকট ও উত্তরণের সদিচ্ছার বিশ্লেষণই আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য।

চাবিশব্দ : উপনিবেশবাদ, মধ্যবিত্ত, অস্তিত্ববাদ, সমাজবাস্তবতা, আত্মোপলব্ধি

১

নির্মোহ বাস্তবতার রূপকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ষাটের দশকে যাত্রা শুরু করলেও তাঁর সাহসী কলম গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে মূলত সত্তরের দশকে। প্রথম গল্পগ্রন্থই প্রকাশ পেলে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সৃষ্টিশীলতার ব্যতিক্রমী সুষমা। 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গ্রন্থের নামই যেন রহস্যে ঘেরা। কি সেই 'অন্য'? কেবলই শিল্পের প্রয়োজনে শিল্প, নাকি ইচ্ছাকৃত অনুপ্রাসের দোলা। চেনাজানা পথেরও

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ কলেজ, বাংলাদেশ

যেমন অজানা বাঁক থাকে, পরিচিত মুখের আড়ালেও যেমন থাকে অচেনা রূপ ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ ঠিক তেমনই এক শিল্পস্বাক্ষর। মানব বসতির সূচনাপর্ব থেকে এই ভূখণ্ড ভৌগোলিক সীমারেখায় যেমন বারবার পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি নানা জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের পদচারণায় হয়েছে কল্লোলিত। বিদেশি শক্তির দ্বারা বারংবার লুণ্ঠিত ও নির্যাতিত এই ভূখণ্ডের মানুষের মাঝে একটি ধারণা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহলো ‘অপরতাবোধ’। আর্যদের আগমনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই ‘বোধ’ পরবর্তীকালে মধ্য ও পশ্চিম এশীয় মুসলিম রাজশক্তির শাসনকাল পেরিয়ে ঔপনিবেশিক প্রভুদের দ্বারা আধুনিক চিন্তাধারায় লালিত মানুষের মগজেও স্থান করে নিয়েছে নির্দিধায়। অপরতাবোধিক বোধটির স্বরূপ হলো সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি শ্রেণি নিজেদের প্রভুর আসনে অধিষ্ঠিত করে এবং তারা নিজেরা we ও বাকিরা other। এই other এর অর্থ যদি ‘অপর’ বলি তাহলে ‘অপর’ বলতে বাংলাভাষায় যা বুঝানো হয় তাহলো ‘বিজাতীয়, ইতর, নিকৃষ্ট, অব্যবহৃত’। আবার ‘অন্য’ শব্দটিকেও ভাবার্থে বলা যায় ভিন্ন, অপর, পৃথক, স্বতন্ত্র। অতএব ‘অন্য’ এবং ‘অপর’ শব্দদুটো প্রায়োগিক দিক থেকে অভিন্ন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অপরতাবোধিক বোধটির প্রত্যক্ষ প্রভাব এই গ্রন্থে লক্ষণীয়। এই অপরতাবোধের বহিঃপ্রকাশ আমরা আরো আগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে পেয়েছি। তবে সেই বোধের পশ্চাতে মুখ্য ছিল সর্বভারতীয় সমাজব্যবস্থা আর ইলিয়াসের লেখনীর মূলে সক্রিয় থেকেছে উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা ও উপনিবেশবিরোধী মনোভাব। আবার ‘অন্য স্বর’ কথাটির মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র বা পূর্বে শ্রুত নয় এমন কিছুও বুঝিয়ে থাকবেন লেখক। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় সুশান্ত মজুমদারের বক্তব্য-‘পুরনো বাসী, মেকি খারিজ করে দিতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই ‘অন্য স্বর’ ভাবার্থে ভিন্ন, অপর, পৃথক, স্বতন্ত্র যাই হোক না কেন তা পূর্বে শ্রুত নয়।’^২

২

১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা কর্তৃক ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এই ভূখণ্ডে আগমন ঘটে ঔপনিবেশিক শক্তির। প্রত্যক্ষ শাসন শোষণের অন্তরালে নিজেদের প্রভু ও এদেশীয়দের ভৃত্য বা দাস হিসেবে বিবেচনার রেওয়াজ চালু রাখার অভিপ্রায়ে চিন্তায় ও কর্মে একটি কেরানি শ্রেণি তারা গড়ে তোলে। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সেই আকাজক্ষারই বহিঃপ্রকাশ। পুঁজিবাদ থেকে জন্ম নিলেও এই শ্রেণির গাঁটছড়া বাধা ছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রজাত মূল্যবোধের সঙ্গে। স্বাধীনশ্রমে বিমুখ ও সৃষ্টিতে অনুৎসাহী এই শ্রেণির মধ্যে একটি বিষয় প্রকট ছিল, তাহলো শাসকের প্রতি ভয় এবং সেই ভয় থেকেই তোয়াজ করার মনোভাব। ফলে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দুর্দান্ত প্রতাপে সদ্য ভূমিষ্ঠ মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজস্বতাকে বলি দিয়ে আধিপত্যবাদীর দাসে উপনীত হয়। অবাধ বিকাশের আকাজক্ষার অন্তরালে ধীরে ধীরে তারা হয়ে পড়ে আত্মপরিচয়হীন। ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর পাকিস্তানের ‘পূর্ব বাংলার’ প্রাদেশিক রাজধানী হয় ঢাকা এবং এই শহরকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে বিকাশ ঘটতে থাকে নব্যশিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির। কিন্তু পূর্ব বাংলা স্বাধীনতা পেয়েও স্বাধীন হয়নি, কার্যত ঘটেছিল উপনিবেশবাদের হস্তান্তর।^৩ এই মধ্যশ্রেণি সম্পর্কে আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর ‘উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এই শ্রেণি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল দিক দিয়ে একান্ত বার্ষক্য জীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে এবং দ্রুত অধঃপতনের গহ্বরে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের সমাজ পুনরায় এক ক্রান্তিকাল বা যুগসংক্রান্তির মধ্য দিয়ে চলছে।’^৪

১৯৪৭-১৯৭১ দীর্ঘ ২৪ বছরের শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটল নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। স্বাধীন হলো দেশ কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত সেই মুক্ত স্বাধীন জীবন কী পেয়েছিল বাংলার মানুষ! আহমদ শরীফের মতে, 'যারা ছিল বাঙালির মাথা'সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভেবেছিল স্বাধীন দেশে তাদেরও রয়েছে সমান সুবিধা নিয়ে বাঁচার অধিকার, মত প্রকাশের সুযোগ কিন্তু বাস্তবে ঘটল তার উল্টো। স্বাধীনতার প্রশ্নে আন্দোলনে নেতৃত্ব ও জীবন দানকারী সমাজের সেই মধ্যশ্রেণি পুনরায় অস্তিত্ব রক্ষা ও আত্মপরিচয়ের সংকটের কাতারে এসে দাঁড়াল। নিজস্বতাকে ছাপিয়ে মেকিভাব, সত্যকে আড়াল করে ছলনার মায়াজাল, মেধাকে উপেক্ষা করে ক্ষমতার দাপট সবমিলিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের সকল পথ হয়ে পড়ল রুদ্ধ। এই সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তির সারিতে সমকালীন সাহিত্যিকও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। অন্যভাবে বললে, সাহিত্যিকের কলমের স্পর্শে যে চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে তা শুধু সমাজের ব্যক্তিবিশেষকেই তুলে ধরে না বরং সাহিত্যিক নিজেও নিজেকে সেই চরিত্রের মধ্যে খোঁজেন এবং প্রকাশ করেন।

৩

পর পর দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ইউরোপীয় ভাবধারা জন্মলগ্ন থেকে আত্মপরিচয়ে সঙ্কটাপন্ন বাঙালি মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত সম্প্রদায়কে করেছিল দ্বিধাবিহীন। একটি ধারা ছিল রবীন্দ্রানুসারী। বাংলা ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রথম জীবনে ঔপনিবেশিক চিন্তাচেতনাকে ধারণ ও লালন করলেও পরবর্তীকালে স্বজাতির মুক্তি ও কল্যাণকামিতায় সেই বাসনা থেকে সরে আসেন এবং বিদ্রোহ নয় বরং শান্ত-সমাহিত পথে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় এক নতুন সাহিত্যধারার সূচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের ছোটগল্প 'পোস্টমাস্টার', 'একরাত্রি', 'ক্ষুধিত পাষণ' প্রভৃতিতে ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের সংকট থাকলেও তা বিবেচ্য নয়, বরং ফুটে উঠেছে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি মুগ্ধতা এবং ফলস্বরূপ প্রবঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতায় নিমজ্জিত হয়ে অস্তিম্বে দার্শনিকতায় উত্তরণ। পোস্টমাস্টার, একরাত্রি এবং ক্ষুধিত পাষণ তিনটি গল্পেই নায়ককে নামহীন রাখার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থানকে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি 'ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।' (পোস্টমাস্টার) বা 'চেউ না আসুক। স্বামী পুত্র গৃহধনজন লইয়া সুবাবলা চিরদিন সুখে থাকুক।' (একরাত্রি) এসব চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে স্বীয় অবস্থানকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। অপরদিকে গ্রামীণ সমাজকাঠামোর ভাঙনে সহায় সম্বলহীন রতনেরও ঠাঁই হয় না কোথাও। এই রবীন্দ্রনাথই আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে লিখলেন 'স্ত্রীর পত্র', 'অপরিচিতা', 'ল্যাবরেটরি', 'হালদার গোষ্ঠী' বা 'বোষ্টমী'র মতো গল্প যেখানে সকল রীতিনীতির বিবুদ্ধে চলেছে ব্যক্তির একক লড়াই ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির অপর ধারার প্রবর্তক তিরিশ ও চল্লিশ কালপর্বের একদল তরুণ সাহিত্যিক, যারা রাবীন্দ্রিক চিন্তাধারাকে অস্বীকার করে জীবনের অবসাদ, যৌনতা, হতাশা, নিঃসঙ্গতা, পরাজয় ও অস্বাভাবিকতাকে সাহিত্যে শিল্পায়িত করতে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। কল্লোল (১৩৩০), কালিকলম (১৩৩৩), প্রগতি (১৩৩৪) পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই তরুণতর লেখকগোষ্ঠী। এ ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন- নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৭), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৬৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখ শিল্পী।

বিভূতি, তারাক্ষর, মানিক বা নজরুলের লেখায় কালপর্বের হতাশা বিভঙ্গতা থাকলেও অন্তিমে বেজেছে মানুষের অখণ্ড সত্তায় উত্তরণের শব্দসুর।

৪

কেবল যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিপন্নতাই নয়, বিশ শতকে প্রতীচ্যের ফ্রেড-কাম্যু-সার্ত্রের দর্শনও প্রভাবিত করেছিল সেই সময়ের সাহিত্যিকদের। মানুষের জটিল মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রবক্তাদয় ফ্রেড ও সার্ত্রের পাশাপাশি আলবেনার কাম্যুর 'দ্যা ফিলোসফি অব অ্যাবসারডিজম' ব্যক্তির নৈরাশ্য, শঙ্কা, আত্মবিচ্যুতি বা মৃত্যুচিন্তা সর্বোপরি আত্মসংকট প্রকাশে সাহিত্যঙ্গনে সূচনা করে এক ভিন্নধারা। একদিকে রবীন্দ্রবিরোধিতা অপরদিকে ফ্রেড-কাম্যুর তত্ত্ব তিরিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যকে সুস্থির প্রসন্ন মঙ্গলময় জীবন থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংসারে, বস্তিতে, ফুটপাতে। চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথুদন্ত মূল্যবোধ ও আত্মসংকটের হাহাকারময় আবর্তে নিষ্কিণ্ত ব্যক্তির মনোবিশ্লেষণকে গল্পের পুটে নিয়ে আসেন সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) তাঁর 'ফসিল', 'গোত্রান্তর', 'খিরবিজুরি' প্রভৃতি গল্পের মধ্য দিয়ে। বুর্জোয়া আত্মাশী শক্তির বিরুদ্ধে অধিকার বঞ্চিতের অস্তিত্বের সংগ্রাম ও চেতনাপ্রবাহরীতিতে ব্যক্তির অন্তর্ভাবিত রূপায়ণে নতুন এক ভাষাভঙ্গি নিয়ে প্রাক-সাতচল্লিশ পর্বে আবির্ভূত হন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এরপর এল ষাটের দশক। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কল্লোল আর সংক্ষোভের দৃশ্যপটে ষাটের দশকে বাংলাদেশের গল্পসাহিত্যে সূচিত হয় আরেকটি নতুন অধ্যায়। সুপ্রাবন্ধিক ও গবেষক রফিকউল্লাহ খানের মতে, 'সমাজের প্রথাগত অবরুদ্ধ বৃত্তাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে ষাটের দশকে অঙ্কুরিত হয়েছিল যুগান্তকারী পরিবর্তনের বীজ'।^৫ ফলে অগ্রজ অনেক গল্পকারেরাই এসময় প্রস্থান করেছেন গল্পের জগৎ থেকে এবং উঠে এসেছেন নতুন প্রজন্মের গল্পকারেরা। স্বরূপের সন্ধানে এসময়ের অনেক গল্পকার জীবন অবলোকন ও রূপায়ণে নবতর মাত্রার পরিচয়বাহী। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যাঁরা তাঁরা হলেন, শওকত আলী, হাসান আজিজুল হক, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, মাহমুদুল হক, রাহাত খান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ। শওকত আলী এবং হাসান আজিজুল হকের গল্পে উঠে এসেছে বস্তুবাদী সমাজচিন্তার আলোকে গ্রামীণ শোষিত নিগৃহীত মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনি ও উত্তরণের জয়গাঁথা। আবার জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এবং রাহাত খানের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। মাহমুদুল হকের গল্পের আঙ্গিক গড়ে উঠেছে অন্তর্জ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যক্তিচৈতন্যের ভেতর থেকে অঙ্কুরিত ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সমন্বয়ে। কিন্তু আলোচ্য সকলকে ছাপিয়ে সৃষ্টি ও বিষয়ের অভিনবত্ব নিয়ে বাংলা সাহিত্যঙ্গনে যাত্রা শুরু করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। সেই নতুনত্বই হলো 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'।

৫

বরণ্য কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক তাঁর প্রবন্ধ 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ' তে বলেছেন-

"কতোকাল আগে, সেই ১৯৬০ সালে সমকাল পত্রিকায় তাঁর গল্প বেরিয়েছিল 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি'। মাঝখানে ইলিয়াস প্রায় কিছুই লেখেন নি। অন্তত আমার তাই মনে হতো। ... আখতারুজ্জামান ইলিয়াস গত পনেরো বছরে গদ্য লেখার জন্য নিজের রক্তপাত ঘটিয়েছেন। এমন

অসাধারণ শ্রম ও সততা আমি আর দেখি নি, এমন আন্তরিকতাও নয়। এর ফলেই পাওয়া গেল ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ এর মতো বই।”^৬ পিতা মুসলিম লীগের নেতা ও জনপ্রতিনিধি হওয়ায় পরিবারে রাজনৈতিক আবহের মধ্যে বেড়ে উঠলেও নিজে কখনো রাজনীতিতে জড়ান নি। এমনকি ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামেও সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছেন। বস্তুত দেখা আর জানার মাঝে, চাওয়ার সাথে পাওয়ার মধ্যে যে বিশাল বৈপরীত্য বিদ্যমান তা তাঁর চিন্তাজগতে এমন এক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয় যার স্পষ্ট প্রকাশ তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলো। ষাটের দশকের মৌল বৈশিষ্ট্য কাহিনি অপেক্ষা চরিত্রের প্রাধান্য যা সমকালীন অন্যান্য লেখকের শব্দকুশলতায়ও উঠে এসেছে কিন্তু ইলিয়াসের স্বতন্ত্রতা এখানেই যে, কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করা তাঁর উদ্দেশ্য থাকে না। গল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী বাস্তবতার প্রেক্ষিতে চরিত্ররা আপনা আপনি বিকশিত হতে থাকে। তাঁর গল্পে ডিটেলসের কাজ এত বেশি যা একসময় পাঠককে তীব্র অস্বস্তির মধ্যে ঠেলে দেয় তবে তা কখনোই পরিমিতবোধকে উপেক্ষা করে নয়। ‘যেমন আছ তেমনি এসো’ কথাটি রবীন্দ্রনাথ বললেও তার যথার্থ প্রয়োগ আমরা পাই ইলিয়াসের গদ্যে। আলোচ্য গ্রন্থে ইলিয়াসের গল্পের ব্যক্তির মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং আত্মপরিচয়ে সঙ্কটাপন্ন। চূড়ান্ত দোদুল্যমানতা, পরনির্ভরশীলতা, আপসকামিতা জড়িয়ে রয়েছে ব্যক্তির পরতে পরতে। ‘তাঁর গল্পে কোনো সুস্থ মানুষ নেই। চরিত্রগুলোকে অনুভূতি আর উপলব্ধির তীক্ষ্ণছুরি দিয়ে এমনভাবে কাটা-ছেঁড়া করেন যে, ব্যক্তির ক্লেদ, দুর্দশা, স্থলন নির্মমভাবে প্রকাশ পায়; গল্পে যারা বনেদি-বিভবান তাদেরও চিহ্নে রয়েছে গোপন ব্যাধি।’^৭ ব্যক্তির এই স্বরূপ প্রসঙ্গে ইলিয়াসের লেখা কয়েকটি বাক্য বিশেষভাবে স্মরণীয়, ‘বেশ কয়েক দশক আগে, এই শতাব্দীর গোড়ায় এই ব্যক্তিপ্রবর রুগ্ন হয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে জন্মভূমি পাশ্চাত্যেই তার দারুণ রকম অবক্ষয় শুরু হয়। আমাদের এখানেও ব্যক্তির অবস্থা খুব কাহিল। যে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া ব্যবস্থা তার জন্মদাতা এবং তার পালনকর্তা তার শরীরেই আজ মোটা রকম ফাটল ধরেছে এবং এই ফাটল জোড়া দেওয়ার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।’^৮

৬

ইলিয়াসের ৫টি ছোটগল্প গ্রন্থে সংকলিত গল্পসংখ্যা ২৩। ১৯৪৩ সালের মঘন্তরের বছর জন্ম হয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের। জীবদ্দশাতেই সংঘটিত হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই অধ্যায়। একটি ১৯৪৭ এর ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তি, অপরটি ১৯৭১ এর স্বাধীনতায়ুদ্ধ। এছাড়া আরোও দুটো ঘটনা ইলিয়াসের মানস গঠনে পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা। একটি স্বাধীনতায়ুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান যেখানে তিনি দেখেছেন জাতিগত শোষণ ও শ্রেণিশোষণের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব গণরোষ এবং অন্যটি স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বাঙালির বিপুল স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা। ষাট ও সত্তরের দশকে বাঙালি সমাজে ‘স্থানচ্যুতির অস্থিরতা বা বৈকল্য’ একটা সামাজিক রোগের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যার উৎসে ছিল বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো। ‘সমাজগতির এই যে গোঁজামিল ও ভণ্ডামি, ক্ষমতার চর্চা ও সম্পদ লুণ্ঠনের মচ্ছব তা ১৯৭১-পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকে। ফলে-যা ব্যক্তির অর্জন ও প্রাপ্য নয় তাই সে পেয়ে যায় সহজে।’^৯ গবেষক ও প্রাবন্ধিক আকবর আলি খানের মতে, ‘বাংলাদেশ অঞ্চলে রাজনৈতিক বিবর্তনের সমীক্ষাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ভূগমূলে প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতার কারণে এতদঞ্চলের রাজনৈতিক সংগঠনকে কুরে কুরে খেয়েছে মধ্যস্বত্বভোগীরা, অনুপার্জিত মুনাফাভোগীরা, চাঁদাবাজি, দলাদলি ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।’^{১০}

এখানেই শেষ নয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে দেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা ও দুই মাসের ব্যবধানে ৩ নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় যে পটপরিবর্তন হয় তারই ধারাবাহিকতায় দেশবাসীর উপর নেমে আসে সামরিক শাসনের খড়্গ। গোটা আশির দশক জুড়ে চলে সামরিক শাসনের স্টিমরোলার। নব্বই এ গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও সামরিক শাসনের নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতির বিষাক্ত রক্তপ্রবাহ অব্যাহত থাকে গণতন্ত্রের ধমনিতে। ১৯৯৭ সালে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ইলিয়াস গভীর মনোযোগ ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন বাংলাদেশের এই আর্থ-সামাজিক দুর্গতি। বলাবাহুল্য এমন অস্থিতিশীল প্রতিবেশে কোন মানুষের সুস্থ চেতনা নিয়ে বেড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই তো ইলিয়াসের গল্পের প্রতিটি চরিত্র লড়াই করেছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে। কখনো নিজের সাথে, কখনো সমাজের আবহে কখনো-বা ধর্মের নামে ভণ্ডামির বিপরীতে তারা তুলে ধরতে চেয়েছে নিজের আত্মপরিচয়কে, মানুষ হিসেবে তার অবস্থানকে।

৭

১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’। প্রথম গ্রন্থেই সবাই জেনে যায় তাঁর বৃত্ত ভাঙার শক্তির পরিচয়। গ্রন্থভুক্ত গল্পসংখ্যা ৬। গল্পগুলোর রচনাকাল ১৯৬৫-৭৫ সাল। ইলিয়াসের প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে তাঁর স্বতন্ত্রতা ও সামগ্রিকতা। বিপর্যস্ত মূল্যবোধ, ঘৃণেধরা সমাজব্যবস্থা আর ক্ষতবিক্ষত মানবাত্মাকে তিনি সর্বদিক থেকে নিখুতভাবে তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থের গল্পগুলোতে। গ্রন্থটি সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক বলেছেন, “‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ তীরের মতো ঝঞ্ঝু, ধানীলংকার মতো বদমেজাজী এবং পরনারীর মতো আকর্ষণীয়। এই বইয়ের গদ্য শুকনো, খটখটে, প্রায় সবটাই ডাঙা, ডাঙার উপরে কচি নরম সবুজ গাছপালা জন্মেছে এমনও মনে হয় না। কোথাও একটু দয়া নেই, জল দাঁড়ায় না-বাস্তব ঠিক যেমনটি, তেমনই আঁকা, ক্যামেরাও এর চেয়ে নিখুত ছবি তুলতে পারে না। শ্মশানের মরা পুড়িয়ে পুড়িয়ে চণ্ডালের যে অবস্থা ইলিয়াসেরও তাই।”^{১১}

‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ গ্রন্থের প্রথম গল্প ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’। মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট যে কতটা তীব্র আর ভয়াবহ হতে পারে তার বেদনাবহ পরিণতি আমরা পাই এই গল্পে। গল্পের চরিত্রগুলোর অবস্থান বিচারে এটাও বলা যায়, গল্পটি ইলিয়াসের নিজ চিন্তার অস্থিরতার প্রতিকৃতি। উল্লেখ্য যে ইলিয়াসের ডাকনাম মঞ্জু এবং গল্পে বর্ণিত রঞ্জুর দাদা ও বাবার পেশাগত যে বিবরণ তার সঙ্গেও ইলিয়াসের পারিবারিক ঐতিহ্যের হুবহু মিল। কোনো কোনো সমালোচকের মতে, ‘রঞ্জু ইলিয়াসের দ্বিতীয় সত্তা (Alter ego)’^{১২}। আবার কারো মতে, ‘রঞ্জু বিষন্নতা, অসুস্থতার প্রতীক’। রঞ্জু অসুস্থতার প্রতীক তবে তা অসুস্থ সমাজ বাস্তবতার। তাই তো রঞ্জু মায়ের ঘরে গিয়ে খোঁজে তার ফেলে আসা সোনার শৈশবকে। অন্যমনস্কতায় মনে পড়ে,

“কতোদিন আগে ভরাবাদলে আশিকের সঙ্গে আজিমপুর থেকে ফিরলাম সাতটা রবীন্দ্রসংগীত শুনে, ‘তুই ফেলে এসেছিস কারে’, সেই সোনার শৈশবে ভুল করে দ্যাখা একটি স্বপ্ন, স্বপ্নের মতো টলটল করে।”^{১৩}

রঞ্জু সবকিছুর মাঝে হাতড়ে বেড়ায় তার নিজের পরিচয়। মায়ের শাড়ির গন্ধ, বাবার সিংহেটের লুপ্ত ধোঁয়া, পুরোনো স্টেটসম্যান, ন্যাপথলিন, বাক্সের চামড়া সব কত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। এমনকি

বাবার রাজনৈতিক আদর্শও। তাই তো রঞ্জুর অগ্রহ থাকলেও আদর্শচ্যুত রাজনীতি তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। নিজেই জানার তীব্র ব্যাকুলতা থেকেই রঞ্জু বারবার ফিরে যেতে চেয়েছে অতীতে, বিচ্ছিন্ন স্মৃতিকাতরতায় উঠে এসেছে কাজলা দিদি আর দুর্গার প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ থেকে বিভূতিভূষণ বাঙালির অস্তিত্বের শিকড়ে ফিরে যাচ্ছে রঞ্জু বারবার। এ যেন বাস্তবতার বিষবাস্প সরিয়ে অতীতের স্বর্ণালি ঐতিহ্যে ফিরে যাবার বাসনা, কিন্তু পারছে না। সময়ের ব্যবধানে মানুষের এই পরিবর্তনকে সুনিপুণ কাব্যিক ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন ইলিয়াস দুর্গার মধ্য দিয়ে। নিশ্চিন্দপুরের জল-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা যে দুর্গা ছিল ভাইয়ের ছায়াসঙ্গী, জীবনকে ভালোলাগার উপলব্ধির প্রথম সূচনা হয় যে দুর্গার সান্নিধ্যে; অন্ধকার বাড়-জলের মধ্যেও যে দুর্গাকে দেখে রঞ্জুর উদ্বেল বুকে কলকলিয়ে ওঠে ‘দিদি’ শব্দটি সেই দুর্গাই সময়ের ব্যবধানে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আজ হান্টার হাতে গামবুট রেনকোট মোড়া এক ইমেজমাত্র।

‘সামরিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট দেশবাসীর কাছে ১৯৬৫ সাল আত্মবিকাশের স্তব্ধতার যুগ।’^{১৪} এই সময়ে লিখিত গল্পটিতে তাই বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত এক যুবকের সমাজ ও জীবন থেকে পলায়নের বিষয়টিই যেন ব্যক্ত হয়েছে। হতাশ ও নিরবলম্ব রঞ্জু কেবলই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে শৈশবকে কিন্তু পারে নি। ‘নিজের সঙ্গে, পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাই রঞ্জুর জীবনসংকটের মূল। এই বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সাহিত্যিক মাহবুবুল আলমের আলোচনাতেও। তিনি বলেছেন, ‘... আলবেয়ার কাম্যুর প্রভাব আছে এ গল্পে।’^{১৫} এই বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই জন্ম নেয় অস্তিত্ব-সংকট, আত্মপরিচয়ের সংকট। সংকট থেকে বেরিয়ে প্রকৃত মুক্তির স্বাদ পাওয়ার তীব্র আকুলতায় রঞ্জুর তৃষ্ণার্ত আত্মা তাই ছটফট করতে লাগল,

“রঞ্জু জলের জন্যে কাঙাল হাঁ করে রইল। বৃষ্টির জল ওর চিবুকে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, নাকের ডগা থেকে ছটকে চলে যায় কোথায়, গালে জলের ছিটে লাগছে। চারিদিকে এত জল, একটি ফোঁটাও ওর পাতলা ঠোঁট বেয়ে পড়লো না যা কিনা এলোমেলো দাঁতের সারি পার হয়ে জিহ্বার সড়ক ধরে কণ্ঠে পৌঁছে যেতে পারে। রঞ্জু জলের প্রত্যাশায় জলে-ডোবা মানুষের মতো এলোপাথাড়ি টোক গিলতে লাগলো। প্রত্যেকটা টোক কাঁটা হয়ে ওর বুকের মধ্যে খোঁচা খোঁচা গেঁথে যাচ্ছে কেবল।”^{১৬}

বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আত্মোপলব্ধির জায়গায় পৌঁছানো সে যে স্বপ্নেরও অতীত। তাই তো মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রঞ্জু সেই অতৃপ্তির চিরবসান ঘটাল। অস্তিত্ববাদী দর্শনে মৃত্যুকে অস্তিত্বের সমলগ্ন করে দেখা হয়। ইলিয়াস তাঁর গল্পে মৃত্যুকে নিয়ে গিয়েছেন বহুমাত্রিকতায়। জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬) মৃত্যুর মধ্যে জীবনের পরিণতির সন্ধান করেছেন। ইলিয়াস কিন্তু আলোচ্য গল্পের অস্তিমে রঞ্জুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাজের দৃষ্টিতে অপ্রকৃতিস্থ, স্বপ্নভাবালুতায় আচ্ছন্ন এক যুবকের জীবনের অপূর্ণতাকেই তুলে ধরেছেন,

“ওর হাতে শিমুলডাল শান্ত, অনিবার্য ছড়িয়ে রয়েছে। শূঁকবে বলে রঞ্জু জোরে নিশ্বাস নিতে চাইল; কিন্তু ওর নিশ্বাস তখন শেষ হয়ে এসেছে, রঞ্জু সুবাস নিতে পারলো না।”^{১৭}

এই যে আক্ষেপ এ যেন চিরায়ত মানবাত্মার অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস। আরও আগে বলা একটি লাইন,

“নদীর অনিকেত জলে পাগল চেউয়েরা জন্ম নিচ্ছে কেবলমাত্র মরবার জন্যেই।”^{১৮}

কী অবলীলায় স্বেচ্ছামৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। মরতে হবে জেনেও জন্ম নেওয়া কেবল নিজের অস্তিত্বকে জানান দেওয়ার জন্যই। রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কাব্যের ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’ (১৮৯৩) কবিতার সেই পংক্তি, ‘কি আছে হোথায়-চলেছি কিসের অবেষণে?’ আত্মপরিচয়ের অবেষণেই রঞ্জুর এই নিরুদ্দেশ যাত্রা।

পাঠকমনের অতৃপ্তি নিয়ে ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’ র সমাপ্তি হলেও পরবর্তী গল্পগুলোতে ইলিয়াসের শ্রম, মেধা ও মননের নিরীক্ষার একটা চূড়ান্ত পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। ‘একজন মহৎ লেখকের যেমন থাকে কাহিনী নির্মাণের ক্ষমতা তেমনি থাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কৌতুকরস ও আনন্দ সৃষ্টির শক্তি।’^{১৯} গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প ‘উৎসব’ এ সেই সৃজনীশক্তির পরিচয় বিধৃত।

‘উৎসব’ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘গণসাহিত্য’ পত্রিকায় ১৯৭৩ সালে। ব্যক্তির অন্তর্জগৎ বিনির্মাণে সমাজবাস্তবতার প্রভাব যে কতখানি তা এই গল্পটি পাঠে সহজেই অনুমেয়। আলোচ্য গল্পে লেখক একদিকে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ধানমন্ডির চাকচিক্যময় জীবন এবং অপরদিকে শ্রমনির্ভর পুরান ঢাকার ফাঁপা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের ক্লেদাক্ত জীবনচিত্র সাবলীল ভাষাভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন। শুধু মানুষই নয়, এই দুই এলাকার কুকুরের মধ্যেও রয়েছে আকাশ-পাতাল ফারাক। ধানমন্ডির কুকুর গম্ভীর, ডাঁটওয়ালা ‘মনে হয় বাঙলা ফিল্মের জমিদার বাবু দোতলার ব্যালকনিতে ডেকচেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে সূর্যাস্ত উপভোগ করছেন। অন্যদিকে পাড়ার কুত্তার বাচ্চাগুলো সব নেড়ি, গায়ে লোম নেই একফোঁটা, শরীর ভরা ঘা নিয়ে কেবল কুঁই কুঁই গোঙায়।’^{২০}

‘গল্পে নিম্ন-মধ্যবিত্ত কেরানি আনোয়ার আলির জীবনসূত্রে উঠে এসেছে তার জীবনাকাজক্ষার অপূর্ণতা।’^{২১} কেরানি জীবনের বাস্তবতার সাথে নিজের আকাজক্ষার দ্বন্দ্ব ও সমাজসৃষ্ট শ্রেণিবিভাজনের চাকচিক্যে আনোয়ার আলি ভুলে যায় তার আত্মপরিচয়। বড়লোক বন্ধুর বাড়ির উৎসবে সুন্দরী মেয়েদের দেখে যে ঘোরের মধ্যে সে চলে যায় ঘরে ফিরেও তার সে ঘোর কাটে না। তাই তো স্ত্রীর সাথে রতিক্রিয়ার সময় তার মনে হয়,

“ভালো ভালো মেয়ে দ্যাখা গেছে বহু, সুখ তো আজ ওদের নিয়ে, সালেহা উপলক্ষ মাত্র।”^{২২}

কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। ইলিয়াস বলেন, ‘আমি Sex এর পিছনে living মানে class কে দেখতে চাই, society কে দেখতে চাই’^{২৩}। আনোয়ার আলির living status এ ধানমন্ডির সুন্দরীদের স্থান নেই আবার চাপিয়ে দেওয়া বাস্তবতার প্রতিও রয়েছে তার বিতৃষ্ণা। এই দুয়ের দ্বন্দ্ব আনোয়ার আলি হয়ে পড়ে ব্যাধিগ্রস্ত। তার সঙ্গমের তাড়নায় ঠাণ্ডা সর পড়ে, নিজের স্ত্রীকে মনে হয় বেচপ কোলবালিশ। এই সংকট থেকে আত্মপরিচয়ে ফিরে আসার জন্য ইলিয়াস যে পদক্ষেপ নিলেন বাংলা সাহিত্যে তা শুধু বিরল নয়, রীতিমতো বাড়াবাড়ি। গল্পকার ও প্রাবন্ধিক হাসান আজিজুল হকের মতে, ‘ইলিয়াসের ক্রোধ আর ক্ষোভ ফেটে পড়ে যখন দেখি কুকুরের মৈথুন দেখে এসে তবে আনোয়ার আলি রমণে প্রবৃত্ত হতে পারে। এ কি ভয়ানক প্রতিশোধ, কি শোচনীয় আত্মহনন, কি প্রচণ্ড ঠা-ঠা উচ্চ হাসি, চোখে জল এসে যায়। এতো শুধু নারীকেই ছিন্নভিন্ন করা নয় আমাদের সমাজকে, দাম্পত্য বন্ধনকে, পারিবারিক পবিত্রতাকে, সঙ্গে সঙ্গে বাৎসল্য, স্নেহ এককথায় তেল গড়িয়ে পড়া মানবিকতার ধারণাকে মুগুর দিয়ে চূর্ণ করেছেন ইলিয়াস। মানুষ আর কৃমিকীটের অস্তিত্বের মধ্যে কোন তফাৎ করতে চান নি।’^{২৪}

তাই কুকুর-রতি দেখে আনোয়ার আলির নিজের লুপ্ত যৌন উত্তেজনা ফিরে পাওয়ার মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শাসনের শিকার নিম্ন-মধ্যবিত্তের আত্মপরিচয়কেই স্পষ্ট করেছেন ইলিয়াস।

৮

‘প্রতিশোধ’ গল্পটি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তরুণদের চারিত্রিক, মানসিক ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির যে মহোৎসবের সূচনা হয়েছিল সেসব কেন্দ্র করে পল্লবিত হয়েছ। পুরো গল্পজুড়ে অন্যায়কারী, সুবিধা আদায়কারী মুক্তিযোদ্ধা নামধারী আনিস ও তার ভগ্নিপতি আবুল হাশেম উপস্থিত থাকে সক্রিয় চরিত্র হিসেবে। অপরদিকে অন্যায়ের প্রতিবাদকারী হিসেবে প্রতিশোধস্পৃহা শুরু থেকে শেষপর্যন্ত যার মধ্যে অব্যাহত থাকে সেই ওসমান যে কিনা আনিসের বড়ভাই সে হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয় চরিত্র। ওসমান তিনবার তিনধরনের পরিকল্পনা করে আবুল হাশেমকে হত্যার জন্য কিন্তু কোনোটিই বাস্তবরূপ পায় না। বরং কল্পনায় থাকতে থাকতে একসময় তা ওসমানের মধ্যেই তৈরি করে আত্মবিকার। শেষপর্যন্ত নিজেরই বানানো মৃত্যুফাঁদে নিজে পড়ার আশঙ্কা কাজ করে তার ভেতর। ওসমানের এই ব্যর্থতার পিছনেও রয়েছে আত্মপরিচয়ের সংকট। নিজেকে জানলে নিজের উপর আস্থা তৈরি হয়। আনিস বা আবুল হাশেমের মতো ওসমান নির্দ্বন্দ্ব চরিত্র নয়। নিজের আত্মশক্তিকে সে কখনো বুঝারই চেষ্টা করে নি। আর তাই ‘ঘরের চেয়ে বারান্দাই তার কাছে ভালো লাগে’।^{২৫}

ইলিয়াস সুনিপুণ ভাষা প্রয়োগে বারবারই দেখাতে চেয়েছেন ওসমানের আত্ম-সংকটকে। কখনো চৌবাচ্চার উপর ঢেউ তোলা টিনের ঢাকনির উপমায়, কখনোবা রেলিংহীন ছাদের উপমায় তুলে ধরেছেন দ্বিধাবিহীন মনোজগৎকে। ওসমানের এই আত্ম-সংকটের পশ্চাতে যুদ্ধ-পরবর্তী সমাজবাস্তবতাও অনেকাংশে দায়ী। বেদনাদায়ক হলেও একথা সত্য যে, স্বাধীনদেশে ভণ্ড মুক্তিযোদ্ধা ও সুবিধাবাদীরা যেভাবে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল তাতে ওসমানের মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনস্তাত্ত্বিক বিভক্ততা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তো ইলিয়াস ইঙ্গিতে ওসমানের ব্যর্থতার দিকটি গল্পে প্রকাশ করেছেন এভাবে,

‘স্বপ্নেও না, বাস্তবেও না, ওসমান কোনোখানেই সাঁতার জানে না।’^{২৬}

নগরজীবনের যন্ত্রণা ও ধ্বংসের যে চিত্র ‘উৎসব’ এ শুরু হয়েছিল তা পূর্ণতা পায় ‘প্রতিশোধ’ গল্পে। মধ্যবিত্তের মানসিকতা, আত্মকালন এবং বাস্তব কর্মব্যর্থতার নিখুঁত চরিত্রায়ণে ওসমান যথার্থ।

‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’র পরে মৃত্যু নিয়ে লেখা এই গ্রন্থের আরেকটি গল্প ‘যোগাযোগ’। প্রয়াত সমালোচক হাসান আজিজুল হকের মতে, ‘ইলিয়াসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প এটি যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন শব্দ নেই বরং আছে সন্তান বাৎসল্য’। ইলিয়াসের প্রেম, ভালোবাসা বিবর্জিত রুক্ষ, ধূসর লেখনীর ধারায় ‘যোগাযোগ’ তাই বৃষ্টির শীতল পরশ। এক মা ও তার অসুস্থ সন্তানের মানসিক ও বাস্তব যোগাযোগের আখ্যান এই গল্প। পুরান ঢাকায় বেড়ে ওঠা রোকেয়া সাত বছরের সন্তান খোকনকে রেখে গ্রামে মামার বাড়ি বেড়াতে যায়। খোকনের দুর্ঘটনার খবর শুনে সে ঢাকায় ফিরেও আসে কিন্তু সন্তান থেকে বিচ্ছিন্নতার তীব্র অনুশোচনা তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে প্রবল মৃত্যুভীতি। বস্তুত যেকোন মানুষ মাত্রেই তার মধ্যে প্রাপ্তির পাশাপাশি কাজ করে হারানোর ভয়। রোকেয়ার ক্ষেত্রেও এমনটাই হয়েছে। প্রচণ্ড ভীতি থেকে তার মাঝে তৈরি হয়েছে হ্যালুসিনেশন। যার কারণে ঢাকায় আসার পথে চলন্ত ট্রেনে প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর খবর সে নানাভাবে পেতে থাকে। তার

মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কাই নানা শব্দে তার কানে বাজতে থাকে। কখনো স্বামীর কণ্ঠ, কখনো মৃত মায়ের কণ্ঠে সে শুনতে পায় কেবল একটাই কথা,

‘আইছস তুই? এত দেরি করলি মা? চাইরটা ঘণ্টা আগে আইলেও তো পোলাডার মুখে পানি দিবার পারতি।’^{২৭}

সন্তানের মৃত্যু সংবাদ আগাম জানতে পারলেও বাস্তবে তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। বিচ্ছিন্নতার এই যন্ত্রণাই একজন মায়ের আত্মপরিচয়কে পরিপূর্ণতা দান করেছে। গল্পটি তাই এই গ্রন্থে ফল্গুধারার মতো।

৯

‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ এর পঞ্চম গল্প ‘ফেরারী’। ‘ফেরারী’ অর্থ আত্মগোপনকারী বা পলায়নকারী। অস্তিত্ব-সংকটাপন্ন এক যুবকের আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখার জন্য নিজের মেকি জীবন থেকে কপটতাপূর্ণ বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যাওয়ার গল্প এই ‘ফেরারী’। সেইসাথে গল্পটি পুরান ঢাকার সমাজ জীবনের বিস্তৃত স্মারক। শৈশবে মেলায় দেখা বায়োস্কোপের মতো এখানে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে জীবনের বিচিত্রপট পরিবর্তন হতে থাকে ‘কখনো গভীরতম চৈতন্যের সাথে, কখনো হঠাৎ ব্যঞ্জনশক্তির কল্লনায় আবার কখনো টাটকা ঝাঁজে কখনো স্মৃতিশিহরিত ভুবনে’^{২৮}।

‘উৎসব’ গল্পের পুরান ঢাকার জীবনচিত্র ও ‘যোগাযোগ’ গল্পের মৃত্যুভীতি দুটোরই সম্মিলিত রূপ ‘ফেরারী’। তবে ‘যোগাযোগ’ এর বিপরীত চিত্রই এখানে উদ্ভাসিত। ‘যোগাযোগ’ গল্পে সন্তানের মৃত্যুচিন্তা রোকেয়ার মৃত্যুভীতিকে মাতৃত্বের পরিচয়ে উন্নীত করেছে আর ‘ফেরারী’ গল্পে পিতার মৃত্যু-আশঙ্কাজনিত ভীতি হানিফের অস্তিত্বসংকটকে করেছে তীব্রতর। গল্পটি পুরান ঢাকার জনজীবন ও মানচিত্রের অনুপঞ্জ্য বিবরণের মধ্য দিয়ে একদিকে কর্মহীন যুবমানসের অবসন্নতা ও দিকহারা সময়ের ইতিবৃত্তকে যেমন ধারণ করেছে তেমনি অপরদিকে ফুটিয়ে তুলেছে পিতার মৃত্যুতে অস্তিত্ববিপন্ন হানিফের মনস্তত্ত্ব। অসুস্থ বাবার মৃত্যু হয়েছে কী না এ প্রশ্নের উত্তরে তার আক্ষেপই বলে দিচ্ছে তার মনের অবস্থা,

‘ড ডাক্তাররে পাই না, ম্ মউতরে ক্যামনে ঠ্যাকাই?’^{২৯}

অস্থিতিশীল সমাজবাস্তবতায় বেড়ে ওঠা বেকার হানিফ সমকালের শ্রোতে গা ভাসাতে পারে না, মহল্লার অন্য যুবকদের মতো ছিনতাই বা রংবাজি করে অর্থোপার্জনের সাহসও তার নেই। তাই সমকাল ও স্বসমাজের অনুপযোগী হানিফ পিতার ছত্রছায়ায় পিতাকে আঁকড়ে ধরে টিকে থাকতে চেয়েছিল। ফলে পিতা ইব্রাহিম ওস্তাগারের মৃত্যু সংবাদ হানিফকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় অলিতে, উপগলিতে, রাজপথে। অবশেষে বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হানিফের সংকট থেকে উত্তরণে থানায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের ভাবনার মধ্য দিয়ে সুস্থ জীবনতৃষ্ণাই প্রকাশিত হয়েছে। বাবার মৃত্যুপরবর্তী হানিফের প্রতিক্রিয়া লেখকের নিরীক্ষাধর্মী ভাষায় উঠে এসেছে এভাবে,

‘বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তো সঙ্গে সঙ্গে মিলিত মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকারে ওর জমাটবাঁধা করোটিতে একটি বিস্ফোরণ ঘটলো। হৃদপিণ্ড ছিটকে পড়লো এদিক ওদিক এবং সম্পূর্ণ তহনছ হয়ে গিয়ে হানিফ তার বঁটে শরীর থেকে প্রায় বেরিয়ে পড়লো।...

সকলের সম্মিলিত শোকধ্বনি পুলিশ সার্জেন্টের পা হয়ে সলিড একটা লাথি মারলো হানিফের পাছায়; সুতরাং আবদুল হানিফ ছুটতে শুরু করলো উল্টোদিকে। এই এক মুহূর্তেই হানিফের সমস্ত শরীরের রক্ত, মাংস এবং করোটির বিন্যাস বড়ো এলোমেলো হয়ে গেলো।^{৩০}

হানিফের মতো অস্তিত্ব বিপন্ন মানুষ সৃষ্টির পিছনে দায়ী যে সমাজব্যবস্থা তার চিত্র অত্যন্ত সাবলীল ভাষাভঙ্গিমায় বর্ণনা করেছেন লেখক আলোচ্য গল্পে—

‘পুলিশের বাপে আছিলো বে তোতলাচোদা! দেখলি না লম্বা চুল, জুলফিআলা মস্তানগুলি হালায় ফাইব ফিফটি ফাইব মারতাহে! ঐগুলি পুলিশের বাপ লাগে, বুঝলি? হালারা ইস্টুডেন!’^{৩১}

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধান্দাবাজি ও ছাত্রদের অধঃপতনের চিত্র উঠে এসেছে আরও কয়েকটি সংলাপে,

‘ইস্টুডেন হালারা কি করবো তুমি জানো না, না? কেলাব থাইকা, হোটেল থাইকা সায়েবরা বারাইবো মাল টাইনা, অরা হেই গাড়িগুলি ধইরা মালপানি কামায়, মাগিউগি পছন্দ হইলে ময়দানের মইদ্যে লইয়া হেইগুলিরে লাগায়। দিন তো অহন হালায় ইস্টুডেন গো, হালায় ইস্টুডেনের মারে বাপ।’^{৩২}

আলবেয়ার কাম্য বলেছেন, ‘জীবনের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আমরা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে যা কিছু করি তা-ই’। অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূলকথা এটাই। ‘ফেরারী’ গল্পের হানিফের মধ্যে কাম্যের ‘দি আউটসাইডার’ উপন্যাসের মারসোর প্রভাব ধরা পড়ে কখনো সখনো। বিশেষ করে মায়ের মৃত্যুর পড়ে মারসোর নির্লিপ্ত আচরণ এবং খুনের দায়ে ধরা পড়ার পরে অকপটে সব স্বীকার করে নেওয়ার সাথে হানিফের পিতার মৃতদেহ রেখে পলায়ন ও পুলিশের কাছে সকল অপকর্ম স্বীকার করে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সব বন্ধন ছিন্ন করে আত্মপরিচয়ে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত।

১০

গ্রন্থের শেষ এবং নামগল্প ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’। ‘এ গল্পের চরিত্র কখনো শৈশবের দোলনায় দোলে, কখনো যৌবনের তাড়নায় সুখ কামনায় কেঁপে ওঠে; কখনো বার্ষিক্যের স্বরে, সঙ্গীতের রসতরঙ্গে ভেসে যায়। পিসীমা স্মৃতিময় ভুবনবিহারিণী অতীতচারিণী। প্রদীপ আজকের তরুণ, স্ফেমে বাঁধানো যুবক।’^{৩৩} গল্পে দুই যুগের দুই বাসিন্দাকে একত্র করেছে ইলিয়াসের কাব্যময় ভাষা,

** শীতকালের জুড়িয়ে যাওয়া পদ্মানদীতে কোন চরের কুলগাছ থেকে ঝরে পড়েছিল আধাপাকা কুল।

** পদ্মার জলরাশিতে ভাসমান বাতাবিনেবুর খোসার মতো প্রদীপ কেবল টলমল করে।

** ঘোলাটে আলোতে পিসীমার সাদা ধুতি তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘিয়ে রঙের মনে হয়।^{৩৪}

আলোচ্য গল্পটি পাঠে দুটি বিষয় মুখ্যত দৃশ্যমান। এক, সময়ের পরিক্রমায় মানচিত্রের বিখণ্ডতায় অসহায় উন্মূলিত মানুষের যন্ত্রণা। ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত বাংলায় ১৯৪৭ কালপরিক্রমায় যেসব হিন্দু পরিবার মাতৃভূমির মায়ায় শত নির্যাতনেও মাটি আঁকড়ে পড়ে ছিল তাদের পুনরায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারে সর্বহারা হতে হয়েছে। এত রক্ত ও ত্যাগের পরেও স্বাধীন দেশে মুক্তির প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত প্রদীপের পিসী ও

পিসতুতো ভাই ননী। সমাজবাস্তবতায় আজও তারা সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে ভয় পায়, তথাকথিত রাজনৈতিক দলকে ‘চান্দা’ না দিয়ে ব্যবসা করতে পারে না।

দ্বিতীয় বিষয়টির জন্য আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে প্রতীচ্যে। বুর্জোয়া সমাজের আধিপত্যে ব্যক্তিসর্বস্বত্বতার যে কি ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে তা চমৎকার দেখিয়েছেন জার্মান ভাষার লেখক ফ্রানৎস কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪)। তাঁর ‘দি মেটামরফোসিস’-এর প্রথম লাইন, ‘এক সকালে ঘুম থেকে উঠে হ্রোগর সামসা দেখল সে পোকা হয়ে গেছে’। ব্যক্তি ক্ষুদ্র হতে হতে মেরুদণ্ডহীন হতে হতে কোথায় গিয়ে পৌছাতে পারে আরশোলায় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে কাফকা তা দেখিয়েছেন। তাই ইলিয়াস তাঁর গল্পে আত্মশক্তিকে অনুসন্ধানী মানুষকে কামনা করেছেন। আলোচ্য গল্পে প্রদীপ সেই ধরনের চরিত্র। পিসীর বাড়িতে বেড়াতে আসা প্রদীপ পিসীমার স্মৃতিকাতরতায় যুক্ত হয়ে যায় প্রজন্মের প্রবাহে। ঘরের শালগ্রাম শিলা, যুগল রাধাকৃষ্ণ, পরমহংসদেবের নেংটি ইঁদুরসহ কখনো কখনো পিসীমাও নিরন্তর হয়ে মিলে যায় প্রদীপের ভেতরে। এ যেন কাফকার রূপান্তরবাদ। বর্তমানের বিকৃতি থেকে রেহাই পেতে প্রদীপ বারবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে শৈশবের নষ্টালজিয়ায়। বিদ্রূপের মোড়কে বাস্তবতার প্রকাশ ইলিয়াসের স্বভাবসুলভ লেখনী। চমৎকার শব্দকুশলতায় হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে প্রদীপের অন্তঃসারশূন্যতার হাহাকারকে লেখক প্রকাশ করেছেন এভাবে,

‘রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফাজিল যুবক যুবতীর মতো দরজা দিয়ে কোথায় পালাচ্ছে? তাকের উপর পরমহংস বেরিয়ে গেছে তার পোষা নেংটি ইঁদুরটি নিয়ে। মস্ত বড়ো অপরিচিত একটি শূন্যতায় শরীরযুক্ত পিসীমা তার ধোঁয়াচ্ছন্ন কেশরাশি এলিয়ে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রদীপ একটার পর একটা ঢোক গলে। মুড়ি খেয়ে জিভ তার শুকনো, গলায় একফোঁটা জল নেই। প্রদীপ চিৎকার করে ডাকে, ‘মা’!’^{৩৫}

‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’র রঞ্জুর মতো প্রদীপও অবচেতনে মায়ের মধ্যে খোঁজে নিজের অস্তিত্বকে। রঞ্জুর মতো অসুস্থ সমাজব্যবস্থায় থেকেও প্রদীপকে নিঃসঙ্গ হতে দেয় না পিসীমার মধ্য দিয়ে পাওয়া স্বর্ণালি শৈশব-স্মৃতি। আর তাই দু’দুবার মাস্টারবেশনের পরিকল্পনা করেও নিজেকে সংযত করে প্রদীপ। ইলিয়াসের মতে ‘চরম নিঃসঙ্গ মানুষ মাস্টারবেশন করে’^{৩৬}। সময়ের বৈশিষ্ট্যতায় টিকে থাকার সংগ্রামে ভ্যাগাবন্ড বলে চিহ্নিত প্রদীপ ব্যক্তি সর্বস্বত্বতায় নিজেকে উপলব্ধির জন্য হাতড়ে বেড়ায় অতীতকে। এভাবে বারবার অতীত-বর্তমানের দ্বিমুখী আবর্তনে দ্বিধাবিহীন প্রদীপ নিজের অস্তিত্বসংকটে হয়ে পড়ে ভীতসন্ত্রস্ত। বর্তমানের অস্থিতিশীল, বিভঙ্গ বাস্তবতা নাকি রক্তসূত্রে রয়ে যাওয়া অতীত ঐতিহ্য ও আবেগ এ দুয়ের টানাপোড়েনে এক অনিকেত শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হয় প্রদীপ। কিন্তু শেষমুহূর্তে সে সমর্থ হয় উপলব্ধিতে ফিরে আসতে,

‘এই ভাবনায় কাতর হয়ে নেভবার আগেকার প্রদীপের মতো এই প্রদীপও লাফ দিয়ে উঠে বসলো। খাটে বসেই জানালা বন্ধ করা যায়। আবার নামতে হলো না বলে খুশি হয়ে জানালাগুলো সটাসট বন্ধ করে দিল। জানালার কপাটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পিসীমার গান ল্যাজ গুটিয়ে বাইরে চলে যায়।’^{৩৭}

পিসীমার সেই ঐন্দ্রজালিক আবহ ছিন্ন করে শূন্যতাবোধ থেকে অস্তিত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে সমর্থ হয় প্রদীপ।

‘মশারির ভেতর চতুষ্কোণ অন্ধকার।’ সেই ঘোরলাগা শূন্যতায় প্রদীপ শরীরের ভেতর থেকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিচিত ধ্বনির মধ্য দিয়ে অনুভব করতে চায় নিজের অস্তিত্বকে। এককথায় ব্যক্তির ক্ষয় ও বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে স্বরূপ-সন্ধানে উত্তরণ ঘটেছে গল্পটিতে।

১১

‘ঐতিহ্যের শেকড়সন্ধানী’^{৩৮} ইলিয়াস বহুস্বরের সংযোজন ও ক্ষণভঙ্গুর চিত্তাজগতকে প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মপরিচয় সন্ধানের আকুলতাকেই সার্থকতায় রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন গ্রন্থের ছয়টি গল্পে। এমনকি মৃত্যুচেতনাও এসেছে অস্তিত্বচেতনার প্রতিরূপক হিসেবে। গ্রন্থের শুরুতে যে আত্মসন্ধানে রঞ্জুর নিরুদ্দেশ যাত্রা শেষগল্পে পিসীমার ঐন্দ্রজালিক আবহ ছিন্ন করে প্রদীপের বাস্তবতায় থিতু হওয়ার চেষ্টার মধ্য দিয়ে লেখক সেই সন্ধানেরই ইতি টানলেন। মাঝখানে আনোয়ার আলির মোহভঙ্গ, ওসমানের ব্যর্থতা, রোকেয়ার অসহায়ত্ব এবং হানিফের মুক্তির প্রত্যাশায় কারাগারে প্রবেশ সবকিছুর মধ্য দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়া ব্যক্তিচেতনা, সামাজিক অবক্ষয় ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বন্দ্বময় কালপরিসর লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের প্রত্যেকটি গল্প ভিন্ন বিষয় ভিন্ন স্বর ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করলেও উদ্দেশ্য ছিল একটাই আত্মপরিচয়ের সংকট অনুধাবন ও তা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা। অতএব বলা যায়, ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ সেই সত্য উন্মোচনের শিল্পস্বাক্ষর।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ আজিজুল হক, *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা* (ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭), পৃ. ১৯৭
২. সুশান্ত মজুমদার, “আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: দ্বৈরথ সমর”, মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান (সম্পা.) *ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ ফিরে দেখা সারাজীবন* (ঢাকা, ম্যাগনাম ওপাস, ফেব্রুয়ারি ২০০০), পৃ. ১১৫
৩. মিনার মনসুর, “বাংলাদেশ (১৯৪৭-’৮২): সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি”, *সুন্দরম*, মুত্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পা. (ঢাকা, শীতসংখ্যা, নভেম্বর ৯১-জানুয়ারী ৯২), পৃ. ২
৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *উনিশ শতকের মধ্যাংশে ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা, জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৫৭-৫৮
৫. রফিকউল্লাহ খান, “কথাশিল্পের নব্য-নন্দন তত্ত্ব ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস”, মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান (সম্পা.) *ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ ফিরে দেখা সারাজীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১
৬. হাসান আজিজুল হক, “আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ”, মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান (সম্পা.) *ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ ফিরে দেখা সারাজীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫
৭. মুজিবুল হক কবীর, *পর্ব থেকে পর্বান্তরে*, (ঢাকা, অনিন্দ্য প্রকাশ-২০১৩) পৃ. ৮২
৮. সুশান্ত মজুমদার, “আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: দ্বৈরথ সমর”, পূর্বোক্ত
৯. মোহাঃ শামীমা নাসরিন, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে সমাজগতির রূপায়ণ* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, জুন-২০১৬), পৃ. ৩৭
১০. আকবর আলি খান, *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষণ* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি-২০০৪), পৃ. ১৪১
১১. হাসান আজিজুল হক, “আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ”, পূর্বোক্ত
১২. আলাউদ্দিন মঞ্জল, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণে বিনির্মাণে* (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স-২০০৯), পৃ. ২১৬
১৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *রচনাসমগ্র-১* (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি-২০০৭), পৃ. ১৩

১৪. মোছা: শামীমা নাসরিন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে সমাজগতির রূপায়ণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
১৫. তদেব, পৃ. ৩৯
১৬. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রচনাসমগ্র-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
১৭. তদেব, পৃ. ২১
১৮. তদেব, পৃ. ২০
১৯. মুজিবুল হক কবীর, পর্ব থেকে পর্বান্তরে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২
২০. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রচনাসমগ্র-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
২১. মোছা: শামীমা নাসরিন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে সমাজগতির রূপায়ণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
২২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রচনাসমগ্র-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
২৩. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, “আত্মকথন”, মুজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান (সম্পা.) ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ, ফিরে দেখা সারাজীবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
২৪. হাসান আজিজুল হক, “আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ”, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬
২৫. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রচনাসমগ্র-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
২৬. তদেব, পৃ. ৩৪
২৭. তদেব, পৃ. ৫২
২৮. মুজিবুল হক কবীর, পর্ব থেকে পর্বান্তরে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪
২৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রচনাসমগ্র-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
৩০. তদেব, পৃ. ৭৪
৩১. তদেব, পৃ. ৬৩
৩২. তদেব
৩৩. মুজিবুল হক কবীর, পর্ব থেকে পর্বান্তরে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
৩৪. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রচনাসমগ্র-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
৩৫. তদেব, পৃ. ৮৮
৩৬. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, “আত্মকথন”, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
৩৭. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রচনাসমগ্র-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
৩৮. সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা (ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭), পৃ. ২০২

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদিস চর্চা: বিকাশধারার একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ*

Abstract

The Hadith is the second important source of Islam just after the holy Quran. All the principles of numerous aspects were revealed in the Quran. As an interpreter of those principles and laws, Muhammad (SM) fulfilled his duty on behalf of Allah. In completing those given responsibilities, the sayings, activities and acquiescence of Rasul (SM) are called the Hadith. Though during the prophet's time, Hadiths were not compiled as books, rather they (hadiths) were generally preserved by individual initiative. At that age, memorizing, oral preaching and educating people were the major options to store hadiths that were preached and preserved by the dedicated companions of prophet (SM). Scholars in the following centuries also sacrificed themselves to promote hadiths by teaching people and compiling books which spread everywhere by their endeavors. Though a group of so called muslims has started to deny and disrespect hadiths, they (hadiths) have been considered as an essential source for 1500 years. The main objective of this study is to prove the continuity and necessity of studying hadiths by analyzing the type, nature and gradual development of them during the prophet's (SM) time.

চাবিশব্দ: রাসুলুল্লাহ; হাদিস; হিফয; রিওয়াত; কিতাবাত

ভূমিকা

ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হাদিস। কুরআনের পরেই এর শরঈ অবস্থান। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদিস এর বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মি। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদিস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। ধমনী যেমন প্রতিনিয়ত রক্তস্রোত প্রবাহিত করে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সদা সতেজ-সজীব ও সচল রাখে, ঠিক তেমনই হাদিস কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম নামক জীবনব্যবস্থাকে আধুনিক, সচল-সজীব, পালনযোগ্য ও যুগোপযোগী করে তোলে। কুরআন মাজিদে বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। আর রাসুলুল্লাহ (সা.) সে সকল সংক্ষিপ্ত মূলনীতি ও বিধি-বিধানের ব্যাখ্যাকার হিসেবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

“আর আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।”^১ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন অতি সংক্ষেপে বিধি-বিধান বর্ণনা করেছে, করণীয় ও বর্জনীয় কার্যাবলি এক কথায় ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু করণীয় কার্যাবলি আদায়ের পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেনি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কুরআনে সালাত আদায় অপরিহার্য করা হয়েছে, কিন্তু সালাতের সুনির্দিষ্ট সময়সূচি, রাকাত সংখ্যা, আদায়ের

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

পদ্ধতি ঠিক করে দেয়নি। এমনকি এ সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করেনি; বরং মহানবি (সা.) তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলা হয়। সেই হাদিস ভাণ্ডার তাঁর জীবদ্দশায় সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়নি; বরং তা সাহাবিগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষিত ছিলো। তবে তা সংরক্ষণের প্রধান উপায় ছিলো মুখস্থ করণ, মৌখিকভাবে প্রচার-প্রসার ও শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই দেখা যায়, নবি কারিম (সা.) সাহাবিগণের প্রতি হাদিস মুখস্থ করতে এবং তা অনাগতদের নিকট পৌঁছে দিতে উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ফলে সাহাবা কিরাম তাঁর নির্দেশ মোতাবেক হাদিস প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তৎপরবর্তী যুগের হাদিসবিশারদগণও পবিত্র হাদিসের প্রচার, প্রসার, শিক্ষাদান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের অবর্ণনীয় ত্যাগ-তিতিষ্কার ফলে হাদিসশাস্ত্র প্রজন্ম পরম্পরায় বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

যুগের পরিক্রমায় মুসলিম নামধারী একটি গোষ্ঠী হাদিস অস্বীকার করছে। অথচ প্রায় দেড় হাজার বছর যাবৎ তা ইসলামি শরিয়তের অপরিহার্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদিস চর্চার ধরন, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাদিস চর্চার ধারাবাহিকতা ও অপরিহার্যতা প্রমাণ করা প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি (Qualitative) গুণগত রীতির (Analytical Method) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে রচিত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে কুরআন মাজিদ, উলুমুল হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থাবলিকে নির্ধারণ করা হয়েছে। গৌণ উৎস হিসেবে দেশবিদেশী বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সাময়িকীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে CS রীতি বা ‘শিকাগো শৈলী’ এর অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার প্রশ্ন

হাদিস চর্চার পর্যালোচনায়-কখন হাদিসের উৎপত্তি হয়, ইসলামি শরিয়তে হাদিসের প্রামাণিকতা, রাসুলুল্লাহ (স.) এর জীবদ্দশায় হাদিস চর্চা ও সংরক্ষণের ধরন ও প্রকৃতি কেমন ছিল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

হাদিস পরিচিতি

ক. হাদিস (হাদিথ) শব্দের বিশ্লেষণ

হাদিস (হাদিথ) শব্দটি আরবি পরিভাষা। এটি *فعل* ওয়নে বাব *انصر* ক্রম *انصر* এর মাসদার *حدوث* *حادثة* থেকে *صفة مشبهة* এর (সিগাহ) রূপ^১। কেউ কেউ বলেন, *হাদিথ* শব্দটি *حدث* অথবা *حدوث* শব্দ মূল থেকে নির্গত হয়েছে। এটি একবচন, এর বহুবচন *احاديث*।^২ আভিধানিক দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো- নতুন (الجديد)^৩, নতুন বস্তু (الجدید من الاشياء)^৪, কোনো সংবাদ (النبا و الخبر)^৫, কোনো কথা বা বাণী (الكلام قليله و كثيره)^৬, পুরাতনের বিপরীত (ضد القديم)^৭।

জারুল্লাহ যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮ হি.) তাঁর ‘আল-কাশশাফ’ গ্রন্থে احاديث শব্দটি اسم جمع (ইসম জমা)^{১০} হিসেবে উল্লেখ করেন।^{১০} কিন্তু আবু হাইয়ান (মৃ. ৭৫৪ খ্রি.) যামাখশারীর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, احاديث শব্দটি ইসম জমা নয়; বরং শব্দটি নিয়ম বহির্ভূতভাবে حديث শব্দের জমা তাকসীর।^{১১} যেমন: قطع এর বহুবচন اقطاع এবং بطيل এর বহুবচন اباطيل আরবি ব্যাকরণের নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আরবি বৈয়াকরণিকদের মতে, এটি নিয়ম বহির্ভূত হলেও অধিক ব্যবহারের কারণে অভিধানবিদগণ একে حديث শব্দের বহুবচন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।^{১২}

حديث শব্দটি حدث শব্দমূল থেকে নিস্পন্ন হলে এর অর্থ হবে هو كون الشيء لم يكن অর্থাৎ নব উদ্ভূত এমন বস্তু, পূর্বে যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন, حدوث (হাদিস শব্দের মাসদার) বলতে ‘কোনো অস্তিত্বহীন বস্তুর অস্তিত্ব লাভ করা বুঝায়, চাই তা মৌলিক হোক বা অমৌলিক। কোন মৌলিক বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়ন আল্লাহ ব্যতীত কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়া প্রত্যেক কথা বা বাণী যা শ্রবণেন্দ্রিয় বা ওহীর সূত্রে, নিদ্রায় কিংবা জাগরণে মানুষের নিকট পৌঁছায় তাকে হাদিস বলা হয়।’^{১৩}

ইবন ফারিস বলেন, حدث শব্দ হতে হাদিস শব্দের উৎপত্তি। কেননা হাদিস হলো বাণী বা কথা; এর থেকে নতুন কোনো ভাব-ভাষা সৃষ্টি হয়।^{১৪} এ সংজ্ঞাটি আরেকটু স্পষ্ট করে শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী বলেন- حديث হল এমন বাক্য যার সমন্বয়ে কথা বলা হয় এবং যা শব্দ-লিপি আকারে নির্গত হয়।^{১৫}

حديث শব্দটি কালাম, বাণী এবং قديم (পুরাতন) এর বিপরীত অর্থেও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।^{১৬} এ ক্ষেত্রে قديم দ্বারা কুরআন আর قديم এর বিপরীতে হাদিস (নতুন) উদ্দেশ্য। ড. সুবহী সালিহ বলেন-“কোনো কোনো আলিম حديث কে جدة (নতুন) অর্থে বুঝিয়েছেন। তাঁরা এ শব্দটিকে قديم (পুরাতন) এর বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা قديم দ্বারা আল্লাহর কিতাব এবং جديد দ্বারা রাসূল এর حديث কে বুঝিয়েছেন।”^{১৭} এ ছাড়া সংবাদ, ঘটনা প্রবাহ, বর্ণনা ইত্যাদি অর্থেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।^{১৮} আল-কুরআনের ২৩ স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে حديث শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে ১২টি স্থানে^{১৯} সরাসরি حديث (হাদিস), ৫টি স্থানে^{২০} حديثا (হাদিসান), ৪টি স্থানে^{২১} احاديث (আহাদিস) ও ২টি স্থানে^{২২} تحدث (তুহাদিস) শব্দ এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা কিতাবুল্লাহ এর কতিপয় আয়াতে^{২৩} আল-কুরআনকে (আহসানুল হাদিস), (হাদিস) ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করেছেন।

গ. হাদিস (حديث) শব্দের পারিভাষিক পরিচয়

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, মহানবি (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদন এবং সাহাবি ও তাবিঈদের কথা, حديث নামে আখ্যায়িত করা হয়।^{২৪} তবে কেউ কেউ শুধুমাত্র মহানবি (সা.)-এর বাণী কর্ম ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলে থাকেন। আর সাহাবি ও তাবিঈদের বাণী-কর্মকে আছার বলেন। এ প্রসঙ্গে মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) বলেন,

حديث এমন একটি শব্দ যা রাসুল (সা.), সাহাবি ও তাবিঈর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতি ছাড়াও আরো ব্যাপক অর্থবোধক।^{২৫} কিন্তু এ বিষয়ে ইমাম ইবন হাজার আল-‘আসকালানী (রহ.) এর অভিমত কিছুটা ব্যতিক্রম। তাঁর মতে, শুধু নবি কারিম (সা.) এর দিকে যা কিছু সম্বন্ধ করা হয় তাই হাদিস।^{২৬} তাঁর এ বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে ড. মাহমুদ আত-তুহহান বলেন, ‘নবি কারিম (সা.) এর কথা, কর্ম, মৌনসম্মতি ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলীকে حديث বলা হয়।’^{২৭} মহানবির (সা.) নবুয়ত ও পরবর্তী জীবনের সমুদয় মুখ নিসৃত বাণী, কর্ম, সমর্থন, অনুমোদন এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য, এমন কি জাফ্রত কিংবা নিদ্রিত সর্বাবস্থায় তাঁর গতিবিধি প্রভৃতি حديث এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব বলা যায়, নবি (সা.) এর বাণী, কাজ, মৌনসমর্থনই হাদিস। তবে ব্যাপক অর্থে- তাঁর (সা.) দৈহিক ও চরিত্রগত, জীবনচরিত সংক্রান্ত গুণাবলীর বিষয়ে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কিংবা পরে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তাকেও হাদিস নামে অভিহিত করা হয়।

হাদিসের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, অপরিহার্যতা ও প্রামাণিকতা

হাদিস জ্ঞানের জগতে এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার এবং কুরআন মাজিদের প্রধান ভাষ্যকার। একে বাদ দিয়ে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা মোটেই সম্ভব নয়। যদিও মহান আল্লাহ (যিকর) কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন।^{২৮} কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ঐশ্বরিক সংরক্ষণ কী কুরআনে বর্ণিত শব্দমালার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে নাকি প্রকৃত অর্থের ক্ষেত্রেও? যদি কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝবার জন্য নবি (সা.) এর ব্যাখ্যা অত্যাৱশ্যক হয় তবে কুরআনের শব্দভাণ্ডার সংরক্ষণের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না; যদি না নবি (সা.) এর ব্যাখ্যাও সংরক্ষিত থাকে।^{২৯} কারণ আল্লাহ তা‘আলা নিজেই নবিকে (সা.) কুরআনের ভাষ্যকার হিসেবে ঘোষণা করে বলেন,

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“আমি তোমার উপর কুরআন নাযিল করেছি; যাতে তুমি মানুষদেরকে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে পারো।”^{৩০} এ আয়াত থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, কুরআন থেকে মানুষ তখনই স্পষ্ট নির্দেশনা পেতে পারে; যখন নবি (সা.) এর দেওয়া ব্যাখ্যা (হাদিস) থেকে কুরআনের অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ কারণেই নবি (সা.) এর দেওয়া ব্যাখ্যা (হাদিস) বিকৃতির হাত থেকে বাঁচাতে হাদিস চর্চা, অধ্যাপনা ও গবেষণা অপরিহার্য।

ক. হাদিস কুরআনের মতোই প্রামাণ্য প্রত্যাদেশ

কুরআন থেকে প্রমাণ

আল্লাহ প্রদত্ত ওহীই নবি করিম (সা.) এর জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র উৎস। এর প্রমাণ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, “وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ” আর তিনি মনগড়া কিছু বলেন না, তাতে কেবল তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ কৃত ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়।^{৩১} উদ্ধৃত আয়াতে সাধারণভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, নবি করিম (সা.) নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কিছুই বলেন না, বরং যাই বলেন তা তাঁর প্রতি প্রেরিত প্রত্যাদেশ মাত্র। ইমাম আল-কুরতুবী (৬০০-৬৭১ হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

وفيها ايضا دلالة على ان السنة كالوحي المنزل في العمل

অর্থাৎ “এর মধ্যে এ নির্দেশনাও রয়েছে যে, নবি করিম (সা.) এর সুন্নাহ কার্য ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহীর তুল্য।”^{১২} ইমাম বাগাভী (৫১০হি.) এর তাফসীরে মা’আলিমুত-তানযীলে উদ্ধৃত হয়েছে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো- নবি করিম (সা.) দ্বীনের ব্যাপারে যা কিছু বলেন তা প্রত্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত।^{১৩} নবির (সা.) দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ “তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষাদেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।”^{১৪} কুরআন মাজীদে মোট ১১টি আয়াতে^{১৫} ‘কিতাব’ শব্দের সাথে ‘হিকমাহ’ শব্দটি (عطف) যুক্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। আর আরবি ব্যাকরণে (عطف) আতফের বিধান হলো পূর্বাপর শব্দদ্বয়ের অর্থ পরস্পর বিপরীত হওয়া। তাই এখানে আতফ দ্বারা ‘হিকমাহ’ বলতে নিশ্চিতভাবে কুরআন নয়, বরং অন্য কিছুকে (সুন্নাহ) বোঝানো হয়েছে। আর তাফসির ইবন কাসিরে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ‘হিকমাহ’ বলতে সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে।^{১৬}

হাদিস থেকে প্রমাণ

অনুরূপভাবে নবি করিম (সা.) হাদিস থেকেও এর ওহি হওয়ার প্রমাণ মেলে। যেমন- আসমা’ বিনত আবু বকর (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবি করিম (সা.) সূর্যগ্রহণের দিন খুতবা দেয়ার সময় আল্লাহর স্তুতি ও গুণকীর্তন করে বলেন- “আমি (এখন) এমন সব বস্তু আমার এ অবস্থান থেকে অবলোকন করছি, যা আমাকে আগে দেখানো হয়নি, এমনকি জান্নাত-জাহান্নামও দেখছি। আর আমার নিকট (এখন) ওহি প্রেরিত হয়েছে যে, তোমরা কবরে দাজ্জালের ফিতনার অনুরূপ ফিতনা দ্বারা পরীক্ষিত হবে।”^{১৭} উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবি করিমকে (সা.) আগে যা দেখানো হয়নি, এমন সব বস্তু তিনি উক্ত সূর্যগ্রহণের দিন দেখতে পেয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছে জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা ও কবরের ফিতনা। এ হাদিস থেকে এটিও বোঝা গেল যে, উদ্ধৃত বিষয়াদি নবি (সা.) কুরআনের আয়াত হিসেবে বলেননি। এ ছাড়া অদৃশ্য জগতের উল্লিখিত বিষয়গুলো তিনি সেচ্ছায় দেখতে পারেননি; বরং আল্লাহই তাঁকে সেসব দেখিয়েছেন। অতএব আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু আসে তা নিঃসন্দেহে ওহি। সুতরাং কুরআনের আয়াত ছাড়াও নবি (সা.) দ্বীন সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তাও মহান আল্লাহরই প্রেরিত ওহি, তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো।

খ. হাদিস কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা

কুরআন থেকে প্রমাণ

আল্লাহ তা’আলা তাঁর প্রিয় নবিকে তাঁর কিতাবের ভাষ্যকার বলে ঘোষণা দিয়ে বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْغُرُبَاتِ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ “আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যেন, আপনি লোকদের প্রতি যে (বিধান) নাযিল করা হয়েছে তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন, আর যাতে তাঁরা তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে পারেন।”^{১৮} তাফসির ইবন কাসীরে উল্লিখিত হয়েছে, উদ্ধৃত আয়াতে যিকর (الذِّكْر) দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। আর (তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে) তা দ্বারা উদ্দেশ্য, এ কুরআনের বিধানাবলীসহ পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠির উপর শাস্তি সম্পর্কিত যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং নবি (সা.) হলেন কুরআনে

বর্ণিত বিধানাবলীর ব্যাখ্যাকার। ৩৯ সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের ব্যাখ্যায় তিনি যা কিছু বলেছেন তাই হাদিস।

হাদিস থেকে প্রমাণ

হযরত মিকদাম ইবন মা'দীকারাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি (সা.) বলেছেন, “জেনে রাখ! আমাকে কিতাব (কুরআন) দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ আর একটি জিনিস।”^{৪০} এ হাদিসের ব্যাখ্যায় সুনান আবু দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘আওনুল মা'বুদ এ উল্লেখিত হয়েছে, এখানে কিতাব দ্বারা কুরআন কারিম উদ্দেশ্য। আর (তার সাথে অনুরূপ আর একটি বিষয়) দ্বারা ওহি গাইর মাতলু বা পরোক্ষ ওহি (হাদিস) উদ্দেশ্য।^{৪১}

গ. বিচারকার্যে সাহাবা কিরামের হাদিস অনুসরণ

আমিরুল মু'মিনীন হযরত ‘উমার (রা.) কাজী শুরাইহকে এই মর্মে ফরমান পাঠিয়েছিলেন যে, যখন তোমার কাছে কোনো বিচার আসবে তখন তুমি তা আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করবে। আর আল্লাহর কিতাবে (সরাসরি) নেই এমন কোনো বিষয় আসলে নবি (সা.) এর হাদিস দ্বারা ফায়সালা করবে।^{৪২} অনুরূপভাবে মু'আয ইবন জাবালকে (রা) ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে প্রেরণ কালে তথায় বিচার-ফয়সালা সমাধানের ব্যাপারে তাকে নবি (সা.) জিজ্ঞেস করলে তিনি কুরআন, হাদিস ও কিয়াসের ভিত্তিতে তা পরিচালনা করবেন মর্মে জবাব দেন।^{৪৩} উল্লিখিত প্রতিটি বিচারকার্য ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবের পরেই তাঁরা নবি (সা.) এর হাদিসের স্থান দিয়েছেন।

ঘ. হাদিসের অপরিহার্যতার ব্যাপারে সাহাবা কিরামের ইজমা

সাহাবা কিরাম রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় ও তাঁর ওফাতের পর হাদিসের অনুসরণ, এতে বর্ণিত বিধিবিধান পালনের বাধ্যবাধকতা, এর নির্দেশের বাস্তবায়ন ও নিষেধ থেকে বেঁচে থাকবার ক্ষেত্রে ঐকমত্য ছিলেন। হাদিস কুরআনের ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে তাঁরা এ দুইয়ের মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতেন না; বরং কুরআন-সুন্নাহ নির্বিশেষে সমভাবে অনুসরণ করতেন।^{৪৪}

মহানবি (সা.) এর যুগে হাদিস চর্চা: ধরন, পদ্ধতি, উৎপত্তি ও বিকাশ

হাদিস চর্চার পর্যালোচনায়- হাদিসের উৎস কী, কখনই বা এর উৎপত্তি হয়, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদিস চর্চা ও সংরক্ষণের ধরন ও প্রকৃতি কেমন ছিল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোজার মধ্য দিয়েই নিম্নে সংক্ষেপে নবি (স.) এর যুগে হাদিস চর্চা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হলো-

হাদিসের উৎস

প্রামাণিক উৎস হিসেবে কুরআন কারীমের পরেই হাদিস শরিফের অবস্থান। বিশুদ্ধ জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার ইলমি ওহি। মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবের প্রতি যে ওহি নাযিল করেছেন তাই মূলত হাদিসের মূল উৎস। হাদিসের ভাষা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিজের হলেও এর মূলভাব আল্লাহ তা'য়ালারই। এর প্রমাণ স্বরূপ কুরআন মাজিদে এসেছে,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ-

“তিনি (নবি) প্রবৃত্তির তাড়নায় মনগড়া কোন কথা বলেন না, যা বলেন তা অবতীর্ণ ওহি ছাড়া আর কিছু নয়।^{৪৫} এ ওহি দু-ধরনের তথা প্রত্যক্ষ ওহি বা কুরআন মাজিদ, আর পরোক্ষ ওহি বা হাদিস শরিফ।^{৪৬} এর সপক্ষে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআন মাজিদ ঘোষণা করছে,

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

“হে রাসুল! আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন, আর আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না”।^{৪৭} আল্লামা ইবন কাসীর (রহ.) [মু.৭৭৮হি.] বলেন, এখানে ‘আল-কিতাব’ মানে পবিত্র কুরআন এবং ‘আল-হিকমাহ্’ মানে সুন্নাহ বা হাদিস।^{৪৮} কুরআন ও হাদিস উভয় একই উৎপত্তিস্থল হতে উৎসারিত। হাদিস শরিফেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। নবি কারিম (সা.) বলেছেন,

لا انى اتيت القرآن و مثله معه-

“আমাকে পবিত্র কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে এরই মত আর একটি জিনিস”।^{৪৯} হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা.) বলেন, “জিবরাঈল (আ.) নবি কারিম (সা.) এর নিকট হাদিস নিয়ে অবতীর্ণ হতেন, যেমন অবতীর্ণ হতেন পবিত্র কুরআন নিয়ে। তিনি কুরআনের ন্যায় তাঁকে হাদিসও শিক্ষা দিতেন”।^{৫০} বস্তুত নবি কারিম (সা.) ইসলামি শরিয়াতের যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করার পরেই জনসম্মুখে তা প্রকাশ করতেন।^{৫১} রাসুল (সা.) থেকে প্রকাশিত হাদিস গ্রহণের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا-

“রাসুল তোমাদের জন্য যে বিধান, জীবনাদর্শ নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাক”।^{৫২}

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআন ও হাদিস একই বৃত্তে প্রস্ফুটিত জ্ঞানভাণ্ডারের প্রবাহমান দু’টি পুষ্প সদৃশ। মূলত হাদিস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা; যা ছাড়া পবিত্র কুরআন অনুধাবন করা দুরূহ ব্যাপার। এ কারণে মৌলিকতা, প্রামাণিকতা ও অবশ্য অনুসরণীয় হওয়ার দিক দিয়ে ইসলামি শরিয়াতে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদিসের অবস্থান। সুতরাং হাদিস আল্লাহ তা‘আলার বাণী নয়, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কথা, এমন অভিযোগে হাদিসের প্রতি কোনোরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কিংবা উপেক্ষা প্রদর্শন করার কোনো সুযোগ নেই।

হাদিসের উৎপত্তি

হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন হাদিস শাস্ত্রের প্রধান উৎপত্তিস্থল। কারণ তাঁর (সা.) জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ছিল ইসলামি জীবন ব্যবস্থার জীবন্ত নমুনা-জলন্ত উদাহরণ। তাঁর প্রতিটি কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, ওঠা-বসা, চাল-চলন, লেন-দেন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর উপস্থিতিতে কৃত-বর্ণিত কোনো কাজ কিংবা ঘটনার অনুমোদন ইত্যাদি সবকিছুই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে ঘিরে সাহাবা কিরামের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তাঁদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করার নিমিত্ত তৃষার্থ হৃদয় রাসুলপানে প্রতীক্ষার প্রহর গুণতেন আর সর্বদা তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন। তাই দেখা যায়, সাহাবাগণ

রাসুল (সা.) এর প্রতিটি বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি গভীর মনোযোগের সাথে অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে শ্রবণ ও অনুধাবন করতেন; ফলে তাঁরা সেগুলো সহজেই স্মৃতির মনিকোঠায় সযত্নে সঞ্চিত রাখতে সক্ষম হতেন। এ ছাড়াও তিনি কেবল তাঁর মুখের কথাই নয়, নিজের কাজকর্ম ও সাহাবাগণের কথা ও কাজের সমর্থন দিয়েও ইসলামি জীবন বিধানের ব্যাখ্যা দান করতেন। সাহাবিগণ সেই ব্যাখ্যাত হাদিসের মহান জ্ঞানভাণ্ডার সংগ্রহ, সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতেন। তাদের জীবনচলার পথে যখনই কোন জটিলতা দেখা দিতো কিংবা কোন প্রশ্নের উদ্বেক হতো, তখনই রাসুল কারিম (সা.) এর নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস করে তাঁরা উত্তর জেনে নিতেন এবং একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে এর সংরক্ষণ করতেন। তাই হাদিসের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম (রহ.) যথার্থই মন্তব্য করেছেন, “সাহাবিগণ মহানবি (সা.) এর সম্মুখে তাঁদের নানাবিধ প্রশ্ন ও সন্দেহ-সংশয় পেশ করতেন এবং তিনি তাঁদেরকে এগুলোর জবাব দিতেন। ফলে তাঁদের মন প্রশান্তি লাভ করতো। তাঁর নিকট শত্রুরাও সাহাবিগণের ন্যায় প্রশ্ন করতো, তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহানবিকে (সা.) পরীক্ষা করা, ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা ও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। আর সাহাবিগণ দ্বীনের রহস্য উদঘাটন করা, তত্ত্ব বুঝা, ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন করা ও দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতেন। আর রাসুল কারিম (সা.) তাদের সকল প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করতেন। অবশ্য যেসব বিষয়ের কোন উত্তর তাঁর (সা.) জানা থাকতো না (যেমন : কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় ইত্যাদি) কেবল সেসব বিষয়েই তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন”।^{৭৩} নিম্নে হাদিসের উৎপত্তি সম্পর্কিত কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হলো—

ক. ছদ্মবেশে জিবরাঈলের (আ) আগমন

কখনও কখনও হযরত জিবরাঈল (আ) মানবাকৃতিতে রাসুল (সা.) এর মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর জানার মাধ্যমে উপস্থিত সাহাবিগণকে পরোক্ষভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। এটিও হাদিস উৎপত্তির একটি উপায়, তন্মধ্যে ‘হাদিসে জিবরাঈল’ নামে খ্যাত হাদিসটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুভ্র পোশাক পরিহিত, কুচকুচে কালো কেশবিশিষ্ট, জনৈক অপরিচিত লোক মহানবি (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইমান, ইসলাম, ইহসান, কিয়ামতের নিদর্শন ও তা সংঘটনের সময় প্রভৃতি বুনিয়াদী বিষয়ে প্রশ্ন করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। অতঃপর তিনি মজলিস ত্যাগ করার পর মহানবি (সা.) ‘উমর ফারুককে (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে উমর! তুমি কি জানো, এই প্রশ্নকারী লোকটি কে?’ ‘উমর (রা) স্বীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করলে রাসুল (সা.) নিজেই বলেন,

فانه جبريل اناكم يعلمكم دينكم —

“এ প্রশ্নকারী ছিলেন জিবরাঈল (আ)। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন”।^{৭৪}

খ. প্রশ্ন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

এ পর্যায়ে রাসুল কারিম (সা.) এর নিকট সাহাবিগণের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেওয়া ও আমল করার বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থাবলি হতে কিছু ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করার মাধ্যমে হাদিসের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে— হযরত আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন, রাসুল কারিম (সা.) এর

যুগে জনৈক ব্যক্তি আহত হলে তাঁকে গোসল করতে বলা হলো। পরে সে ইস্তিকাল করলো। নবি (সা.) এ ঘটানা শুনতে পেয়ে রাগান্বিত স্বরে বলেন,

قتلهم الله الم يكن شفاء العى السؤال؟

“আল্লাহ তা’আলা ঐ লোকগুলোকে ধ্বংস করুন! (আমার নিকট জিজ্ঞেস করলে না কেন?) জিজ্ঞেস করাই কি সব অভ্যুত্থার অবসান নয়?”^{৫৫} অপর বর্ণনায় এসেছে, নাওয়াস ইবন সাম’আন (রা) বলেন, আমি রাসুল কারিম (সা.) কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য দীর্ঘ একটি বছর মদিনায় অবস্থান করেছি। অবশেষে আমি তাঁর নিকট البر (আল-বির) পূণ্য ও الاثم (আল-ইছম) পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম-

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس-

অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “‘বির’ বা পূণ্য হচ্ছে উত্তম চরিত্র এবং ‘ইছম’ বা পাপ তা-ই, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় জাগায় ও সংকোচবোধ সৃষ্টি করে এবং তা লোকেরা জানুক এটা তুমি পছন্দ করো না।”^{৫৬}

গ. আগন্তুকদের জিজ্ঞাসার জবাব

কেবল মদিনা জনপদের লোকজনই নয়, বরং দূর-দূরান্তের নগর-বন্দর ও বেদুঈনপল্লী হতেও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মহানবির (সা.) সান্নিধ্যে এসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তাদের কাক্ষিক্ষত উত্তর জেনে নিতেন। ফলে হাদিস ভাণ্ডারে যুক্ত হতো নতুন নতুন জ্ঞান। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা মসজিদে নববিত্তে বসা ছিলাম এমন সময় উটের পিঠে আরোহণ করে এক ব্যক্তি আগমন করল। সে তার উটকে মসজিদের পাশে বাধলো। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে? তখন তাকে বলা হলো, ঐ যে সাদা পোশাক পরিহিত হেলান দিয়ে বসা, তিনিই মুহাম্মদ (সা.)। তখন সে মহানবিকে (সা.) জিজ্ঞেস করল, আমি আপনার নিকট কিছু প্রশ্ন করবো এবং প্রশ্ন করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতাও প্রদর্শন করবো। আপনি কিন্তু আমার উপর মনে কোন কষ্ট নিতে পারবেন না। অতঃপর নবি কারিম (সা.) তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদান করলে সে আল্লাহ সম্পর্কে, সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁর রাসুল হিসাবে প্রেরিত হওয়া সম্পর্কে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক মাসের সিয়াম এবং ধনীদেব নিকট হতে যাকাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে রাসুল কারিম (সা.) বলেন, হ্যাঁ! আল্লাহ তা’আলা এসবই ফরজ করেছেন। পরিশেষে সেই লোকটি মহানবি (সা.) এর উত্তরে অনুপ্রাণিত হয়ে বললো, আপনি যে দীন নিয়ে এসেছেন, তাঁর প্রতি আমি ইমান আনলাম, আমার নাম ‘যিমাম ইবন ছা’লাবা’, আমি আমার জাতির লোকদের নিকট আপনার প্রতিনিধি হয়েই ফিরে যাচ্ছি।^{৫৭}

অনুরূপভাবে ‘আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবি কারিম (সা.) এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! ইসলামের মূল বিষয় সম্পর্কে এমন কিছু বর্ণনা করুন, যা আমল করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো এবং আমাদের পশ্চাতের লোকদেরকে তদানুযায়ী আমল করার আহবান জানাবো। অতঃপর নবি (সা.) তাদেরকে চারটি বিষয়ে আদেশ ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন।^{৫৮} এমনিভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসুল

কারিম (সা.) এর নিকটে বসেছিলাম। তিনি লোকদের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় জৈনৈক আরব বেদুঈন এসে নবি কারিমকে (সা.) জিজ্ঞেস করল, কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে? মহানবি (সা.) তাঁর কথা শেষ করে বেদুঈনকে ডেকে বললেন, *فاذا اضيعت الامانة فانتظر الساعة* - “যখন আমানত বিনষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করবে।” লোকটি জিজ্ঞেস করল, আমানত কীভাবে নষ্ট করা হবে? নবি (সা.) বললেন, *اذا اسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة* - “দায়িত্বপূর্ণ কাজ যখন অনুপযুক্ত ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হবে, তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থাক।”^{৫৯}

ঘ. প্রিয়নবির স্বপ্রণোদিত বক্তব্য

নবি কারিম (সা.) সাহাবা কিরামের যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তাতেই যে কেবল হাদিসের উৎপত্তি হতো ব্যাপারটা এমন নয়; বরং তিনি নিজে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময় সাহাবিগণকে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা দানের মাধ্যমেও হাদিসের উৎপত্তি হয়। হানযালা (রা.) বলেন, ‘আমরা একদিন মহানবি (সা.) এর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি আমাদের নিকট জান্নাত ও জাহান্নামের বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। এর ফলে এ দুটি জিনিস আমাদের সামনে এমন উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যেন আমরা প্রত্যক্ষভাবে জান্নাত-জাহান্নাম দেখতে পাচ্ছি।’^{৬০}

ঙ. মহানবির নির্দেশ

কখনও রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্দেশ জারি করতেন, তখন সাহাবিগণ পাগলপারা হয়ে তা পরিপালনে প্রাণপন চেষ্টা চালাতেন। এ ধরনের নির্দেশাবলির মাধ্যমেও হাদিসের উৎপত্তি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসুল (স.) এর একটি প্রসিদ্ধ বাণী উল্লেখযোগ্য, *يَلْعَنُوا عَنِّي* “আমার পক্ষ হতে একটি (হাদিস) বাণী হলেও তা (মানুষদেরকে) পৌঁছে দাও।”^{৬১} এ নির্দেশনা পেয়ে সাহাবাগণ হাদিস প্রচারের আমানতী দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালান।

হাদিসের বিকাশধারা

উল্লিখিত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ইলমে হাদিস উৎপত্তি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় হাদিস বিকশিত হয়ে শাস্ত্রীয়রূপ পরিগ্রহ করে। তাই হাদিসের বিকাশধারা প্রসঙ্গে প্রথমেই রাসুল (স.) এর জীবদ্দশায় হাদিস চর্চা ও সংরক্ষণ কীভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কিত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হলো—

এক. রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদিস চর্চা

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় হাদিস চর্চা ও সংরক্ষণের প্রধান উপায় ছিল সাহাবিগণের হাদিস মুখস্থকরণ ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে তা জীবন্ত রাখা। আর হাদিস প্রচারের প্রধান বা একমাত্র উপায় ছিল মৌখিক প্রচার। তবে রাসুল (সা.) এর যুগে হাদিস লিখিত হয়নি তা বলা যাবে না; কিন্তু তা ছিল নিতান্তই নগণ্য। রাসুল (সা.) ইতিকালের সময় সাহাবিগণের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার। এদের প্রত্যেকের পক্ষে সব সময় রাসুল (সা.) এর সান্নিধ্যে অবস্থান করে তাঁর সকল কথা শুনা বা সকল কাজ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল না। তাই অধিকাংশ সাহাবির জ্ঞাত হাদিসের মধ্যে কিছু ছিল রাসুল (সা.) এর নিকট থেকে সরাসরি শুনা বা দেখা আর কিছু ছিল অপরাপর সাথীদের নিকট থেকে শুনা বা দেখা।

ক. মহানবির (সা.) মাক্কী জীবনে হাদিস সংরক্ষণ ও চর্চা

কুরআন নাযিলের সূচনা লগ্ন থেকেই কুরআন মাজিদ মুখস্থ করণের পাশাপাশি রাসুল (স.) ওহি লিখক সাহাবিদের দ্বারা নিজ তত্ত্বাবধানে তা লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু শুরু থেকে যত দিন পর্যন্ত সাহাবিগণ কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গি, উপস্থাপন পদ্ধতি, বিষয়বস্তু ইত্যাদি দেখে কোনটি কুরআনের আয়াত আর কোনটি তা নয়, এটি বুঝবার যোগ্যতা তাদের হয়নি ততদিন পর্যন্ত হাদিস লেখার ওপর রাসুলের (সা.) নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। এ নিষেধাজ্ঞার কারণ মূলত: কুরআনের সাথে হাদিস সংমিশ্রণের ফলে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে এসেছে, “তোমরা আমার হাদিস লিখ না। কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু কেউ লিখে থাকলে তা মুছে ফেল। তবে আমার কথা মৌখিকভাবে বর্ণনা করায় কোন দোষ নেই। আমার নামে যে মিথ্যা প্রচার করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।”^{৩২} রাসুল (সা.) এর এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে তাঁর মাক্কী জীবনে হাদিস লিখে সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখন হাদিস সংরক্ষণের একমাত্র উপায় ছিল মুখস্থ রাখা। আরবগণ স্বভাবগতভাবে প্রখর ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁরা তাদের সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, নেতাদের স্মরণীয় ঘটনা, কাব্য-শ্লোক, বংশ পরিচয় ইত্যাদি সবকিছুই স্বভাবসুলভ মুখস্থ করে রাখতেন। এ মানুষগুলো ইসলামে প্রবেশ করার পর রাসুল (সা.) এর বাণীসমূহও মুখস্থ করার মাধ্যমে হৃদয় গহিনে স্বয়ংক্রিয় সংরক্ষণ করে রাখতেন। তাঁরা নবি (সা.) এর যে কোনো বাণী একবার শোনা মাত্রই স্মৃতিপটে অংকন করতে সক্ষম হতেন।^{৩৩} তাদের এই প্রখর স্মৃতিশক্তির কারণে হাদিস চর্চা ও প্রচারের ক্ষেত্রে এর উপর তাঁরা নির্ভর করতেন। তাই বলা যায় যে, তৎকালে হাদিস চর্চা ও সংরক্ষণের মাধ্যম ছিল মুখস্থকরণ, মৌখিকভাবে পর্যালোচনা এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে তা জীবন্ত করে রাখা।

খ. মহানবির (সা.) মাদানী জীবনে হাদিস সংরক্ষণ ও চর্চা

মহানবি (সা.) মদিনায় হিজরতের পর সাহাবাগণ যখন কুরআন-হাদিসের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করবার যোগ্যতা অর্জন করেন, তখন সাধারণভাবে তাঁদেরকে হাদিস লিখার অনুমতি প্রদান করা হয়। এ সময় সাহাবিগণ তাঁর মহামূল্যবান মনিমুক্তা সদৃশ বাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাঁরা মহানবির (স.) প্রত্যেকটি বাণী গভীর মনযোগসহকারে শ্রবণ করতেন এবং তাঁর যাবতীয় কাজ-কর্ম, চাল-চলন, আচার-আচরণ ইত্যাদি সন্ধানী দৃষ্টিতে অবলোকন করতেন। ফলে মহানবির (স.) বাণী ও সকল কর্ম সাহাবিদের স্মৃতিপটে পাথর খোদায়ের মত গ্রথিত ও অংকিত হয়ে যেত। এ ছাড়া মহানবি (স.) স্বীয় বাণী মুখস্থ করার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন, পাশাপাশি তা প্রচার-প্রসারের জন্যও উৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসুল (স.) বলেন, “আমার পক্ষ হতে একটি (হাদিস) বাণী হলেও তা (মানুষদেরকে) পৌঁছে দাও।”^{৩৪} তিনি আরও বলেন, “যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য দ্বীন সম্পর্কিত ৪০টি হাদিস মুখস্থ করবে, আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিন তাকে ফকিহ হিসেবে পুনরুত্থিত করবেন। আর আমি সেদিন তাঁর জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।”^{৩৫} হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেন, “আল্লাহ সে ব্যক্তিকে আলোকোন্ডাসিত করে দেবেন, যে আমার কথা (হাদিস) শুনে তা সংরক্ষণ করে ও ভালোভাবে মুখস্থ করে এবং অপরের নিকট পৌঁছে দেয়। অনেক জ্ঞানের বাহক এমন লোকের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়, যে তার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।”^{৩৬} তাই দেখা যায়, ‘আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবি কারিম (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অসুবিধার বিবরণ দেন এবং রাসুল (সা.) এর নিকট নিবেদন করে বলেন,

ইসলামের মূল বিষয় সম্পর্কে এমন কিছু বর্ণনা করুন যা আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো এবং আমাদের পশ্চাতে অবস্থিত সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তদানুযায়ী আমল করার আহবান জানাবো। অতঃপর রাসুল (সা.) চারটি বিষয়ে নির্দেশ ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করে বলেন, “احفظوه و اخبروه من وراءكم-” “তোমরা এগুলো মুখস্থ করো এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদেরকে পৌঁছে দাও।”^{৬৭}

উপর্যুক্ত হাদিসগুলোর বর্ণনাবলি থেকে বোঝা যায় যে, রাসুল (সা.) এর হাদিস মুখস্থকরণ ও তা প্রচারের ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক নির্দেশনা পেয়ে সাহাবা কিরাম কুরআন মাজিদের ন্যায় হাদিস মুখস্থকরণে আগ্রহী হচ্ছিলেন। যার ফলে বাস্তবিক কারণেই প্রতিদিন মহানবির সান্নিধ্যে গিয়ে যে সকল সাহাবির পক্ষে হাদিস শ্রবণ করা সম্ভব হতো না তাঁরা তাঁদের অপরাপর সাথীদের নিকট থেকে হাদিস শ্রবণ করতেন। এমনকি তাঁরা শ্রুত হাদিসসমূহ পরস্পর পুনরাবৃত্তি, চর্চা ও পর্যালোচনার জন্য আলোচনা মজলিসের আয়োজন করতেন। আর এই আলোচনা সভা মসজিদে নববীতে আবার কখনো কোনো সাহাবিদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো। হযরত আনাস (রা) বলেন, “আমরা নবি কারিম (স.) এর নিকট অবস্থান করতাম এবং হাদিস শ্রবণ করতাম। অতঃপর তিনি যখন মজলিস ত্যাগ করতেন তখন আমরা পরস্পর শ্রুত হাদিসের পুনরাবৃত্তি এবং মুখস্থ করতাম।”^{৬৮} মহানবির (স.) হাদিস প্রচারের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সাহাবিগণ হাদিস শোনা মাত্রই তা অপরের নিকট পৌঁছে দিতে তৎপর থাকতেন। যেমন : হযরত বারা ইবন আযিব (রা) বলেন, আমরা মহানবির (স.) মুখ নিসৃত সব হাদিস শুনতে সক্ষম হইনি; বরং আমাদের অনেক বন্ধু ও সাথী আমাদের নিকট হাদিস পৌঁছে দিতেন। কেননা আমরা অধিকাংশ সময় উট চরানোর কাজে ব্যস্ত থাকতাম।^{৬৯}

মহানবি (সা.) নিজেই সাহাবিদের নিয়ে মসজিদে নববীতে জ্ঞান চর্চার মজলিসের আয়োজন করতেন। কেউ মহানবিকে (সা.) প্রশ্ন করলে অথবা কোন বিষয়ে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জবাব দিতেন। হযরত উরওয়া (রা) হযরত আয়িশাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রিফার স্ত্রী মহানবির (সা.) কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, রিফা আমাকে তিন তালাক দিয়েছে, অতঃপর আমি আব্দুর রহমান ইবন যুবাইরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আমি তাকে নপুংসক হিসেবে পেয়েছি। এতদ্ শ্রবণে মহানবি (সা.) তাকে বললেন, তুমি কি আবার রিফার কাছে ফিরে যেতে চাও ? তুমি কখনো তার কাছে ফিরে যেতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং সে না তোমার স্বাদ গ্রহণ করবে।^{৭০}

এ ছাড়াও সাময়িক নিষেধাজ্ঞার পর রাসুলুল্লাহ (স.) কর্তৃক হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল ‘আস (রা.) ও হযরত আবু শাহ (রা) হাদিস লেখার অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে সাহাবাগণ পুনরায় হাদিস লেখায় ব্রতী হন। এ ধরনের কিছু হাদিস থেকে অনুমেয় যে, মাদানী জীবনে মহানবি (স.) হাদিস লেখার ক্ষেত্রে শুধু সাধারণ অনুমতিই দেননি; বরং হাদিস লেখার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হলে তা দূর করে দিতেন। নবি (স.) এর অনুমোদন, উৎসাহ পেয়ে এবং হাদিস নির্ভুলভাবে সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে যে সকল সাহাবি (অল্প সংখ্যক) লেখা-পড়া জানতেন তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে হাদিস লিখে তাদের সংগ্রহে রেখে দিতেন, এর বহু প্রমাণ হাদিস শরীফে বিদ্যমান রয়েছে। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও রাসুল (স.) বিভিন্ন সাহাবির দ্বারা ফরমান লিখিয়ে নিতেন। সাহাবিগণ রাসুল (স.) এর বাণী শুনামাত্র যেভাবে তা মুখস্থ করণ এবং লিখনের মাধ্যমে সংরক্ষণে

তৎপর ছিলেন; ঠিক তেমনিভাবে কাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমেও তাঁরা হাদিস চর্চা ও সংরক্ষণ করতেন। তবে এ কথা সত্য যে, মহানবির জীবদ্দশায় যেখানে কুরআনই সংকলিত হয়নি, সেখানে হাদিস সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

গ. সন্ধিচুক্তি ও বিভিন্নদেশে দূত প্রেরণের মাধ্যমে হাদিস চর্চা

নবি (সা.) মদিনায় হিজরত করে মদিনাবাসী ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক, আনসার-মুহাজির মুসলিমদের নিয়ে “মদিনা সনদ” নামে যে ঐতিহাসিক চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেন, যা ৫২টি ধারায় লিখিত ছিল।^{১৬} নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসুলুল্লাহ (স.) সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য অনেক দূত ও প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তাঁরা তাঁর লিখিত পত্র ও নির্দেশ মোতাবেক দেশ ও সম্প্রদায় প্রধানদেরকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। ফলে মহানবি (সা.) এর বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।^{১৭} এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের প্রতি প্রশাসনিক নির্দেশনা ও চিঠি-পত্র প্রেরণ, রাষ্ট্রীয় ফরমান, ঘোষণাপত্র, চুক্তিনামা ও নিরাপত্তানামা ইত্যাদির মাধ্যমেও হাদিস চর্চা হতো। যেমন : মু'আয ইবন জাবালকে (রা.) ইয়ামেনের গভর্ণর ও শাসক হিসেবে প্রেরণের পূর্বে মহানবি (সা.) বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছিলেন।^{১৮} অনুরূপভাবে মহানবি (সা.) তাঁর যুগে ইয়ামান ও বাহরাইন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত বিশাল ইসলামি প্রজাতন্ত্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মচারী ও জনসাধারণের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। মহানবি (সা.) এর চিঠিপত্র নির্দিষ্ট গ্রন্থে সংকলিত হয় এবং তা ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। অতএব বলা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন চিঠি-পত্র, ফরমান (হাদিস) লিখন এবং তা প্রচার-প্রসারে সরকারি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল।^{১৯} এ উদ্যোগের মাধ্যমেও হাদিসের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ লিখিত হয়েছে; যা নবি যুগে হাদিস লিখনের প্রমাণ বহন করে।

দুই. সাহাবিগণের মাধ্যমে হাদিস সংরক্ষণ ও চর্চা

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নবুয়তোত্তর সময় থেকে ৯৯ হিজরি (হযরত ওমর ইবন আব্দুল আযীযের (রহ.) খিলাফত কাল) পর্যন্ত সময়ে হাদিস চর্চার ধরন-প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দীর্ঘ এক শতাব্দী কালের অধিক সময় পর্যন্ত পাঁচটি পদ্ধতি^{২০} অবলম্বনে হাদিস চর্চিত ও সংরক্ষিত হয়ে আসছে। যথা- ক. হাদিস হিফয তথা মুখস্থকরণ; খ. কিতাবাহ বা হাদিস লিখন; গ. হাদিস শিক্ষা দান; ঘ. হাদিস রিওয়াত বা বর্ণনা; ঙ. হাদিস অনুযায়ী আমলকরণ; নিম্নে এ সম্পর্কিত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো—

ক. হাদিস হিফয তথা মুখস্থকরণ

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবিগণ কুরআনের ন্যায় হাদিস ভাণ্ডারকেও যথাযথভাবে মুখস্থ করণে সদা সচেতন ছিলেন। বিশেষত: আহলুস-সুফফার সদস্যবৃন্দ সার্বক্ষণিক রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাহচর্য ও হাদিস শিক্ষার জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যারা অন্যান্য দায়িত্বের কারণে সর্বদা মহানবি (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত থাকতে পারতেন না, তাঁরা সুযোগ পেলেই আহলুস-সুফফার সদস্যদের থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে কখন কী ঘটেছে, তিনি কখন কী বলেছেন, তা জেনে নেয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকতেন। অনেকে আবার

পালাক্রমেও রাসুল্লাহ (সা.) এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতেন। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) বলেন, “আমি আমার আনসারী প্রতিবেশী আতবান ইবন মালিক (মসজিদে নববী হতে ৩/৪ মাইল দূরে অবস্থিত) আওয়ালী এলাকায় বাস করতাম। নবিজির সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্যে আমরা পালা নির্ধারণ করলাম। যেদিন আমি উপস্থিত হতাম সে দিনের ওহি এবং অন্যান্য বিষয়ের খবর আমি তাঁকে দিতাম। আর তিনি যে দিন উপস্থিত হতেন সেদিন তিনি আমাকে অবহিত করতেন।”^{৭৬} অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রা.) বলেন, “আমরা নবি কারিম (সা.) এর নিকট বসতাম, তিনি আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাজে চলে যেতেন, আর আমরা বসে পরস্পরের মধ্যে তা একটার পর একটা পুনঃপুনঃ আলোচনা করতাম। এরপর যখন মজলিস ত্যাগ করতাম, তখন হাদিস আমাদের অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যেত, যেন তা আমাদের অন্তরে রোপন করা হয়েছে।”^{৭৭} তাই দেখা যায়, সাহাবা কিরাম তাঁদের শিক্ষার্থীদেরকে হাদিস মুখস্থ করণে উৎসাহিত করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলতেন, “তোমরা পরস্পর হাদিস আলোচনা কর। কেননা পরস্পর আলোচনাতেই হাদিসের জীবন।”^{৭৮} আলী (রা.) তাঁর শিক্ষার্থীদের বলেন, “তোমরা পরস্পর মিলিত হবে এবং বেশি বেশি হাদিস আলোচনা করবে; অন্যথায় হাদিস তোমাদের অন্তর থেকে মুছে যাবে।”^{৭৯} আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলতেন, তোমরা পরস্পর হাদিস আলোচনা করবে; কেননা আলোচনাই হাদিসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।”^{৮০} অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস (রা.) তাঁর ছাত্রদেরকে বার বার হাদিস চর্চা করতে উৎসাহিত করতেন।^{৮১} এভাবে সাহাবাগণ ও প্রবীণ তাবিসীগণ অক্লান্ত সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়ে মহানবি (সা.) থেকে প্রকাশিত সকল ধরনের হাদিস মুখস্থ করণের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করেছেন।

খ. কিতাবাহ বা হাদিস লিখন

কুরআন নাযিলের সূচনা লগ্নে কুরআন-হাদিসের সংমিশ্রণের আশঙ্কায় হাদিস লেখা নিষিদ্ধ ছিল। এ নিষেধাজ্ঞা কোন চিরন্তন বিধান ছিল না। এ কারণে মাদানী জীবনে রাসুল (সা.) সাধারণভাবে শুধু হাদিস লেখারই অনুমতি দেননি; বরং এ কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেও তা নিরসন করে দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, আমি নবি (সা.) থেকে শ্রুত সকল হাদিস সংরক্ষণের জন্য লিখে রাখতাম। এমনটি দেখে কুরাইশ সাহাবিগণ আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। আমাকে তারা বলে, তুমি রাসুল (সা.) এর মুখে যা শোন তা সবই লিখে রাখ? অথচ তিনি একজন মানুষ। তিনি কখনও সন্তোষ চিন্তে কিংবা রাগান্বিত হয়ে কথা বলেন। আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, অতঃপর আমি হাদিস লেখা বন্ধ করে দেই এবং একদিন রাসুল (সা.) এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করি। এ কথা শুনার সাথে সাথে নবি (সা.) নিজের দুই ঠোঁটের দিকে ইশারা করে বললেন, “তুমি লিখতে থাক, যে আল্লাহর হাতের মুঠায় আমার প্রাণ তাঁর শপথ, আমার মুখ হতে প্রকৃত সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছুই বের হয় না।” এ কথা শুনার পর আব্দুল্লাহ (রা.) রাসুলকে (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার নিকট থেকে যা কিছু শুনতে পাই সবই কি লিখে রাখবো? রাসুল (সা.) বললেন, ...হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ত্রুদ্ব ও সন্তোষ উভয় অবস্থায় বলা সব লিখে রাখবো? তখন রাসুল (সা.) চূড়ান্তভাবে বললেন, “হ্যাঁ, এ সকল অবস্থায়ও আমি প্রকৃত সত্য ছাড়া কিছুই বলি না।”^{৮২} হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, সাহাবিগণের মধ্যে একমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) ছাড়া আমার চেয়ে বেশী হাদিস আর কেউ বর্ণনা করেননি। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।^{৮৩} হযরত রাফি ইবন খাদিজ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া

রাসুলুল্লাহ! আমরা আপনার কাছ থেকে যা কিছু শুনি তা কি লিখে রাখতে পারবো? তিনি বললেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই।^{৮৪} হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি আরো বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি খুৎবা দিলেন এবং কিছু কাহিনী বর্ণনা করলেন। অতঃপর আবু শাহ নামক জনৈক সাহাবি বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এ ভাষণটি আমাকে লিখে দিন। তখন মহানবি (সা.) সাহাবিগণকে নির্দেশ দিলেন, اكتبوا لابي شاة- “তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও।”^{৮৫} হাদিসবেত্তাদের মতে, এ নির্দেশ দ্বারা হাদিস লিখে রাখার প্রতি আরোপিত প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়। ফলে সাহাবাগণ পুনরায় হাদিস লেখায় ব্রতী হন।^{৮৬} এ মর্মে তিনি আরো স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন, فيدوا العلم بالكتاب- “তোমরা (হাদীসের) জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করে রাখ।”^{৮৭}

এরই ধারাবাহিকতায় অনেক সাহাবি হাদিস লিপিবদ্ধ করণের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সাহাবির সংকলন হলো- (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক আস-সহীফা আস-সাদিকাহ, (২) সহীফা জাবির ইবন আব্দুল্লাহ আনসারী (রা.), (৩) সা'দ ইবন উবাদাহ (রা.) এর সহীফা (৪) সামুরা ইবনু জুনদুব (রা.) কর্তৃক রিসালাহ বা পাণ্ডুলিপি, যা তার ছেলে সুলায়মান বর্ণনা করেছেন। (৫) ইবন মাসউদ (রা.) এর সহীফা, (৬) ইবন আব্বাস (রা.) এর সহীফা, উল্লেখ্য যে, তাঁর কৃতদাস আবু কুরায়ব বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাসের গ্রন্থাদীর বিরাট একটি স্তূপ ছিলো; যা একটি উটের বোঝা সমপরিমাণ। (৭) সহীফা ওয়াহাব ইবন মুনাঈহ (রা.), জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) ১৫৪০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন যা তাঁর শিষ্য ওয়াহাব ইবন মুনাঈহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীতে এ সংকলনটি সহীফা ওয়াহাব ইবন মুনাঈহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। (৮) আমর ইবন হাযম (রা.) এর তা'লীফ বা রচনা, (৯) সহীফা আলী (রা.); এতে যাকাত, হত্যার বিধান, গোলাম আযাদ করণ, কাফিরের বিনিময়ে মুসলমানকে হত্যা না করার বিধান, মদিনার হেরেমের সীমারেখা ও তার বিধান, অন্যকে পিতা হিসাবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে পশু জবাই করা, ভূমির প্রাচীন নিদর্শনসমূহ ধ্বংস করার নিন্দা ইত্যাদি বহু বিষয়ের হাদিস উল্লেখ ছিল। (১০) আনাস ইবন মালিক (রা.) এর সহীফা ইত্যাদি।

গ. হাদিস শিক্ষাদান

হাদিস মুখস্থ ও সংরক্ষণ করতে রাসুল (সা.) সাহাবিদের প্রতি যেমনি তাগিদ দিতেন, তেমনি তা অন্যদের নিকট পৌঁছে দিতে উৎসাহিত করতেন। সাহাবিগণ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মু'আবিয়া (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, “আমি একদা নবি কারিম (সা.) এর সাথে ছিলাম। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন বসে আছ? তারা বললো, আমরা ফরজ সালাত পড়েছি, তারপর বসে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবির সুন্নাহ (হাদিস) সম্পর্কে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করছি।”^{৮৮} এ ছাড়াও মক্কা বিজয়ের পর এবং বিদায় হজ্জের দিন রাসুল (সা.) সাহাবাদের সামনে যে আবেগঘন ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন, তার শেষাংশে তিনি বলেছিলেন, “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট এ কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়।”^{৮৯} কারণ যারা রাসুলের (সা.) হাদিস অন্যদের নিকট পৌঁছে দেয় তাদের উপর সরাসরি নবির (সা.) দু'আ বর্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে একদিন নবি (সা.) বললেন, اللهم ارحم خلفائي- “হে আল্লাহ! তুমি আমার খলিফাগণের উপর রহমত নাযিল কর।” সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া

রাসুলুল্লাহ! আপনার খলিফা কারা? জবাবে নবি (সা.) বলেন, *الذين يروون احاديثي ويعلمونها الناس* - “যারা আমার হাদিসসমূহ বর্ণনা করে ও তা মানুষদের শিক্ষাদান করে।”^{৯০} এসব বাণীতে উদ্ধৃদ্ধ হয়ে রাসুলের ইত্তিকালের পর সাহাবিদের এক বিরাট জামা’আত এ কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হন এবং সমগ্র আরব জাহানে হাদিসের আলো সম্প্রসারিত করেন। বিশেষত মদিনায় হযরত আয়েশা (রা) [মৃ.৫৭হি.], ইবন ওমর (রা) [মৃ.৭৩হি.], আবু হুরায়রা (রা) [মৃ.৫৭হি.] প্রমুখ সাহাবিগণ হাদিসের দারস অব্যাহত রাখেন। মক্কায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) [মৃ.৬৮হি.] হাদিস শিক্ষার এক বিরাট কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। কুফায় হযরত আলী (রা) [মৃ.৪০হি.], ইবন মাসউদ (রা) [মৃ.৩২হি.], আনাস ইবন মালিক (রা) [মৃ.৯৩হি.], প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবিগণ হাদিস শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। বসরায় হযরত আবু মুসা আশ’আরী (রা) [মৃ.৫৪হি.] শাসন কার্য পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে হাদিসের দরস দিতে থাকেন। শামে (সিরিয়া) আবু সাঈদ খুদরী (রা) [মৃ.৭৪হি.], মিসরে আমর ইবনুল ‘আস (রা) [মৃ.৬৩হি.] হাদিস শিক্ষাদান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য সাহাবিগণ নিজ নিজ এলাকায় হাদিস শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলেন।”^{৯১} প্রবীণ তাবিঈগণ তাঁদের থেকে সরাসরি হাদিস শিক্ষা লাভ করেন। মদিনার বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবিগণ ‘নৈশ বিদ্যালয়’ ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। কারণ যারা দিনের বেলায় জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ততার দরুণ শিক্ষা বঞ্চিত থাকতেন তাঁদের জন্য এটি ছিল বিকল্প ব্যবস্থা। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) বলেন, “রাতের অন্ধকার যখন তাদেরকে ঢেকে ফেলতো, তখন তাঁরা মদিনায় অবস্থিত তাঁদের শিক্ষকদের নিকট চলে যেতেন এবং সেখানে তাঁরা সকাল বেলা পর্যন্ত পড়াশুনার কাজে মশগুল থাকতেন।”^{৯২} এ পর্যালোচনায় হাদিস বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত তাবিঈগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২৬জন ইমাম মুহাদ্দিস রাবীর পরিচয় পাওয়া যায়।^{৯৩} এভাবে পরবর্তী স্তরে হাদিস চর্চা ও শিক্ষাদান জ্ঞানের একটি জনপ্রিয় স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে অব্যাহত থাকে।

ঘ. হাদিস রিওয়াত বা বর্ণনা

রাসুল (স.) এর ইত্তিকালের সময় তাঁর সাহাবিদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ্য চৌদ্দ হাজার।^{৯৪} তবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুরআ (রহ.) এর মতে, সাহাবিদের সংখ্যা এক লক্ষাধিক।^{৯৫} ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন, তাঁদের সংখ্যা (মক্কা ও মদিনায়) ছিল ষাট হাজার।^{৯৬} সাহাবা কিরামের সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, সকল সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেননি। তবে বহু সাহাবি হাদিস বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন কিংবা তাদের বর্ণনাসূত্রের ধারাবাহিকতা পরবর্তী যুগের হাদিস বিশারদগণের নিকট পৌঁছেন। তবে তাদের মধ্যে সিংহভাগ সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে অনুমান করা যায়; কিন্তু তাদের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে বলা দুক্ল হ ব্যাপার। বর্ণনা সূত্রের পরম্পরায় যে সকল সাহাবির হাদিস পরবর্তী যুগে এসে পৌঁছেছে সে সকল হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিদের সংখ্যা কত তা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (রহ.) বলেন, হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার বলে মত দিয়েছেন। অবশ্য হাফিয যাহাবী (রহ.) ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, তাদের সংখ্যা ১৫০০ এর মতো হতে পারে; তবে তাদের সংখ্যা কোন মতেই ২০০০ পর্যন্ত পৌঁছাবে না। ইমাম ইবন হাযম জাহেরীর মতে, নবি (সা.) থেকে হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবির সংখ্যা মোট ১০১৮ জন। ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর মুসনাদে মোট ৯০৪ জন সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। বাকী ইবন মাখলাদ (রহ.) তাঁর মুসনাদে এমন আরো ৫৬৮ জন সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা

করেছেন, যাদের থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেননি। আবু বকর আল-বারকী এই তালিকায় আরো ৮৭ জনের নাম বর্ণিত করেছেন, যাদের থেকে বাকী ইবন মাখলাদ ও ইমাম আহমদ হাদিস আহরণ করেননি। ইমাম ইবনুল যাওযী আরো ৬ জনের নাম বর্ণিত করেছেন।^{৯৭} সুতরাং মোট সংখ্যা দাঁড়ায় $(৯০৪ + ৫৬৮ + ৮৭ + ৬) = ১৫৬৫$ জন। তবে এই তালিকার কারো কারো সাহাবি হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। বস্তুত হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবির সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মতবৈচিত্র্য থাকলেও তাদের সংখ্যা ১৫০০ এর মত বলে ইমাম যাহাবী যে মন্তব্য করেছেন সেটিই অধিক বস্তুনিষ্ঠ মত বলে প্রতীয়মান হয়।

হাদিস শাস্ত্রের যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে তার ভিত্তি মূলত: উল্লিখিত দেড় হাজার সাহাবি; যাদের মধ্যে প্রথম পর্যায়: সর্বাধিক (১০০০এর বেশী) হাদিস বর্ণনাকারী ৭ জন সাহাবি থেকে বর্ণিত মোট হাদিস সংখ্যা ১৬৮৭০টি; ২য় পর্যায়: হাদিস বর্ণনাকারী ৪ জন সাহাবি থেকে বর্ণিত (৫০০-৯৯৯) মোট হাদিস সংখ্যা ২৬২১টি; ৩য় পর্যায়: হাদিস বর্ণনাকারী ২৮ জন সাহাবি থেকে বর্ণিত (১০০-৪৯৯) মোট হাদিস সংখ্যা ৫৪৫৯টি; ৪র্থ পর্যায়: হাদিস বর্ণনাকারী ৪৫ জন সাহাবি থেকে বর্ণিত (৪০-৯৯) মোট হাদিস সংখ্যা ২৬৪৪টি; ৫ম পর্যায়: হাদিস বর্ণনাকারী ১১১ জন সাহাবি থেকে বর্ণিত (১০-৩৯) মোট হাদিস সংখ্যা ২১২২টি; সর্বশেষ পর্যায়: হাদিস বর্ণনাকারী ৯১৬ জন সাহাবি থেকে বর্ণিত (০১-০৯) মোট হাদিস সংখ্যা ১৯৮০টি।^{৯৮} অতএব উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, সর্বমোট হাদিস বর্ণনাকারীর (রাবীর) সংখ্যা ১১১১ জন এবং তাদের বর্ণিত হাদিস সংখ্যা মোট ৩১,৬৯৬টি।

ঙ. হাদিস অনুযায়ী আমলকরণ

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিটি বাণী মুখস্থ করণের সাথে সাথে তা কাজে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহাবিগণ ছিলেন সদা তৎপর। এ কারণে তাদের কর্মধারার মাধ্যমেও হাদিস চর্চার ক্রমবিকাশ অব্যাহত থাকে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সকল আদেশ-নিষেধ বা ফরমানকে তাঁরা নিজেদের নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাতেন। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, “আমাদের কেউ যখন দশটি আয়াত শিক্ষা লাভ করতো, তখন উহার অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা ও তদানুযায়ী আমল করার পূর্বে সে আর কিছু শেখার জন্যে অগ্রসর হতো না।”^{৯৯} হাদিস অনুযায়ী আমল করার জন্যে এবং ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান সাহাবিদের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়নের দিকে নবি (সা.) স্বয়ং বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। সাহাবিগণ যাতে সুন্নাত অনুযায়ী সালাত আদায় করতে পারেন সেজন্য তাদের উদ্দেশ্যে রাসুল (সা.) বলেন, صلوا كما رايتموني أصلي- “আমাকে তোমরা যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ, ঠিক সেভাবেই তোমরা সালাত আদায় কর।”^{১০০} হাজ্জের নিয়ম-নীতি অনুসরণের জন্যে বলেছিলেন, خذوا عني مناسككم- “আমার নিকট হতে হজ্জ পালনের নিয়ম-কানুন তোমরা (শিক্ষা) গ্রহণ কর।”^{১০১} কখনও সাহাবিগণের আমলে ক্রটি দেখা গেলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। একবার নবিজি মসজিদে নববীতে জনৈক সাহাবিকে সুন্নতের পরিপন্থি সালাত আদায় করতে দেখে বলেছিলেন, ارجع فصل- “তুমি পুনরায় সালাত আদায় কর, কেননা তুমি (সঠিকভাবে) সালাত পড়নি।”^{১০২} এভাবে আমলের মাধ্যমে হাদিস চর্চার ধারা ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হয়।

পর্যালোচনা

১. হাদিস অস্বীকারকারীদের মতে, কুরআন যেহেতু পূর্ণাঙ্গ, ত্রুটিমুক্ত, স্পষ্ট ও বিস্তারিত; তাই রাসুলুল্লাহর কথা নয়, কেবল কিতাবুল্লাহর প্রতি নির্ভর করাটা যুক্তিযুক্ত। তাদের বক্তব্য শুধু হাদিসই নয় কুরআন অস্বীকারেরও নামান্তর।
২. তারা হাদিসকে ওহি হিসেবে বিশ্বাস করে না। অথচ কুরআন-হাদিস দুটি প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ (ওহী) প্রত্যাদেশ। যার দলীল উল্লিখিত হয়েছে।
৩. কুরআন নাযিলের প্রথম যুগে কুরআনের সাথে হাদিস মিলে যাওয়ার আশঙ্কায় রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদিস লিপিবদ্ধ করণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তা প্রত্যাহার করেছিলেন যার প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে।
৪. দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে হাদিস সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার অভিযোগে তারা হাদিসকে অস্বীকার করতে চায়; অথচ হাদিসকে অবিকৃত রাখতে পঠন, পাঠন, সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারে যুগে যুগে বহু হাদিসবিশারদগণ জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।
৫. যুক্তিবাদিরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আনুগত্য তাঁর জীবদ্দশায় সীমাবদ্ধ করতে চায়; অথচ তিনি হলেন সর্ব শেষ নবি ও রাসুল, তার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবি-রাসুল পৃথিবীতে আসবেন না।
৬. তারা বলেন, যে সকল আইন আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত নয় সেগুলো পালন করা শিরক (আল-কুরআন, ৪২:২১)। যেহেতু সুল্লাহ পালনের ব্যাপারে আল্লাহর সুনির্দিষ্ট নির্দেশ নেই, তাই তা পালন শিরক তুল্য। তাদের যুক্তিটি যথার্থ নয় বরং কুরআন অস্বীকারের নামান্তর।
৭. তারা আরো যুক্তি প্রদর্শন করে যে, হাদিসের পারস্পরিক বাহ্যিক বিরোধ মীমাংসা এবং হাদিস সহিহ-দ্বয়িফ ও অন্যান্য পরিভাষা মুহাদ্দিসগণের ইজতিহাদ প্রভৃতি অজুহাতে হাদিস অস্বীকার করে।

উপসংহার

হাদিসশাস্ত্র বিশ্ববাসীর জন্য এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামি শরিয়াতের অন্যতম প্রধান উৎস। একে বাদ দিয়ে আল্লাহর বিধান সঠিকভাবে পরিপালন করা কল্পনাতেই ব্যাপার। তাই মহানবি (স.) এর যুগে হাদিস চর্চার পর্যালোচনার নিমিত্ত এই প্রবন্ধে হাদিস পরিচিতি, হাদিসের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, অপরিহার্যতা ও প্রামাণিকতা, নবি (স.) এর যুগে ও তৎপরবর্তী কালে হাদিস চর্চা সম্পর্কিত নাতিদীর্ঘ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। নবি (সা.) এর জীবনাদর্শ (হাদিস) অনাগত মানবতার কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সাহাবা কিরামের যুগ হতে বর্তমান অবধি মুসলিম সমাজে এর প্রচার-প্রসার ও সংকলন-গ্রন্থবদ্ধ করণ, পঠন-পাঠন ও গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংকলিত হাদিস গ্রন্থরাজি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। হাদিসবিদগণ হাদিসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে রচনা করেছেন উলুমুল হাদিস (উসুলুল হাদিস ও রিজাল শাস্ত্র) নামে দু'টি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান। হাদিসের মৌলিক সংকলনের বহু ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে; আবার প্রণীত হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত সংকলনও। এ ছাড়া হাদিস সংকলনের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা শৈলীভেদে বিভিন্ন অভিধায় রচিত হয়েছে বৈচিত্র্যময় হাদিস গ্রন্থরাজি। নব্য হাদিস

অস্বীকারকারীরা হাদিসকে যতই প্রশংসিত করার অপচেষ্টা করুক না কেন নবি (স.) এর যুগে হাদিস চর্চার উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে হাদিসগ্রন্থ রচনা ও গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে এবং তা চলমান থাকবে অনন্ত কালব্যাপী।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

- ১ আল কুরআন, ১৬ : ৪৪
- ২ জামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন মুকাররম ইবন মানজুর আল-আফরিকী, *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারু সাদির, তা.বি., সংস্ক.১, খ.২, পৃ. ১৩১
- ৩ ড. মুহাম্মদ আজ্জাজ আল-খতীব, *আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন*, কায়রো: মাকতাবাতুল ওয়াহবাহ, সংস্ক.২, পৃ. ২০
- ৪ ড. মাহমুদ আত-তুহহান, *তাইসির মুসতাহিল হাদিস*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মাআরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযীহ, ২০১১ খ্রি. সংস্ক.১১, পৃ. ১৩
- ৫ ড. মুহাম্মদ আজ্জাজ আল-খতীব, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২০
- ৬ *প্রাণ্ডক্ত*
- ৭ ড. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আবু শোহবা, *আল ওয়াসাইত ফী উলুমি ওয়া মুসতাহিল হাদিস*, কায়রো: মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ১৩
- ৮ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাতী, *ফাতহুল মুগীস শরহ আলফিয়াতিল হাদিস*, লিবাণন: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪০৩ হি., সংস্ক.১, খ. ১, পৃ. ১০
- ৯ ইসম জমা': যে জমা' বা বহুবচন একটি দলকে বুঝায়, কিন্তু তার নিজ (لفظ) শব্দ থেকে কোনো একবচন থাকে না। (রশিদ শারতুনী, *মাবাদিউল আরাবিয়া*, বৈরুত: আল-কাসুলিকিয়াহ, ১৯৪২ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ৯১)
- ১০ আবুল কাসেম জারুল্লাহ মাহমুদ ইবন ওমর আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ত. বি., খ. ২, পৃ. ২৪৩
- ১১ আবু হাইয়ান, *বাহরুল মুহীত*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯২খ্রি., খ. ৫, পৃ. ২৮১
- ১২ ড. মাহমুদ আত-তুহহান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ.১৩
- ১৩ বি.দ্র. রাগিব আল-ইস্পাহানী, *মুফরাতাদুল কুরআন*, মিসর: মুস্তফা আল-আবী আল-হালাবী, ১৩২৪ হি., পৃ. ১০৮; সা'দী আবু জীব, *আল-কামুসুল ফিকহী*, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়াহ, তা. বি., পৃ. ৭৯; ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'হজী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়াহ, তা. বি., পৃ. ১৭৬; আবুল হাসান আহমদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়া, *মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ*, খ. ২, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি., পৃ. ৩১; ইবন মানযুর আল-আফরিকী, *প্রাণ্ডক্ত*, খ. ১১শ, পৃ. ১৩১; লুইস মালুফ, *আল-মুনজিদ*, করাচী : দারুল ইশায়াত, ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খ্রি., পৃ. ১৯৩
- ১৪ আবুল হাসান আহমদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়া, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩১
- ১৫ শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *আল-হাদিস হুজ্জিয়াতুন বিনাফসিহি ফীল আকাঈদি ওয়াল আহকাম*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৩

- ১৬ ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস, *কামুস ইলিয়াস আল আসরী*, বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ১৩৮; ওয়াহিদুজ্জামান, *লুগাতুল হাদিস*, খ. ১, করাচী: কারখানা তিজারাতে কুতুব, তা.বি., পৃ. ৩১; আল-হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুযুতী, *তাদরীবুর রাবী*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল কাওসার, ১৩১৫হি., পৃ. ৬; বুতরুস আল-বস্তানী, *কিতাবু কুতরিল মুহীত*, খ. ১, বৈরুত: মাকতাবাতু বুস্তান, ১৯৬৯ খ্রি., পৃ. ৩৬৭-৩৬৮; Edward william lane, *An Arabic English lexican*, Part-2 (Beirut : 1980), p. 529
- ১৭ ড. সুবহী আল-সালিহ, *উলুমুল হাদিস ওয়া মুসতলাহুহ*, বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালিয়াঈন, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৪-৫
- ১৮ ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস, *কামুসুল জীব*, মিসর : মাতবাআতুল আদরিয়াহ, ১৯২৮ খ্রি., পৃ. ৯৮, ড. আজ্জাজ আল খতীব, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২০; ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস, *আল কামুসুল মাদরাসী*, মিসর : আল মাতরাআতুল আসরিয়াহ, তা.বি., পৃ. ৮২; Edward William Lane, *An Arabic English lexicon*, New york: Frederick ungar publishing co., 1956, part-2, p. 529
- ১৯ আল-কুরআন, ১৮: ০৬, ৩৯: ২৩, ৪৫: ০৬, ৫১: ২৪, ৫২: ৩৪, ৫৩: ৫৯, ৫৬: ৮১, ৬৮: ৪৪, ৭৭: ৫০, ৭৯: ১৫, ৮৫: ১৭, ৮৮: ০১
- ২০ আল-কুরআন, ০৪: ৪২, ০৪: ৭৮, ০৪: ৮৭, ১২: ১১১, ৬৬: ০৩
- ২১ আল-কুরআন, ১২: ০৬, ১২: ২১, ১২: ১০১, ২৩: ৪৪
- ২২ আল-কুরআন, ০২: ৭৬, ৯৯: ০৪
- ২৩ আল-কুরআন, ১৮:৬; ৩৯:২৩; ৫২:৩৪
- ২৪ আব্দুল হক দিহলবী, *আল মুকাদমাহ*, লাহোর: মাকতাবাতুস মুসতাফায়ী, তা.বি, পৃ.৩; মান্না' খালীল আল কাতান, *আল-হাদিস ওয়াহ ছাকাফাতুল ইসলামিয়াহ*, সৌদি আরব: আল মা'আরিফ, ১৪০৮হি./১৯৮৮ খ্রি., খ.১, পৃ. ২
- ২৫ আস-সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *মীযানুল আখবার মুকাদামাতু ফিকহীস সুনানি ওয়াল আসার*, কানপুর: আল-মাকতাবা আল-মাজীদিয়াহ, তা.বি, পৃ. ১-২
- ২৬ ড. সুবহী আল-সালিহ, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৫
- ২৭ ড. মাহমুদ আত-ত্বহান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৪
- ২৮ আল-কুরআন, ১৫ : ০৯
- ২৯ জাস্টিস মুহাম্মদ তাকি ওসমানি, *সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা*, অনু. প্রফেসর ড. রহমান হাবিব, ঢাকা: বি আই আই টি, ২০১৪ খ্রি. পৃ.৫৮
- ৩০ আল-কুরআন, ১৬: ৪৪
- ৩১ আল-কুরআন, ৫৩: ০৩
- ৩২ শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল-কুরআন*, কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়াহ, ১৯৬৪ খ্রি., সং.২, খ.১৭, পৃ. ৮৫
- ৩৩ *প্রাণ্ডক্ত*
- ৩৪ আল-কুরআন, ৬২:০২
- ৩৫ আল-কুরআন, ২:২২৯, ২:২৩১, ২:১৫১, ২:২৫১, ৩:৪৮, ৩:৮১, ৩:১৬৪, ৪:৫৪, ৪:১১৩, ৫:১১০, ৬:২০২

- ৩৬ ইমাম ইবন কাছীর (রহ.), অধ্যাপক আখতার ফারুক অনূদিত, *তাফসীরে ইবন কাছীর*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৮খ্রি., খ.১, পৃ. ৭৪৮
- ৩৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.), *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৪
- ৩৮ আল-কুরআন, ১৬: ৪৪
- ৩৯ হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর, *তাফসীর ইবন কাসীর*, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রাহমান অনূদিত, ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৪৭৫
- ৪০ ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশআস (রহ.), *সুনানু আবী দাউদ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি, হাদিস নং-৪৬০৪
- ৪১ শামসুল হক আল-আযীমাবাদী, *আওনুল মাবুদ শরহ সুনানে আবু দাউদ*, বৈরুত: দারুল কতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১৫হি., খ. ১২, পৃ.২৩১-৩২
- ৪২ ইব্রাহীম ইবন মুসা আশ-শাতেবী আল মালেকী, *আল মুওয়াফাকাহ ফী উসূলিশ শারীআহ*, বৈরুত: দারুল মারিফাহ, তাবি, খ.৪. পৃ. ৮
- ৪৩ হারিস ইবন 'আমর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ মু'আযকে ইয়ামানে প্রেরণকালে তাঁকে বললেন, তুমি (ইয়ামানের জনগণের মাঝে) কীভাবে ফায়সালা করবে? মু'আয বললেন, আল্লাহর কিতাবে যা আছে তার মাধ্যমেই আমি ফায়সালা করব। রাসুলুল্লাহ বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে না পাও? মু'আয বললেন, তাহলে রাসুলুল্লাহ এর সূন্নাহ এর মাধ্যমে (ফায়সালা করব)? রাসুলুল্লাহ বললেন, যদি রাসুলুল্লাহ এর সূন্নাতে না থাকে? মু'আয বললেন: (তাহলে) আমি আমার ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করব? রাসুলুল্লাহ বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আল্লাহর রাসুলের দূতকে (সত্য বোঝার) তাওফীক দিয়েছেন। [আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জার্মি তিরমিযী*, বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, তাবি, হাদিস নং-১৩২৭]
- ৪৪ ড. মুহাম্মদ আয-যুহাইলী, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, দামেশক: দারুল খাইর, ২০০৩খ্রি., পৃ. ১৯৭
- ৪৫ আল-কুরআন, ৫৩ : ৩-৪
- ৪৬ ওহি প্রধানত দু'প্রকার, যথা : (১) ওহি মাতলু, যা নামাযে তিলাওয়াত করা হয়। এর অপর নাম 'ওহি জলী' বা প্রত্যক্ষ ওহি (২) ওহি গায়ের মাতলু, এটি নামাযে পাঠ করা হয় না। এর অপর নাম 'ওহি খফী' বা পরোক্ষ/প্রচ্ছন্ন ওহি। প্রথম শ্রেণির ওহিকে কুরআন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ওহিকে হাদিস বলে।
- ৪৭ আল-কুরআন, ৪ : ১১৩
- ৪৮ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন কাসীর, *তাফসীর কুরআনিল আযীম*, রিয়াদ : মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৪১২/১৯৯২খ্রি., ১ম সংস্ক., খ.১, পৃ. ৬১০
- ৪৯ মুহাম্মদ আবু যাহ, *আল-হাদিস ওয়াল মুহাদিসুন*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৪০৪/১৯৮৪, পৃ. ১১
- ৫০ আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, মিসর : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৯৬খ্রি., খ.১, পৃ. ৯৬
- ৫১ নবি করিম (সা.) এর নিকট দীন সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করা হলে এবং সে বিষয়ে তাঁর পূর্ব জ্ঞান না থাকলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এর কোন জবাব দিতেন না, বরং জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভের পরই তার জবাব দিতেন। যেমন : একদা জনৈক ইয়াহুদী পণ্ডিত নবি করিম (সা.) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান কোনটি? এর সঠিক উত্তর তাঁর জানা ছিল না বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে এর কোন জবাব দেননি। পরে তিনি জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে এর সঠিক উত্তর জেনে তাকে জানিয়ে দিলেন, পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদ। (মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদিস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৭০খ্রি., পৃ. ৬২)

- ৫২ আল-কুরআন, ৫৯ : ৭
- ৫৩ ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খায়রিল ইবাদ, ভারত : মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৮৮০, খ. ৩, পৃ. ৭৫
- ৫৪ ইমাম মুসলিম (রহ.), সহীহ মুসলিম, বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০৩খ্রি., খ. ১, পৃ. ১২৬৬
- ৫৫ আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), মুসনাদ আহমদ, মিসর : আল-মাতবা'আ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৮৯৩, খ. ১, পৃ. ১৬০
- ৫৬ ইমাম মুসলিম (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
- ৫৭ ইমাম মুসলিম (রহ.), সহীহ মুসলিম, বৈরুত : দারুল কুতুবিল আলামিয়াহ, ১৯৯১খ্রি., খ. ১, পৃ. ১৯৮০
- ৫৮ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫
- ৫৯ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
- ৬০ আহমদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
- ৬১ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১২
- ৬২ ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬৮
- ৬৩ মুফতী আমীমুল ইহসান, হাদিস সংকলনের ইতিহাস, ঢাকা: কুতুব খানা রশীদিয়া, ১৪১১হি., পৃ. ৬-৭.
- ৬৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১২
- ৬৫ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
- ৬৬ ইমাম তিরমিযী (রহ.), মোহম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) কর্তৃক তাহকীক কৃত, সহীহ আত-তিরমিযী, ঢাকা: হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২০১৩খ্রি., খ. ৫, পৃ. ১৬৭
- ৬৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
- ৬৮ খতিব আল বাগদাদী, আল-জামি' লি আখলাকির বাবী ওয়া আদাবিস সামি, মিসর : দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, তা.বি, পৃ. ৪৬
- ৬৯ মুহাম্মদ ইবন সা'আদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি, খ. ৪, পৃ. ১৮৩
- ৭০ ড. আজ্জাজ আল-খতীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
- ৭১ ইমাম আবু দাউদ (রহ.), আস-সুনান, বৈরুত: দারুল রিসালাতিল আলামিয়া, ২০০৯খ্রি., পৃ. ৩১১
- ৭২ মুহাম্মদ ইবন আলী আল-আনসারী, আল-মিসবাহুল মুদী, বৈরুত : দারুল কুতুব, তা.বি, পৃ. ৪০
- ৭৩ “যখন তুমি আহলে কিতাবদের কাছে আগমন করবে, তখন তুমি তাদেরকে দাঁড়াত দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তারা যদি একথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। আর তারা যদি একথা মেনে নেয় তবে তাদের জানিয়ে দিবে আল্লাহ তা'আলা তাদের যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে।” (আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭)
- ৭৪ মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজমী (রহ.), হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা : এমদাদীয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লি., পূর্বমুদ্রণ-২০০৮খ্রি., পৃ. ৫৪;
- ৭৫ ড. সুবহী আল-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-৪৯
- ৭৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

- ৭৭ খতীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি*, মিসর: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, তা.বি, পৃ. ৪৬; আল-হাফিয নুরুদ্দীন ইবন 'আলী ইবন আবী বকর আল-হায়সামী, *মাজমা'উয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, কায়রো: ত্বাবা আল-কুদুসী, ১৩৫৩হি., পৃ.১৬০
- ৭৮ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুযুতী, *তাদরীবুর রাবী*, করাচী : মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা, ১৩৯২/১৯৭২, সংস্ক.২, খ. ২, পৃ. ১৫২
- ৭৯ হাকিম আবু আবদুল্লাহ, *মারিফাতু উলূমিল হাদিস*, কায়রো : মাকতাবাতু দারুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, ১৯৩৮ খ্রি., পৃ. ১৪১
- ৮০ হাকিম আবু আবদুল্লাহ, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৪১
- ৮১ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন আদির রহমান আদ-দারেমী, *সুনান দারেমী*, বৈরুত: দারুল বাশায়ের আল-ইসলামী, তা.বি, খ. ১, পৃ. ১৪৭
- ৮২ ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, দিল্লী : আসাছল মাতাবি, তা.বি, পৃ.৩২
- ৮৩ ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), *প্রাণ্ডক্ত*, খ.২, পৃ. ২৪৮; ড. সুবহী আল-সালিহ, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ.২৮
- ৮৪ খতীব আল-বাগদাদী, *তাকইদুল ইলম*, বৈরুত : দারুল-ইহইয়াইস সুনাতিন নাবাবিয়াহ, ২য় সংস্ক., ১৯৭৪ খ্রি., পৃ. ৭২-৭৩
- ৮৫ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ.), *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৪৮১
- ৮৬ মুহাম্মদ আব্দুল আযীয আল-খাওয়ালী, *মিফতাহুস সুন্নাহ*, মিসর : মাকতাবাতুল আরাবিয়াহ, ১৯২৮খ্রি., পৃ.১৬
- ৮৭ ইবন আব্দুল বার, *জামি'উল বায়ানিল ইলম ওয়া ফায়লিহী*, রিয়াদ : দারুল ইবনুল জাওয়ী, ৪র্থ সংস্ক., ১৪১৭/১৯৯৭খ্রি., খ.১, পৃ.৩১৯
- ৮৮ ইমাম হাফিজ আবু আদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আদিল্লাহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী, *আল-মুত্তাদরাক আলাস সহীহায়ন*, বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, তা.বি, খ.১ ,পৃ.১৭২
- ৮৯ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ.), *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ.২৮
- ৯০ আল-হাফিয নুরুদ্দীন ইবন 'আলী ইবন আবী বকর আল-হায়সামী, *প্রাণ্ডক্ত*, খ.২, পৃ.২৬৩
- ৯১ মুহাম্মদ আবু যাহ, *আল-হাদিস ওয়াল মুহাদিসুন*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৪০৪/১৯৮৪খ্রি., পৃ. ১০১-১০৮
- ৯২ ইবন হাজার আল'আসকালানী, *আল-ইসাবা*, বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, খ.৭, পৃ. ২০৫
- ৯৩ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুযুতী, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ.২৭৭-২৭৮
- ৯৪ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল বাকী আয-যারকানী, *শরহ মুআত্তা মালিক*, বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১৪১১হি., খ.২, পৃ.৩৪১
- ৯৫ শামসুদ্দীন আস-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীস*, বৈরুত : দারুল ইমামিত তাবারী, ১৪০৯/১৯৯৬খ্রি., খ.৪, পৃ. ৩৯
- ৯৬ আবুল ফিদা ইসমাদিল ইবন উমর ইবন কাসীর (রহ.), *আল-বায়িসুল হাসীস ফী ইখতিসারি উলুলুল হাদিস*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল আলামিয়াহ , তা.বি, পৃ. ২৫
- ৯৭ ড. মুহাম্মদ আবু যাহ, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৩২; জালালুদ্দীন আস-সুযুতী, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২২১; আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, *হাদিস অধ্যয়নের মূলনীতি*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ২০০৯খ্রি., পৃ. ১৪

- ৯৮ ইবনুল জাওযী, *তালকীহ ফুহুমি আহলিল আছার*, বৈরুত: শিরকাতুত-দান আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম, ১৯৯৭খ্রি., পৃ. ২৬২-২৭৪
- ৯৯ ইবন আব্দুল বার, খ.২, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১০৭
- ১০০ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১২৮
- ১০১ ইবন আব্দুল বার, খ.২, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৯০; ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩২৭
- ১০২ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী (রহ), *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৫১

কুরআন-হাদিস ও বিজ্ঞানে মানবসৃষ্টিতত্ত্ব

মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম*
আবু তৈয়ব মোঃ নাজমুছাফিকব ভূইয়া**

Abstract

Man's quest to know about his origin has prompted him to go into his roots, and religious scriptures are the finest source for him. The greatest miracle is the Holy Qur'an. The Qur'an contains an exquisite explanation of the genesis, development, and developmental phases of intra-uterine life. In the seventh century, Muslims had this information, and the hadiths of the Prophet Muhammad (pbuh) described nearly everything regarding prenatal and even postnatal events. Modern embryology is a relatively new field that began with the advent of the microscope in the 17th century. However, the concept of the human being developing in stages was not recognised until much later. The holy Qur'an and Sunnah [words, actions, and endorsements of Prophet Muhammad (pbuh) gathered by reliable narrators] have supplied a thorough explanation of the significant events in human development, from gametes and fertilization through full term pregnancy and birth, and even postpartum. In essence, information in the Qur'an and Hadith rectified many pre-existing superstitions and ambiguous notions about human development. In this article, we will attempt to provide the statements and theories of the holy Qur'an, Sunnah, and Science regarding the genesis of human beings.

চাবিশব্দ: মানবসৃষ্টিতত্ত্ব, মানুষের উৎপত্তি, মানবশরীর গঠনতন্ত্র, আল-কুরআন, আল-হাদিস, বিজ্ঞান, জ্ঞান

ভূমিকা

পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানব সৃষ্টি মহান আল্লাহর কুদরতের একটি নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা কাদামাটি দিয়ে প্রথম মানব সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি এই কাদার কাঠামোতে রুহ বা আত্মা দান করেছেন। মানবসৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কুরআনে সুনির্দিষ্ট কতিপয় আয়াত এসেছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার নিচু ও নিকৃষ্ট উৎস, তার প্রথম ও পরবর্তী সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যাতে মানুষ তার অহঙ্কারকে মোকাবেলা করতে পারে এবং আল্লাহর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মহাশক্তির প্রতি তার বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। ইসলাম ধর্মে হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.), খ্রিষ্ট ধর্মে এডাম (Adam) ও ইভ (Eve), সনাতন ধর্মে মনু ও শতরূপা হলেন প্রথম মানব-মানবী। মানুষকে আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি এই চারটি মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজ্ঞান মানবশরীরের প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু, অনন্য নামকরণ এবং সচিত্র বিবরণ দেওয়ার অনেক আগে কুরআনে মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি সবিস্তারে প্রকাশ করা হয়েছিল। মানবসৃষ্টির মূল ও প্রাথমিক উপাদান হলো মানব জ্ঞান। মানব জ্ঞান কোন তৈরিকৃত বস্তু নয়, বরং এটি পর্যায়ক্রমে স্তরের পর স্তর

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

দ্বারা গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, কোনও আল্ট্রাসাউন্ড মেশিনের অস্তিত্বের অনেক আগে কুরআনে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশের কালানুক্রমিক পর্যায়গুলোর বর্ণনা আছে। কুরআনে বিধৃত বর্ণনাগুলোর ব্যাখ্যা হিসেবে হাদিসেও মানবসৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনা পাওয়া যায়। আর কুরআন-হাদিসে বর্ণিত মানবসৃষ্টি সংক্রান্ত পর্যায়গুলো বিজ্ঞান উৎকর্ষের ধাপে ধাপে প্রমাণিত ও স্বীকৃত হচ্ছে। প্রবন্ধে কুরআন-হাদিস ও আধুনিক বিজ্ঞানে মানবসৃষ্টি সম্পর্কে গুরুত্ববহ যেসব তত্ত্ব রয়েছে তা সবিস্তারে আলোচনার প্রয়াস থাকবে। পর্যালোচনামূলক এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হলো কুরআন-হাদিস ও বিজ্ঞানের আলোকে মানবসৃষ্টিতত্ত্ব উপস্থাপন করা।

গবেষণা-পদ্ধতি

একটি গবেষণার প্রকৃতি, অনুকল্প গঠন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে গবেষণা পদ্ধতি। ‘কুরআন-হাদিস ও বিজ্ঞানে মানবসৃষ্টিতত্ত্ব’ শীর্ষক গবেষণাকর্মটি মূলত মানবসৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কুরআন-হাদিসের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা এবং সাধারণ বিজ্ঞানের আধুনিক বিশ্লেষণধর্মী তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা এবং প্রচলিত অসার দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়াস। এ গবেষণায় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণপূর্বক বিজ্ঞানের সাথে কুরআন-হাদিসের নির্দেশনার সমন্বয়সাধন এবং প্রচলিত ভুল ধারণার অপনোদন মূখ্যবিষয় বিষয়। গবেষণার প্রকৃতি বিবেচনায় এ গবেষণাকর্মটিতে বিশ্লেষণাত্মক ও গুণাত্মক গবেষণা (Qualitative Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রত্যয় সংজ্ঞায়ন এবং প্রত্যয়সমূহের সাথে কুরআন-হাদিস ও বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। একই সাথে গবেষণায় উল্লিখিত মানবসৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কুরআন, হাদিস ও বিজ্ঞানের আলোকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক গবেষণা (Descriptive Research) পদ্ধতি এবং ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ গবেষণাকর্মে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বিবেচনায় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) এবং লাইব্রেরি পদ্ধতি (Library Method) অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

‘কুরআন-হাদিস ও বিজ্ঞানে মানবসৃষ্টিতত্ত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো- প্রথমত: মানবসৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্যের উপস্থাপন করে মানবসৃষ্টি সম্পর্কে ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক ধারণা তুলে ধরা। দ্বিতীয়ত: আল-কুরআনে বর্ণিত মানবসৃষ্টির সাতটি স্তর সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা, যা বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবেও স্বীকৃত। তৃতীয়ত: মানবসৃষ্টির সাতটি স্তর সম্পর্কে কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং আধুনিক বিজ্ঞানে মানবসৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়গুলো সঠিক প্রমাণিত হওয়ার তথ্য উপস্থাপন করা গবেষণা প্রবন্ধের প্রধানতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। সর্বোপরি কুরআন-হাদিসের আলোকে বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করা এবং ইসলামি বিশ্বাসের ভিতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা উক্ত গবেষণাকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মানবসৃষ্টিতত্ত্ব

সুবিশাল পৃথিবীর সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। মানবসৃষ্টি হলো তাঁর সৃষ্টিজগতের মাঝে সেরা সৃষ্টিকর্ম। বিভিন্ন স্তর বা ধাপে মহান আল্লাহ মানবসৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

“وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا” “তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে বা স্তরে স্তরে।”^১ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থ আল-কুরআনে মানবসৃষ্টি সম্পর্কে সাতটি স্তর বর্ণনা করেছেন। যা পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত। এ সাতটি পর্যায় পেরিয়ে মানবশরীর পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

মানবসৃষ্টির মূল উপাদান হলো মানব ক্রণ। মানব ক্রণ কোনো তৈরিকৃত বস্তু নয়, বরং এটি পর্যায়ক্রমে স্তরের পর স্তর দ্বারা গঠিত হয়।^২ পবিত্র কুরআন-হাদিস ও বিজ্ঞানের আলোকে মানবসৃষ্টির সাতটি স্তর হলো- সূলালাহ (মাটির সার নির্যাস, বিজ্ঞানের ভাষায়- sperm ও ovum), নুতফাহ (প্রজনন কোষ, বিজ্ঞানের ভাষায়- zygote), 'আলাক্বাহ (জমাট রক্তপিণ্ড, বিজ্ঞানের ভাষায়- blastocyst), মুদগাহ (মাংসপিণ্ড, বিজ্ঞানের ভাষায়- somites), 'ইযাম (অস্থি, বিজ্ঞানের ভাষায়- skeleton), লাহম (মাংসপেশী, বিজ্ঞানের ভাষায়- muscles), রুহ (প্রাণ, বিজ্ঞানের ভাষায়- foetus)।^৩ ক্রণতত্ত্ববিদ Von Baer^৪ ১৮২৭ সালে ক্রণ বিকাশের এ স্তরগুলো (stages) আবিষ্কার করেন।^৫

সপ্তম শতাব্দিতে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের বহুপূর্বেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বৈজ্ঞানিক এ সত্যতা বিবৃত হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত আছে,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

“আর আমি তো মানুষকে মাটির সার নির্যাস হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে। অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে। অতঃপর অস্থিকে আবৃত করে দেই মাংসপেশী দ্বারা। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। সুতরাং তিনি মহামহিম আল্লাহ যিনি সর্বময় মহান স্রষ্টা।”^৬

পবিত্র কুরআন, হাদিস ও বিজ্ঞানের আলোকে উপর্যুক্ত সাতটি স্তরের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

প্রথম স্তর: সূলালাহ (মাটির সার নির্যাস)

আল-কুরআনে মানবসৃষ্টির প্রথম পর্যায়কে বলা হয়েছে, মাটির সার নির্যাস^১ (سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ) অর্থাৎ মাটির সার নির্যাস থেকে মানবসৃষ্টির সূচনা হয়।^২ মাটির সার নির্যাস হচ্ছে সোডিয়াম (Na),

ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), পটাসিয়াম (k), হাইড্রোজেন (H₂), অক্সিজেন (O₂), নাইট্রোজেন (N₂) ইত্যাদি। বৃক্ষরাজি এবং ক্ষেতের ফসল স্বীয় মূলের সাহায্যে এগুলো চুষে নেয়। তারপর বৃক্ষ ফল (আম, কাঁঠাল, আপেল, আঙ্গুর, কলা ইত্যাদি) দেয়। ক্ষেতে ফসল (ধান, গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়। ফল এবং ফসলগুলো মানুষ খাদ্যরূপে গ্রহণ করার পর পাকস্থলিতে ডাইজেস্ট হয়। ডাইজেস্টিভ খাদ্যের সার নির্বাস থেকে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পুরুষের শুক্রাশয়ে (testes) উৎপন্ন হয় Spermatozoon (সংক্ষেপে একে Sperm বলা হয়) এবং নারীর ডিম্বাশয়ে (ovary) উৎপন্ন হয় Ovum। অতঃপর Spermatozoon এবং Ovum এর নিষেক থেকে সৃষ্টি হয় Zygote। জাইগোট জরায়ুতে (uterus) স্থানান্তরিত হয়ে ভ্রূণ (embryo) গঠন করে। আর এ ভ্রূণ ক্রমাগত রূপান্তরের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি হয়। সুতরাং ‘সুলালাহ’ হচ্ছে ভ্রূণ সৃষ্টির মূল উপাদান, যার দ্বারা মানবসৃষ্টির অন্যান্য স্তরসমূহ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।^{১৮} মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ “আর আমি তো মানুষকে মাটির সার থেকে সৃষ্টি করেছি।”^{১৯}

দ্বিতীয় স্তর: নুতফাহ (জাইগোট)

আরবি ‘নুতফাহ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট অতি সূক্ষ্ম জনন কোষ। Sperm এবং Ovum উভয় অর্থে নুতফাহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।^{২০} আবার Sperm এবং Ovum এর নিষেকের ফলে গঠিত কোষ জাইগোটকেও কুরআনে নুতফাহ বলা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে নুতফাহ শব্দের পরে ‘আমশাজ’ (الْمُشَاج) শব্দটি এসেছে।^{২১}

নুতফাহ হলো পুরুষ (শুক্রাণু) ও নারীর (ডিম্বাণুর) মিলনের ফলে সৃষ্ট বস্তু

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রারম্ভে Sperm, Ovum এর ভিতর প্রবেশ করে নিষেক (fertilization) ঘটায়। এরপর জাইগোট গঠিত হয়। এ তত্ত্বটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন দশম শতাব্দির বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে সিনা।^{২২} তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ ‘Al-Qanun Fittib’-এ Sperm এর নাম দিয়েছেন ‘আজযায়ে মামবিয়াত’ এবং Ovum এর নাম দিয়েছেন ‘বাইযায়ে উনসা’।^{২৩}

পুরুষ ও স্ত্রীর সহবাসের ফলে উভয়ের যে নুতফাহ মিশ্রিত হয় সেই মিশ্রিত নুতফাহ থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জাইগোট সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনে ‘নুতফাতুল আমসাজ’ দ্বারা মিশ্রিত নুতফাহ বা জাইগোটই উদ্দেশ্য, যা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের সহবাসের ফলে ঘটে থাকে।^{২৪} পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

“আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন।”^{২৫} এক ইয়াহুদী রাসুলকে (স.) জিজ্ঞাসা করেন—

يَا مُحَمَّدُ، مِمَّ يُخْلَقُ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ: يَا يَهُودِيُّ، مِنْ كُلِّ يُخْلَقُ: مِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ، وَمِنْ نُطْفَةِ الْمَرْأَةِ

“হে মুহাম্মদ (স.), কী হতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে? রাসুল (স.) বললেন, ওহে ইয়াহুদী! মানুষ সৃষ্টি হয়েছে কেবল স্ত্রী ও পুরুষের মিলিত বীৰ্য ও নিঃসৃত রস হতে।”^{১৭}

জাইগোট গঠনের ২৪ ঘণ্টা পর তা বাচ্চাখলির দেয়ালে ঘেরা প্রকোষ্ঠে স্থান লাভ করে এবং ২টি, ৪টি, ৮টি এভাবে ক্রমান্বয়ে বিভাজন হতে থাকে। এটাকে বলা হয় Morula।^{১৮} এ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ

“অতঃপর আমি তাদেরকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।”^{১৯}

জ্ঞান তৈরিতে নুতফার ক্ষুদ্র অংশ

বিজ্ঞান অনুযায়ী পুরুষের স্থূলিত বীৰ্যের সমগ্র অংশ থেকে মানুষ তৈরি হয়নি। স্ত্রী সহবাসের সময় পুরুষ একসঙ্গে ২৫০ মিলিয়ন শুক্রানু নির্গত করে। এই ২৫০ মিলিয়ন শুক্রানুর মাত্র ১০০০টি নারীর ডিম্বাশয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। অবশেষে নারীর ডিম্ব, যা একটি লবণকণার অর্ধেক আকারের, তা পুরুষের মাত্র একটি শুক্রাণুকে ডিম্বে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়। এই একটি শুক্রাণুই নারীর ডিম্বকে গর্ভদান করে।^{২০} আল্লাহ তায়ালা বলেন, مَاءٍ مَذْيُونٍ, “অতঃপর তার বংশধারা এমন এক বস্তু হতে উৎপন্ন করে যা নিকৃষ্ট পানির মতোই।”^{২১} পুরুষ ও নারীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর গঠন সম্পর্কে রাসুল (স.) বলেছেন,

فَأَمَّا نُطْفَةُ الرَّجُلِ فَنُطْفَةٌ غَلِيظَةٌ، مِنْهَا الْعَظْمُ وَالْعَصَبُ، وَأَمَّا نُطْفَةُ الْمَرْأَةِ فَنُطْفَةٌ رَقِيْقَةٌ، مِنْهَا اللَّحْمُ وَالْدَّمُ

“পুরুষের শুক্রাণু হলো গাঢ়, যা হাড় ও স্নায়ু থেকে তৈরি হয়; আর নারীর ডিম্বাণু পাতলা, যা মাংসপিণ্ড ও রক্ত থেকে তৈরি হয়।”^{২২}

সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে নুতফাহ

জেনেটিক বিদ্যা অনুযায়ী শিশু ছেলে হবে অথবা মেয়ে, তা নির্ধারণ করে পুরুষের শুক্র। নারীর ডিম্বানুর এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই। নর ও নারীর লিঙ্গ নির্ধারণের মূল উপাদান হল ক্রোমোজোম।^{২৩} মানুষের ৪৬টি ক্রোমোজোমের মধ্যে ২টি হলো লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোম। পুরুষের ক্রোমোজোমকে xy এবং নারীর ক্রোমোজোমকে xx দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। y ক্রোমোজোম বহন করে ছেলের জীন বা বংশধারার উপাদান এবং x ক্রোমোজোম বহন করে মেয়ের জীন বা বংশধারার উপাদান। যদি মায়ের x ক্রোমোজোম বাবার শুক্রাণুর x ক্রোমোজোমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে xx জোড়া তৈরি করে তাহলে শিশুটি হবে মেয়ে। অপরদিকে যদি মায়ের x ক্রোমোজোম বাবার শুক্রাণুর y ক্রোমোজোমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে xy জোড়া তৈরি করে তাহলে শিশুটি হবে ছেলে।^{২৪}

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে X ও Y ক্রোমোজোমের এ ঘটনা বা তথ্য ১৪০০ বছর আগে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, **وَإِنَّهُ خَلَقَ الرُّؤُوسَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ** “আর এই যে তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী। শুক্রবিন্দু হতে যখন তা স্থলিত হয়।”^{২৫}

ক্রণের ৮ম সপ্তাহে নর-নারীর লিঙ্গের প্রভেদ চিহ্ন প্রকাশ পেতে থাকে।^{২৬} মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন,

فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّؤُوسَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ “অতঃপর তা (ক্রণ) থেকে তিনি সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী।”^{২৭}

তৃতীয় পর্যায়: ‘আলাক্বাহ (ব্লাস্টোসিস্ট)

আরবি শব্দ ‘আলাক্বাহ’র অর্থ হলো জমাট বাধা রক্তপিণ্ড।^{২৮} বিজ্ঞানে একে বলা হয় ব্লাস্টোসিস্ট (Blastocyst)।^{২৯} আরবিতে ‘আলাক্বাহ’ শব্দের তিনটি ব্যবহারিক অর্থ রয়েছে, ১. জোঁক সদৃশ বস্তু (Leech like substance) ২. ঝুলে থাকা বস্তু (Hanging, Clinging thing) ৩. জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড (Blood Clot)। তিনটি শব্দই ক্রণের জন্য প্রযোজ্য।^{৩০}

কুরআনের ক্রণতত্ত্ব ও ক্রণবিদ্যার গবেষক এবং টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডা. কেইথ এল মুর (জ.১৯২৫-মৃ.২০১৯)^{৩১} ‘আলাক্বাহ’র এ তিনটি অর্থের সাথে ক্রণের অবস্থার মিল খুঁজে পেয়েছেন। তিনি স্বীয় গবেষণায় উল্লেখ করেন, এটি (‘আলাক্বাহ’) দেখতে জোঁকের মত (বিজ্ঞানের ভাষায়- Leech like substance)। একটি জোঁক রক্ত চুষে নিয়ে যে রূপ ধারণ করে আলাক্ব সে রকম একটি বস্তু। ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে ‘আলাক্বাহ’ জোঁক সদৃশ রূপ লাভ করে। এর মধ্যে থাকে মাথার সম্মুখভাগের উন্নত অংশ। এ পর্যায়ে হৃদপিণ্ড অর্থাৎ Cardiovascular system এর উন্নয়ন ঘটে এবং ক্রণটি পুষ্টির জন্য তার মাতৃরক্তের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে ১৫-১৬ দিনের মাথায় ‘আলাক্বাহ’ বাচ্চাদানির দেয়ালে ঝুলন্ত দেহবস্তুর মত ঝুলে থাকে।^{৩২} মহান আল্লাহ বলেন, **لَمْ يَكْ نُطْفَةٍ مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَىٰ** “সে কি বীর্যের শুক্রবিন্দু ছিল না যা স্থলিত হয়? অতঃপর সে ‘আলাক্বাহ’ পরিণত হয়।”^{৩৩} আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, **خَلَقَ الْإِنْسَانَ** “তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক্ব’ (জমাট রক্ত) থেকে।”^{৩৪}

চতুর্থ পর্যায়: মুদগাহ (সোমাইটস)

আরবিতে মুদগাহ শব্দের অর্থ মাংসপিণ্ড (Fleshy Lump)।^{৩৫} বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় সোমাইটস (Somites)।^{৩৬} মুদগাহ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হলো চর্বিতে পদার্থের ন্যায় মাংসপিণ্ড।^{৩৭} প্রফেসর কেইথ মুর চুইংগাম চিবিয়ে তা বের করে ক্রণের ছবির সঙ্গে তুলনা করেন। চর্বনকৃত চুইংগামে দাঁতের ঘেরকম ছাপ দেখা যায় এই অবস্থায় ক্রণের পৃষ্ঠদেশেও ঠিক সেরকম ছাপ দেখা যায়।^{৩৮}

ব্লাস্টোসিস্ট এর বাইরের স্তর ট্রোপোব্লাস্ট নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে প্রাচীর কলা (Tissue) বিগলিত হলে ব্লাস্টোসিস্ট নিমজ্জিত হয়। কুরআনে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে মুদগাহ্। এ প্রক্রিয়া অন্তত ২৩-৪২ দিন পর্যন্ত চলে। মুদগাহ্ অবস্থায় ক্রণকে প্রকৃতপক্ষে চর্বি মত (chewed like substance) দেখায়। তখন ১৩টি খাঁজকাটা মাংসপিণ্ডের ব্লক ক্রণের শিরদাঁড়ায় সাজানো থাকে যেগুলোকে বলা হয় ‘মেসোডার্মাল সেক্সম্যান্টস (mesodermal segments)।’^{৩৯}

গর্ভে ক্রণের তৃতীয় সপ্তাহ শেষে নটোকর্ড এবং নিউরাল টিউবের প্রত্যেক পার্শ্বে মেসোডার্ম পুরু হয়ে প্যারাকসিয়াল মেসোডার্ম এর দীর্ঘ কলাম গঠন করে। এটাই একসিস এর নিকট পুরু মেসোডার্ম। এটা অতিসত্ত্বর ইপিথেলয়েড সেলস (Epitheloid Cells)-এ বিভক্ত হয় যাকে সোমাইটস বলে।^{৪০} সোমাইটসের প্রথম জোড়া এমব্রিওর ক্রেনিয়াল (মাথার দিকে) প্রান্ত ১৯-২১ দিনে প্রকাশ পায়। তবে পরবর্তীতে প্রতিদিন সোমাইটস হতে তিন জোড়া করে নতুন সোমাইটস গঠিত হয়। পঞ্চম সপ্তাহের শেষের দিকে ৪২-৪৪ জোড়া সোমাইটস গঠিত হয়। এটা হলো চার জোড়া অকসিপিটাল, আট জোড়া সারভাইকাল, বারো জোড়া থোরাসিক, পাঁচ জোড়া লামবার, পাঁচ জোড়া স্যাকরাল এবং আট থেকে দশ জোড়া কক্সিজিয়াল। প্রথম অকসিপিটাল এবং শেষ ৫-৭ কক্সিজিয়াল অদৃশ্য হয়ে যায় এবং বাকিগুলো ভারতব্রাল কলাম এবং স্কালের অংশবিশেষ গঠন করে। মানব-ক্রণতত্ত্ববিদ হ্যামিলটন, বয়েড এবং মসম্যানের মতে, নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য সোমাইটস এমব্রিওর সুস্পষ্ট ফিচারস পৃষ্ঠদেশ পরিমণ্ডলে দেখা যায়। এটা হলো সেই ভিত্তিমূল যেখান থেকে মাংস বেড়ে ওঠে।^{৪১} কুরআনে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

نَمْ جَعَلْنَاهُ نَطْقَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْقَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعُلُقَةَ مِضْغَةً-

“অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি।”^{৪২}

পঞ্চম পর্যায়: ‘ইয়াম (স্কেলেটন)

আরবি শব্দ عظام (‘ইয়াম) অর্থ অস্থি বা কঙ্কাল।^{৪৩} বিজ্ঞানে এটাকে Skeleton বলা হয়েছে।^{৪৪} এ পর্যায়ে প্রথমে যে অস্থিগুলো দেখা যায়, সেগুলো হচ্ছে উপরিভাগের কচি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। প্রাথমিক ৬ সপ্তাহে কচি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মেসেনচিম্যাল টিস্যুগুলো (mesenchymal tissue) কোমল অস্থিতে পরিণত হয়ে ভবিষ্যৎ অস্থির স্বচ্ছ মডেল গঠন করে। ৬ সপ্তাহের শেষের দিকে উপরের দিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কঙ্কালের পূর্ণাঙ্গ কোমল মডেল প্রদর্শন করে। ১২ সপ্তাহের মধ্যে ক্রণের একটি ক্ষুদ্র পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল গঠিত হয়।^{৪৫} মহান আল্লাহ বলেন,

فَخَلَقْنَا الْمِضْغَةَ عِظَامًا “অতঃপর মাংসপিণ্ডকে অস্থিতে রূপান্তরিত করি।”^{৪৬}

মহান আল্লাহর অশেষ নেয়ামত তিনি মানুষকে সোজা সুউচ্চ শারীরিক কাঠামো দিয়েছেন। মানুষের এ শারীরিক কাঠামো অনেকগুলো ছোট-বড় হাড় ও গ্রন্থি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব হাড় ও গ্রন্থি

মানুষকে বসতে, দাঁড়াতে, কাত হতে সহায়তা করে এবং এসব হাড় ও গ্রন্থির যথাযথ কাঠামোবদ্ধতার ফলেই মানুষ হাত, পা, মাথা ইত্যাদি নাড়াচাড়া করতে পারে।

চারিদিকে বিজ্ঞানের জয়জয়কার হলেও একবিংশ শতাব্দীর এ আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীরা মানুষের হাড় ও গ্রন্থির সঠিক সংখ্যা নিরূপণে সক্ষম হননি। বিজ্ঞানীদের অনেকে ২০০, ৩০০, ২০৬ এমনকি ১০০-৩০০ এর মাঝামাঝি অনেক সংখ্যায় হাড়ের সংখ্যা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্বকোষ (Encyclopedia)-এ হাড়ের বিবরণ, প্রকারভেদ, কার্যকারিতা, হাড়ের বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা থাকলেও সরাসরি হাড়ের সংখ্যা বর্ণনার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রচলিত তথ্য হলো হাড়ের সংখ্যা ২০৬টি। এ তথ্যটি সর্বপ্রথম ১৯৯৫ সালে ‘The Hutchinson Encyclopedia’-তে প্রকাশিত হয়েছে।^{৪৭} তবে প্রফেসর কেইথ মুর-এর মতে, মানব কঙ্কালে মোট ৩৬০টি জোড়া থাকে। Skeleton স্তরে ৩৬০টি জোড়া সমৃদ্ধ কঙ্কাল তত্ত্ব সম্পূর্ণ হতে ১২ সপ্তাহ সময় লাগে।^{৪৮}

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) চৌদ্দশ’ বছর পূর্বেই মানুষের ৩৬০ জোড়া হাড়ের ঘোষণা দিয়ে অনন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য উন্মোচন করেছেন। মানব শরীরের হাড় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল (স.) বলেছেন,

إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ مَفْصِلٍ

‘প্রতিটি আদম সন্তানকে ৩৬০ জোড়া হাড় দ্বারা যথাযথভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।’^{৪৯} ডা. হামিদ আহমেদ তাঁর ‘The Journey of Faith inside the Human Body’ গ্রন্থে মানবশরীরের ৩৬০ জোড়া হাড়ের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন- ১৪৭ জোড়া মেরুদণ্ডের হাড়, ২৪ জোড়া বক্ষস্থিত হাড়, ৮৬ জোড়া উচ্চ প্রান্তসীমা (হাতের আঙুল পর্যন্ত), ৯২ জোড়া নিম্ন প্রান্তসীমা (পায়ের আঙুল পর্যন্ত), ১১ জোড়া নিতম্বের মধ্যকার অস্থি কাঠামো।^{৫০} উল্লিখিত হাদিসে ৩৬০ জোড়া হাড় দ্বারা সঞ্চরমান (নড়াচড়া করানো যায় এমন) হাড়গুলোকে বোঝানো হয়েছে। যেমন মেরুদণ্ডের সাথে মাথার খুলির সংযোগ, যা দ্বারা আমরা মাথাকে বিভিন্ন দিকে সরাতে পারি। আবার মেরুদণ্ডের সাথে উরুর অস্থির সংযোগ, যার ফলে আমরা পা-কে বিভিন্নভাবে বাঁকাতে পারি।

এ সময় (ছয় সপ্তাহ কাল) অরগানোজেনিসিস এ জিনিথ (শিরাবিন্দু) পরিলক্ষিত হয়, যা দ্বারা কর্ণ, চক্ষু গঠনের পদ্ধতি, হাড়, মাংস এবং চামড়া গঠন হয়। এ জন্য প্রত্যেকটি অঙ্গের পৃথিকীকরণ চিহ্নিত হয় এবং ত্বরিতভাবে গোনাদস থেকে টেসটিসে অথবা গর্ভাশয়ের পৃথিকীকরণ পরিদৃষ্ট হয়। বর্তমান সময়কালে জানা গেছে, ইন্ট্রা-ইউটেরাইন লাইফ (গর্ভকালীন জীবন) এর ৭ থেকে ৮ সপ্তাহে গোনাদস টেসটিসে অথবা ওভারিতে পৃথিকীকরণ আরম্ভ হয়।^{৫১}

ষষ্ঠ পর্যায়: লাহম (মাসল্‌স)

আরবি শব্দ لَحْم (লাহ্ম) অর্থ মাংসপেশী।^{৫২} এটাকে বিজ্ঞানে বলা হয় Muscles stage।^{৫৩} ৭ম সপ্তাহ থেকে কঙ্কালতন্ত্র বিস্তার লাভ করে এবং অস্থিগুলো যথাযথ আকার ধারণ করে। ৮ম সপ্তাহ

থেকে অস্থির চারপাশে পেশীতন্ত্র আবৃত হতে থাকে। ৮ম সপ্তাহ শেষ হলে নির্দিষ্ট পেশীতন্ত্র, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মাথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময় ক্রণটি নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়।^{৫৪} মহান আল্লাহ বলেন, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا “অতঃপর অস্থিকে মাংসপেশী দ্বারা আবৃত করেছি।”^{৫৫}

একটি ক্রণ sperm-ovum থেকে skeleton পর্যন্ত একটি স্তর থেকে আরেকটি স্তরে উন্নতি লাভের সাথে সাথে পূর্বের স্তরের আকৃতি লোপ পায়, কিন্তু skeleton থেকে muscles এর স্তরে উন্নতি লাভের সময় skeleton এর আকৃতিগত কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় না। বরং skeleton এর চারপাশে পেশীতন্ত্রের আবৃত হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে ক্রণটি Muscles stage এ উন্নতি লাভ করে।^{৫৬} এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“আর আমি তো মানুষকে মাটির সার হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আমি তাদেরকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরবর্তীতে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে। অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে। অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে। সুতরাং তিনি মহামহিম আল্লাহ যিনি সর্বময় মহান স্রষ্টা।”^{৫৭}

এখানে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন ক্রণের পরিবর্তন বুঝাতে গিয়ে خَلَقْنَا (খালাক্বনা) এবং جَعَلْنَا (জা‘আলনা) এ দু’টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এগুলো যথাক্রমে خَلَقَ (খালকুন) এবং جَعَلَ (জা‘লুন) শব্দদ্বয় থেকে উদ্ভূত। শব্দ দু’টি আভিধানিকভাবে কোনো কিছু সৃষ্টি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পূর্বে ছিলো না এমন বস্তুকে কোনো আকৃতি দেওয়া বা পূর্বে ছিলো এমন বস্তুকে নতুন কোন আকৃতি দেওয়া বোঝাতে خَلَقَ (খালকুন) এবং جَعَلَ (জা‘লুন) শব্দ দু’টির ব্যবহার হয়ে থাকে।^{৫৮}

মহান আল্লাহ সুলালাহ’র ক্ষেত্রে خَلَقَ, নুতফাহ’র ক্ষেত্রে جَعَلَ, আলাক্বাহ্, মুদগাহ্ ও ইয়ামের ক্ষেত্রে পুনরায় خَلَقَ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেননা, একটি ক্রণ সুলালাহ থেকে ইয়াম পর্যন্ত এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নতি লাভ করতে গিয়ে পূর্বের আকৃতি লোপ পেয়ে নতুন আকৃতি ধারণ করে।^{৫৯} অপরদিকে ইয়াম থেকে লাহ্ম এর স্তরে ক্রণের উন্নতি লাভ করা বোঝাতে মহান আল্লাহ خَلَقَ বা جَعَلَ ব্যবহার না করে كَسَوْنَا (কাসাওনা, যা كَسَوْهُ মূলধাতু থেকে উদ্ভূত) ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ- পোশাক পরিধান করা, কোন বস্তুকে বাহ্যিক কোনো আবরণ দ্বারা আবৃত করা।^{৬০} একটি ক্রণ ইয়াম থেকে লাহ্মের পর্যায়ে উন্নতি লাভের ক্ষেত্রে যেহেতু ইয়াম (স্কেলেটন)

এর কোনো পরিবর্তন হয় না বরং একে লাহ্ম (মাসল্‌স) দ্বারা (পোশাক পরিধানের ন্যায়) আবৃত করে দেওয়া হয়, তাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে خَلَقْنَا (খালাক্বনা) এবং جَعَلْنَا (জা'আলনা) ব্যবহার না করে كَسَوْنَاهُ (কাসাওনা) ব্যবহার করেছেন।

সপ্তম পর্যায়: রুহ (ফিটাস)

মানবসৃষ্টির সর্বশেষ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্‌র ক্ষণের মাঝে রুহ (আত্মা বা প্রাণশক্তি) সঞ্চার করেন। এতে করে নারী-পুরুষের সেই নূতনা একটি পরিপূর্ণ মানব-শিশুতে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, “অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে”।^{৬১} আরবিতে ‘খালক্বান আখারা’ অর্থ ভিন্ন আকার।^{৬২} বিজ্ঞানে এ পর্যায়কে Foetus (Miniature human baby) বলা হয়েছে।^{৬৩}

৮ম সপ্তাহের মধ্যে ক্ষণের মৃদু নড়াচড়া শুরু হয়। এটা ক্ষণের মধ্যে রুহ (আত্মা) সঞ্চার হওয়ার লক্ষণ।^{৬৪} আল্লাহ তা'আলা বলেন, “অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন এবং তাতে রুহ সঞ্চার করেন।”^{৬৫}

রুহ বা আত্মা কী? এর উত্তর পাওয়া খুব কঠিন। সহজ অর্থে রুহ বা আত্মা হলো জীবনীশক্তি। একে দেখা যায় না। তার রঙ, রূপ, গঠন কিছুই বর্ণনা দেওয়ার মতো নয়।

বিজ্ঞানের মতে, “জীবন আর মৃত্যুর মাঝে পার্থক্য হচ্ছে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা। যতক্ষণ আমাদের মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কার্যক্ষম থাকে ততক্ষণ আমরা আমাদের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারি বা অন্য কথায় নিজেদের জীবিতবোধ করি। একজন মানুষের প্রতিটি অঙ্গ সুস্থ থাকলেও যদি তার মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল না হয় তাহলে সে মৃত। আবার একজন মানুষের সম্পূর্ণ শরীর প্যারালাইজড থাকলেও যদি তার মস্তিষ্ক মোটামুটিভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তাহলে সে তার অস্তিত্ব বুঝতে পারবে। অতএব সে জীবিত। আসলে আমরা আত্মা বলতে যে স্পিরিচুয়াল সত্তার বা শক্তির কথা চিন্তা করি, বিজ্ঞানে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। দৈহিক কার্যক্রম ও মস্তিষ্কের সমন্বয়ের ফলে আমরা আমাদের মাঝে অস্তিত্ব অনুভব করি এবং একটি জীবনীশক্তিবোধ করি। এই পুরো ব্যাপারটিই মস্তিষ্কপ্রসূত। আত্মা নামক কোনো পৃথক সত্তা বা শক্তির কোনো অস্তিত্ব এখনো বিজ্ঞান খুঁজে পায়নি।”^{৬৬}

রাসুল (স.)-কে যখন কাফিররা রুহ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা রাসুলকে (স.) বললেন, “يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا-”, “আর তারা আপনাকে রুহ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। আপনি বলুন, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশে সৃষ্ট এবং তোমাদেরকে (এ বিষয়ে) অতি সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।”^{৬৭}

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা

মহান আল্লাহ সন্তান ভূমিষ্ঠকরণ প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেন বলে ঘোষণা করেছেন। কুরআনের বাণী, **مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ- ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ**, “তিনি একে কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? শুক্রবিন্দু হতে তিনি একে প্রথমে সৃষ্টি করেন এবং পরে এর পরিমিত বিকাশ সাধন করেন। অতঃপর এর জন্য পথ সহজ করে দেন।”^{৬৮}

শক্তভাবে আটকানো জরায়ু মুখ (cervix uteri) এবং স্বাভাবিকভাবে সংকীর্ণ প্রসবদ্বার যার দুটো হাড়ই পূর্ণশ্রেণির শক্ত বলয় দ্বারা পরিবেষ্টিত^{৬৯}, এ রকম একটা পথে মানব শিশুর জন্ম আপাতদৃষ্টিতে এক অসম্ভব কর্ম। নিম্নবর্ণিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে আমরা অত্র আয়াতের গভীর অর্থ খুঁজে পেতে পারি।

তিনটি ধাপে প্রসব সম্পন্ন হয় : বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

নরম ও পিছল তল বা জরায়ুপথ তৈরি: প্রথম ধাপ চলাকালে, ডিম্বাশয় ও গর্ভফুল থেকে রিলাক্সিন (relaxin) নামে এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত হয়, যার কারণে শ্রেণি সন্ধি বন্ধনীগুলো পৃথক হয়ে যায় এবং সারভিক্স ইউটেরি তথা জরায়ু মুখ নরম হয়ে থাকে। তার পরেই ঘটে থাকে জরায়ুর সংকোচন। জরায়ুর উপরের অংশে এটি শুরু হয়। এ অংশে থাকে সক্রিয় সঙ্কোচন পেনিকলা যা জরায়ুর সংকীর্ণ নিক্সিয় নিম্নাংশের মধ্য দিয়ে শিশুকে ঠেলা দিতে থাকে। একই সঙ্গে প্রতিটি জরায়ু সংকোচন ক্রিয়ার পাশাপাশি শিশুর চারদিক ঘিরে থাকা বিল্লির ভিতর দিয়ে এক ধরনের জলীয় পদার্থ (amniotic fluid) পানির ব্যাগের মত জরায়ুর মুখ পর্যন্ত চলাচল করে এবং শিশুর বেড়ে ওঠা ত্বরান্বিত করে। পরিশেষে এই থলেটি ফেটে গেলে বিল্লিটি শিশুর বয়ে চলার জন্য একটা নরম ও পিছল তল বা জরায়ুপথ তৈরি করে।^{৭০}

শিশুর অবস্থানের পরিবর্তন: প্রসবের দ্বিতীয় ধাপে শিশুর মানস ও অবস্থানে কিছু ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটে যা অনিয়মিত আকারের অস্থিযুক্ত ছিদ্রের ভিতর দিয়ে শিশুর অতিক্রমণকে সহজ করে তোলে। স্বাভাবিক প্রসবে, শিশুর মাথা প্রথমে বের হয়ে আসে, তারপর আসে দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সাধারণত মা নিজেও মধ্যচ্ছদা (diaphragm) ও উদর পেশিতে স্বেচ্ছাকৃত চাপ প্রয়োগ করে থাকে। গড়পড়তা শিশুর মাথার আকার ঠিক পেলভিস বা যে অস্থিপথে শিশু অতিক্রমণ করে, তাতে যতটুকু ফাঁক থাকে তার সমান, এর বেশি নয়। কাজেই প্রসবকালে মাথা চাপে সংকুচিত থাকে।^{৭১} এটা সম্ভব হয় এ কারণে যে, এ সময় মাথার হাড় নরম থাকে এবং হাড়ের মাঝে থাকে ‘ফন্টানেলি’ (fontanelles) নামক এক ধরনের আঁশজাতীয় ফাঁকা স্থান, যা জন্মকালে মাথার করোটিকে আকৃতি পরিবর্তনে সক্ষম করে তোলে।^{৭২}

গর্ভফুলের বহিরাগমণ: প্রসবের তৃতীয় ধাপ হচ্ছে, গর্ভফুলের বহিরাগমণ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই গর্ভফুলের বহিরাগমণ সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর এভাবেই জরায়ু মুখ (cervix uteri) এবং স্বাভাবিকভাবে সংকীর্ণ প্রসবদ্বার যার দুটো হাড়ই পূর্ণশ্রেণির শক্ত বলয় দ্বারা

পরিবেষ্টিত, এ রকম একটি পথে ধাপে ধাপে পূর্ণ মানবশিশুতে রূপ নেয়া একটি মানবজ্ঞান খুব সহজেই জন্ম লাভ করে।^{৭৩}

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায়, পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ভ্রূণতত্ত্ব তথা মানবসৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে যে সকল নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা কোনোভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতির ফলে আমরা যেমন কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনাবলির সঠিক মর্মার্থ বুঝতে কিছুটা সক্ষম হয়েছি তদ্রূপ বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের বহুকাল পূর্বে অবতীর্ণ কুরআন ও হাদিসের এমন নির্দেশনাবলির দ্বারা বিজ্ঞানও তার গবেষণাকর্মে পেয়েছে ভিন্ন গতি। অতীব আশ্চর্যের বিষয় হলো, মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনে আলোচ্য তত্ত্বগুলোর ইঙ্গিত করেছেন সেই সময়ে, যখন বিজ্ঞানের বাতাস বিন্দুমাত্র প্রবাহিত হয়নি। চিকিৎসক বা বিজ্ঞানী না হয়েও মুহাম্মদ (স.) এ বিষয়ে স্থায়ী হাদিসসমূহে নির্দেশনা দিয়েছেন এমন যুগে, যখন কারো পক্ষে এই সূক্ষ্ম জ্ঞান, যা আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, তা জানা সম্ভব ছিল না। সুতরাং, আমাদের উচিত পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনাসমূহের সাথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করে কুরআন-হাদিসের নির্দেশনাসমূহের সঠিক মর্মার্থ উদ্ঘাটন করা। সবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষের নেপথ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কুরআন-হাদিসের নির্দেশনাসমূহ অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছে। তাই বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো কুরআন-হাদিসের নির্দেশনার নিরিখে ব্যাপকভাবে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। তাহলে বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিষয় কুরআন-হাদিসের নীতি-নির্দেশনার সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবেই বিশ্বমুসলিমসহ সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। কুরআন-হাদিসের নির্দেশনাসমূহকে সমুন্নত রেখে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

- ১ আল-কুরআন, ৭১:১৪।
- ২ I. Gruner and Oskar Cameron (translated by), *The Canon of Medicine of Avicenna* (New York: AMS press, 1st edition, 1973), p. 359, ISBN: 0-404-11231-5.
- ৩ মুহাম্মদ আবু তালেব, *বিজ্ঞানময় কুর'আন Al-Qur'an is all Science*, (ঢাকা: আরজু পাবলিকেশন্স, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৩৭
- ৪ Karl Ernst von Baer (1792-1876) was a German scientist and explorer. Baer was a naturalist, biologist, geologist and a founding father of embryology. The Estonian anatomist and embryologist Karl Ernst von Baer was the first to describe the mammalian ovum. He also developed the germ-layer theory, which became the basis for modern embryology. He published in 1827 the first description of a mammalian egg, *Epistola de ovi mammalium et hominis genesi* (On the Origin of the Mammalian and Human Ovum).

<<https://www.encyclopedia.com/people/science-and-technology/cell-biology-biographies/karl-ernst-von-baer>> last accessed on 29/01/2023.

- ৫ Dr. Keith L. Moore, *The Developing Human-Clinically Oriented Embryology*, Volume 8 (United Kingdom: Saunders Publishing, 8th edition, 2007), p.15; মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬
- ৬ আল-কুরআন, ২৩:১৩-১৫
- ৭ Mohar Ali, *A Word for Word Meaning of Qur'an*, Volume 2 (United Kingdom: Jamiyat Ihyaa Minhaaj Al-Sunnah, 2003), p. 1077, ISBN: 954-03695-6.
- ৮ আল-কুরআন, ২৩:১৩
- ৯ I. Gruner and Oskar Cameron (translated by), *ibid*, p. 99; মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
- ১০ আল-কুরআন, ২৩:১২
- ১১ Mohar Ali, *ibid*.
- ১২ I. Gruner and Oskar Cameron (translated by), *ibid*; মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত
- ১৩ ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) ছিলেন একজন পারসিক মুসলিম বহুবিদ্যাবিশারদ। তার পুরো নাম আবু আলি হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান বিন আলী ইবনে সিনা। তিনি আবু আলী সিনা, পুর সিনা বা পাশ্চাত্যে আভিসেনা নামেও পরিচিত। তাকে ইসলামি স্বর্ণযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, চিন্তক, লেখক এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক গণ্য করা হয়। তার সর্বাধিক বিখ্যাত রচনাগুলোর মধ্যে কিতাবুশ শিফা ও কানুন ফিততিব অন্যতম। < https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%87_%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE> last accessed on 15/06/2023.
- ১৪ মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১
- ১৫ I. Grmieri and Oskar Cameron (translated by), *ibid*, p. 359; Malik Ghulam Farid (edited by), *Dictionary of the Holy Qur'an with References and Explanation of the Text* (United Kingdom: Islam International Publications Limited, 2006), p.781.
- ১৬ আল-কুরআন, ৭৬:২
- ১৭ আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদু আহমদ ইবন হাম্বল* (কায়রো: মু'আসসাসাভুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯), হাদিস নং ৪৪৩৮, খ. ৭, পৃ. ৪৩৭
- ১৮ Dr. Keith L. Moore, *ibid*, p. 4; মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
- ১৯ আল-কুরআন, ২৩:১৩

- ২০ I. Gruner and Oskar Cameron (translated by), *ibid*, p. 242-243; সৈয়দ শাহ আব্দুল মুগনী, *মহাবিশ্বের বিস্ময় আল কুরআন* (ঢাকা: আজমাইন পাবলিকেশন্স, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৭৯
- ২১ আল-কুরআন, ৩২:৮
- ২২ আহমদ বিন হাম্বল, পূর্বোক্ত
- ২৩ Dr. Keith L. Moore, *ibid*, p. 30.
- ২৪ Dr. Keith L. Moore, *ibid*, p.30-49; Dr. Iqbal Aziz Muttaqui and Others, *Secondary Biology* (translated by Professor Md. Obaidur Rahman Sikder and Raihana Begum) (Dhaka: National Corriculam and Text Board, 2nd edition, 2007), p. 32-33; সৈয়দ শাহ আব্দুল মুগনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪
- ২৫ আল-কুরআন, ৫৩:৪৫-৪৬
- ২৬ Dr. Keith L. Moore, *ibid*, p.738.
- ২৭ আল-কুরআন, ৭৫:৩৯
- ২৮ Mohar Ali, *ibid*.
- ২৯ Dr. Keith L. Moore, *ibid*.
- ৩০ Edward William Lane, *Arabic-English Lexicon*, Volume 5 (New Delhi: Asian Educational Services, 6th edition, 2003), p. 417-423; সৈয়দ শাহ আব্দুল মুগনী, পূর্বোক্ত
- ৩১ প্রফেসর ডা. কেইথ লিওন মুর (Keith L. Moore) ১৯২৫ সালে কানাডায় ব্রান্টফোর্ড অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। অ্যানাটমি ও ভ্রূণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে একজন নামকরা বিজ্ঞানী। তিনি কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি অনুষদের এনাটমি বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ল্যাবরেটরিতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে মানুষের ভ্রূণ পরীক্ষা করে তা জোঁকের ছবির সাথে তুলনা করে দেখেন। এতে দুই ছবির মাঝে অদ্ভুত মিল দেখা যায়
- <https://wikiislam.net/wiki/Dr._Keith_Moore> last accessed on 15/06/2023.
- ৩২ Dr. Keith L. Moore, *ibid*, p. 78; Karim Hassanein Ismail, *Human life cycle and the Beginning of Life: An Islamic Perspective*, Volume 111(3) (Journal of Periodicum Biologorum, 2009), p. 365-372; মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯
- ৩৩ আল-কুরআন, ৭৫:৩৭-৩৮
- ৩৪ আল-কুরআন, ৯৬:১-৩
- ৩৫ Mohar Ali, *ibid*.
- ৩৬ মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
- ৩৭ Edward William Lane, *ibid*, Volume 8, p. 275.

- ৩৮ Dr. Keith L. Moore, *ibid*, p. 619; সৈয়দ শাহ আব্দুল মুগনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
- ৩৯ Antone G. Jacobson, *Somitomeres: mesodermal segments of vertebrate embryos* (London: The Company of Biologists Limited, 1988), p. 209-218; মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত
- ৪০ Dr. Keith L. Moore, *ibid*, p.95.
- ৪১ Dr. Keith L. Moore, *ibid*, p. 95-126.
- ৪২ আল-কুর'আন, ২৩:১২-১৪
- ৪৩ Malik Ghulam Farid, *ibid*, p. 580.
- ৪৪ Mohar Ali, *ibid*, p. 1078.
- ৪৫ Dr. Keith L. Moore, *ibid*, p. 517-519; মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত
- ৪৬ আল-কুর'আন, ২৩:১৪
- ৪৭ <https://islam.ru/en/content/story/sunnah-science-every-man-has-360-joint-bones>, accessed on 15 July 2023; The Hutchinson Encyclopedia (Israel: Helicon Books, 1995), p. 357.
- ৪৮ Dr. Keith L. Moore, *ibid*.
- ৪৯ আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আন নিসাপুরী, *আস-সহীহ লি মুসলিম* (বৈরুত: দারু ইহইয়া আত তুরাসুল আরবি, তা.বি.), হাদিস নং ১০০৭, খ. ২, পৃ. ৬৮৯
- ৫০ <https://islam.ru/en/content/story/sunnah-science-every-man-has-360-joint-bones>, accessed on 15 July 2023; Hamid Ahmed Hamid, *The Journey Of Faith In The Human Body*, (Damesk: Dar al Qalam Li al-taba'ah wa al-Nashar, 2002), p. 35.
- ৫১ Dr. Keith L. Moore, *ibid*, p. 142-149.
- ৫২ Mohar Ali, *ibid*.
- ৫৩ মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত
- ৫৪ T.W. Sadler, PhD, *Langman's Medical Embryology* (Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 12th edition, 2012), p. 81-85; মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত
- ৫৫ আল-কুর'আন, ২৩:১৪
- ৫৬ T.W. Sadler, PhD, *ibid*.
- ৫৭ আল-কুর'আন, ২৩:১৩-১৫
- ৫৮ ড. ইব্রাহীম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আল মু'জাম আল ওয়াসীত* (দিল্লী: দারুন লি ইশা'আতিল ইসলামিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ১২৫-২৫২
- ৫৯ T.W. Sadler, PhD, *ibid*.
- ৬০ ড. ইব্রাহীম ও অন্যান্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮৮; Mohar Ali, *ibid*.
- ৬১ আল-কুর'আন, ২৩:১৪

৬২ Mohar Ali, *ibid.*

৬৩ মুহাম্মদ আবু তালেব, পূর্বোক্ত

৬৪ T.W. Sadler, PhD, *ibid*, p. 115.

৬৫ আল-কুরআন, ৩২:৯

৬৬ <https://www.bissoy.com/q/11111126197>, accessed on 09 September 2020.

৬৭ আল-কুরআন, ১৭:৮৫

৬৮ আল-কুরআন, ৮০:১৮-২০

৬৯ T.W. Sadler, PhD, *ibid*, p. 104.

৭০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৭১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০-৯৫

৭২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬

৭৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১০০

পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে ইসলামের নির্দেশনা: একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম*

তানবীর হোসাইন**

Abstract

As a result of the modernization of global trade policy, the public is being benefited as well as being cheated in some cases. With the outbreak of the Corona epidemic, therecession began in the entire world economy. The powerful and wealthy states were not spared from this economic-crisis. Furthermore, there is a worldwide state of war and economic sanctions. This is exacerbating the plight of the global economy. Apart from this, some unscrupulous business organizations and business circles in the field of marketing products outside the country and the level of the business cycle charge excessive prices, the public life today is on the brink of famine. In this situation, black market, profiteering, all kinds of adulteration and fraud free marketing system is the demand of the people. This claim is constantly spreading worldwide. Therefore, it is very important to control the market system and determine the price of goods in the emergency in the light of Islam to facilitate the economic prosperity and the life of the people at all levels.

চাবিশব্দ: মূল্য নির্ধারণ, জনস্বার্থ, স্থিতিশীলতা, ভারসাম্য মূল্য, বিক্রয় মূল্য

ভূমিকা

ইসলাম মানবতার জন্য কল্যাণকর, পূর্ণাঙ্গ ও শাস্ত্রত এক জীবন ব্যবস্থা। এতে রয়েছে মানব জীবনের সকল বিষয়ের ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণকর বিধি-বিধান। ইসলামের প্রতিটি বিধান বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবধর্মী। প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের জঁাতাকলে নিষ্পেষিত ও নিগৃহীত মানুষের জন্য ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এক বিরাট আশীর্বাদ। আর অর্থনীতিতে পণ্য বিপণন ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম একটি অংশ হলো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ। ইসলামি অর্থনীতিতে সাধারণত বাজার চালিকাশক্তির তৎপরতার মাধ্যমে পণ্যমূল্য নির্ধারিত হয়। মহানবি সা. মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র বা ব্যক্তির যে কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক হস্তক্ষেপকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তবে জনস্বার্থে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে অর্থনীতি, বাজার ব্যবস্থাও জনজীবনে শান্তি ফিরে আসলেও পণ্যের মূল্য নির্ধারণের অদূরদর্শী পরিকল্পনা সমগ্র অর্থনীতিতে বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। চলমান বিশ্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, খাদ্য ও বিবিধ পণ্যে বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞা এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুযোগ-সন্ধানী একদল অসাধু চক্র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জরুরি পণ্যের মূল্য অসৎ উদ্দেশ্যে হাসিলের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ করে শান্তিপূর্ণ জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। বাংলাদেশে অত্যাবশ্যিকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ ২০১১ এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ থাকা সত্ত্বেও অসাধু ব্যবসায়ীদের অবৈধ কারসাজি ও জনগণের দুর্ভোগ রোধ করা যাচ্ছে না। যেহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

** এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

এবং ধর্মের প্রতি তাঁদের এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে সেহেতু প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে ইসলামি নির্দেশনা সমূহ প্রচার প্রসার এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা ও জনজীবনে স্থিরতা ও সমৃদ্ধি বাস্তবায়ন করা জরুরি। উক্ত পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে তথা পণ্য বিপণন ব্যবস্থাপনায় ইসলামের কল্যাণকর ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতিগুলো বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন এখন সময়ের দাবি।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি গুণগত রীতির (Qualitative) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Analytical Method) অনুসরণে রচিত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে আল-কুরআন, আল-হাদিস, ইসলামি অর্থনীতি ও বাজার ব্যবস্থার বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। গৌণ উৎস হিসেবে গবেষণা প্রবন্ধ, সাময়িকী ও ইন্টারনেটের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অত্র গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে গবেষণা, জরিপ কিংবা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়নি। উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে CS রীতি বা ‘শিকাগো শৈলী’ এর অনুসরণ করা হয়েছে

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

চলমান অর্থনৈতিক অস্থিরতাকে আরো জটিলকরণে একদল অসাধু চক্রের অসৎকার্য বন্ধের নিমিত্তে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের জীবন-মান সহজীকরণই এ গবেষণার একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

সাহিত্য পর্যালোচনা

চলমান অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও দ্রব্য মূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে ইসলামের আলোকে বাংলা ভাষায় যুগোপযোগী কোনো গবেষণাকর্ম নেই বললেই চলে। তবে ইসলামি অর্থনীতি নিয়ে বিজ্ঞ লেখকগণের অনেক গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী (রহ.) রচিত *হেদায়া* গ্রন্থ, আলাউদ্দিন মুহাম্মদ আল-হাছকাফী রচিত *আদ-দুররুল মুখতার*, আবুল হাসান আল-মাওয়াদী রচিত *কিতাবুল হাভী আল-কাবীর*, ইবনুল কাইয়ুম আল-জাওযিয়াহ রচিত *আত-তুরুকুল হুকমিয়াহ*, মাওলানা হিফজুর রহমান রচিত *ইসলাম কী ইকতেসাদী নিজাম*, আলাউদ্দিন ফওরী রচিত *কানযুল উম্মাহ্* ইত্যাদি। উক্ত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম সমূহ এবং চলমান অর্থনৈতিক অস্থির পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পণ্যের পরিচয়

সাধারণ অর্থে পণ্য বলতে একগুচ্ছ দ্রব্যকে বুঝায়, যা মানুষের অভাব ও প্রত্যাশা মেটাতে সক্ষম। সামগ্রিক অর্থে পণ্য হলো এমন কোনো দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান, বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী যা মানুষের উপযোগ সৃষ্টি করে এবং প্রয়োজন, অভাব, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা মিটাতে সক্ষম। ‘পণ্য’ এর শাব্দিক অর্থ উৎপাদিত দ্রব্য, মনের চাহিদা যা দিয়ে মেটানো যায়।^১ আরবিতে পণ্যের প্রতিশব্দ হলো— *بِئَات*। বিখ্যাত আরবি অভিধান *معجم المعاني الجامع* গ্রন্থে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات في سنة معينة يعطي صورة واضحة للاقتصاد القومي وقدرته الإنتاجية وما يطرأ عليها من تغيير على مهر السنين وفي ظروف الرواج والكساد وفي أحوال السلم والحرب

একটি নির্দিষ্ট বছরে সমাজের লোকজনের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য ও সেবা, যার উৎপাদন ক্ষমতা এবং বছরের পর বছর ধরে এর পরিবর্তনশীলতা প্রতিকূল ও অস্বাভাবিক অবস্থায়, স্থিতিশীলতা ও যুদ্ধাবস্থার মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।^২

পণ্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Product। Cambridge Dictionaryতে Product এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “Something that is made to be sold, usually something that is produced by an industrial process or, less commonly, something that is grown or obtained through farming” এমন কিছু যা বিক্রি করার জন্য তৈরি করা হয়, সাধারণত এমন কিছু যা একটি শিল্প প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত হয় বা সাধারণভাবে এমন কিছু যা চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত বা প্রাপ্ত হয়^৩। বিখ্যাত বিপণন গবেষক Professor Philip Kotler এবং Professor Kevin Lane Keller পণ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, “Product is anything that can be offered to a market to satisfy a want or need” পণ্য বলতে এমন কিছুকে বুঝায় যা বাজারে অর্পণের মাধ্যমে প্রয়োজন ও অভাবের সন্তুষ্টি বিধান করতে সক্ষম হয়।^৪

মূল্যের পরিচয়

‘মূল্য’-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Price, Exchange, Rate, Value, Worth, Quotation^৫। মূল্যের আরবি প্রতিশব্দ^৬ ثمن، قيمة، سعر। বিশিষ্ট ফিকহবিদ ইবনু আবিদীন (রহ.) বলেন,

إن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص

“যে অর্থের বিনিময়ে ক্রেতা-বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করতে সম্মত হয়, তাই হলো মূল্য। তা ভারসাম্য মূল্যের (Equilibrium Price) চেয়ে কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে।^৭

ব্যাপ্তিক অর্থনীতিতে ‘মূল্য’ কেন্দ্রীয় চালক। এর ওপর ভিত্তি করে চাহিদা, যোগান, উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি অন্যান্য চালকের মান নির্ধারণ হয়^৮। আর যে নিয়ম-নীতির ওপর ভিত্তি করে কোনো পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারিত হয় তাই মূল্যনীতি। পরিভাষায়, কোনো দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য অঙ্কে প্রকাশিত হলে তাকে ‘মূল্য’ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো দ্রব্যের স্বত্ব বা মালিকানা ত্যাগ করে তার বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তা-ই হলো ঐ দ্রব্যের মূল্য।

মূল্য নির্ধারণের ধারণা

মূল্য নির্ধারণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় পণ্যের মূল্য পরিমাণ নির্বাচন করা হয় তাকে মূল্য নির্ধারণ বলা হয়। ‘মূল্য নির্ধারণ’-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Pricing, Price fixing^৯ এবং আরবি

প্রতিশব্দ *تسعر* যার মূলধাতু *سعر* যার অর্থ প্রজ্জ্বলিত করা, উত্তপ্ত করা^{১০}। পরিভাষায় তাস'যীর (تسعر) হলো,

هو إلزامولي المرأة من يقوم مقامه الناس بثمن معين لا يتابعون إلا به فيمنعون من الزيادة عليه أو النقص عنه عند الضرورة في الطعام وغيره مما يحتاج الناس إليه بحيث يراعي حق الطرفين بالعدل للمصلحة العامة

“রপ্তিপ্রধান বা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনবোধে সাধারণ জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে খাদ্যপণ্য বা অন্য কোনো দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি সহনীয় ও ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ করা, যাতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক উক্ত মূল্যে বেচাকেনা করতে বাধ্য থাকবে। কেউ বেশিতে বা কমে বিক্রি করতে চাইলে তাকে বারণ করা হবে”^{১১}

ইমাম আশ-শাওকানী (রহ.) বলেন,

التسعر هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كلمن ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أنلا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة

“তাস'যীর বা মূল্য নির্ধারণ হলো, জনস্বার্থে সরকারপ্রধান বা বাণিজ্যবিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক এই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করা যে, প্রতিটি বিক্রয়পণ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে হবে, এর বেশিতে বা কমে বিক্রয় করা যাবে না”^{১২}

পণ্যমূল্য বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে থাকে। যেমন পণ্যের চাহিদা, যোগান, উপযোগিতা, গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি। পণ্যমূল্য নির্ধারণ জটিল ও স্পর্শকাতর একটি প্রক্রিয়া, কেননা এর উপর একদিকে ক্রেতার ক্রয়সিদ্ধান্ত নির্ভর করে, আবার বিক্রেতার লাভ-লোকসানও নির্ভর করে থাকে। পণ্যের মূল্য সাধারণত উৎপাদক ও বিক্রেতা কর্তৃক নির্ধারিত হয়। অনেক সময় পণ্যের মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমেও নির্ধারিত হয়। বিক্রেতা যে দামে মনে মনে পণ্য বিক্রয় করতে চায় সে দামের চেয়ে বেশি দাম ক্রেতার কাছে চায়। আবার ক্রেতা যে দামে পণ্য ক্রয় করতে চায় সে তার চেয়ে কম দাম বিক্রেতাকে বলবে। এই দরকষাকষির মাধ্যমে একটা পর্যায়ে তারা গ্রহণযোগ্য একটি মূল্য স্থির করবে, যেখানে তারা উভয়ই সন্তুষ্টি লাভ করবে। এটাই হলো পণ্যমূল্য নির্ধারণ। যথাযথ পণ্যমূল্য নির্ধারণের উপর বিপণনকারীর সাফল্য নির্ভর করে থাকে। বিপণনকারীকে বিপণন কৌশলের সাথে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করতে হয়। পণ্যের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য এমন একটি বিন্দুতে নির্ধারণ করা উচিত, যেখানে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা থাকে এবং সেই সাথে কোম্পানি মুনাফা অর্জন করে আর ক্রেতাও সন্তুষ্টি লাভ করে। এককমূল্য বা দরকষাকষির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। একটা সময় পর্যন্ত দরকষাকষিই ছিল মূল্য নির্ধারণের একমাত্র উপায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এককমূল্য ধারণা বেশি জনপ্রিয় হতে থাকে। পণ্যের দাম মোড়কের গায়ে লেখা থাকে যাকে বলে ফিক্সড প্রাইস। এতে বিক্রেতা উৎপাদনব্যয়ের সাথে মুনাফা যোগ করে দাম নির্ধারণ করে থাকে। ক্রেতা একদামে পণ্য ক্রয় করে বলে ঠেকে যাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পায়। তবে এখনও দরকষাকষির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ বহুল প্রচলিত।

ইসলামে মূল্য নির্ধারণ

ইসলামে মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে ফিক্‌হবিদগণের পর্যালোচনা হলো, যদি ব্যবসায়ী মহলের কারসাজি ব্যতীত প্রাকৃতিক অভাবের কারণে মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে সরকার মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা রাখবে না। বরং তখন যোগান বাড়ানোর চেষ্টা করবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবে। কারণপ্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরণ কাক্ষিত পরিমাণ ফসল উৎপাদন না হওয়ায় উৎপাদক বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তাই সে ক্ষতি লাঘবের জন্য মূল্য বেশি নিতে চেষ্টা করবে, এটি চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নীতি। এমতাবস্থায় মূল্য নির্ধারণ করে চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নীতিকে বাধাগ্রস্ত করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। ইমাম শাওকানী (র.) বলেন,

أَنَّ النَّاسَ مُسْلَطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَالتَّعْسِيرُ حَرَجٌ عَلَيْهِمْ، وَالْإِمَامُ مَأْمُورٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْ مِنْ نَظَرِهِ فِي مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ، وَإِذَا تَقَابَلَ الْأَمْرَانِ وَجِبَ تَمَكِينُ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْجَهْدِ لَأَنْفُسِهِمْ

সকল মানুষ নিজ সম্পদের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া তাদের ক্ষমতা হরণের সমতুল্য। শাসকের দায়িত্ব হলো সকল সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা। মূল্য হ্রাস করে একতরফাভাবে শুধু ক্রেতার স্বার্থ রক্ষা করাকে, মূল্য বাড়তে দিয়ে বিক্রেতার স্বার্থ রক্ষার চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করা তার কর্তব্য নয়। আর যখন উভয়ের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হয় তখন উভয় পক্ষকে চিন্তা, গবেষণা করার সুযোগ দেয়া কর্তব্য।^{১৩}

তবে যদি ব্যবসায়ীমহল এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, যা বাজারের স্বাভাবিক বিধিকে অকেজো করে দেয় এবং বাজারদরের উপর গুটিকয়েক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ও দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে সরকার সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বরং তা শুধু সরকারের অধিকার নয়, কর্তব্যও বটে। যেহেতু ব্যবসায়ীমহল অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে বাজারের স্বাভাবিক বিধিকে প্রভাবিত করেছে, তাই তাদের এ অপকর্মের প্রতিকার করা যুক্তিযুক্ত। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ফকীহ আল-হাছকাফী (রহ.) বলেন,

"و لا يسع حاكم إلا إذا تعدى الرباب عن القيمة تعديا فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأي"

“কোনো শাসক মূল্য নির্ধারণ করবেন না। তবে মালিকরা ভারসাম্য মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য দাবি করলে, তবেই তিনি বিজ্ঞ লোকদের সাথে পরামর্শক্রমে মূল্য নির্ধারণ করবেন”।^{১৪}

ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়াদী (রহ.) বলেন,

وَلأنَّ الْإِمَامَ مُدْبِرٌ إِلَى فِعْلِ الْمَصَالِحِ ، فَإِذَا رَأَى فِي التَّعْسِيرِ مَصْلَحَةً عِنْدَ تَزَايِدِ الْأَسْعارِ ، جاز أن يفعله

“রষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব হলো সাধারণের কল্যাণ সুনিশ্চিত করা। মূল্যক্ষীতির সময় তাসয়ীর (মূল্য নির্ধারণ) উপকারী মনে হলে, তিনি তা করতে পারেন”।^{১৫}

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন,

"وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على من يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل
ومنعهم بما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب"

“ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রিতে বাধ্য করা এবং ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রিতে
বাধা দেয়ার লক্ষ্যে ন্যায্যসংগত তাসযীর শুধু বৈধই নয় বরং কর্তব্য”^{১৬}

সাধারণ অবস্থায় সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া ঠিক নয়। কারণ এতে উৎপাদনকারীর উৎপাদনে আগ্রহ ও উদ্দীপনা কমে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “তোমরা মূল্য বেঁধে দিও না। কেননা আল্লাহ তা’আলাই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন, হ্রাস-বৃদ্ধি করেন এবং রিযিক প্রদান করেন”^{১৭}।

মূল্য বিক্রেতার অধিকার। তাই বলে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ অসাধুভাবে মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন না। যদি এমনটি কেউ করেন তবে হাদিসের আলোকে তিনি আত্মসাৎকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। এ ধরনের অসাধু, স্বেচ্ছাচারী উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ যদি সীমালঙ্ঘনপূর্বক অস্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং মূল্য নির্ধারণ ছাড়া ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব না হয় তাহলে সরকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে^{১৮}। মূল্য নির্ধারণের পর কেউ যদি সীমালঙ্ঘন করে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে তাহলে এ বিক্রয় যথার্থ হবে, তবে আইন লঙ্ঘনের দায়ে সে দোষী সাব্যস্ত হবে^{১৯}। ব্যবসার লক্ষ্যই হলো মুনাফা অর্জন। ইসলাম তা নিষিদ্ধ করে না, ব্যবসায়ীকে মুনাফা থেকে বঞ্চিত করে না। কেননা মুনাফা পাওয়ার অধিকার না থাকলে কেউ-ই ব্যবসা করতো না। ফলে জনগণের জীবন-জীবিকা অসম্ভব হয়ে পড়তো। তবে, ক্রেতাকে বিভ্রান্ত বা বাধ্য করে অত্যাধিক, সীমাহীন মুনাফা (Excessive and extorbidand profit) গ্রহণ ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা, তা এক ধরনের শোষণ এবং অন্যদের ওপর যুলম। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَيْدِيهِمْ, তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না।^{২০} সাধারণত ব্যবসায় অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকদের বিবেচনায় যা স্বাভাবিক, তাই বৈধ মুনাফা কিন্তু পণ্যমূল্য জানে না এমন ক্রয়কারীর নিকট থেকে বেশি মূল্য আদায় করা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং আইনের দৃষ্টিতে তা ধোঁকা, প্রতারণা। এ কাজ যে করে ফিকহবিদগণ তার নাম দিয়েছেন ‘আল-মুস্তারসিল’। এ বিষয়ে রাসুল (সা.) বলেন, “ব্যবসায়ী যদি সীমাতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করে এ সুযোগে যে, ক্রেতা পণ্যের প্রকৃত মূল্য জানে না, তাহলে এই অতিরিক্ত পরিমাণের মূল্য সুদ পর্যায়ে গণ্য হবে”^{২১}। রাসুল (সা.) বলেন, ‘মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় আসবে যখন কোনো ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তা হালাল বা হারাম পন্থায় অর্জিত হয়েছে কিনা তা মোটেই চিন্তা করবে না’^{২২}। কুরআন মাজীদে “অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ” বলতে এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে, যা ইনসাফ ও ন্যায়নীতিবিরোধী।

বিশেষ পরিস্থিতিতে মূল্য নির্ধারণ বৈধ হওয়ার প্রমাণসমূহ

পণ্যের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে রাসুল (সা.) বলেন,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ لَنَا . فَقَالَ " إِنْ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْفَاضِلُ الْبَاسِطُ الرَّزَّازُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْفَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যুগে একবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে লোকেরা বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য বেঁধে দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলাই মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন, তিনিই নিয়ন্ত্রণকারী, অপ্রশস্তকারী, প্রশস্তকারী ও রিযিক দানকারী। আমি আমার প্রতিপালকের সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হতে চাই যে, তোমাদের কোনো লোক যেন এ দাবি করতে না পারে (আমার বিরুদ্ধে) যে, তার জান-মালের উপর আমি হস্তক্ষেপ করেছি।^{২৭}

সাধারণভাবে বাজার কর্তৃপক্ষ বা সরকার মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে না, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ বৈধ। আল মুনতাক্বা শারহ মুয়াত্তা গ্রন্থে বলা হয়েছে,

ان على الامام ان يجمع وجوه الى اهل السوق ويحضر غيرهم معهم ليطمئن الى صدقهم، فيسألهم بكم يشترون وبكم يبيعون فيفاوضهم على سعر يرضونه ويكون في صالح المشتريين، ولا يجبرهم على سعر لا يرضونه؛

সরকার দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করতে চাইলে বাজার বিশেষজ্ঞ মানুষদের একত্র করবেন এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিবর্গকে বক্তব্য যাচাইয়ের জন্য একত্রিত করবেন। অতঃপর দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়, উৎপাদন, ব্যয় ও চাহিদা সম্পর্কে তাদের মতামত শুনবেন। অতঃপর এমন একটি মূল্য নির্দিষ্ট করবেন যাতে উৎপাদকের ক্ষতি না হয় আবার জনগণের ক্রয়ক্ষমতার উর্ধ্বে না চলে যায়। তবে ব্যবসায়ীদের অমতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা যাবে না।^{২৮}

বিশেষ পরিস্থিতিতে মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ বৈধ হওয়ার আরো কিছু দলিল নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করা হলো।

মহান আল্লাহর বাণী, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, অর্থাৎ “এবং তিনি (আল্লাহ) দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি”।^{২৯} আয়াতটি অবতরণের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও স্পষ্টত তাসাঈরকে সমর্থন করে। কারণ, দীন ইসলামে এমন কোনো সংকীর্ণতা বা অপরিপূর্ণতা নেই যে, একপক্ষ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অন্য পক্ষের ক্ষতি সাধন করবে আর এর প্রতিকারের কোনো সুযোগ থাকবে না। মূল্য নির্ধারণ মূল্যস্ফীতি প্রতিকারের অন্যতম পন্থা।

মহানবি (স.)-এর বাণী:

সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) বলেন,

إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَتَىٰ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَيَقُومَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ لَا وَكُنْ
وَلَا شَطَطًا ثُمَّ يَغْتَقِ

যদি কোনো ক্রীতদাস দু-জন ব্যক্তির মালিকানাধীন হয়, এমতাবস্থায় কোনো একজন তার অংশ আযাদ করে দিলে, উক্ত ক্রীতদাসের কিছু অংশ স্বাধীন হয়ে যায় আবার কিছু অংশ অপর মালিকের মালিকানায় থেকে যায়। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য স্বাধীনকারী ব্যক্তি যদি ধনী হয়, তাহলে অবশিষ্ট অংশ ক্রয় করে আযাদ করে দিবে। যেহেতু উক্ত স্বাধীনকারী ব্যক্তির ওপর বাকি অংশ ক্রয় করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে, তাই এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ করা হবে, যা বাজারদরের চেয়ে কমওনয়, আবার বেশিও নয়।^{২৬} কারণ কম হলে অন্য অংশীদার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর বেশি হলে ক্রয়কারী স্বাধীনকারী ব্যক্তিটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ হাদিসে স্বাধীনকারী ব্যক্তির জন্য যেহেতু উক্ত ক্রীতদাসটিকে ক্রয় করে আযাদ করে দেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়েছে, তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতএব, ক্রেতা সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষিতা রয়েছে এমন দ্রব্যেরও যদি অতিরিক্ত মূল্য হাঁকা হয়, তাহলে সরকার একটি ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য নির্ধারণের বৈধ ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে। রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, উত্তম উপার্জন কী? তিনি উত্তর দিলেন, "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" "উত্তম উপার্জন হচ্ছে ব্যক্তির হাতের শ্রম এবং মাবরুর অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও কল্যাণমূলক বোচাকেনার মাধ্যমে উপার্জিত আয়"।^{২৭} বাই মাবরুর হলো এমন ক্রয়-বিক্রয়, যাতে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণ নিহিত থাকে। অর্থাৎ তাতে প্রতারণা, আত্মসাৎ ও আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি থাকে না। অতএব, অধিক মুনাফাখোঁরী যেহেতু অনুমোদিত নয়, তাই এ ক্ষেত্রে তাস'যীর যুক্তিসঙ্গত। আলী (রা.) বর্ণনা করেন, "রাসুল (সা.) বিপাকে পড়ে বাধ্য হয়ে বোচাকেনা (লেনদেন) করতে নিষেধ করেছেন"^{২৮}। অর্থাৎ এ অবস্থায় অবৈধ মুনাফা আহরণ করা যাবে না। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ.) বাধ্যতামূলক সম্মতিক্রমে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদন করেননি। অথচ সংকট সৃষ্টি করে যখন ক্রেতাদের থেকে অধিক মূল্য হাতিয়ে নেয়া হয়, তখন উক্ত ব্যবসায় ক্রেতাদের মোটেও আত্মতৃপ্তি বা সমৃদ্ধি থাকে না। তাই এমতাবস্থায় তাস'যীরকে বৈধ করা না হলে গণমানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আবু সা'য়ীদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لا ضرر ولا ضرار من ضرار ضره الله ومن شاق شق الله عليه

“ইসলাম কাউকে ক্ষতি চাপিয়ে দেয় না, আবার অপরকেও ক্ষতি করার অনুমতি দেয় না। যে কেউ অপরের ক্ষতি সাধন করবে আল্লাহ তার ক্ষতি সাধন করবেন আর যে কেউ অপরের জন্য সংকট সৃষ্টি করবে আল্লাহ তাকে সংকটে নিপতিত করবেন”^{২৯}।

এ হাদিস থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, ক্রেতাপক্ষকে ক্ষতি করার জন্য বিক্রেতাপক্ষকে অবাধ সুযোগ দেয়া যায় না। এমনিভাবে ক্রেতাপক্ষকেও সে ক্ষতি মেনে নেয়ার জন্য ইসলাম কখনো উৎসাহিত করতে পারে না। তাই এ ক্ষতি রোধে সরকারের তাস'যীরের অধিকার থাকাটা যৌক্তিক। সরকার মূল্য নির্ধারণ করে না দিলে যদি বিক্রেতাপক্ষ ইচ্ছেমত বিক্রি করে অধিক লাভবান হয়, তবে ক্রেতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর মূল্য নির্ধারণ করে দিলে বিক্রেতার অধিক লাভ থেকে বঞ্চিত হলেও ন্যায্য মূল্য পায়, অপরদিকে ক্রেতারও ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। ইসলামি শরী'আতের একটি স্বীকৃত

মূলনীতি হলো মুবাহ (বৈধ) কাজ যদি হারামের দিকে ধাবিত করে, তাও হারাম হিসেবে পরিগণিত হয়।

হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ الْخَلَالَ يَنْتَنُ، وَإِنَّ الْحَرَامَ يَبِيتُ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَخْلُفُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

আবু আব্দুল্লাহ্ আন-নু'মান ইবন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয় যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হল সে হারামেই লিপ্ত হল।^{৯০}

অতএব, বিক্রেতার অবাধ স্বাধীনতা যখন জুলুমের কারণ হয়, তখন তা তাস'যীর (মূল্য নির্ধারণ নীতি) দিয়ে রহিতযোগ্য হবে। উল্লেখ্য যে, হাদিসবিশারদগণ তাস'যীরের বিরুদ্ধজ্ঞাপক হাদিসমূহের প্রত্যুত্তরে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা হলো, ঐ সময়ের মূল্যস্ফীতি মানবসৃষ্ট কোনো কৃত্রিম সংকটের কারণে ছিল না। কারণ, তখনকার সাহাবা কিরাম (রা.) এত সতর্কব্রতান ছিলেন যে, তাঁদের সম্পর্কে এ রকম ধারণা করাও দুর্ভাগ্য। রবং ঐ সময়ের মূল্যস্ফীতি প্রাকৃতিক কারণে দ্রব্যের অভাবহেতু সৃষ্টি হয়েছিল। আর এমতাবস্থায় যেহেতু মূল্য নির্ধারণ বৈধ নয়, তাই রাসুল (সা.) মূল্য নির্ধারণের আশ্রয় নেননি। দ্বিতীয়ত, পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত হাদিসসমূহে রাসুল (সা.) মূল্য নির্ধারণ করেননি, কেবল তাই বর্ণিত হয়েছে; মূল্য নির্ধারণ থেকে নিষেধ করেছেন মর্মে কোনো বক্তব্য নেই।

ইসলামে মূল্য নির্ধারণের শর্তাবলি

ইসলামে পণ্য মূল্য নির্ধারণকে নিরুৎসাহিত করা হলেও বিশেষ পরিস্থিতির আলোকে মূল্য নির্ধারণ বৈধ। কাজী যাদাহ (র.) বলেন,

فإن كان ارباب الطعام يتحكمون و يتعدون عن القيمة تعدياً فاجشاً، وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ صِيَانَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِالتَّسْعِيرِ فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ بِمَشُورَةِ مَنْ أَهْلَ الرَّأْيِ وَالْبَصِيرَةِ

খাদ্য পণ্যের মূল্য যদি প্রচলিত মূল্যের চেয়েও অত্যধিক বেশি হয়, সীমা লঙ্ঘন করে এবং মূল্য নির্দিষ্ট করা ব্যতীত সাধারণ মুসলিমদের অধিকার রক্ষা সম্ভব না হয় তাহলে শাসকশ্রেণি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের আলোকে মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন।^{৯১}

সুতরাং যৌক্তিক কোনো কারণে যদি একান্তই মূল্য নির্ধারণ করতে হয়, তাহলে কিছু পদ্ধতি ও শর্তাবলি পূরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন:

১. নির্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতি জনগণের ব্যাপক প্রয়োজন থাকতে হবে।
২. মূল্য নির্ধারণের সময় বিক্রেতার স্বার্থের দিকে সজাগ সৃষ্টি রাখতে হবে।

৩. মূল্য নির্ধারণের জন্য ভোক্তা, উৎপাদক, ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ ও বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। তাঁরা পর্যাপ্ত যাচাইয়ের পর ভোক্তা, উৎপাদক ও ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এমন একটি মূল্য নির্ধারণ করবেন।
৪. নির্ধারিত মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কার্যকর রাখা হবে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তা রহিত করা হবে।
৫. খাদ্যসহ সকল ধরনের পণ্যে প্রয়োজনবোধে তাস'যীর বৈধ হবে।
৬. মূল্যবৃদ্ধি কৃত্রিম সংকটের কারণে হতে হবে। প্রাকৃতিক কারণে দ্রব্যের অভাবহেতু মূল্য বৃদ্ধি পেলে মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না।
৭. ব্যবসায়ীরা ভারসাম্য মূল্যের (قيمة المثل) চেয়ে বেশি মূল্য দাবি করলে তাস'যীরের আশ্রয় নেয়া যাবে।
৮. কেউ কম মূল্যে বিক্রি করলে তাকে তাস'যীর দ্বারা বেশি মূল্যে বিক্রিতে বাধ্য করা যাবে না। কারণ, তাতে জনগণ লাভবান হয় এবং যোগান ও চাহিদা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর থাকে। অনেক সময় পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বিক্রেতাকে কম মূল্যেও পণ্য বিক্রি করতে হয়।

পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং এর প্রতিকারে ইসলামের নির্দেশনা

একচেটিয়া ব্যবসা বা মজুদদারী

ইসলামে মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা চাহিদা ও যোগানবিধির ওপর নির্ভরশীল, তাই চাহিদা ও যোগান-এর মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকা একান্ত শর্ত। কোনোভাবেই চাহিদা বা যোগান এর প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করা যাবে না। যে ব্যবসাপদ্ধতিতে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে যোগান ও চাহিদা উভয়টিকে কিংবা একটিকে প্রভাবিত করে ভারসাম্যপূর্ণ বাজারের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বিনষ্ট করা হয়, তা ইসলামে নিষিদ্ধ। সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্যের যে পদ্ধতি যোগান-চাহিদার স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বিনষ্ট করে, তাই একচেটিয়া ব্যবসা।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সময়কালে বর্তমান সময়ের মত একচেটিয়া কারবারের পরিপূর্ণ ধরন বা অবকাঠামো না থাকলেও তখনও এ ধরনের কারবারের মৌলিক অস্তিত্ব ছিল। হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) এ জাতীয় কারবারকে "احتكار" নামে অভিহিত করেছেন এবং এ জাতীয় কারবার করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তা স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় প্রভাব সৃষ্টি করে বাজার ব্যবস্থার চাহিদা ও যোগান নামক স্বয়ংক্রিয় বিধিকে নষ্ট করে দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, مَنْ احْتَكَرَ عَلَى "যে ব্যক্তি মুসলিমদের খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে, আল্লাহ তাকে দেউলিয়াত্বের শাস্তি প্রদান করবেন"^{৩২}। অপর হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, يَنْسِفُ الْعَبْدُ الْاِحْتِكَارَ إِنَّ "নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো সে মজুদকারী, যে মূল্য কমলে ব্যথিত হয় আর মূল্য বাড়লে আনন্দিত হয়"^{৩৩}। ইমাম আল-আওয়ায়ী (রহ.) মজুদকারীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, الاحتكار من يعترض السوق "যিনি বাজার ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করেন, তিনিই মুহতাকির বা মজুদকারী"^{৩৪}। এটা স্পষ্টত একচেটিয়া ব্যবসাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, তাতে বাজারব্যবস্থাকে

বাধাহীন করা হয়। এমনিভাবে অপর আরেকটি হাদিসে এসেছে, মু'আয বিন জাবাল (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) কে ইহতিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসুল (সা.) উত্তর দেন, إذا سمع برخص ساءه وإذا سمع بغلاء فرح به “পণ্যের মূল্যহ্রাসের খবর যখন ব্যবসায়ীকে বেদনা দেয় এবং মূল্যবৃদ্ধির খবর আনন্দ দান করে, তাই ইহতিকার”।^{৩৫}

একচেটিয়া ব্যবসাতে এ-দুই চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা বিনষ্টকারী ব্যবসা-পদ্ধতিকে হাদিসের ভাষায় কখনো "تلقى الجلب" কখনো "تلقى الركبان" কখনো "تلقى البيوع" বলা হয়েছে^{৩৬}। আর সেটি হলো, শহরে প্রবেশ করার পূর্বেই পণ্য আমদানিকারকদের থেকে পণ্য ক্রয় করে নেওয়া। আবার, কখনো একে بيع الحاضر لباد বলা হয়। অর্থাৎ গ্রামীণ পণ্যের মালিকের পক্ষ হয়ে শহরে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বিক্রি করা। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عن ابن عمر قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب والركبان والسلع حتى تبلغ الأسواق

ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বাজারে না পৌঁছানো পর্যন্ত পণ্য, সওয়ারী ও মালামাল গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।^{৩৭}

এ জাতীয় ব্যবসা চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করে প্রকৃত প্রতিযোগিতা নষ্ট করে দেয়। অথচ বাজার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যোগান-চাহিদার প্রতিযোগিতা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

বাজার সিডিকেট

অসাধু ব্যবসায়ী চক্র একজোট হয়ে বাজার সিডিকেট^{৩৮} তৈরির মাধ্যমে অধিক লাভের আশায় জরুরি পণ্য সমূহ গুদামজাত করে রাখে। তাই বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি হয় এবং পণ্যমূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। যার ফলে পণ্যের ক্রয়মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের অন্যতম একটি বাধা অসাধু ব্যবসায়ী সিডিকেট। ইসলামের নির্দেশনা হলো হালাল পণ্য উৎপাদনের পরে তা স্বাধীন ভাবে বাজারে প্রবেশ করবে এবং মূল্য বৃদ্ধির জন্য তাকে আটকে রাখা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

‘যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে’।^{৩৯}

রাসুল (স) বলেন “যে ব্যক্তি ৪০ দিন খাবার আটকে রাখে সে আল্লাহর জিন্মা থেকে বের হয়ে যায়”।^{৪০}

এ সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال

“ধন-সম্পদ উপার্জনে তোমরা অবৈধ পন্থা সমূহ অবলম্বন করো না। তবে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিতে বৈধ ব্যবসা করো এবং এর মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করো”।^{৪১}

মধ্যস্থত্বভোগী বা দালালি

ইসলামের দৃষ্টিতে দালাল হলো, আজিরে মুশতারিক বা সময়মুক্ত শ্রমিক। অতএব অন্যান্য শ্রমিকের মতোই দালালি করে মজুরি নেয়া জায়েজ। তবে শর্ত হলো, কত টাকা মজুরি দিতে হবে তা আগেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। মধ্যস্থত্বভোগী বা দালালির সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অসুবিধাও রয়েছে। কারণ অন্যান্য পেশার মতো এ পেশায়ও অনুপ্রবেশ ঘটেছে প্রতারক, মিথ্যাচারী ও দুশ্চরিত্র লোকের। তাই ক্ষেত্রবিশেষে মধ্যস্থত্বভোগী ন্যায্য মূল্যে পণ্য ক্রয়ে ভোক্তার জন্য অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা। ইসলাম পণ্য উৎপাদন থেকে বাজারজাত করণের সকল স্তরে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে নিষেধ করেছে। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন “আমরা ব্যবসায়ী দলের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের থেকে পণ্য ক্রয় করতাম। রাসুল (স) পণ্য বাজারে পৌঁছার পূর্বে তা ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন”^{৪২}।

কালোবাজারি ও প্রতারণা

কালোবাজারির^{৪৩} মাধ্যমে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। কালোবাজারি সরাসরি প্রতারণা, জুলুম ও আর্থিক অসততা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ”^{৪৪}। পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে কালোবাজারি, প্রতারণা, দালালি, মজুদদারী ও সিডিকেট সহ সকল অপরাধ সমূহ বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُفْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ "يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا". قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ". ثُمَّ قَالَ "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا"

“আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, কোনো একসময় রাসুলুল্লাহ (সা.) বাজারে একটি খাদ্যশস্যের স্তুপ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজের হাতকে স্তুপের মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং হাতে ভেজা অনুভব করেন। স্তুপের মালিককে তিনি প্রশ্ন করেন, এ কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! এটা বৃষ্টির পানিতে ভিজে গিয়েছিল। তিনি বললেন, ভেজাগুলো স্তুপের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা দেখতে পেত? অতঃপর তিনি বললেন, প্রতারণাকারী ও ধোঁকাবাজদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই”^{৪৫}।

সুপারিশমালা

চলমান বিশেষ পরিস্থিতিতে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারে—

১. পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, বণ্টন ও বিপণনে ইসলামি নির্দেশনা অনুসরণ করা।
২. ইসলামের আলোকে মানব হৃদয়ে পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩. চলমান বিশেষ পরিস্থিতিতে সাময়িক সময়ের জন্য জরুরি নিত্যপণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া।
৪. কৃষি জমি অনাবাদি না রাখা ও ফসল উৎপাদনের যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। ফলে কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্য হ্রাস করা সম্ভব হবে।
৫. কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সাথে এর বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বিধানের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা।
৬. কৃষককে কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহারে সকল শ্রেণির কৃষককে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।
৭. বাজার ব্যবস্থা সচল ও সহজীকরণে বিশেষ পর্যবেক্ষক টিম গঠন করা।
৮. খুচরা পর্যায়ে মূল্যতালিকা প্রদর্শন এবং প্রতিটি ধাপে পাকা রশিদ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা।
৯. নিত্যপণ্যের উৎপাদন ও আমদানি বৃদ্ধির সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং জরুরি পণ্যে সরকারি ভর্তুকি বৃদ্ধি করা।
১০. দেশি পণ্য উৎপাদনে অধিক গুরুত্ব দেওয়া ও চলমান বিশেষ পরিস্থিতিতে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক পণ্য আমদানি হ্রাস করা।
১১. বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং শুল্ক স্টেশনগুলো চলমান সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য খালাসে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া।
১২. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহণে ফেরি পারাপারে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া।
১৩. ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১৪. কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, অতিরিক্ত মুনাফা আদায় ও মজুতদারদের বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি বাড়ানো।
১৫. পাইকারি হতে খুচরা পর্যায়ে অতিরিক্ত মুনাফার বিষয়ে কঠোর নজরদারি বাড়ানো।
১৬. তেল ক্রয়-বিক্রয়ে পাইকারি হতে খুচরা সকল পর্যায়ে পাকা রসিদ (প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাসহ মুদ্রিত তথ্য) প্রদান নিশ্চিত করা।
১৭. তেলের মিলগেট, পরিবেশক ও ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, সঠিকভাবে প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন করা।
১৮. মজুত ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত সকল আইনে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৯. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ- ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ৯(১), ৯(২), ৯(৩), ১২(১) ও ১২(৪) এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৮, ৪০ এবং ৪৫ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতর, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।
২০. সিডিকেটের মাধ্যমে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, ভেজাল মিশ্রণ, পরিমাণে কম দেওয়া, মজুতদারী ইত্যাদি অপরাধ দমনে ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কলাম লিখন, গ্রন্থ রচনা, অডিও ও ভিডিও নির্ভর অনুষ্ঠানমালা মিডিয়ায় প্রচার করা।

উপসংহার

আধুনিক বিশ্ব ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর বিশ্ব। এ ধারণার প্রসারতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিনিয়ত পণ্য বিপণনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক কাঠামো ও লেনদেনে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে সমগ্র বিশ্বে বিপণন পদ্ধতিতে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন-নতুন কৌশল ও পদ্ধতি। এতে জনসাধারণ যেমন উপকৃত হচ্ছে তেমনি প্রতারিতও হচ্ছে। করোনা মহামারীর প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিতে মন্দার প্রকোপ শুরু হয়েছে। এ প্রকোপ থেকে রেহাই পায়নি ধনীরাষ্ট্রসমূহও। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতাসহ খাদ্য ও বিবিধ পণ্যে বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞা এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুযোগ সন্ধানী একদল অসাধু চক্র খাদ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জরুরি পণ্যের মূল্য নিজের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে এবং বৈশ্বিক এ দুরাবস্থাকে অধিক পরিমাণে ত্বরান্বিত করছে। দেশ ও দেশের বাইরে পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে অসাধু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীচক্রের মাত্রাতিরিক্তমূল্য আদায়ে জনজীবন আজ দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে। তাই কালোবাজারি, মুনাফাখোরি, ঠকবাজিসহ সকল প্রকার ভেজাল ও প্রতারণামুক্ত বিপণন ব্যবস্থা গণমানুষের প্রাণের দাবি। এ দাবি প্রতিনিয়ত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং সকল স্তরের জনসাধারণের জীবন সহজীকরণে ইসলামের আলোকে বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও জরুরি অবস্থায় পণ্য মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি।

তথ্যনির্দেশ

- ১ জামিল চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলা একাডেমী আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৮), পৃ. ৭৭৩
- ২ <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/> সংগ্রহ ২৩/০৮/২০২২
- ৩ [https:// dictionary.cambridge.org/dictionary/english/product](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/product) সংগ্রহ ২৩/০৮/২০২২
- ৪ Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 12th, India: pearson Education, Inc. 2006, P. 52
- ৫ Dr. Rohi Baalbaki, AL-MAWRID, *A Modern Arabic-English Dictionary*, Beirut, Dar EI-Ilm Lilmalayin, 1995, P. 42; Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Edited by J. Milton Crowan), Beirut: Librairie du Liban, 1980, P. 415

- ৬ Dr. Munir Baalbaki, Al-Mawrid. A Modern Arabic-English Dictionary, Beirut: 1970, P. 722.
- ৭ আবদুর রাউফ, আল-মুনাজ্জী, আত-তারীফ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১০ হি.), পৃ. ২২৪
- ৮ ড. মোঃ লিয়াকত আলী খান, ব্যষ্টিক অর্থনীতি (ঢাকা-চট্টগ্রাম: শাওন প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৯
- ৯ Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, ibid, p. 411.
- ১০ আবুল কাশেম হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ রাগিব আল ইস্পাহানী, আলমুফরাদু ফী গারীবিল কুরআন (করাচি: নূর মুহাম্মদ তিজারাত কুতুব, তাবি), পৃ. ২৩৩
- ১১ ড. মুহাম্মদ বিন আহমাদ আল-সালিহ, আত-তাস'যীর ফী নজরিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া, মাজাল্লাতুল বুহছিল ইসলামিয়া, আর-রিয়াসাতুল 'আম্মা লি ইদারাতিল বুহছ আল-ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতাহ ওয়াদ-দাওয়াহ, তাবি, সংখ্যা ৭৯, পৃ. ৩৮
- ১২ মুহাম্মদ বিন আলী আশ-শাওকানী, নায়লুল আওতার মিন আহাদীছি সাইয়্যিদুল আখইয়ার, ইদারাতুল তাবা'আ আল-মুনরিয়াহ, ১৯৯৮ সাল, খ-৫, পৃ. ২৭৬
- ১৩ মুহাম্মদ ইবনে আশ শাওকানী, নায়লুল আওতার শারহি মুনতাকা আল আখবার (লেবানন: বায়তুল আফকার আদ দাওলিয়াহ, ২০০৫), পৃ. ১০২৫
- ১৪ আলাউদ্দিন মুহাম্মদ আল-হাছকাফী, আদ-দুররুল মুখতার (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৮৬ হি.), খ-৬, পৃ. ৪০০
- ১৫ আবুল হাসান আল-মাওয়াদী, কিতাবুল হাভী আল-কাবীর (বৈরুত: দারুল ফিকর), খ-৫, পৃ. ৯০২
- ১৬ ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, আত-তুরকুল হুকমিয়াহ (কায়রো: মাতবা'আতুল মাদানি), খ-১, পৃ. ৩৫৫
- ১৭ ইমাম আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদ, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবি), খ-৩, পৃ. ২৭৭
- ১৮ মাওলানা আব্দুল আউয়াল ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (মূল: মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলাম কী ইকতেসাদী নিজাম), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৯৯৮, পৃ. ৪৭
- ১৯ মাওলানা সদরুদ্দিন ইসলামী, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব, অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা: নাকীব পাবলিকেশন্স- ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৯৮
- ২০ আল-কুরআন: ২:১৮৮
- ২১ ইমাম আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, খ-৩, পৃ. ২৬৩
- ২২ ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা (হায়দ্রাবাদ: মজলিছ দায়িরাতুল মা'আরিফ), খ-৫, পৃ. ২৭৪
- ২৩ ইমাম তিরমিজি, জামে-আত-তিরমিজি (ভারত: ইসলামি কুতুবখানা, ১৯৭৮৫ ইং), খ.০১, পৃ. ৩৭৮
- ২৪ সুলাইমান ইবনে খালফ আল বাযী, আল মুনতাকা শরহে মুয়াত্তা (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৯৯), ১ম সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫১
- ২৫ আল-কুরআন: ২২: ৭৮
- ২৬ ইমাম আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, খ-৪, পৃ. ৪২
- ২৭ ইমাম বায়হাকী, পূর্বোক্ত, খ-৫, পৃ. ২৬৩
- ২৮ ইমাম আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, খ-৩, পৃ. ২৬৩
- ২৯ ইমাম দারু কুতনী, আস-সুনান (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৯৬৬ খ্রি.), খ-৩, পৃ. ৪৭

- ৩০ ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী (ইন্ডিয়া: সাহরানপুর, ইসলামি কুতুবখানা, মুখতার কোং, ১৯৮৫ ইং) খ. ০১, পৃ. ১৯
- ৩১ আহমাদ বিন কুদুর কাযী যাদাহ, নাতায়িজুল আফকার ফী কাশফির রুমুযি ওয়াল আসরার (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ২০০৩), ১ম সংস্করণ, ১০ শ খণ্ড, পৃ. ৭০
- ৩২ ইমাম ইবনু মাজাহ, সুনান ইবনে মাজাহ (বৈরুত: দারুল ফিকর), খ-২, পৃ. ৭২৯
- ৩৩ আলাউদ্দিন ফওরী, কানযুল উম্মাল (লেবানন: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮১), খ-৪, পৃ. ৯৭
- ৩৪ আবু দাউদ, আস-সুনান (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবি), অধ্যায়: আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ: আননাহযু আনিল হুকারাহ, খ-৩, পৃ. ২৮৫
- ৩৫ ইমাম তাবারানী, আল-মুজামুলা কাবীর (মুসেল: মাকতাবাতুল উলুম, ১৯৮৩ খ্রি.), ২০ খ., পৃ. ৯৫
- ৩৬ আলাউদ্দিন ফওরী, পূর্বোক্ত, খ-৪, পৃ. ১৬৪
- ৩৭ ইমাম আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, খ-৩, পৃ. ২৫৯
- ৩৮ সিডিকেট হলো ব্যক্তি, কোম্পানি, কর্পোরেশন বা সংস্থার একটি স্ব-সংগঠিত গোষ্ঠী যা কিছু নির্দিষ্ট ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য অথবা একটি অংশীদারত্বমূলক স্বার্থ অনুসরণ বা প্রচারের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। দ্র. উইকিপিডিয়া, সংগ্রহ ২১/০৭/২০২৩
- ৩৯ আল-কুরআন: ৩৩:৫৮
- ৪০ ইমাম আবু দাউদ, পূর্বোক্ত, খ-৩, পৃ. ২৬৩
- ৪১ হাফেয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (কায়রো: মাকতাবাতুছ ছাফা, ১৪২৫হিঃ/২০০৪খ্রিঃ), খ. ২, পৃ. ১৬১।
- ৪২ ইমাম ইবনু মাজাহ, পূর্বোক্ত, খ-২, পৃ. ৭২৯
- ৪৩ গোপনে বেশি দামে কেনা-বেচা; black marketing। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১১ ইং), ত্রয়োদশ সংস্করণ, পৃ. ২৫৯।
- ৪৪ আল-কুরআন: ৪: ২৯
- ৪৫ ইমাম তিরমিজি, জামে-আত-তিরমিজি (ইন্ডিয়া: ইসলামি কুতুবখানা, ১৯৮৫), খ. ০১, পৃ. ৩৭৮

ভূমি ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় ইসলামি নির্দেশনা : বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দিন*

Abstract

Land is a special gift of Allah the Almighty. Land is an integral part of development. So land has been given special importance in sustainable development. It is earning capital, source of livelihood, shelter and above all the basic element of all development activities. United Nations also included land and terrestrial ecosystems as a part of sustainable development goals. As a United Nations country, Bangladesh is determined to implement these goals. Bangladesh has made positive progress in various areas in implementing these goals. Therefore, to achieve SDGs, the issues related to the sustainable management of land and terrestrial ecosystems are reviewed from an Islamic perspective to create public awareness in consideration of Muslim population is marked as the objective of this research. Quantitative method was used in the present study. As part of the qualitative research, document analysis was carried out. Descriptive method and analytical method were followed in the comparative review of Islamic guidelines on sustainable land and terrestrial ecosystem management goals. Implementation of the recommendations outlined in the article will play a positive role in achieving sustainable land management and terrestrial ecosystem conservation goals.

চাবিশব্দ: ভূমি, বাস্তুতন্ত্র, বনাঞ্চল, ভূমিক্ষয়, উন্নয়ন

ভূমিকা

ভূমি উন্নয়নের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। উন্নয়নের সাথে ভূমির রয়েছে ওতপ্রোত সম্পর্ক। মানুষ উৎপাদনমুখী যেকোনো কাজই করুক না কেন, তার সাথে ভূমির সম্পর্ক থাকে। তাই টেকসই উন্নয়নে ভূমিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ভূমির বিভিন্ন উপাদান উন্নয়ন কাজে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ইসলাম ভূমিকে মানুষের বসবাসের ও উৎপাদনের আদি উপাদান হিসাবে মহান আল্লাহর বিশেষ দান হিসেবে বিবেচনা করে। মানব জাতির প্রয়োজনীয় উপকরণ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি ভূমি থেকেই সংগৃহীত হয়ে থাকে। তাই মানুষ এর উপর বসবাস করছে, ঘর-বাড়ি নির্মাণ করছে, এ মাটির রস ও উর্বরাশক্তি ব্যবহার করে মানুষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করছে। এই ভূমি সীমিত এবং স্থানান্তর অযোগ্য হলেও এর রয়েছে উর্বরাশক্তি, খনিজ সম্পদ, উদ্ভিদ ও প্রাণিজাত প্রাকৃতিক সম্পদ। এছাড়াও স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান, স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবহার, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ ইত্যাদি টেকসই ভূমি ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। জাতিসংঘ টেকসই ভূমি ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট ৯টি লক্ষ্যমাত্রা ও ৩টি লক্ষ্য বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। জাতিসংঘভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের বদ্ধপরিচর। বাংলাদেশ এ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধন

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

করেছে। সুতরাং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ভূমি ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। সর্বোপরি, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিবেচনায় এ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ইসলামি নির্দেশনার আলোকে উপস্থাপন করা জরুরি।

গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

পরিমাণগত পদ্ধতি (Quantitative Method) ব্যবহার করে বর্তমান গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গুণগত গবেষণার অংশ হিসেবে ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ (document analysis) করা হয়েছে। ভূমি ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে ইসলামি নির্দেশনার তুলনামূলক পর্যালোচনায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive Method) ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমি ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি ইসলামি দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা করে জনসচেতনতা তৈরি ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর করণীয় নির্ধারণ এ গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত।

ভূমি ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনায় ইসলামি নির্দেশনা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৫তম অভীষ্ট হলো ‘স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুकरण প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।’ এ অভীষ্ট অর্জনে ৯টি লক্ষ্যমাত্রা ও ৩টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা ও লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

লক্ষ্যমাত্রা-১ (স্থলজ সম্পদের সংরক্ষণ, পুনরুত্থান ও টেকসই ব্যবহার)

“২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতি রেখে বিশেষ করে বন, জলাভূমি, পাহাড় ও শুষ্ক ভূমিতে স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধাবলির সংরক্ষণ, পুনরুত্থান ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।”

এ লক্ষ্যমাত্রায় জাতিসংঘ ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের নির্দেশনা দিলেও বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমি এলাকার অনুপাত হিসাবে বনাঞ্চল ২০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা বর্তমানে ১৮%।^২ এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে চকোরিয়া ও সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ২০,০০০ একর ভূমি অর্ন্তভুক্ত করেছে।^৩ একইসাথে জাতিসংঘ ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের নির্দেশনা দিলেও বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমি এলাকার অনুপাত হিসাবে বৃক্ষআচ্ছাদিত ভূমি ২৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে,^৪ সামাজিক বনায়নসহ দেশব্যাপী বৃক্ষরোপন কর্মসূচির সুফল হিসেবে বর্তমানে দেশে বৃক্ষআচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২২.৩৭%।^৫ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের স্থলজ বাস্তুতন্ত্র দ্বারা আবৃত এলাকার অনুপাত দেশের মোট ভূমির তুলনায় ৫% এবং মিঠাপানির বাস্তুতন্ত্র দ্বারা আবৃত এলাকার অনুপাত দেশের মোট ভূমির তুলনায় ১৪%-এর উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ, যা বর্তমানে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র দ্বারা আবৃত এলাকা ২.৪% এবং মিঠাপানির বাস্তুতন্ত্র দ্বারা আবৃত এলাকা ৫%।^৬

স্থলজ বাস্তুতন্ত্র	লক্ষ্যমাত্রা	মিঠাপানির বাস্তুতন্ত্র	লক্ষ্যমাত্রা
২০১৫	১.৭%	২০১৫	১.৮%
২০২০ (লক্ষ্যমাত্রা)	২.৪%	২০২০(লক্ষ্যমাত্রা)	৫%
২০২৫(লক্ষ্যমাত্রা)	৩.৩%	২০২৫(লক্ষ্যমাত্রা)	৯%
২০৩০(লক্ষ্যমাত্রা)	৫%	২০৩০(লক্ষ্যমাত্রা)	১৪%

এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন আলোচ্য বিষয় হলো- স্থলজ সম্পদের সংরক্ষণ, পুনরুত্থান ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যমাত্রায় স্থলজ সম্পদ বলতে বন, পাহাড়, মরুময় শুষ্ক ভূমি, জলাভূমি, স্বাদু পানি ইত্যাদি হতে আহরিত সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। এ ধরনের ভূমি থেকে মূলত তিন ধরনের সম্পদ অর্জিত হয়। যথা:

১. গাছপালা : গাছপালা মানুষের জীবনের এক অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজের গাছের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই কেবল সম্পদ উপার্জন নয়; জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে বাঁচিয়ে রাখতেও গাছের প্রয়োজন রয়েছে। তদুপরি উন্নয়ন বিবেচনায় গাছপালার অবদানও অতুলনীয়। মানুষ ফল-মূল সংগ্রহ, খাদ্য উপকরণ সংগ্রহ, জ্বালানী, শিল্পের কাচামাল, আসবাবপত্র তৈরি, যানবাহন এবং ঔষধ তৈরি ইত্যাদি কাজে গাছপালা ব্যবহার করে। তাই অর্থনীতিতে এর অবদান রয়েছে। তবে গাছপালার ধরন ও অর্থনৈতিক পরিধি এবং উপযোগীতাও বিভিন্ন ধরনের। একেক ধরনের গাছ একেক ধরনের অর্থনৈতিক উপযোগ তৈরি করে। গাছের বিভিন্নতার পরিচয় দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, “তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন। যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয়, এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন-একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং আল্লাহর হুকুম দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপচয় কর না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করে না।”^৭

২. পশুপাখি : স্থলজ সম্পদের মাঝে পশু-পাখি অন্যতম। আমরা বনভূমিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পশুপাখি পাই। একইসাথে খামারে অথবা বসতবাড়িতে লালন-পালন করেও পশুপাখি থেকে অর্থনৈতিক উপযোগ তৈরি করতে পারি। পশুপাখি থেকে খাদ্য, পোশাক, ব্যবসায়ের উপাদান, আসবাবপত্র, যানবাহন ইত্যাদি অর্থনৈতিক সুবিধা পেয়ে থাকি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, “আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাতে রয়েছে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার। আর তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ কর। আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য যখন সন্ধ্যায় তা ফিরিয়ে আনো এবং সকালে চারণে নিয়ে যাও। আর এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায়, ভীষণ কষ্ট ছাড়া যেখানে তোমরা পৌঁছতে সক্ষম হতো না। নিশ্চয়ই তোমাদের রব দয়ালু, পরম দয়ালু।”^৮

৩. কৃষি উৎপাদন : ভূমি ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবিকার অধিকাংশই উৎপাদন করে থাকি। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত ফল-মূল, খাদ্য, পশু-খাদ্য ছাড়াও আমরা ভূমিতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করি। তাই টেকসই অর্থনীতিতে ভূমির অবদান রয়েছে। কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, “আর যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন সৃষ্টজীবের জন্য। তাতে রয়েছে ফলমূল ও খেজুরগাছ, যার খেজুর আবরণযুক্ত। আর আছে খোসায়ুক্ত দানা ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল।”^৯

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের এ লক্ষ্যমাত্রায় স্থলজ সম্পদের সংরক্ষণ বলতে গাছপালা, পশুপাখি ও কৃষিজাত সম্পদের সংরক্ষণে বুঝায়। এসকল বৃক্ষ ও পশুপাখির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বৃক্ষ ও পশুপাখির যত্ন নেয়া, বৃক্ষ নিধন না করা, পশুপাখি হত্যা করা, পশুপাখিদের বিচরণক্ষেত্র বিনষ্ট না করা, এগুলোর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। কুরআন ও হাদিসে এ তিন ধরনের সম্পদের উপকারীতা সম্পর্কে আলোচনা করার পাশাপাশি এগুলোর সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছে। যেমন বৃক্ষ নিধন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে হাদিসের বাণী, “আব্দুল্লাহ বিন হুবশী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি (বিনা প্রয়োজনে) গাছ কাটবে আল্লাহ তার মাথাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন।”^{১০} বিনা কারণে কোনো পশু হত্যা করা বা কোনো পশুকে কষ্ট দেয়া হারাম ঘোষণা করে হাদিসের বাণী, “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল, সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারত।”^{১১}

লক্ষ্যমাত্রা-২ (বনভূমি সংরক্ষণ)

“২০২০ সালের মধ্যে বৈশ্বিকভাবে সকল প্রকার বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন, বনভূমি উজাড়রোধ, ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমি পুনরুদ্ধার, বনায়ন ও পুনঃবনায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধন।”^{১২}

এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন আলোচ্য বিষয় হলো— বনভূমি সংরক্ষণ। বনভূমি বলতে সাধারণত গাছপালা আচ্ছাদিত স্থান বা অঞ্চলকে বুঝায়। উৎপত্তিগত অর্থ বিচারে বসত বাড়ির বহির্ভাগে অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠা গাছপালার সমষ্টিকে বন বলা হয়েছে।^{১৩} সাধারণ ঘন সন্নিবেশিত বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত স্থানই হলো বনভূমি। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত ২০২০ সালের মধ্যে উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো— UN REDD Bangladesh National Programme (July 2015 to June 2018), Strengthening National Forest Inventory and Satellite Land Monitoring System in Support of REDD+ in Bangladesh (January 2015 to December 2018, National Botanic Garden and Baldha Garden Conservation and Development Project, July 2016 to June 2019, CREL Project, July 2014 to June 2018, Establishment of Rangunia Rubber Estate in Chittagong Zone (1st Phase), Sustainable Forestry and Livelihood Project (SUFAL), July 2017 to June 2022।^{১৪} এই সূচকে কয়েকটি উপশ্রেণিতে অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়; যেমন— ক. মোট বন এলাকায় পরিবর্তন, খ. বনে মাটির ওপরে সব জীবের পরিবর্তন, গ. সংরক্ষিত অঞ্চলে বনাঞ্চলের অনুপাত এবং ঘ. দীর্ঘমেয়াদি বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বনাঞ্চলের অনুপাত। এই সূত্রে বিদ্যমান তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশে—ক. ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র সম্পন্ন হবে, খ. মাটির ওপরে সব জীবের হার ৬৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ (২০১৫, ২০১৯), গ. সংরক্ষিত অঞ্চলের ২৪ দশমিক ১১ শতাংশ ভূমি বনের আওতায় এসেছে (জুন ২০১৮) এবং ঘ. ৩৫ দশমিক ১০ শতাংশ বনভূমি দীর্ঘমেয়াদি বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় আনা হয়েছে।^{১৫}

ঘনআচ্ছাদিত বন সম্পর্কে কুরআনের বাণী, “ঘনবৃক্ষ শোভিত বাগ-বাগিচা।”^{১৬} বনভূমি আমাদের জীবনধারণ-জীবিকা নির্বাহসহ প্রত্যাহিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা নানাভাবে

বনভূমির উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীতে যদি প্রয়োজনীয় পরিমাণ বনভূমি না থাকে তাহলে পৃথিবী বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু আজকের এ যুগে মানুষ বসতবাড়ি নির্মাণ, কলকারখানা প্রস্তুত, শিল্পের কাঁচামাল, আসবাবপত্র তৈরি, সাম্রাজ্যবাদী আত্মসন ইত্যাদি নানা কারণে বনভূমি উজাড় করে ফেলছে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, যা টেকসই উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক। তাই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে, বনভূমি সংরক্ষণের বিকল্প নেই। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করা যাবে না, যা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। একই সাথে বনভূমি সংরক্ষণে কৃত্রিম বনায়ন সৃষ্টি করতে হবে। ইসলাম বৃক্ষ রোপনকে সাদাকাতুল্য ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি কোনো মুসলিম কোনো গাছ রোপণ করে অথবা ক্ষেতে ফসল বোনে আর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ প্রাণি খায়, তবে তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।”^{১৭} রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, “আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি কিয়ামত এসে যায় এবং তখন তোমাদের কারো হাতে একটি চারাগাছ থাকে, তবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগেই তার পক্ষে সম্ভব হলে সে যেন চারাটি রোপন করে।”^{১৮}

লক্ষ্যমাত্রা-৩ (ভূমি-অবক্ষয় রোধ)

২০৩০ সালের মধ্যে মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, মরুকরণ, খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিসহ ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি ও মৃত্তিকার পুনরুজ্জীবন এবং একটি ভূমি-অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে সচেষ্ট হওয়া।^{১৯}

এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন আলোচ্য বিষয় হলো- মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা ও ভূমি-অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণ। বাংলাদেশ সরকার এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ভূমি-ক্ষয় রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে সবুজ বনায়ন সৃষ্টিতে সরকার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২৭ লক্ষ ১২ হাজার চারা বিক্রি করেছে। উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টিনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ৩০০৭৫.০ হেক্টর বাগান তৈরি করা হয়েছে।^{২০} উপকূলীয় চরাঞ্চলে বনায়নের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের অগ্রণী দেশ হিসেবে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে, যা সম্প্রীতি জাতিসংঘ ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রায় অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়া জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও অভিযোজনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬০০ বর্গ কি.মি. আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খণ্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে। চর বনায়নের প্রভাবে উপকূলীয় বনের ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের প্রায় ৪৫৩ বর্গ কি. মি. জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে।^{২১} বাংলাদেশ সংরক্ষিত বনে গাছ কাটায় জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত বলবৎ রেখেছে, যা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের আরও ভালো সংরক্ষণের একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত।

পৃথিবীর স্থলজ সম্পদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে মরুকরণ মোকাবেলা ও ভূমি-অবক্ষয় রোধ করার বিকল্প নেই। কেননা ভূমির যথাযথ ব্যবহারের উপরই টেকসই স্থলজ উন্নয়নের উপাদানগুলো

নির্ভরশীল। কেননা ভূমির উর্বরতা রক্ষা ও ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব না হলে বৃক্ষ তার প্রাণশক্তি হারাবে, বিশ্ব হয়ে যাবে মরুভূমি। তাই সর্বদা ভূমিক্ষয় রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং খরা ও বন্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় স্থানে বন্যনিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, খরায় ভূমির সদ্যবহার তথা চাষাবাদের সুবিধার্থে খাল নির্মাণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। হযরত উমর (রা.) এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভূমির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইরফান মাহমুদ তাঁর ‘হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা’ শীর্ষক বইয়ে বলেন, “বিজিত ভূমিতে বাঁধ নির্মাণ, পুকুর খনন এবং পানি সরবরাহের জন্য খাল ও সুইজ নির্মাণ করে সেচের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। একমাত্র মিসরেই এ সমস্ত কাজে দৈনিক এক লক্ষ বিশ হাজার লোক নিয়োজিত ছিল এবং তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়েছিল সরকারি কোষাগার থেকে। খলীফার অনুমতিক্রমে খুজিস্তান ও আহওয়াজ জেলায় অনেক খাল খনন করা হয়েছিল। এ সমস্ত খালের দরুন অনেক নতুন জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল।”^{২২} ইসলাম খরা বা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির পুনরুত্থানে সেচ দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। সেচের মাধ্যমে মৃত ভূমিকে পুনরায় চাষাবাদের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়। তবে সেচ বা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে অন্যভাবে ভূমির যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকেও ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে। বর্তমান সময়ে এক দেশ বাঁধ নির্মাণ করে পানি আটকিয়ে রাখে ফলে অন্য দেশ পানি না পেয়ে মরুকরণের শিকার হয়, যা টেকসই উন্নয়ন নীতিমালার পরিপন্থি। ইসলাম এ ধরনের কাজে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবি (সা.) বলেছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকিয়ে রাখা উচিত নয়, তাতে তৃণভূমির উন্নয়ন (ঘাস উৎপাদন) ব্যাহত হবে।”^{২৩}

লক্ষ্যমাত্রা-৪ (পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ)

২০৩০ সালের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে, যাতে করে টেকসই উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় সুবিধাবলি প্রদানে এদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।^{২৪} এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন আলোচ্য বিষয় হলো- পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ী জেলাসমূহের সরকারি বন এবং পার্বত্য জেলার অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলসহ পাহাড়ী বনের পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৯.৩৩%। এ সকল বনাঞ্চলে গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম এবং প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও বেত প্রভৃতি জীববৈচিত্র্যের বাস্তুসংস্থান টিকিয়ে রাখতে ভূমিকা পালন করে। এ বনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হাতি, চিতাবাঘ, বন্যশুকর, হরিণ, হনুমান, বানর, উল্লুক, সজারু, বনরুই, ধনেশ, মথুরা, বনমোরগ, শকুন, অজগর, টিয়া, ময়না ইত্যাদি।^{২৫} এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের গৃহিত দুটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো- Reforestation at Sylhet Forest Division for Combating Adverse Impact of Climate Change, (July 2016 to June 2019), Reforestation at Hill Forest Through Participatory Forestry, (July 2016 to June 2020)।^{২৬} সর্বোপরি, জাতিসংঘের নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশে সংরক্ষিত অঞ্চলের আওতায় পাহাড়ী জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকার হার ০.৩৫ শতাংশ (বিএফডি ২০১৯)।^{২৭}

মহান আল্লাহর পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, “আর জমিনে তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে তোমাদের নিয়ে জমিন হেলে না যায়।”^{২৮} সুতরাং পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় পাহাড় সৃষ্টি সম্পর্কে হাদিসের বর্ণনা, “আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যখন মহান আল্লাহ জমিনকে সৃষ্টি করলেন, তখন জমিন হেলতে ও দুলতে থাকে। তখন মহান আল্লাহ পাহাড়রাজি সৃষ্টি করলেন এবং সেগুলোকে জমিনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন আর এতে জমিন স্থির হলো।”^{২৯}

পৃথিবীর ভূ-ভাগের এক বিশাল এলাকা জুড়ে আছে পাহাড়-পর্বত। পাহাড়-পর্বত মানুষের চলাচলের সীমানার বাইরে হওয়ায় পৃথিবীর বৃক্ষরাজি ও জীবজন্তুর একটি আদর্শ অভয়ারণ্য হলো পাহাড়। কিন্তু মানুষ দিন দিন পাহাড় কেটে বাসস্থান তৈরি, কলকারখানা তৈরি, পাহাড়ি এলাকার বৃক্ষনিধন ইত্যাদির মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে। সুতরাং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসকল পাহাড়ি এলাকা সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামও বিশেষ বিবেচনায় যেকোনো ভূ-ভাগ সরকারি উদ্যোগে সংরক্ষণের নির্দেশনা দেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) জীবজন্তুর সঠিক পরিচর্যা, তাদের লালন-পালন এবং খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ করেছিলেন, যাকে হিমা বলা হত। এ সকল হিমা পরিবেশ ও জীবজন্তু সংরক্ষণ করা হতো এবং জীবজন্তু অবাধে বিচরণ করতে পারতো। হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলেও বেদুইনদের পশুর চারণভূমি হিসেবে হিমা নির্ধারিত ছিলো। ঐ সময় হিমার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিলো পশুখাদ্য এবং পানি সরবরাহ। সচরাচর হিমার মধ্যে এক বা একাধিক ঝরনা বা পানির উৎস পাওয়া যেত।^{৩০}

সুতরাং পাহাড়ী এলাকাকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করে সেগুলোর সংরক্ষণ করতে হবে। আর মহান আল্লাহর পাহাড় সৃষ্টির এটাও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, “এরপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। তিনি তার ভিতর থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি। আর পর্বতগুলোকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জীবনোপকরণস্বরূপ।”^{৩১}

লক্ষ্যমাত্রা-৫ (বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহের সুরক্ষা)

“প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলোর অবক্ষয় হ্রাস করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়রোধ এবং ২০২০ সালের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহের বিলোপ প্রতিরোধ ও সুরক্ষাদান।”^{৩২}

এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন আলোচ্য বিষয় হলো— বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহের সুরক্ষাদান। বাংলাদেশ জাতিসংঘের এ লক্ষ্যমাত্রার আলোকে দেশের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বিভিন্ন জলাভূমি, নদী, উপকূলীয় এলাকা এবং সামুদ্রিক দ্বীপ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাকে (Ecologically Critical Area-ECA/ইসিএ) ঘোষণা করেছে। এ পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২০০৯-২০১০ হতে অদ্যাবধি ঘোষিত ০৯টি জাতীয় উদ্যান, ১৮টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ০৩টি ইকোপার্ক, ০১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ০২টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া এবং ০২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাসহ বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫১টি।^{৩৩} এ লক্ষ্যমাত্রা পরিমাপের

সূচক হলো (Red List Index), The International Union for Conservation of Nature (IUCN) আইইউসিএনের ২০১৫ সালের রিপোর্টে লাল তালিকায় বাংলাদেশের ১৩৮ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৫৬৬ প্রজাতির পাখি, ১৬৭ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪৯ প্রজাতির উভচর, ২৫৩ প্রজাতির মাছ এবং ১ হাজার ৬১৯ প্রজাতির অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে ৯০ টি বা ৬ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ এবং ৮০২ প্রজাতি বা ৫০ শতাংশ কম উদ্বেগপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে আশার বাণী হচ্ছে বাংলাদেশে এখানে উন্নতী লক্ষ্যনীয়, যেমন- প্রজাতিগুলোর মধ্যে ‘বিলুপ্তির হুমকিতে নেই’ এমন শ্রেণিতে থাকা ‘সবচেয়ে কম উদ্বেগজনক’ প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ২০০০ সালে উদ্বেগহীন প্রাণীর অনুপাত ছিলো ৫৩ শতাংশ। ২০১৫ সালে ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে।^{৩৪} এ লক্ষ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- Survey on Vascular Flora of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts (01/07/2015-30/06/2017), Biodiversity Conservation & Restoration in Mahamaya Eco park^{৩৫} এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইন ২০১৭ প্রণয়ন। এ আইনের প্রস্তাবনায় আইনের লক্ষ্য- উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, “জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার, জীবসম্পদ ও তদসংশ্লিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার হইতে প্রাপ্ত সুফলের সৃষ্টি ও ন্যায্য হিস্যা বণ্টন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করিবার নিমিত্ত প্রণীত আইন।”^{৩৬} এছাড়াও Bangladesh National Herbarium (BNH) বিএনএইচ ২০২০-২০২৩ মেয়াদে দেশের ১,০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্টিং (Red listing) এবং পাঁচটি নির্বাচিত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অগ্রাসী উদ্ভিদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণে ‘Developing Bangladesh National Red List of Plants এবং Developing Invasive Alien Plant Species (IAPs) Management Strategy for Selected Protected Areas’ শীর্ষক দুইটি কম্পোনেন্ট টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৯৭৯টি উদ্ভিদ প্রজাতির মূল্যায়নপূর্বক ৮টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিলুপ্ত এবং ২৮০টি প্রজাতিকে হুমকির সম্মুখীন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০২১-২০২৪ মেয়াদে বরিশাল এবং সিলেট বিভাগের উপর ভাস্কুলার উদ্ভিদ জরিপ, তথ্য-উপাত্ত ও ছবিসহ নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, সংরক্ষণ এবং সচিব ফ্লোরিস্টিক পুস্তক রচনার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ যাবত ৫,২০১টি উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।^{৩৭}

ইসলাম বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহের পাশাপাশি যেকোনো প্রাণির সুরক্ষা দিতে নির্দেশনা দেয়।

প্রথমত, ইসলাম প্রয়োজন ছাড়া যেকোনো প্রাণির সেবাকে সাওয়াবের কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাষ্ট্রায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হল। তারপর একটি কুয়া দেখতে পেয়ে তাতে সে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। উপরে উঠে এসে সে দেখতে পেল একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, এ কুকুরটির তেমনি পিপাসা পেয়েছে, যেমনি আমার পিপাসা পেয়েছিল। তারপর সে কুয়ার মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবীগণ বলল, হে আল্লাহর রাসুল! পশুদের

ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (সা.) বললেন, প্রাণি মাত্রেয় সেবার মধ্যেই পুণ্য রয়েছে।”^{৩৮}

দ্বিতীয়ত, ইসলাম বিনা প্রয়োজনে তথা খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া কোনো পশু হত্যা করে নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছড়ুই বা তার চেয়ে ছোট কোন প্রাণিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাকে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন প্রশ্ন করা হলো তার হক কী? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তার হক হলো তাকে জবেহ করে খাওয়া এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।”^{৩৯}

তৃতীয়ত, পশু-পাখির চিকিৎসা সেবা দেয়া, যাতে করে তারা বিলুপ্ত হয়ে না যায় এবং কষ্ট পেয়ে মারা না যায়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “সাহল ইবন হানযালা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) এমন একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, অনাহারে যার পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিলো। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা এসব বাকশক্তিহীন পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। সুস্থ সবল পশুর পিঠে আরোহণ করবে এবং এদেরকে উত্তমরূপে আহার করাবে।”^{৪০}

চতুর্থত, বিলুপ্ত প্রজাতির সুরক্ষায় জীবজন্তুর উপর গবেষণা করে তাদের জীবনযাপনের নিরাপত্তা, খাবার, বাসস্থান, বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। জীবজন্তুকে নিয়ে গবেষণা করতে কুরআনী আদেশ। মহান আল্লাহ বলেন, “এবং তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে।”^{৪১}

লক্ষ্যমাত্রা-৬ (জেনেটিক সম্পদে সকলের প্রবেশাধিকার)

“আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুযায়ী জিনগত (জেনেটিক) সম্পদ ব্যবহার থেকে আহরিত সুবিধাবলির স্বচ্ছ ও ন্যায্য বণ্টন এবং এ ধরনের সম্পদে যথোপযুক্ত প্রবেশাধিকার প্রবর্তন।”^{৪২}

এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন আলোচ্য বিষয় হলো- জেনেটিক সম্পদে সকলের প্রবেশাধিকার। অর্থাৎ, কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণির বংশ বিস্তার ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল ব্যবহারে সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই সূচকে নাগোয়া প্রটোকল বাস্তবায়নে আইনগত, প্রশাসনিক ও নীতিকাঠামো প্রতিপালনের মূল্যায়ন করা হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক সূচক; জাতীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ করা হয় না। অ্যাক্সেস ও বেনিফিট শেয়ারিং (এবিএস)-এর জন্য ২০১০ সালে এটিকে নাগোয়া প্রটোকল নামেও উল্লেখ করা হয়। এটি মূলত ১৯৯২ সালের কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটির (সিবিডি) সম্পূরক চুক্তি। এর উদ্দেশ্য হলো জীনগত সম্পদ ব্যবহার থেকে পাওয়া সুবিধাগুলোর ন্যায্য ও ন্যায়সংগত ভাগাভাগি নিশ্চিত করা। ফলে এটি জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারে অবদান রাখতে পারবে। সিবিডিতে অংশগ্রহণকারী দেশ যারা এবিএস বিষয়ে আইনি, প্রশাসনিক অথবা নীতি-পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা এবিএস ক্লিয়ারিং হাউসে জমা দিয়েছে, তাদের জমা দেওয়া সেই সংখ্যা থেকে এ সূচক গণনা করা হয় (ইউএনএসকাপ ২০২০)।^{৪৩} এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ খাদ্য ও কৃষির জন্য উদ্ভিদ জীনগত সম্পদবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (পিজিআরএফএ) প্রতিপালন করেছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিপূরক হিসেবে প্রতীয়মান।

ইসলামি দৃষ্টিকোণে উদ্ভিদ ও প্রাণি মানুষের উপকারার্থে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কোনো বিশেষ এলাকার বা দেশের মানুষ এ অধিকারে বেশি লাভবান বা অন্য এলাকার বা দেশের মানুষকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। উদ্ভিদ ও প্রাণিজাত সকল সম্পদে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রবেশাধিকার থাকবে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, “হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।”^{৪৪}

সুতরাং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উদ্ভিদ ও প্রাণিজাত সকল হালাল সম্পদ থেকে সকলে ভোগ করতে পারবে।

লক্ষ্যমাত্রা-৭ (বন্যপ্রাণি পাচার রোধ)

“সংরক্ষিত উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির চোরা শিকার ও পাচারের অবসানকল্পে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বন্যপ্রাণিজাত অবৈধ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ।”^{৪৫}

এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন আলোচ্য বিষয় হলো- বন্যপ্রাণি পাচার রোধ এবং বন্যপ্রাণিজাত অবৈধ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত এ লক্ষ্যমাত্রা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণার (২০১৫) বহু আগেই এ বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও ২০১২ সালে ‘বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২’ শিরোনামে এ সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ। এ আইনের প্রস্তাবনায় এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে, “যেহেতু বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন রহিতপূর্বক দেশের জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।”^{৪৬} এ আইনের ধারা ৬, ১১ ও তফসিল ৪ এর বিধান লংঘন করে কেউ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিরোধী অপরাধ করলে তিনি ধারা ৩১ অনুসারে সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তির জন্য ৩ (তিন) বছরের কারাদণ্ড অথবা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।^{৪৭}

জাতিসংঘ ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাংলাদেশ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ৩১ অনুসারে বন অধিদপ্তরের আওতাধীন বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করেছে, যার বর্তমান পরিচালক, মোঃ ছানাউল্যা পাটওয়ারী। এ ইউনিট জুন-২০২৩ মাসে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ৩৪টি উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে, যাতে উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণী ৩৯০ টি।^{৪৮}

বন্যপ্রাণি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এক বিশেষ দান। মানুষ বন্যপ্রাণি দ্বারা খাবারের চাহিদা মেটায়, দুধ পান করে এবং এগুলোর চামড়াজাত পণ্য ব্যবহার করে। কিন্তু যে সকল প্রাণি হিংস্র এবং তাদের জন্য সংরক্ষিত যে সকল উদ্ভিদ রয়েছে সেগুলোর নিরাপত্তা দিতে হবে। কারণ পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এগুলোর নিরাপত্তা দেয়া প্রয়োজন। ইসলাম খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া কোনো বন্যপ্রাণি পাচার, হত্যা এবং ব্যবহার্য জিনিস বানাতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। সুতরাং বন্যপ্রাণি পাচার থেকে বিরত থাকতে হবে। জাহেলি যুগের লোকেরা হজ্জ যাত্রায় হাজীদের

সাথে থাকা কুরবানির পশু ডাকাতি করে নিয়ে যেত, মহান আল্লাহ এ ধরনের পশু তথা যাকে কুরবানীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তাকে ছিনতাই না করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ কাজে তিনি পারস্পরিক সহযোগিতা করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত কুরআনের আদেশ হলো, “হে মুমিনগণ, তোমরা অসম্মান করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহের, হারাম মাসের, হারামে প্রেরিত কুরবানির পশুর, গলায় চিহ্ন দেয়া পশুর এবং আপন রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অনুসন্ধান পবিত্র গৃহের অভিযুক্তদের। যখন তোমরা হালাল হও, তখন শিকার কর। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতায় যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে কেননা তারা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।”^{৪৯}

এ আয়াতে নির্দিষ্ট সময়ে শিকার নিষিদ্ধ, বিশেষত হজ্জের জন্য কুরবানী করার নিয়তে নির্ধারিত পশু শিকার হারাম করা হয়েছে। সুতরাং এ নিষিদ্ধ পশু যেন কেউ শিকার করতে না পারে সেজন্য একে অপরকে সাহায্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেহেতু ইসলাম অবৈধ শিকার ও পাচার নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো পাচার রোধে পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতা করা। কেননা ইসলাম প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত কাজে পরস্পরকে সহায়তা করতে নির্দেশনা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।”^{৫০}

এ আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ দ্বারা রাস্তা কাটা, বৃক্ষ নিধন করা, বিনা প্রয়োজনে চতুষ্পদ জন্তু হত্যা করা ও ফসলাদি জ্বালিয়ে দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।^{৫১}

একইসাথে পাচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বন্যপ্রাণির অঙ্গ কর্তন করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পশুর অঙ্গ-প্রতঙ্গ কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।”^{৫২}

লক্ষ্যমাত্রা-৮ (ক্ষতিকর স্থলজ ও জলজ প্রজাতির নিয়ন্ত্রণ)

“২০২০ সালের মধ্যে স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী প্রজাতির বিরূপ প্রভাব দৃশ্যমান উপায়ে কমিয়ে আনা ও এদের বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অধিক ক্ষতিকর প্রজাতিগুলোর নিয়ন্ত্রণ বা উচ্ছেদ সাধন।”^{৫৩}

এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন আলোচ্য বিষয় হলো- ক্ষতিকর স্থলজ ও জলজ প্রজাতির নিয়ন্ত্রণ। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯^{৫৪} এবং সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮^{৫৫} প্রণয়ন করেছে, তবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইন ২০১৩-তে, এ সংক্রান্ত আইনের ধারা সংযোজন করা প্রয়োজন।^{৫৬}

প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাণি রয়েছে। তবে প্রাণিগুলোর মধ্যে কতগুলো রয়েছে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। তাই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে এসকল ক্ষতিকর প্রাণির ক্ষতি থেকে মানুষকে নিরাপত্তা দিতে হবে। হাদিসেও বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রাণি হত্যা করতে নির্দেশনা রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে

বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পাঁচ প্রকার প্রাণি অধিক ক্ষতিকারক। এদেরকে হারামেও (সীমানার মধ্যে) হত্যা করা যায়। এগুলো হল বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল, কাক ও পাগলা কুকুর।^{৫৭} তবে অনর্থক কোনো নিরীহ প্রাণিকে ক্ষতিকর প্রচার করে হত্যা করা যাবে না। যেমন: গিরগিটি ক্ষতিকর তাই হত্যা করা বৈধ মনে করা। ইসলাম এ ধরনের কাজকে নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সহধর্মিণী ‘আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) গিরগিটিকে ক্ষতিকর (রক্তচোষা) প্রাণি বলেছেন। কিন্তু একে হত্যা করার আদেশ দিতে আমি তাঁকে শুনি নি।”^{৫৮} এমনকি কোনো ক্ষতিকর প্রাণি বা জন্তুরও বংশসহ ধ্বংস করা যাবে না। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, নাবীগণের মধ্যে কোন এক নাবী একটি গাছের নীচে অবতরণ করেন। অতঃপর তাঁকে একটি পিপড়ায় কামড় দেয়। তিনি তাঁর আসবাবপত্রের ব্যাপারে আদেশ দেন। এগুলো গাছের নীচ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। অতঃপর তাঁর নির্দেশে পিপড়ার বাসা আগুন দিতে জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওয়াহী নাযিল করলেন, ‘তুমি একটি মাত্র পিপড়াকে শাস্তি দিলে না কেন?’^{৫৯}

লক্ষ্যমাত্রা-৯ (উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের মূল্যায়ন)

“২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল ও হিসাব ব্যবস্থায় বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের মূল্যায়ন অঙ্গীভূত করা।”^{৬০}

এ লক্ষ্যমাত্রার অধীন আলোচ্য বিষয় হলো- উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের মূল্যায়ন। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এ বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য বিষয়াদি দারিদ্র্য বিমোচনে বিবেচনায় নিয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নে ব-দ্বীপ বিবেচনায় দেশের ৪টি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসেবে ধরে প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির মাত্রায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একই ধরনের দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা জেলাগুলোকে অভিন্ন গ্রুপ বা হটস্পটে আনা হয়েছে। এভাবে দেশে মোট ৬টি হটস্পট উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল, নগর অঞ্চল ও ট্রান্সকাটিং অঞ্চল (শেরপুর, নীলফামারী ও গাজীপুর জেলা)] চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব হটস্পটের পানিসম্পদ, ভূমি, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, খাদ্যনিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ভূ-প্রতিবেশ, নদীর অভ্যন্তরীণ ব্যবহার, ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা, পলি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে পানির চাহিদা নিরূপণ ও সুপেয় পানি সরবরাহে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।^{৬১} অর্থাৎ, ব-দ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশের বিদ্যমান সমস্যা মোকাবিলা করে ভূমি ও পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা লাভই এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে উচ্চতর পর্যায়ের ৩টি জাতীয় অভীষ্ট এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ৬টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে নির্দিষ্ট অভীষ্ট-৪ হলো- ‘জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা’।^{৬২}

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সকল ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থলজ ও জলজ সম্পদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের খাদ্য উপকরণ উদ্ভিদ ও প্রাণি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে আদেশ করেছেন। কুরআনের বাণী, “কাজেই মানুষ তার খাদ্যের

প্রতি লক্ষ করুক। নিশ্চয় আমি প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি। তারপর জমিনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি। অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর ও শাকসবজি, জায়তুন ও খেজুর বন, ঘনবৃক্ষ শোভিত বাগ-বাগিচা, আর ফল ও তৃণশুল্ক। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জীবনোপকরণস্বরূপ।”^{৩৩}

সুতরাং উন্নয়ন পরিকল্পনা, দারিদ্র নিরোসন কর্মসূচি, বৈশ্বিক উষ্ণতা নিরোসন, দুর্যোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করণে স্থলজ ও জলজ সম্পদের অন্তর্ভুক্তি থাকতে হবে।

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি

উপরিউক্ত ৯টি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ৩টি বাস্তবায়ন পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে, নিম্নে এ বাস্তবায়ন পদ্ধতিগুলো ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি-১ (জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অর্থায়ন)

“১৫.ক. জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারকল্পে সকল উৎস থেকে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এর বৃদ্ধি সাধন।”^{৩৪}

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পে অভ্যন্তরীণ উৎস, বৈদেশিক সহায়তা ও বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত Annual Development Plan (ADP) তথা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বরাদ্দ ছিলো মোট ১৭৮৬০.৮ মিলিয়ন টাকা। এ খাতে অর্থ বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি ছিল ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (৩৮৬৫.৬ মিলিয়ন টাকা)। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বরাদ্দ ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সাথে তুলনা করলে, অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রায় ৫.৬ এবং ৫.৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।^{৩৫} এছাড়াও জলবায়ু অর্থায়ন ট্রাস্ট, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশের পরিচালিত প্রকল্প, বেসরকারি এনজিও পরিচালিত প্রকল্পের মাধ্যমে এ খাতে অর্থায়ন লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামি দৃষ্টিকোণে জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। তাই রাষ্ট্রপ্রধান এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বিভিন্ন উৎস থেকে কর আরোপ করতে পারবেন অথবা সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও সুবিধা ভোগের জন্য কারো কাছে ইজারা দিতে পারবেন এবং প্রাপ্ত কর এ খাতে ব্যবহার করতে পারবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো কোনো সাহাবীর জন্য কোনো কোনো জঙ্গল নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তারা সেখানে মৌমাছি পালন করতেন এবং উৎপাদিত মধুর একটি নির্দিষ্ট অংশ বায়তুল মালে জমা দিতেন। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “হযরত আমর ইবনু শুআইব (রা.) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা সূত্রে বর্ণিত। মুতয়ান গোত্রের হিলাল নামক এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তার মধুর ‘উশর’ নিয়ে এলেন এবং তাঁর নিকট ‘সালাবাহ’ নামক একটি সমতলভূমি বন্দোবস্ত চাইলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে উক্ত ভূমিটি বন্দোবস্ত দিলেন। পরবর্তীতে যখন ‘উমার (রা.) খলিফা হন, তখন (এ এলাকার আমির) সুফইয়ান ইবনু ওয়াহাব ‘উমার ইবনুল খাতাবকে (রা.) ঐ ভূমির বিষয়ে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন। উত্তরে ‘উমার (রা.) তাকে লিখেন, তিনি (হিলাল) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর

নিকট তার মধুর যে ‘উশর’ দিতেন তিনি যদি তা তোমাকেও দেন তাহলে ‘সালাবা’ ওয়াদীতে তার বন্দোবস্ত বহাল রাখবে। অন্যথায় তা বনের মৌমাছি হিসেবে গণ্য হবে এবং যে কেউ তার মধু খেতে পারবে।”^{৬৬}

এ থেকে বুঝা যায় যে, জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে বনাঞ্চল ইজারা দিয়ে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করা যাবে, ইসলামে এ ধরনের নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র বনভূমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা দেয়। সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্র বন ব্যবস্থাপনায় অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে। বনভূমি ইজারা দিয়ে এক দশমাংশ ছাড়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে যৌক্তিকভাবে যেকোনো পরিমাণ কর আরোপ করতে পারবে। যেমন: হযরত আলী (রা.) বরস অঞ্চলের বনভূমির ইজারাদারদের উপর চার হাজার দিরহাম কর ধার্য করেছিলেন এবং তাদেরকে চামড়ার উপর এ সম্পর্কিত একটি চুক্তিপত্রও লিখে দিয়েছিলেন।^{৬৭}

জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশ সুরক্ষার সাথে মুসলমানদের ঐক্যের মিল রয়েছে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের পরিবেশ বিপর্যয় হলে ক্রমান্বয়ে তা অন্য প্রান্তের মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সম্পর্ক হাদিসের বাণী, “নুমান বিন বশীর (রা.) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়।”^{৬৮}

সুতরাং উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশ সকলেই সমন্বিতভাবে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর প্রতি আর্থিক সাহায্য বাড়িয়ে দিতে হবে।

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি-২ (টেকসই বন ব্যবস্থায়ন অর্থায়ন)

“১৫.খ. টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় অর্থায়নের জন্য সকল স্তর ও সকল উৎস হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ ও পুনঃবনায়নসহ অনুরূপ ব্যবস্থাপনার অধিকতর উন্নয়নকল্পে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পর্যাপ্ত প্রণোদনা সুবিধা প্রদান।”^{৬৯}

বাংলাদেশ সরকার টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্নভাবে অর্থায়ন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার বন অধিদপ্তরের অধীনে ৪২২৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।^{৭০}

মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রয়োজনে বনভূমি উজাড় করছে। এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। তাই টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের, প্রতিটি রাষ্ট্রের, সর্বোপরি বিশ্বের কার্বন গ্যাস নিস্করণকারী দেশসমূহের। কেননা তাদের অব্যাহত কার্বন নিস্করণই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ। সুতরাং পর্যাপ্ত বনভূমি সৃষ্টির মাধ্যমে কার্বন নিস্করণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বিশ্বকে রক্ষা করা সম্ভব। ইসলামও যেকোনো ক্ষেত্রে যে দায়ী তার উপর এর ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশনা দেয়। সুতরাং উন্নত বিশ্বের শিল্প কারখানা যেহেতু মরুভূমির জন্য অধিকতর দায়ী, তাই বনভূমি সংরক্ষণে তারা উন্নয়নশীল

দেশসমূহকে আর্থিক প্রণোদনা দিতে বাধ্য। সুতরাং ইসলামি নির্দেশনার আলোকে টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় উন্নতদেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পর্যাপ্ত প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করবে।

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি-৩ (স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি)

“১৫.গ. টেকসই জীবিকার সুযোগ গ্রহণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বাড়ানোসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সংরক্ষিত প্রজাতির অবৈধ শিকার ও পাচার রোধের উদ্যোগ-প্রচেষ্টায় বৈশ্বিক সমর্থন-সহায়তা বৃদ্ধি।”^{৯১}

বাংলাদেশ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির চেষ্টা করছে, যাতে তারা সংরক্ষিত প্রজাতির অবৈধ শিকার ও প্রচার থেকে বিরত থাকে। বিশেষত, বন গবেষণা ইনস্টিটিউট; বর্তমানে (২০২২-২৩ অর্থবছরে) এ প্রতিষ্ঠান ৫৪টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তাদের উদ্ভাবনী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং ঔষধ শিল্পের কাঁচামালে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।^{৯২} এছাড়াও টিআর, কাবিখা, ইজিপিপি ইত্যাদির আওতায় উপকূলীয় বা পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে সরকার। সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL) Project (টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প) পরিচালনা করছে বাংলাদেশ বন বিভাগ। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি। এতে- (ক) সরকারি বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং (খ) বনের উপর সরাসরি নির্ভরশীলতা হ্রাসসহ বনজ সম্পদ উজাড় রোধ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকা সুবিধা প্রদান করা সম্ভবপর হবে। ফলে বনের বক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি পাবে, বনের বাহিরে বক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে, উপকূলীয় তটরেখা সুরক্ষা পাবে এবং অতিদরিদ্র- বিপদাপন্ন নারী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এ প্রকল্পের সময়সীমা (২০১৮-২০২৩)।^{৯৩}

স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশেষত উপকূলীয় বনাঞ্চলে বসবাসকারী, পাহাড়ী আধিবাসী ও প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী নানাভাবে বিভিন্ন স্থলজ প্রাণির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশায় জড়িত। ফলে নানাক্ষেত্রে তারা ভিন্ন কোনো জীবিকার সন্ধান না পাওয়ায় সংরক্ষিত প্রজাতির অবৈধ শিকার এবং পাচারের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। তাই সংরক্ষিত প্রজাতির অবৈধ শিকার ও পাচার রোধে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে ক্ষেত্রমতে যাকাত, সাদাকাত এবং বায়তুল মাল থেকে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

সুপারিশমালা

ভূমি ও স্থলজ বাস্তুসংস্থানের উন্নয়ন টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। বিদ্যমান সমস্যাদি সমাধান করে টেকসই ভূমি ও স্থলজ বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হলো-

- ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ কল্পে পরিকল্পিত নীতিমালা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

- স্থলজ সম্পদের সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমি পুনরুদ্ধারে বনায়ন ও পুনর্বাসন বিষয়ে সন্তোজনজনক অগ্রগতি সাধনে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করা।
- বনভূমি সংরক্ষণে কৃত্রিম বনায়ন সৃষ্টি করা এবং বিনা প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করা থেকে বিরত থাকা।
- খরা ও বন্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় স্থানে বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, খরায় ভূমির টেকসই ব্যবহারের সুবিধার্থে খাল নির্মাণের মত প্রকল্প গ্রহণ করা।
- পার্বত্য অঞ্চলে বা স্বতন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- সংরক্ষিত উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির পাচারের অবসানকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বন্য প্রাণিজি অবৈধ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা।
- ক্ষতিকর প্রাণির অনিষ্ট থেকে বাঁচার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি এদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।
- সকল ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থলজ ও জলজ সম্পদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।
- বৃক্ষ ও পশু পাখির যত্ন নেয়া, বৃক্ষ নিধন না করা, পশুপাখি হত্যা ও বিচরণক্ষেত্র বিনষ্ট না করা।
- উপরিউক্ত সকল বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা পরিপালন করা।

উপসংহার

পৃথিবীর মোট আয়তনের মাত্র একভাগ স্থলভাগ এবং এই ভাগকেই আমরা ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। উন্নয়নের সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনার রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। ভূমির সঠিক ব্যবহার উন্নয়ন কাজে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বৈশ্বিক পেক্ষাপট বিবেচনার পাশাপাশি টেকসই ভূমি উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারও বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আবাসান এদেশের ভূমি সুরক্ষার জন্য বড় হুমকি। সুন্দরবন বাংলাদেশের টেকসই ভূমি ও স্থলজ বাস্তুসংস্থান সুরক্ষার সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক, কিন্তু হতাশার কথা হলো ক্রমান্বয়ে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হুমকির সম্মুখীন। এ সমস্যা সমাধানে সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল বৃদ্ধি, পাহাড়ি ও সমতল ভূমিতে বৃক্ষরোপনের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। সরকার ভূমি ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এছাড়াও টেকসই ভূমি সুরক্ষার জীববৈচিত্র্য রক্ষা, বিলুপ্ত প্রজাতির অভয়ারণ্য ঘোষণা, বনায়ন ইত্যাদিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলামি নির্দেশনার আলোকে আলোচিত উপরিউক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। একইসাথে প্রবন্ধে নির্দেশিত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। সর্বোপরি, ভূমি ব্যবস্থাপনায় ইসলাম যে নির্দেশনা দিয়েছে তা পালন করার মাধ্যমে মানুষের উপযোগী করে ভূমি ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ করার মাধ্যমে টেকসই ভূমি ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে।

তথ্যনির্দেশ

- ১ Editorial Board, Transforming Our World : The 2030 Agenda For Sustainable Development, The General Assembly, 4th plenary meeting 25 September 2015 (New York : United Nations, 2015) Seventieth session Agenda items 15 and 116, p. 29.
- ২ <https://sdg.gov.bd/page/indicator-wise/5/456/3/0#1>. Search on date: 30.07.2023.
- ৩ *Action Plan of MoEF by targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan and Beyond* (Dhaka : Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh April, 2018), p. 30
- ৪ <https://sdg.gov.bd/page/indicator-wise/5/457/3/0#1>
- ৫ বন অধিদপ্তর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ (ঢাকা: বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২০), পৃ. ১০
- ৬ https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/page/eac07668_7242_4576_aab5_17024a5b8c7d/SDG%20MoEFCC_M%26E%20Data%20Requirement.pdf. Search on date: 30.07.2023
- ৭ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُمُ اللَّيْلُ وَالزُّرْعَانِ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (আল কুরআন, সূরা আনআম, ৬ : ১৪১)
- ৮ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا: لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ. إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ (আল কুরআন, সূরা নাহল, ১৬ : ৫)
- ৯ (আল কুরআন, সূরা আনআম, ৬ : ১৪১) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالزَّيْتُونُ. (আল কুরআন, সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ১০-১৩)
- ১০ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ [আবু দাউদ সূলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানী (ইমাম আবু দাউদ), *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ৩৬১, হাদিস নং : ৫২৩৯।]
- ১১ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারি (ইমাম বুখারি), *আস সহিহ* (মিশর : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৩০, হাদিস নং : ৩৩১৮।]
- ১২ Editorial Board, op.cit., p. 29.
- ১৩ এ. বি. এম রবিউল ইসলাম, *পরিবেশ দূষণ বনায়ন ও ইসলাম : আমাদের করণীয়* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬), বর্ষ-৫৬, সংখ্যা-১, পৃ. ১০৯।
- ১৪ *Action Plan of MoEF by targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan and Beyond*, op.cit., p. 33.

- [illegible]

- 8৯ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا السُّبُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَيْمَانَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ (আল কুরআন, সূরা মায়েদা, ৫ : ২।)
- ৫০ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (আল কুরআন, সূরা মায়েদা, ৫ : ৩১।)
- ৫১ আবু হাইয়ান মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আন্দালুসী, তাফসীরে বাহরুল মুহীত (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ২০০১), খ. ৩, পৃ. ৪৮৩।
- ৫২ [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ (ইমাম ইবনে মাজাহ), আস সুনা (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১০৬৩, হাদিস নং : ৩১৮৫।]
- ৫৩ Editorial Board, op.cit., P. 29.
- ৫৪ প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯ (ঢাকা: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯), ২০১৯ সনের ১২ নং আইন।
- ৫৫ সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (ঢাকা: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৮), ২০১৮ সনের ৬১ নং আইন।
- ৫৬ Action Plan of MoEF by targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan and Beyond, op.cit., p. 39.
- ৫৭ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَمْسٌ فَوَاسِقٌ، يُقْتَلَنَ فِي الْحَرَمِ: الْقَارُؤُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، - زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلزُّوَءِ: «فَوَاسِقٌ» (ইমাম বুখারি, পূর্বোক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৯, হাদিস নং : ৩৩১৪।)
- ৫৮ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرَجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأَخْرَقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ (ইমাম বুখারি, পূর্বোক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩০, হাদিস নং : ৩৩১৯।)
- ৬০ Editorial Board, op.cit., P. 29.
- ৬১ গওহার নঈম ওয়ারা, “বদীপ মহাপরিকল্পনা কী এবং কেন?” দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮।
- ৬২ বাংলাদেশ ব-দীপ পরিকল্পনা ২১০০ : একুশ শতকের বাংলাদেশ (সংক্ষিপ্ত সার), (ঢাকা : সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০১৮), পৃ. ১৩।

- গৃহীত হবার তারিখ : ১১.০৭.২০২৩

ইসলামে মতানৈক্যের পদ্ধতি: পরিপ্রেক্ষিত তুলনামূলক ফিক্‌হ

মুহাম্মদ তাজামুল হক*

Abstract

The main purpose of this study is to explore the etiquettes of disagreement (ādāb al-ikhtilāf) in Islam in the perspective of comparative Fiqh (Fiqhul Muqāran). The etiquettes may be a strategic way of increasing mutual respect and passion among the different schools of Fiqh. The scholarly interpretation of the primary sources of Islamic shariah has given rise to various juristic schools (madhāhib). This article shows how the Muslim scholars engaged in scholarly debate and maintained mutual respect and unity in early periods of Islam. It also explores the etiquettes of disagreement which are to be followed to maintain the unity of Muslim community within juristic differences. This is a descriptive study of Islamic Jurisprudential history. It analyses various etiquettes of disagreement guided by the holy Quran and Sunnah and practiced by the prophet's companions. Intellectual disagreement and diversity of thought are greatly appreciated in Islam. This study sum up in to an opinion that the diverse interpretations made by classical Muslim scholars were based on their deep understanding of the texts of the holy Quran and Sunnah. They adhered to the etiquettes of Islam when they differed and expressed their views. This scholarly opinion certainly would shape the mind of Muslim reseachers and scholars to maintain etiquettes of disagreement while responding to contemporary issues. Furthermore it would contribute to mitigating the existing conflicts and divisions among the followers of various schools of Fiqh.]

চাবিশব্দ: মতানৈক্য, ইফতিরাক, ইসলামি শিষ্টাচার, তুলনামূলক ফিক্‌হ, ভিন্নমত

ভূমিকা

ফিক্‌হী মতপার্থক্য অটুট রেখে মুসলিম ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব। ফিক্‌হের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে ‘আল-ফিক্‌হুল মুকারান’ তথা ‘তুলনামূলক ফিক্‌হ’ নামক যে অভিজ্ঞানটি বিকাশ লাভ করেছে, তাতে মতানৈক্য আলোচনার এক অবশ্যম্ভাবী বিষয় এবং মূল কেন্দ্রবিন্দু। ফিক্‌হ চর্চায় পূর্ববর্তী আলিমগণ পরস্পর যেসব মতভিন্নতা করেছেন, তাতে ইসলাম প্রদর্শিত শিষ্টাচারের পরিপূর্ণ অনুসরণ করায় মুসলিম ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। ইসলাম ভিন্ন মতের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করে, তেমনি সর্তকতার সাথে উপযুক্ত প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করে সুনিপুণ ও উত্তম ভাষায় মতানৈক্য করার দিক-নির্দেশনা পেশ করেছে। পূর্ববর্তী আলিমগণ কর্তৃক মতভিন্নতার ইসলামি পদ্ধতি অনুসরণের ফলে মতভেদপূর্ণ ফিক্‌হ থেকেও উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে তুলনামূলক ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচিতি, মতপার্থক্যের প্রকৃতি ও পরিধি, পরিত্যাজ্য বিভক্তি ও গ্রহণযোগ্য মতভেদ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের মূল ভাষ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলনামূলক ফিক্‌হ শাস্ত্রে প্রয়োগযোগ্য বিভিন্ন ইসলামি শিষ্টাচার উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বনে ইসলামে মতানৈক্যের পদ্ধতিসমূহ তুলনামূলক ফিক্‌হের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

তুলনামূলক ফিক্হ: পরিভাষা পর্যালোচনা

তুলনামূলক ফিক্হ পরিভাষাটির আরবি ‘আল-ফিকহুল মুকারান’ (الفقه المقارن) যা ‘আল-ফিক্হ’ ও ‘আল-মুকারান’ দু’টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। আল-ফিক্হ শব্দটির শাব্দিক অর্থের পাশাপাশি একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। উপরন্তু ‘আল-ফিকহুল মুকারান’ যৌগিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে একটি নতুন পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছে।

‘আল-ফিক্হ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ বুঝা (فهم), জানা (علم), অনুধাবন করা (إدراك), বিচক্ষণতা (فطنة), শিক্ষা লাভ করা (تعلم), দক্ষতা অর্জন করা (مهاره) ইত্যাদি।^১ ইব্ন মানযূর আল-আফ্রিকী বলেন, আল-ফিক্হ শব্দটির অর্থ মৌলিকভাবে দু’টি দিককে ধারণ করে: এক. الشق তথা ব্যুৎপত্তিগত বিদারণ। দুই. الفتح তথা উন্মোচন।^২ এ দু’টি অর্থই এটা দাবি করে যে, ফিক্হ কোনো সাধারণ জ্ঞান নয়; বরং যে জ্ঞান অর্জিত হলে কোনো বস্তুর ব্যুৎপত্তি সুনির্ধারিত হবে এবং যা অর্জিত হলে কোনো বস্তুর উপরে বর্তমান অজ্ঞানতার আবরণ থেকে তা মুক্ত হবে তা-ই ফিক্হ। সে হিসেবে ফকীহ হচ্ছেন এমন ‘আলিম যিনি চিন্তা-ভাবনা ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে আইনের তত্ত্ব উন্মোচন করেন এবং তার প্রকৃত তাৎপর্যগুলো অনুসন্ধান করেন এবং অবোধগম্য ও জটিল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করেন।^৩ হাদিসে এসেছে: فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ - অর্থাৎ ‘সেটা ঐ ব্যক্তির উদাহরণ আল্লাহর দ্বীনের ‘ফিক্হ’ যার মজ্জায় পরিণত হয়েছে, আল্লাহ তাঁর রাসুলকে যা নিয়ে পাঠিয়েছেন তা তার জন্য উপকারী হয়েছে। ফলে সে তা জেনেছে এবং অপরকে জানিয়েছে।’^৪

পারিভাষায় ফিক্হ হচ্ছে- العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية - অর্থাৎ ‘শরীআতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে শরীআতের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত বিধি বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার জ্ঞান।’^৫

আরবি ‘আল-মুকারান’ শব্দটি قَارَنَ পরিবর্তন ধারা অনুযায়ী গঠিত বলে বর্ণিত হয়েছে। শব্দটি আভিধানিকভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে-

এক. কখনও কখনও শব্দটি المصاحبة و الإقتران (আল-মুহাসাবাহ ওয়াল ইকতিরান) অর্থ জ্ঞাপন করে। যেমন: قَارَنَ الشَّخْصَ أَى صَاحِبَهُ وَاقْتَرَنَ بِهِ "يحاول أن يقارن العالم ليكتسب منه علماً" অর্থাৎ ‘সে লোকটির কারিন হয়েছে’-এর অর্থ ‘সে তার সঙ্গী হয়েছে এবং তার সাথে মিলিত হয়েছে’ মানে সে জ্ঞানী লোকটির সাথে মিলিত হয়েছে যেন তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।’^৬

আল-আশ‘আরীর মতে, অনুরূপ অর্থে পবিত্র কুরআনকেও القران বলা হয়। তিনি বলেন, قرن الشئ بالشئ অর্থাৎ ‘একটি বস্তু অপর বস্তুর সাথে সংযোজিত হয়েছে’ থেকে القران শব্দটি উদ্ভূত। পবিত্র কুরআনে সূরাসমূহ এবং আয়াতসমূহ পরস্পরের সাথে সংযোজিত বলে তাকে কুরআন বলে।^৭

দুই. শব্দটি القارن والموازنة (আল-মুআযানাহ ওয়াল মুকাবিলা) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন: قَارَنَ الشَّيْءَ بالشَّيْءِ أو قَارَنَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَالشَّيْءِ أَى وَازَنَهُ بِهِ، قَابِلَ بَيْنَهُمَا، وَازَنَ بَيْنَهُمَا "قَارَنَ نَصُوصًا بَعْضُهَا بِبَعْضٍ" অর্থাৎ ‘বস্তুটির সাথে বস্তুটির কারিন বা বস্তু বস্তুর মাঝে কারিন’-এর অর্থ ‘তার (বস্তুর) সাথে তাকে তুলনা ও দু’টির মাঝে পরস্পর মুখোমুখি। দু’টির মাঝে পরস্পর তুলনা মানে নসের দিক থেকে পরস্পর তুলনা করা।

অনুরূপভাবে قارن بين الرأيين او النتائج او الكاتبين অর্থাৎ দু'টি মত বা ফলাফল বা গ্রন্থের মাঝে কারিন বা তুলনা মানে قارن كائناً بآخر একটি গ্রন্থকে অপরটির সাথে তুলনা করা।^৮

তিন. শব্দটি المقايسة (আল-মুকায়াসাহ) তথা অনুমান করা অর্থে ব্যবহৃত। যেমন: কোনো এক কবির ভাষায়- عن المرء لا تسئل وسل عن قريته ... فكل قرين بالمقارن يقتدي অর্থাৎ 'ব্যক্তির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। তার সঙ্গীর সম্বন্ধে জেনে নাও। কেননা প্রত্যেক সঙ্গী তার সাথীর অনুগামী হয়ে থাকে।'^৯

চার. আল-মুকারণ শব্দটি الإزدواج (আল-ইয়দিওয়াজ) তথা বিবাহ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়: اقترن فلان بفلانة أي تزوجها، وسعى النكاح القرآن অর্থাৎ 'অমুক অমুকের সাথে মুকতারিন' মানে সে তাকে বিবাহ করেছে'। আর এভাবে আন-নিকাহকে আল-কিরানও বলা হয়।^{১০}

পাঁচ. শব্দটি المحاذاة (আল-মুহাযাত) তথা সমতুল্য হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাযী [ম্. ৬৬৬ হি.] বলেন, وهذا يوازن هذا إذا كان على زنته أو كان محاذيه, [হি.] বুলেন, 'দু'টি বস্তুর মাঝে মুআযানা' মানে 'এটি এটির মুআযিন যখন এটি তার ওজনে হয় বা তা তার সমতুল্য হয়।'^{১১}

সর্বোপরি 'আল-মুকারণ' (المقارن) শব্দটি (قرن) মূল থেকে কর্মবাচক শব্দ যার অর্থ তুলনামূলক। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মাঝে তুলনা করা অর্থেই সবার্খিক ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, যে ফিক্‌হ বিভিন্ন ফিক্‌হী মতামতের মধ্যে তুলনা করে তাকে তুলনামূলক ফিক্‌হ বলে। আল-ফিক্‌হুল মুকারান'-এ শব্দটির উক্ত 'তুলনামূলক' অর্থই বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে কেউ কেউ তুলনামূলক ফিক্‌হকে অর্থাৎ রা বর্ণের উপর যেরযোগে কর্মবাচক হিসেবে মুকারিন বলেন, যার অর্থ তুলনাকারী।^{১২}

পারিভাষায় 'আল-ফিক্‌হুল মুকারান'-এর সংজ্ঞায় উমর সুলাইমান আল-আশকার [১৯৪০-২০১২ খৃ.] বলেন,

الفقه المقارن يبحث فيما اختلف فيه أهل العلم من أحكام بعرض أقوال أهل العلم في المسألة الواحدة وتحديد موضع الخلاف فيها وهو المسمى بتحرير محل النزاع ثم بيان سبب الخلاف وذكر أدلة كل فريق وبيان ما يرد على كل دليل والإجابة عنه ان وجد و تحديد قول الراجح و بيان سبب الترجيح

“ফিক্‌হুল মুকারান এমন শাস্ত্র যাতে কোনো নির্দিষ্ট বিধানে ‘আলিমগণ যে বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন তা প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের পারস্পরিক বক্তব্যসমূহ উল্লেখ করা; অতপর মতভেদের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা যাকে ‘মাহাল্লু নিযা’ নামকরণ করা হয়; অতপর মতভেদের কারণ বর্ণনা করা, প্রত্যেক দলের দলিল উল্লেখ করা, যদি দলিল খন্ডন ও প্রতিউত্তর উল্লেখযোগ্য হয় তবে তা উল্লেখ করে সবশেষে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত নির্ধারণ ও অগ্রাধিকার প্রদানের কারণসমূহ বর্ণনা করার মাধ্যমে বিধানের ক্ষেত্রে ‘আলিমগণের মতপার্থক্য আলোচনা করাই তুলনামূলক ফিক্‌হ।’^{১৩}

ড. আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার তাঁর ‘বিভিন্ন ফিক্‌হের তুলনামূলক পর্যালোচনা’ গ্রন্থে বলেন,

جمع آراء المجتهدين مع ادلتها في المسألة الواحدة المختلفة فيها و مقابلة هذه الأدلة بعضها ببعض ليظهر بعد مناقشتها أيها أقوى دليلاً

“কোনো একটি মতবিরোধপূর্ণ মাস’আলায় মুজতাহিদগণের মতামতকে তাদের দলিল-প্রমাণাদিসহ একত্রে উল্লেখ করে সে সমস্ত মত ও দলিলকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করানো, যাতে বিশ্লেষণ করে এর মধ্যকার কোনো মতটি দলিল-প্রমাণের দিক থেকে বেশি শক্তিশালী তা নির্ণয় করা যায়।”^{১৪}

ড. মুহাম্মদ ফাতহী আদ-দারীনী [১৯২৩-২০০১ খৃ.] বলেন,

تقرير آراء المذاهب الفقهية الإسلامية في مسألة معينة، بعد تحرير محل النزاع فيها، مقرونة بادلها، ووجوه الاستدلال بها وما ينهض عليه الاستدلال من مناهج أصولية وخطط تشريعية وبيان منشأ الخلاف فيها، ثم مناقشة هذه الأدلة أصولياً والموازنة بينها وترجيح ما هو أقوى دليلاً، أو اسلم منهجاً، أو الاتيان برأي جديد، مدعم بالبدليل الارجح في نظر الباحث المجتهد

“কোনো একটি নির্দিষ্ট মাস’আলায় ফিক্‌হী মাযহাবের মতামতসমূহের বিতর্কিত মতটি উপস্থাপনান্তে মতভেদের ক্ষেত্র অনুসন্ধান, দলিল-প্রমাণাদী উপস্থাপন এবং তা থেকে প্রমাণ পেশের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ, উসূল শাস্ত্রের নীতিমালা ও বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতির সাথে উক্ত প্রমাণের অসামঞ্জস্যতা; তাতে মতপার্থক্যের কারণ বর্ণনা করা; অতপর এ উসূলী দৃষ্টিভঙ্গিতে উক্ত দলিলসমূহ পর্যালোচনা এবং তাতে তুলনা করা ও যা দলিলের বিবেচনায় অধিক শক্তিশালী বা পদ্ধতিগত অধিক সঙ্গত তা প্রাধান্য দান; অথবা অনুসন্ধিসু মুজতাহিদের দৃষ্টিতে প্রাধান্যপ্রাপ্ত দলিলের দ্বারা সমর্থিত কোনো একটি নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।”^{১৫}

সর্বোপরি শরীআর শাখা-প্রশাখাজনিত কোনো একটি মাস’আলাতে ‘আলিমগণের মতবিরোধপূর্ণ মতামতকে দলিল-প্রমাণাদিসহ উল্লেখ করে সেগুলোকে একটি অপরটির সাথে তুলনামূলক আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে দলিলের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী ও শরীআতের নীতিমালার সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ মতকে প্রাধান্য দেয়ার শাস্ত্রীয় পদ্ধতির নাম তুলনামূলক ফিক্‌হ।

তুলনামূলক ফিক্‌হে মতপার্থক্য প্রসঙ্গ

তুলনামূলক ফিক্‌হের শাস্ত্রীয় পরিচয় সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এ শরীআর বিধি-বিধানের মতপার্থক্য করার পরিসীমা সুস্পষ্ট। পারস্পরিক তুলনা ও একটির উপর অন্যটিকে প্রাধান্য দেয়ার লক্ষ্যে শরীআতের কেবল মতপার্থক্যপূর্ণ মাস’আলাগুলো নিয়ে তুলনামূলক ফিক্‌হ আলোচনা করে। ফলে মুজতাহিদগণের মতামত ও ফকীহগণের ফাতওয়া একত্র করাই হলো তুলনামূলক ফিক্‌হের আলোচ্য বিষয়।^{১৬} কারণ পূর্বের ও পরের অনেক ‘আলিমই বিভিন্ন মাস’আলায় মতভেদ করেছেন। আল্লামা মুহাম্মদ তাকী আল-হাকিম বলেন,

موضوع الفقه المقارن هو آراء المجتهدين في المسائل الفقهية من حيث تقييمها والموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض. المسائل الفرعية المختلف فيها بين علماء الشريعة من أئمة المذاهب و غيرهم ممن سبقهم أو لحقهم من المجتهدين

“তুলনামূলক ফিক্‌হ-এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, ফিক্‌হী মাস’আলাসমূহে মুজতাহিদগণের মতামতসমূহ; তা দৃঢ় করণ; পরস্পর তুলনা করা এবং একটি অপরটির উপর প্রাধান্য প্রদান বিবেচনায়। ঐ সমস্ত শাখা-প্রশাখাজনিত মাস’আলাসমূহ যেগুলোতে মায়হাবের ইমাম ও তাদের মত তাদের আগে যারা চলে গেছে বা তাদের সাথে পরবর্তীতে যোগ হয়েছে এরকম মুজতাহিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে এমন বিষয়গুলোই হচ্ছে তুলনামূলক ফিক্‌হ-এর আলোচ্য বিষয়।”^{৭৭}

শরীআতের হুকুম নির্ধারণ করতে গিয়ে ভিন্নমতের পক্ষেও দলিল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করা অত্যাৱশ্যক। মূলত ফিক্‌হুল মুকারানে কোনো বিষয়ে হুকুম নির্ধারণের আলোচনায় পক্ষ-বিপক্ষের দলিল, দলিলের উৎস, দৃঢ়তা ও বিশুদ্ধতা, প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত, সবচেয়ে শক্তিশালী, শরীআতের চাহিদার নিকটবর্তী মত ইত্যাদি সহনশীল ভাষায় প্রকাশ করার বিষয়ের আলোচনার পরিধিভূক্ত। মাহমুদ আবু লাইস বলেন,

هو دراسة الآراء الفقهية المختلفة في المسألة الواحدة مع مستنداتها من الأدلة الشرعية و تقويمها و بيان ما عليها و ما لها بالمنافسة و إقامة الموازنة بينها توصيلاً إلى معرفة الراجح منها أو الجمع بينها أو الإتيان برأى جديد أرجع دليلاً منها

“শার’ঈ দলিলসহ একই মাস’আলায় বিভিন্ন ফিক্‌হী মত অধ্যয়ন, তার মূল্যায়ন, পর্যালোচনার মাধ্যমে এর পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তিতর্ক উল্লেখপূর্বক মতামতগুলোর মধ্যে তুলনা করা যাতে এগুলোর মধ্যকার অধিকতর অগ্রগণ্য মত সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় অথবা এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা বা অধিকতর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দলিলের ভিত্তিতে নতুন কোনো মত প্রদান করা যায়।”^{৭৮}

এভাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তুলনামূলক ফিক্‌হের আলোচনার বিষয়বস্তু বিস্তৃত। তবে শরীআতের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন যেসব মাস’আলা আছে সেগুলো তুলনামূলক ফিক্‌হের আলোচ্য বিষয় নয়। অনুরূপভাবে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে যে সকল বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা হয়ে থাকে তা তুলনামূলক ফিক্‌হের বিষয়বস্তু নয়। এটাকে পরিভাষায় তুলনামূলক ফিক্‌হ হিসেবে ধরা হয় না। একইভাবে ইলম আত-তাওহীদের আকীদা বিষয়ক মাস’আলাও তুলনামূলক ফিক্‌হের আলোচ্য বিষয় নয়।^{৭৯} ইমাম মহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া আন-নববী (র.) বলেন,

জেনে রাখুন দলিলসহ পূর্ববর্তী ‘আলিমগণের মতামত অবগত হওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আনুষঙ্গিক বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য উন্মাতের জন্য কল্যাণকর। দলিলসহ তাঁদের বিভিন্ন মতামত আলোচনার মাধ্যমে অধিকতর শক্তিশালী ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত অবগত হওয়া যায়। তার ও অন্যের সামনে জটিলতা ও এর উপকারিতা স্পষ্ট। এ বিষয়ে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপকারী প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে এবং তার মেধা বিকশিত হয়। দৃষ্টিমান ও জ্ঞানীগণের মধ্যে সে অনন্য হয়ে ওঠে। দুর্বল হাদিস থেকে সহীহ হাদিস এবং যে দলিলের উপর ভিত্তি করে একটি

মতের বিপরীতে অন্য মতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় তার থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দলিল পৃথক করতে সক্ষম হয়।^{২০}

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শরীআতের কেবল মতপার্থক্যপূর্ণ মাস'আলাগুলো তুলনামূলক ফিক্‌হের প্রধান উপজীব্য। এ সব মতপার্থক্য কেবল অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতামত নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। আলিমগণ উক্তরূপ পর্যালোচনাকালীন উম্মার বিভক্তির প্রতি যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি ঐক্যের প্রতিও যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন।

তুলনামূলক ফিক্‌হ: বিভক্তি ও ঐক্য

আল-ফিক্‌হুল মুকারান ছাড়াও তুলনামূলক ফিক্‌হের অন্যান্য পরিভাষা হচ্ছে 'আল-খিলাফ আল-আলী' (الخلاف العالی) তথা উচ্চমানের বিতর্ক, 'ইলম আল-খিলাফিয়াত' (علم الخلافیات) বা 'ইলম আল-ইখতিলাফ' (علم الإختلاف) তথা বিরোধাত্মক জ্ঞান। খিলাফ, খিলাফিয়াত, ইখতিলাফ শব্দগুলো 'খালফ' (خلف) একই শব্দমূল হতে উৎসারিত। শব্দটি অমিল, বৈচিত্র, বৈপরিত্য ইত্যাদি অর্থ জ্ঞাপন করে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মত ও পথের ভিন্নতা^{২১}, ভাষা ও বর্ণের অমিল^{২২}, স্বাদ ও গন্ধের বৈপরিত্য^{২৩} অর্থে শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে। তবে মত ও চিন্তাগত অমিলের ক্ষেত্রেই 'ইখতিলাফ' শব্দটির ব্যবহার সমধিক। ইমাম রাগিব (র.) 'ইখতিলাফ এর সংজ্ঞায় বলেন, ان يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله' অর্থাৎ 'ইখতিলাফ অর্থ: একজন অপরজন হতে স্বতন্ত্র গতিবিধি বা পৃথক মত অবলম্বন করা।'^{২৪} তবে একই ধাতু হতে উৎপন্ন হলেও খিলাফ এবং 'ইখতিলাফ'-এর মাঝে কিছু পার্থক্য আছে। আবুল বাকা আল কাফারী (র.) 'ইখতিলাফ' ও 'খিলাফ'-এর মধ্যে চার রকমের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

এক. পথ ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য এক এর নাম 'ইখতিলাফ'। পক্ষান্তরে পথ ও লক্ষ্য উভয়ই ভিন্ন হলে সেটা খিলাফ।

দুই. ইখতিলাফ হয় দলিল-প্রমাণ নির্ভর। কিন্তু খিলাফ হচ্ছে এমন ভিন্নমত যা প্রমাণ ভিত্তিক নয়।

তিন. কাযী (বিচারক) যদি খিলাফ অনুযায়ী রায় প্রদান করেন এবং তা অন্য কাযীর সম্মুখে পেশ করা হয়, তবে দ্বিতীয় কাযী তা নাকচ করতে পারেন। ইখতিলাফের ক্ষেত্রে তা পারেন না। কেননা 'খিলাফ হচ্ছে সেই ভিন্নমত যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'-এর পরিপন্থী।^{২৫}

চার. 'ইখতিলাফ ও খিলাফের মধ্যকার পার্থক্য কেবল পারিভাষিক। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দলিল-প্রমাণভিত্তিক মতবিরোধকে যেমন ইখতিলাফ বলা হয়, তেমনি 'খিলাফ' শব্দটিও এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইখতিলাফ কোনো গর্হিত বিষয় নয়; বরং এটা এক স্বাভাবিক পরিস্থিতি, সত্যের সন্ধানীকে যার মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই। অপরপক্ষে 'খিলাফ' হচ্ছে এক লক্ষ্যচ্যুত হঠকারিতা, যা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। ইব্ন মাসউদ (রা.) বলেন, الخلاف شر 'খিলাফ অতি মন্দকাজ'।^{২৬}

তুলনামূলক ফিক্‌হে ইখতিলাফ যেমন একটি অত্যবশ্যক বাস্তবতা, তেমনি খিলাফ একটি আবশ্যিক পরিত্যাজ্য। কারণ খিলাফ মুসলিমদের 'আল-ইফতিরাক' (الإفتراق) তথা বিভক্তি এবং 'আত-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِخْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّي سَتَفَرَّقُوا عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

বস্তুত রাসুলুল্লাহর (সা.) হুশিয়ারী আক্বীদা-বিশ্বাসের বিভক্তি বিষয়ে। এ ধরণের বিভক্তি পরস্পর বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে; ঐক্যের চেতনা ধ্বংস করে; আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে বিচ্যুত করে; এবং অবশেষে শয়তানের পথে পরিচালিত করে। অথচ আল্লাহ তা'আলার পথ এ ধরণের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নবোধের বিপরীতে একটি সহজ-সরল একক গন্তব্য। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“এবং এ পথই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন, যেন তোমরা সাবধান হও।”^{২৯}

পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভিন্নমত সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই। সর্বজন বিদিত ও সন্দেহাতীত বিষয়ে ভিন্ন মত অবলম্বন করলে সেটা কুফর এবং অন্যান্য বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের (জমহুর) বিপরীত মত গ্রহণ করলে তা বিদআত ও গুমরাহী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিরাপদ পথ সেটাই, যা কুরআন-সুন্নাহ বর্ণনা করেছে এবং উম্মাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ এক্যমত পোষণ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে সূরা আল-ইমরানে জাহিলী যুগের বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে ঐক্যবোধ ও প্রত্যাশিত মুসলিম উম্মাহর যে চরিত্র আল্লাহ তা'আলা বিধৃত করেছেন তা এ বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। তোমারা পরস্পর শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের অন্তরে হৃদয়তা সঞ্চার করেছেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়েছো। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে অবস্থান করছিলে। তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা দিক-নির্দেশনা পাও।”^{৩০}

ইসলাম একটি উম্মাহ প্রত্যাশ্যা করে যা প্রতিষ্ঠিত হবার পর আত-তাফাররুক বা বিভেদাত্মক ইখতিলাফকে নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং পরস্পর ইখতিলাফ করেছে, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদি পৌঁছার পর, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।”^{৩১}

আক্বীদাগত বিষয়ে যারা কুরআন-সুন্নাহ এবং সাহাবি-তাবিঈন বা উম্মাতের সংখ্যাগরিষ্ঠের পথ অবলম্বন করে তাঁরা ‘আহলুল-সুন্নাহ ওয়াল-জামাত’ (اهل السنة و الجماعة) এবং ভিন্ন মতালম্বীদেরকে বলে ‘আহলুল-বিদঈ ওয়াল-আহওয়্য’ (اهل البدع والاهواء)।

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বিচ্ছিন্নতা মুক্ত হয়ে তাঁর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। এ রজ্জু আঁকড়ে ধরলে সফলতা নিশ্চিত। কেননা, তা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথও নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“অতএব কোনো ব্যক্তি যদি বাতিল মতকে অস্বীকার করে, আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে যেন এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী রশি ধরলো, যা কোনোদিনই ছিঁড়ে যাবার নয়; আল্লাহ তা‘আলা সব শুনে ও জানেন।”^{৩২}

কিন্তু ইসলাম বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে চিন্তার বৈচিত্র্যতাকে অনুমোদন করেছে। ফিক্হ শাস্ত্রে চিন্তার বৈচিত্র্যতাকে ‘আল-ইখতিলাফ আল-ফিক্হী’ বলা যেতে পারে। এ বৈচিত্র্যতার ঘটার পিছনে আল্লাহর রজ্জুকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরাই উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করে। উক্তরূপ উদ্দেশ্যে বিধি-বিধান নির্ধারণগত মতপার্থক্যে পবিত্র কুরআন দ্বারাও অনুমোদিত হয়েছে। বনু নায়ীর অভিযানকালে সাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কেউ মনে করলেন, এ বাগানতো মুসলিমদেরই হাতে আসবে। ফলে ভালো গাছগুলো রেখে দেয়া উত্তম মনে করলেন। অন্যরা মনে করলেন, ভালো গাছগুলো কেটে ফেলা উচিত। তাতে শত্রুর অন্তর্দাহ বেশি হবে। তাঁরা নির্বিচারে সব কেটে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এই মতভেদ আল্লাহ তা‘আলার নিকট অপছন্দ হয়নি; বরং তিনি উভয় দলের কার্যক্রমকে সমর্থন করেছেন এবং উভয় দলের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْعَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

“তোমরা যেসব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছো এবং যেগুলো (না কেটে) তার মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো (তা অসংগত ছিল না, বরং); তা ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহ তা‘আলার অনুমতিক্রমেই, (আর আল্লাহ তা‘আলা অনুমতি এজন্যই দিয়েছেন), যেন তিনি এ দ্বারা অবাদ্যদের অপমানিত করতে পারেন।”^{৩৩}

স্বয়ং রাসুলুল্লাহর (সা.) উপস্থিতিতেই শাখাগত বিধি-বিধান নির্ধারণে ‘আল-ইখতিলাফ আল-ফিক্‌হী’ বা বিধি-বিধানগত চিন্তার বৈচিত্রতার সূচনা হয়েছিল।

তুলনামূলক ফিক্‌হের প্রেক্ষিতে মতানৈক্যের পদ্ধতি

মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিন্নতায় বৈচিত্রময় হয়ে থাকে। বিচিত্র জাতি, বর্ণ ও অঞ্চলের মানুষের উপর পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রভাব বিদ্যমান থাকা অস্বাভাবিক নয়। ফিক্‌হের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে ‘আল-ফিক্‌হুল মুকারান’ নামক যে অভিজ্ঞানটি বিকাশ লাভ করেছে, তাতে মতানৈক্য এক অবশ্যজ্ঞাবী বিষয়; বরং তা এ শাস্ত্রের যাবতীয় আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। ফিক্‌হ চর্চায় পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ যেসব পরস্পর মতভিন্নতা করেছেন তাতে তাঁরা ইসলাম প্রদর্শিত শিষ্টাচারের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন। ফলে তাঁদের পরস্পর মতভেদপূর্ণ ফিক্‌হ থেকেও উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়েছে। ড. তাহা জাবির আলওয়ানী বলেন,

“তুলনামূলক ফিক্‌হের উপকারিতা লাভ করা তখন সম্ভব যখন মতানৈক্যটি সীমার মধ্যে অবস্থান করে এবং তা এমন শিষ্টাচারপূর্ণ হয়, যা তার প্রতি আকৃষ্ট ও সমুদ্র থাকার জন্য উপাদেয় হয়ে থাকে। কিন্তু যদি সীমা লঙ্ঘিত হয় এবং শিষ্টাচারের কোনো সৌন্দর্য থাকে না এমন হয়, তখন তা ঝগড়া-বিবাদ ও বিভক্তিতে রূপ নেয় এবং প্রকাশ্যভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।”^{৩৪}

ইসলামের বিধি-বিধান নির্গমণে শরীআর মূল ভাষ্যগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকালীন মুজতাহিদ আলিমগণ রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবি-তাবিঈগণের অনুসৃতিতে বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি ও শিষ্টাচার অনুসরণ করেছেন।

এক. ঐক্যমত ও ব্যক্তিগত মতামত

ইসলামি শরীআতে ‘আল-ইজমা’ ওয়া আত্-তাফারুদ’ (الإجماع والتفرد) পরিভাষায় বহুল পরিচিত। খুলাফাহ রাশিদুনের সময় কোনো সমস্যার সমাধানে তাঁরা ইজতিহাদের পদ্ধতি হিসেবে ‘ইজমা’ (ঐক্যমত)-এর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করতেন। তবে তাঁরা প্রথমে পবিত্র কুরআনে সমস্যাটির সুনির্দিষ্ট সমাধান খুঁজতেন। তারপর সুন্নাহতে অনুসন্ধান করতেন। কুরআন ও সুন্নাহ হতে কোনো সমাধান না পেলে বিশিষ্ট সাহাবিগণের বৈঠক ডেকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন। সর্বসম্মত কিংবা অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে গৃহিত সিদ্ধান্তই ইজমা নামে খ্যাতি লাভ করে। তবে ব্যাপক মতপার্থক্যের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত নিরূপণ কখনও কখনও কঠিন হয়ে পড়ত। তখন খলিফার একক ইজতিহাদের ভিত্তিতেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।^{৩৫} খলিফাগণের সাথে সাহাবিগণের বৈঠকের পাশাপাশি সাহাবিগণের প্রায় প্রতিদিনই ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত দিতে হত। সিদ্ধান্ত দেয়ার পূর্বে তাঁরা পরিস্কারভাবে বলে নিতেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সিদ্ধান্ত দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করলেও তাঁদের দেয়া ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তগুলো সম্পূর্ণ সঠিক না-ও হতে পারে।^{৩৬} যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনো কোনো বিষয়ে সাহাবিগণের মধ্যে মতপার্থক্য থেকে যেত। কিন্তু পরবর্তী কালে এ ব্যাপারে যদি রাসুলুল্লাহর (সা.) কোনো সহীহ

হাদিস জানতে পারতেন, তাহলে সব মতপার্থক্য ভুলে সাথে সাথে তা মেনে নিতেন। সবশেষে কোনো বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-থেকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া না গেলে এবং সাহাবিগণের মধ্যেও ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলে, তাঁরা একে অপরের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁরা কখনোই কারও উপর বিশেষ কোনো একটি মত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেননি। সাহাবিগণের এ ব্যক্তিগত মত আত্ম-ত্যাগের দ্বারা হিসেবে পরিচিত। যদিও ব্যক্তিগত মত প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাহাবিগণের পরস্পরের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য ছিল, তবে সে পার্থক্য ঐ যুগে কোনোরূপ দলাদলিতে পর্যবসিত হয়নি। ব্যক্তিগত মত প্রদান প্রসঙ্গে মাদীনায়ে ইব্ন উমার (রা.) ও ইরাকের কুফায় আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর মত বিশিষ্ট সাহাবিগণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। তাঁদের এই মতপার্থক্য পরবর্তী যুগের আলিমগণের বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত হওয়ার সূচনাবিন্দু কিংবা প্রচ্ছন্ন পূর্বাভাস।^{৩৭}

দুই. পদ্ধতিগত মতভিন্নতা: মতভিন্নতার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় ‘ইখতিলাফ’ দুই প্রকার। ‘পদ্ধতিগত মতভিন্নতা’ তথা ‘ইখতিলাফ আত্ম-তানাক্বু’ (اختلاف النوع) ও ‘পরস্পর বিরোধী মতভেদ’ তথা (اختلاف التضاد)। সবগুলো মতামত একই লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত এবং প্রমাণসিদ্ধ হলে তাকে পদ্ধতিগত মতভিন্নতা বলা হয়। পার্থক্য হচ্ছে, একজনের দৃষ্টিতে এক পদ্ধতি এবং অন্য জনের দৃষ্টিতে অন্য পদ্ধতি উত্তম। বনু নায়ীরের বৃক্ষ নিধনের ঘটনায় সাহাবিগণের উভয় পক্ষের কর্মনীতি ভিন্ন হলেও লক্ষ্য ছিলো এক তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ফিক্‌হের মতভেদসমূহ মূল্যায়ন করলে এটি প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, সাহাবিগণের শরীআ সম্পর্কিত মতভেদ হচ্ছে, ‘বহুমুখী মতভিন্নতা’ (اختلاف النوع) যা সম্পূর্ণভাবে বৈধ। নিষিদ্ধ হচ্ছে ‘পরস্পর বিরোধী মতভেদ’ (اختلاف التضاد)- যা একমতের দৃষ্টিতে বিপরীত মত সম্পূর্ণ ভুল।^{৩৮} এরূপ মতভেদ খুবই বিরল। তবে তাও যেহেতু দলিল-প্রমাণ নির্ভর তাই অহেতুক এমন বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া অবাস্তবীয়, যা শরীআর গণ্ডি অতিক্রম করে যাবতীয় বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য সৃষ্টি করে। খলীফা ‘উমর ইব্ন আবদুল আযীয [৬১-১০১ হি.] শরীআ সম্পর্কিত আলিমগণের মতভেদের প্রেক্ষিতে বলেন,

مَا أَجِبُ أَنْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَخْتَلِفُوا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانُوا قَوْلًا وَاحِدًا كَانَ النَّاسُ فِي ضَبَقٍ
وَأَنَّهُمْ أَيْمَةُ يُفْتَدَى بِهِمْ وَلَوْ أَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلٍ أَخَذَهُمْ كَانَ فِي سَعَةِ

“রাসুলুল্লাহর (সা.) সাহাবিগণ মতভেদ না করলে সেটা আমি পছন্দ করতাম না। কেননা সব কিছুতেই তাঁদের মত যদি একটাই হত, তবে মানুষ সঙ্কটে পড়ে যেত। আর তাঁরা হচ্ছেন এমন নেতৃত্ব যাদের অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এখন কোনো ব্যক্তি তাঁদের যে কারও মত অবলম্বন করবে সূন্নাহর মাঝেই থাকবে।”^{৩৯}

তিন. জনগণের বিধানগত অনুশীলন অক্ষুণ্ণ রাখা: কোনো বিষয়ের বিধান দীর্ঘদিন একভাবে পালনের পর যদি তা অন্যভাবে পালনের বিষয় আসে তখন সমাজে তার প্রতিক্রিয়া হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ফলে কোনো বিষয়ে নতুন কোনো দলিল পাওয়া গেলে বা দৃঢ় মতামত আমল করতে চাইলে তা সম্ভাব্য বিতর্কের সবটুকু দিকে লক্ষ্য রেখে আমল করা আবশ্যিক। মীরাস বন্টনে إخوة শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের তিন খলীফা ও ইব্ন আব্বাসের অভিমতের ভিন্নতা বিষয়ক বর্ণিত হাদিসটিতে দেখা যায় উসমান (রা.) সমাজে ইতোমধ্যে ইসলামি বিধান হিসেবে প্রচলিত ও মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এমন বিধান পরিবর্তনের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন। হাদিসটির ভাষ্য হচ্ছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَزِدَّانِ الْأُمَّ عَنْ الثَّلَاثِ، قَالَ اللَّهُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ؟ فَأَلَّاخَوَانِ يَلْسَانِ قَوْلِكَ لَيْسَا بِإِخْوَةٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي، وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ، وَتَوَارَتْ بِهِ النَّاسُ

“ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি উসমান ইবন আফফানের (রা.) নিকট এসে বললেন, আপনারা মাতাকে দুই ভাই থাকলে এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশে নামিয়ে আনেন, অথচ আল্লাহ বলেন, “তা ‘ইখওয়া (ভাইদের সমষ্টি) থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ।”^{৪০} আর ‘ইখওয়া’ বা ভাইদের সমষ্টি নিঃসন্দেহে ইখওয়া (দুই ভাই) হিসেবে ধর্তব্য হবে না। তখন উসমান (রা.) বললেন, ‘আমি আমার পূর্বে যা ঘটেছে; শহরে শহরে চালু হয়েছে এবং মানুষেরা তার উত্তরাধিকার হয়েছে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করবো না।’^{৪১}

অর্থাৎ আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর সময়ে দুই ভাই থাকলেই মায়ের অংশ এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-ষষ্ঠাংশে নামিয়ে আনা হয়েছিল। তারা সবাই ‘ইখওয়া’ শব্দটিকে একের অধিক ভাই-বোন যাই থাকুক না কেন সেটাই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ফলে উসমান (রা.) একইভাবে ‘আমল করতে চেয়েছেন। তবে কোনো কোনো ‘আমল উম্মাহর বৃহৎ অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন সারা বিশ্বে একই দিন রোযা রাখা ও ঈদ পালন। এ ধরনের উম্মাহ সংশ্লিষ্ট বিধানে নতুন এমন ইজতিহাদ প্রয়োজন যাতে ‘আলিমগণের সাথে জ্যেতিবিজ্ঞানীসহ অন্যান্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশারদগণের সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এমন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খণ্ডিতভাবে অনুসরণ করার ফলে উম্মাহর বিভাজন হয়।

চার. সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা

পবিত্র কুরআন দ্বিপাক্ষিক সংলাপের নীতি হিসেবে ‘আল-জাদাল বিল আহসান (الجدل بالأحسن)-এর প্রস্তাবনা করেছে। আল-জাদাল শব্দটির অর্থ বিতর্ক। শব্দটি আল-জিদাল (الجدال) ও আল-মুজাদালাহ (المجادلة) রূপান্তরেও ব্যবহৃত হয়। আর আহসান (أحسن) শব্দটি সুন্দর ও উত্তম অর্থবোধক। আল-জাদাল বিল আহসান অর্থ সুন্দর পদ্ধতিতে বিতর্ক। আল্লাহ তা‘আলা বিতর্ককে মানব প্রকৃতির অংশ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, অর্থাৎ “আর মানবজাতি অধিকাংশ বিষয়ে বিতর্ককারী।”^{৪২} বিতর্ককারী দু’পক্ষ তাদের মতামত দ্বারা একে অপরকে বেধে ফেলতে চায়। তাই বলা হয়-جدلت الحبل অর্থাৎ ‘আমি তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করছি।’^{৪৩} আল্লাহ তা‘আলাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে মুশরিকদের সাথে সুন্দর পদ্ধতিতে বিতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তাদেরকে তা দিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ

“হে রাসুল! আপনি আপনার প্রভুর দিকে লোকদের আহবান করুন হিকমত ও সুন্দর অভিভাষণের মাধ্যমে, আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন অতীব সুন্দর পন্থায়।”^{৪৪}

ইসলামে যেখানে অন্য ধর্মলম্বলীদের সাথেও সুন্দর পদ্ধতিতে বিতর্ক করার আদেশ^{৪৫} এবং বিতর্কে হিংসা-বিদ্বেষ বা কলহমূলক সর্বপ্রকার অসৎগুণাবলীর প্রসারকে কাফিরদের আচরণ^{৪৬} বলা হয়েছে,

সেখানে মুসলিমদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন এবং অসংগুণাবলী ত্যাগ তুলনামূলকভাবে অত্যধিক প্রত্যাশিত ও অনুসরণীয়। অতএব বিতর্ককালীন একমাত্র সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই দলিল-প্রমাণাদি উপস্থাপন ও যুক্তিসমূহের পর্যালোচনা করা আবশ্যিক।

পাঁচ. সুন্দর আচরণ করা: পবিত্র কুরআন মুসলিমগণকে কথা বলার সময় ‘হসন’ তথা শৈল্পিকতা ও নিপুণতা বজায় রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেন, وَفُؤِلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا - অর্থাৎ “মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বল।”^{৪৭} সুতরাং মুমিন মুত্তাকি মুসলিমগণের আবশ্যিক দায়িত্ব হচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলার দ্বীনের বিষয়ে উত্তম আচরণ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَّبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ
الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

“যারা ভয় পায় তাঁদের বলা হবে, তোমাদের প্রভু কি নাযিল করেছেন; তাঁরা বলবে, মহাকল্যাণ; যারা সৎকাজ করেছে তারা পৃথিবীতে ভাল ফল পাবে এবং আখিরাতেও তাদের জন্য উৎকৃষ্ট কল্যাণ রয়েছে।”^{৪৮}

সুতরাং তুলনামূলক ফিক্হ আলোচনায় তর্ক-বিতর্কসমূহ উত্তম আচরণের সীমায় আবদ্ধ থাকবে। অবশ্যই পূর্ববর্তী ‘আলিমগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে তা প্রতিভাত হয়ে উঠবে। তুলনামূলক ফিক্হের আলোচনায় ‘আলিমগণের মতামতকে বিশুদ্ধ (আস-সহীহ), অধিক বিশুদ্ধ (আল-আসাহ), কাছাকাছি (আল-করীব), অধিক নিকটবর্তী (আল-আকরাব), উত্তম (আল-আওলা), ভালো (আল-খাইর), অতি উত্তম (আল-আহসান) ইত্যাদি পরিভাষায় প্রকাশ করা উচিত। ফলে উক্তরূপ তারতম্য একদিকে সাধারণ মুসলিমগণকে সঠিক ‘আমলের প্রতি অনুরাগী ও অন্যদিকে মায়হাবী মতামতসমূহকে পরস্পর নিকটবর্তী করার প্রয়াস হবে।

ছয়. আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের শ্রেষ্ঠত্ব: বিতর্কপূর্ণ মাসাআলার আলোচনায় সমকালীন ইমামগণের নিকট উক্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের কোনো দলিল অপ্রকাশিত থাকলে কিংবা কোনো দিক আলোচনায় না এসে থাকলে সেসব দলিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যিক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের অন্তর্গত ‘উলুল আমর’ তথা আদেশ দাতাগণের। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর সমাধান।”^{৪৯}

উক্ত আয়াতে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, উলুল আমর বা আদেশ দাতাগণ আনুগত্যের তখনি উপযুক্ত হবেন যখন তাঁরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের অর্ন্তভূক্ত থাকবেন। আর যখনি কোনো বিষয় পারস্পরিক মতবিরোধের পর্যায়ে চলে আসবে তখন তার সমাধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ

দুই সীমার মধ্যে অবস্থান করেই সমাধান করতে হবে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আইনগত সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীনচিত্তে এবং শান্তভাবে পরিগ্রহণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।^{৭০}

তবে বিতর্ককালীন কোনো বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলে নিজেদের প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে বিষয়টির জ্ঞান ও বিশুদ্ধতা আল্লাহর জন্য ছেড়ে রাখা। পূর্ববর্তী আলিমগণ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করার পর ‘আল্লাহ-ই সঠিক জানেন’ মন্তব্য উল্লেখ করতেন। মুসলিম মিলাতের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলেরই আনুগত্য করা আবশ্যিক।

সাত. ইসলামি শিষ্টাচারের অনুসরণ

ইসলাম শিষ্টাচারের ধর্ম। মুসলিম সমাজে যখন কোনো বিতর্ক উপস্থাপিত হয় তখন তার সমাধানে যে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয় তাতে ইসলামি শিষ্টাচারগুলোও উপস্থিত থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এসব শিষ্টাচারের মাঝে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছে:

ক. বিশুদ্ধ নিয়্যাতের সুরক্ষা

ইসলামি শিষ্টাচারের সর্বাধিক অগ্রাধিকারের বিষয় হচ্ছে- নিয়্যাত বা ইচ্ছার স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধতা। মানুষকে আল্লাহ তা‘আলার প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতেই অস্পষ্ট বিধানসমূহের ইজতিহাদগত মতপার্থক্যের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। কোনো মাযহাব বা বক্তব্য বা কোনো মতকে হয়ে প্রতিপন্ন করার মতো গর্হিত মনোবাসনা নিয়ে এ কাজ করা যায় না।

খ. পরামর্শ পদ্ধতি অনুসরণ

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা^{৭১} ও রাসুলুল্লাহর (সা.) বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ^{৭২}-এর পর্যায়ে শুরা বা পাম্পরিক আলোচনা একটি উত্তম পদ্ধতি। তুলনামূলক ফিক্‌হের মাস‘আলা উপস্থাপন প্রক্রিয়ায় ‘আলিমগণের মতামতসমূহ উপস্থাপন এতটা উন্মিত করা আবশ্যিক যাতে সার্বিক পর্যায়ে শুরা পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

গ. প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ

ইসলামে প্রবৃত্তির অনুসরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে প্রবৃত্তির অনুসরণ বশত নবিগণকে হত্যা^{৭৩} ও অন্যায় বিচারের নিন্দা^{৭৪} করা হয়েছে। পাশাপাশি সঠিক পথ ও মত থেকে বিচ্যুত হওয়ার সতর্কতা^{৭৫} সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। এটা এ উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে যেন প্রবৃত্তির অনুসরণ বশত যে আত্মসিদ্ধির সুযোগ ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় তা লোপ পায়। ফলে তুলনামূলক ফিক্‌হের আলোচনা উপস্থাপনকালীন পদ্ধতিতে সার্বিকভাবে কোথাও যেন প্রবৃত্তির অনুসরণ না হয় তা লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক।

ঘ. ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীলতা

ইসলামে সার্বিকভাবে যে কোনো প্রকার ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার সাথে শির্ক হয় এমন দেব-দেবীদেরও গালাগালি করতে নিষেধ করা হয়েছে।^{৭৬} ‘আকীদার ক্ষেত্রে যেখানে সহনশীলতা রয়েছে সেক্ষেত্রে ফিক্‌হী মতবিরোধপূর্ণ মাস‘আলা আরও গৌণ। পূর্ববর্তী ‘আলিমগণ পরস্পরের মতামতের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায়

শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল ছিলেন। সুতরাং তুলনামূলক ফিক্‌হের মাস'আলা উপস্থাপন পদ্ধতিতে সার্বিকভাবে ভিন্ন মতকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে উপস্থাপন জরুরি। 'আলিমগণ কোনো মাস'আলায় কোনো দুর্বল দলিলকে ব্যক্তিগত মতামতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্য কোনো 'আলিম দুর্বল দলিলের বিপরীতে ইজতিহাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের এ সকল মতামতের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করা কর্তব্য। ফিক্‌হী মতামতের ভিন্নতার কারণে কোনোভাবেই যেমনি আকীদার ভিন্নতায় রূপ দান উচিত নয়, তেমনি ফিক্‌হী মতামতের ভিন্নতার কারণে কুরআন ও হাদিসের কোনো দলিল অস্বীকারের অভিযোগ উঠানোও অবান্তর।

ঙ. হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ বিবাদ ও বিভক্তি এড়িয়ে চলা

ইসলাম হিংসা-বিদ্বেষ ও বিবাদ-বিভক্তিকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্য ও ধ্বংসের কারণ হিসেবে চিত্রিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اٰتُوْا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا يَبِغُوْنَ

“যাদেরকে আল্লাহর কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছিল।”^{৫৭}

পবিত্র কুরআনে মুশরিকগণের মত বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে মেনে নিয়ে নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের পথ রুদ্ধ করে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاطِيعُوْا اللّٰهَ وَرِسُوْلَهُ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِجَالُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

“তোমরা আল্লাহ ও রাসূলে আনুগত্য কর, নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদ কর না। অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীগণের সঙ্গে রয়েছেন।”^{৫৮}

সুতরাং ফিক্‌হুল মুকারানের আলোচনায় মাযহাবী মতবিরোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অপরিহার্য। কোনোভাবে মাযহাবী মতবিরোধকে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোর কারণ হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক নয়; বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বিরোধের কারণগুলো মিটিয়ে ফেলাই অধিক সমীচীন।

চ. ঐক্যের পথ অনুসরণ: ঐক্য ও সংহতি মুসলিম জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবি হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন। তাওহীদের পরে মুমিনদেরকে যে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে তা হলো ঐক্য। পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াতে^{৫৯} ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন-যাপনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ মুমিনদের পারস্পরিক ঐক্যবোধকে সূদূর প্রাচীরের মতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে লড়াইকারীদের সাথে তুলনা করেছেন।^{৬০} রাসুলুল্লাহ (সা.) একইরূপ উপমার ব্যবহার করে বলেন,

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ
بَعْضًا، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

“আবু মুসা থেকে বর্ণিত, নবি (সা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘মুমিনগণ অপর মুমিনের জন্য একটি প্রাচীরের মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে। এরপর তিনি এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলে প্রবিষ্ট করেন।”^{৬১}

তুলনামূলক ফিক্‌হ বিভিন্ন মাযহাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে যাকে ‘তাকরীব আল-মাযাহিব’ (تقريب المذاهب) বলা হয়। মুসলিম উম্মাহর ফিক্‌হী মতপার্থক্য দূরীকরণে এ শাস্ত্র যে ভূমিকা রাখে তা সামগ্রিকভাবে উম্মাহর আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতিতে যুগান্তকারী প্রভাব ফেলে।^{৬২} সুতরাং ফিক্‌হী মতপার্থক্য আলোচনার সময় মাযহাবসমূহের মাঝে নৈকট্য স্থাপনের প্রচেষ্টা কাম্য।

উপসংহার

ইসলাম মানবজাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশকে আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টির অনুপম নিয়ম ও অপরিমেয় ক্ষমতার নিদর্শন বলে আখ্যা দেয়। ফলে ভিন্ন মতের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করে, তেমনি যত্ন ও সতর্কতার সাথে উপযুক্ত প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করে সুনিপুণ ও উত্তম ভাষায় মতানৈক্য করার দিক-নির্দেশনা পেশ করেছে। ফিক্‌হের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা সে দিক থেকে একটি অপরিহার্য বাস্তবতা। তুলনামূলক ফিক্‌হ চর্চা এ বার্তা সরবরাহ করে যে, যে সকল মাস‘আলায় বেশি মতবিরোধ রয়েছে, সেগুলোর কোনোটিই মৌলিক মাস‘আলা নয়। তাছাড়া সেগুলোর অধিকাংশের দলিলও সম্ভবনামূলক। অকাট্য দলিলসম্পন্ন বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কোনো বড় ধরনের মতবিরোধ ঘটেনি। ফিক্‌হী মতপার্থক্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন বিভিন্ন মাযহাবের মতামতের দলিল সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করে এবং দ্বীন সম্পর্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটায়। ফলে তাকলীদের গণ্ডি থেকে বের হয়ে দলিলভিত্তিক অনুসরণের আলোতে উদ্ভাসিত হওয়া যায়। এতে দ্বীনের ব্যাপারে একে অপরের সাথে আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করা থেকে বিরত থাকে। ফলে মতবিরোধপূর্ণ মাস‘আলাতে কেউ কাউকে শত্রু জ্ঞান করার মানসিকতা হ্রাস পায় এবং সহনশীলতার মনোভাব তৈরি হয়। বিভিন্ন মাযহাবের মতামত ও তাদের দলিল-প্রমাণাদি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং ইমামগণের দলিল নেয়ার অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জানার পর ইমামগণের সম্পর্কে উঁচু ধারণা সৃষ্টি হয়। মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ এক-একটি মাস‘আলা বের করতে ইমামগণ যে কঠিন পরিশ্রম করেছেন সেটা তার পক্ষে কিছুটা আঁচ করা সম্ভব হয়। ইমামগণের বিভিন্ন মতামত জানার পর একজন ফতোয়াদানকারী সময় ও অবস্থাভেদে সঠিক মত গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। তাঁর নিজ সমাজ ও অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইমামগণের মতামতের মাঝে যা উপযোগী তা গ্রহণ করা সহজ হয়।

তুলনামূলক ফিক্‌হ চর্চার মাধ্যমে যে মাস‘আলাতে উত্তর প্রদান করা হয় সে মাস‘আলা সম্পর্কে মনে প্রশান্তি বিরাজ করে। ফলে শরীআতের বিধানের ক্ষেত্রে এ মাস‘আলা পরিপালনে মনের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ থাকে না। তুলনামূলক ফিক্‌হ বিভিন্ন মাযহাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর আভ্যন্তরীণ ঐক্য সংহত করে। সর্বোপরি যদিও মতপার্থক্যই তুলনামূলকের ফিক্‌হের মূল উপজীব্য তবুও পবিত্র কুরআন-হাদিস,

রাসুলুল্লাহর (সা.) শিক্ষা, সাহাবি ও তাবিঈগণের অনুসৃতিতে ভিন্নমত উপস্থাপনের নিয়ম ও পদ্ধতির অনুসরণ করলে উম্মাহর ঐক্য চেতনায় তা কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

তথ্যনির্দেশ

- ১ মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকুব ফিরোযাবাদী, *আল-কামুস আল-মুহীত* (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরবি, ২০০৩ খৃ.), পৃ. ১১৫১; ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ আল-জাওহারী, *আস-সিহাহ* (বৈরুত: দারু আল-ইলমি লি আল-মালদীন, ১৯৮৭ খৃ.), খ. ৬, পৃ. ২২৪৩; যাইনুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন আবদুল কাদির আর-রাযী, *মুখতারু আস-সিহাহ* (বৈরুত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ২৬৪
- ২ জামাল উদ্দীন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মানযুর আল-আফ্রিকী, *লিসানুল আরব* (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরবি, ১৯৯৯ খৃ.), খ. ১৩, পৃ. ৫২২
- ৩ আবু হামিদ মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-গাযালী, *ইহইয়াউ আল-উলুমি আদ-দ্বীন* (বৈরুত: দারু আল-কলম, ১৯৮৯ খৃ.), খ. ১, পৃ. ২৪
- ৪ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ* (বৈরুত: দারু ইব্ন কাসীর, ১৯৮৭ খৃ.), খ. ১, হাদিস নং ৭৯, পৃ. ৩১
- ৫ মুহাম্মদ আমীন ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আবদুল আযীয আদ-দামিশকী আল-হানাফী, *রাদ্দু আল-মুহতার 'আলা আদ-দুরর আল-মুখতার* (বৈরুত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১২ হি.), খ. ১, পৃ. ১১৮; শামছুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল-মাহাল্লী, *আল-বাদরু আত-তালিউ ফী হাল্লি জাম'ই আল-জাওয়ামিউ* (দামিশক: মুয়াসসাতু রিসালাহ, ২০০৫ খৃ.), খ. ১, পৃ. ৩২; আল্লামা কাযী আদদুদ্দিন আবদুর রহমান আল-ঈজী, *শারহু আল-মুখতাসার লি ইবনি হাজ্বি* (বৈরুত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ২০০৪ খৃ.), খ. ১, পৃ. ১৮; ড. ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী, *আল-ফিকহু আল-ইসলামী ওয়া আদিলাতুহু* (বৈরুত: দারু আল-ফিকর, ২০০৬ খৃ.), খ. ১, পৃ. ১৬; আহমদ ইবন ইয়াহইয়া আল-মুরতাজা, *আল-বাহরুয যাখখার আল-জামিউ লি মাযহাবিল আমসার* (মদীনা: মাকতাবাতু 'উলুম ওয়াল হিকাম, ২০০৩ খৃ.), খ. ২, পৃ. ১১৫; সা'আদুদ্দীন মাসউদ ইব্ন উমর আত-তাফতযানী, *শারহু আত-তালভীহ আলা আত-তাওযীহ* (মিসর: মাকতাবাতু সাবীহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১৮
- ৬ আহমদ মুখতার 'উমর, *মুজামু আল-লুগাহ আল-আরাবিয়াহ আল-মু'আছারাহ* (কায়রো: 'আলামুল কুতুব, ২০০৮ খৃ.), খ. ৩, পৃ. ১৮০৫
- ৭ ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফি উলুমি আল-কুরআন* (বৈরুত: মু'আসসাতু রিসালাহ, ১৪০৬ হি.), পৃ. ১৯
- ৮ আহমদ মুখতার 'উমর, *প্রাণ্ডক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৮০৫
- ৯ আল্লামা মুহাম্মদ তাকী আল-হাকিম, *আল-উসুলু আল-আম্মাহ লি আল-ফিকহি আল-মুকরান* (বৈরুত: দারু আল-আন্দালুস, ১৯৭৯ খৃ.), পৃ. ২
- ১০ আবু যায়িদ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ, *মুজামু আল-মুনাহী আল-লাফযিয়াহ* (রিয়াদ: দারু 'আসিমা, ১৪১৭ হি.), পৃ. ৪২০
- ১১ যাইনুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইব্ন আবদুল কাদির আর-রাযী, *মুখতারু আস-সিহাহ* (বৈরুত: দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ৭১৯
- ১২ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ৯৮৬
- ১৩ উমর সুলাইমান আল-আশকার ও অন্যান্য, *মাসাইল ফী আল-ফিকহি আল-মুকরান* (জর্দান: দারু আন-নাফায়িস, ১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ১১
- ১৪ ড. আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার, *বিভিন্ন ফিকহের তুলনামূলক পর্যালোচনা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩ খৃ.), পৃ. ১৭৭
- ১৫ ড. মুহাম্মদ ফাতহী আদ-দারিনী, *বহুসুন মুকারানাহ ফী আল-ফিকহ আল-ইসলামী ওয়া উসুলুহ*, (বৈরুত: মুআসসাতু আর-রিসালাহ, ১৪২৯ হি.), খ. ১, পৃ. ১৮; ড. আবদুল ফাতাহ আল-কাব্বারাহ, *আল-ফিকহুল মুকারান*, (বৈরুত: দারু আন-নাফায়িস, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ৮৭

- ১৬ আয়াতুল্লাহ শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম আল-জান্নাতী, *দুরুসুন ফীল ফিক্‌হি আল-মুকারান* (কুস্ম: মুজাম্মা' আশ-শহীদ আস-সাদার, ১৪১১ হি.), খ. ৯
- ১৭ আল্লামা মুহাম্মদ তাকী আল-হাকিম, *প্রাণ্ডক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪
- ১৮ মাহমুদ আবু লাইস, *বুহসুন ফী আল-ফিক্‌হি আল-মুকারান* (সংযুক্ত আরব আমিরাতে: বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ১৩
- ১৯ ড. আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৮০
- ২০ মহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া আন-নববী, *আল-মাজমু' শারহ আল-মুহাযযাব* (বৈরুত: দারু আল-ফিকর, ১৯৯৬ খৃ.), খ. ১, পৃ. ৫
- ২১ আল-কুরআন, ৪:৮২
- ২২ আল-কুরআন, ৩০:২২
- ২৩ আল-কুরআন, ৬: ১৪১
- ২৪ আবুল কাসিম রাগিব ইবন হুসাইন আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গারীব আল-কুরআন* (রিয়াদ: মাকতাবাতু নাযযার মুত্তফা আল-বায়, তা.বি.), খ. ৫, পৃ. ১৩৭
- ২৫ আবুল বাক্ব আল-হাসীনী আল-কাফাবী আল-হানাফী, *আল-কুলিয়াত* (বৈরুত: মুআস্সাতু রিসালাহ, ১৮৬৮ খৃ.), খ. ১, পৃ. ৭৯-৮০; মুহাম্মদ আউওয়ামা, *আদব আল-ইখতিলাফ ফী মাসায়িলি আল-ইলম ওয়া আদ-দ্বীন* (জিদ্দাহ: দারু আল-মানাহিয, ২০০৭ খৃ.), পৃ. ৮৯
- ২৬ আবু দাউদ, *আস-সুনান* (বৈরুত: মাকতাবা আল-আসরিয়া, তা.বি.), খ. ২, অধ্যায়: আল-মানাসিক, পরিচ্ছেদ: আস-সালাত বি-মিনা, হাদিস নং ১৯৬০, পৃ. ১৯৯
- ২৭ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবিনী, *আস-সুনান* (বৈরুত: দারুল-ফিকর, তা.বি.), খ. ১, অধ্যায়: আল-মুকাদ্দামা, পরিচ্ছেদ: ইত্তিবাউ সুন্নাতিল খুলাফায়ির রাশিদিন আল-মাহদিয়িন, হাদিস নং ৪৩, পৃ. ১৬
- ২৮ ইবন মাজাহ, *প্রাণ্ডক্ত*, খ. ২, অধ্যায়: আল-ফিতান, পরিচ্ছেদ: ইফতিরাবুল উমাম, হাদিস নং ৩৯৯৩, পৃ. ১৩২২
- ২৯ আল-কুরআন, ৬:১৫৩
- ৩০ আল-কুরআন, ৩:১০৩
- ৩১ আল-কুরআন, ৩:১০৫
- ৩২ আল-কুরআন, ২:২৫৬
- ৩৩ আল-কুরআন, ৫৯:৫
- ৩৪ ড. ত্বাহা জাবির আলওয়ানী, *ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ২৪
- ৩৫ মুহাম্মদ মুত্তফা শালাবি, *আল-মাদখাল ফী আত-তা'রীফ বিল-ফিক্‌হ আল-ইসলামী* (বৈরুত: দারু আন-নাহদাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৮ খৃ.), পৃ. ১০৭
- ৩৬ সুলাইমান ইবন আহমদ আত্-তব্রানী, *আল-মুজাম আল-আওয়াত* (কায়রো: দারু আল-হারামাইন, ১৪১৫ হি.), খ. ২, পরিচ্ছেদ: আল-আলিফ, মিন ইসমিহি আহমাদ, হাদিস নং ২১০৮, পৃ. ৩২৩
- ৩৭ ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, *মায়হাব: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* (মালয়শিয়া: সিয়ান পাবলিকেশন, ২০১৪ খৃ.), পৃ. ৭৬
- ৩৮ 'আলি ইবন 'আলি মুহাম্মদ ইবন ইবন আবি আল-ইয আদ-দামিশ্কী, *শারহ আল-'আকাঈদ আত্-তাহাবিয়্যাহ* (বৈরুত: মুআস্সাসাতু আর-রিসালাহ, ১৪১৭ হি.), পৃ. ৭৭৯-৭৮১
- ৩৯ ইবন আবদিল বার, *জামিউল বায়ানিল ইলমি ওয়া ফযায়িলি* (সৌদি: দারু ইবন আল-জাওযী ১৪১৪), খ. ২, পরিচ্ছেদ: জামি বায়ানি মা ইয়ালজিমু আন-নাজিরু ফি ইখতিলাফিল উলামা, হাদিস নং ১৬৮৯, পৃ. ৯০২

- ৪০ আল-কুর'আন, ৪:১১
- ৪১ আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম নিসাপুরী, *আল-মুস্তাদরাক আল আস-সাহিহাইন*, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪২৪ হি.), খ. ৪, অধ্যায়: আল-ফারাইদ, পরিচ্ছেদ: মিরাসুল ইখওয়া মিনাল আব ওয়াল উম, হাদিস নং ৭৯৬০, পৃ. ৩৭২
- ৪২ আল-কুরআন, ১৮:৫৪
- ৪৩ মান্না' আল-কাত্তান, *মাবহিস ফী 'উলূমি আল-কুরআন* (বৈরুত: মুআস্সাসাতু আর-রিসালাহ, ১৯৮৩ খ.), পৃ. ২৯৪
- ৪৪ আল-কুরআন, ১৬:১২৫
- ৪৫ আল-কুরআন, ২৯:৪৬
- ৪৬ আল-কুরআন, ১৮:৫৬
- ৪৭ আল-কুরআন, ২:৮৩
- ৪৮ আল-কুরআন, ১৬:৩০
- ৪৯ আল-কুরআন, ২৮:৭৭
- ৫০ আল-কুরআন, ৩:১৫৯; ৩৩:৩৬
- ৫১ আল-কুরআন, ৪:৬৫
- ৫২ আল-কুরআন, ৪২:৩৮
- ৫৩ আল-কুরআন, ২:৮৭
- ৫৪ আল-কুরআন, ৪:১৩৫
- ৫৫ আল-কুরআন, ৩৮:২৬
- ৫৬ আল-কুরআন, ৬:১০৮
- ৫৭ আল-কুরআন, ৩:১৯
- ৫৮ আল-কুরআন, ৮:৪৬
- ৫৯ আল-কুরআন, ৩:১০৩; ৩:১০৫
- ৬০ আল-কুরআন, ৬:১৪
- ৬১ বুখারী, *প্রাণ্ডক্ত*, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: তাশবিকিল আসাবি' ফিল মাসজিদ ওয়া গাইরিহি, হাদিস নং ৪৮১, পৃ. ১৪৪
- ৬২ মুহাম্মদ রহুল আমিন ও আবদুল্লাহ আল মাসুদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, *তুলনামূলক ফিকহ: ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের এক অনন্য পদ্ধতি* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩ খ.), বর্ষ: ৫৩, সংখ্যা: ২, পৃ. ৫৮-৫৯

মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদের কবিতা ও গানে ইসলামি ভাবধারা : একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ ওমর ফারুক*
ফাতেহা বেগম**

Abstract

Born in Bangladesh, a very gifted poet with a Unique Islamic personality is named Ghiyas uddin Ahmed. He was a poet, songwriter, composer, artist, writer, social worker and many other qualities. Poet Ghiyas uddin Ahmed wrote thousands of poems and songs about Allah, Rasul, Allah's creation, the mystery of human creation, the afterlife, the punishment of the grave, worship and self-criticism. Ghiyas uddin Ahmed was a believer in Sufi philosophy. In his view Sufism in Islam is based on romanticism about life, Soul and God, People and Allah are lovers of love. In his poems and Songs, he urged the common people to seek the pleasure of Allah by refraining from immoral activities, besides making a noble call for the complete observance of the Shariat and by presenting the subject of the punishment and consequences of the hereafter in an artistic way.

চাবিশব্দ: আধ্যাত্মিকতা, কবি, কবিতা, গান, সাধনা, ইসলাম

ভূমিকা

গিয়াস উদ্দিন আহমদ নিভৃত পল্লি গ্রামে জন্ম নেয়া বাংলাদেশের অসামান্য প্রতিভাধর এক অনন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে একজন কবি, গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, লেখক, সমাজসেবকসহ বহুগুণে গুণাবিত। প্রখ্যাত নাট্যকার ও সাহিত্যিক প্রয়াত হুমায়ূন আহমেদ তাঁর বিভিন্ন নাটকে কবি গিয়াস উদ্দিন রচিত “মরিলে কান্দিসনা আমার দায় রে যাদু ধন” শীর্ষক গানটি সংযোজন করেন। গানটি জাতীয়ভাবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেলেও গানের রচয়িতা তেমনভাবে খ্যাতি লাভ করেনি। অথচ তাঁর সমগ্র জীবনের মরমী সাধনা ও সৃষ্টিকর্ম বিশেষত ইসলামী দিকদর্শন নিয়ে তাঁর কবিতা ও গান জাতির মধ্যে এক নতুন সঞ্জীবনী শক্তি সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমান প্রজন্মের জন্য তা হতে পারে এক আলোকবর্তিকা। কবি গিয়াস উদ্দিন আল্লাহ, রাসুল, আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব, মানব সৃষ্টি রহস্য, আল্লাহর অপার মহিমার বর্ণনা, আখিরাতে, কবরের আযাব, ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মোহ-ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা, ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং আত্মসমালোচনামূলক প্রভৃতি বিষয়ের উপর সহস্রাধিক কবিতা ও গান রচনা করেছেন। তাঁর অনেক সাহিত্যকর্ম সঠিক সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অভাবে জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়নি। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, মরমী কবি গিয়াস উদ্দিনের আরো দু-সহস্রাধিক কবিতা ও গানের পাণ্ডুলিপি বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেগুলো প্রকাশিত হলে জ্ঞানের রাজ্যে এক নতুন

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

** লেখক ও গবেষক

সংযোজন হতে পারে। এ ধরনের একজন গুণী ব্যাক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁর কবিতা ও গানে ইসলামি ভাবধারা রূপায়ণই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

গিয়াস উদ্দিন আহমদ : জীবন পরিক্রমা

কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদের জন্ম ১৪ আগস্ট ১৯৩৫ খ্রি. সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার শিবনগর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তাঁর পিতার নাম ফতেহ উল্লাহ এবং মাতার নাম অমরতা বিবি।^১ গ্রামের মক্তবেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানা না গেলেও তিনি বাল্যকাল থেকেই মরমী কবি আছদ উল্লাহর কাছে মরমীবাদের উপর দীক্ষা নেয়া শুরু করেন। তাঁর সাথে তিনি বিভিন্ন গানের আসরে যেতেন এবং সংগীত বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করতেন। এছাড়া তিনি তাঁর ছেলেবেলা সম্পর্কে বিশেষ করে দু-জন সাধকের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন— সাধক পুরুষ আফজল শাহ (র) ও সাধক হেকিম আলী। সাধক আফজল শাহ আজ থেকে দুইশত বছর পূর্বে জন্ম নেন। আফজল শাহ উরফে আরমান আলী নীরবে নিভৃত কাটিয়ে গেছেন তার জীবনের একশত বিশ বছর। বাংলা, আরবি, উর্দু, ফার্সি ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কীর্তিমান এই সাধক। তিনি রচনা করে গেছেন অনেকগুলো গ্রন্থ। তিনি সিলেটি নাগরি লিপিতে রচনা করেছেন সাতটি মূল্যবান গ্রন্থ। এই নাগরি বর্ণে রচিত অবিস্মরণীয় গ্রন্থের নাম 'নুর পরিচয়'। শিল্পী গিয়াস উদ্দিনের বাড়ির ঠিক পশ্চিম পাড়ে এই সাধক পুরুষদের বাড়ি। তাদের সাহিত্যকর্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা কবি গিয়াস উদ্দিনকে এ গানের জগতে আসতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।^২ এতদ্ব্যতীত যে সব কবি সাহিত্যিক ও মরমী সাধকের সাহিত্যকর্ম, ভাব ও উদ্দীপনা তাঁর মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করতেন তাঁরা হলেন— হাছন রাজা (জন্ম ১৮৫৪ সালের ২১ ডিসেম্বর মৃত্যু ৭ ডিসেম্বর ১৯২২ সালে), রাধারমন (জন্ম ১৮৩৩ সালে মৃত্যু ১৯১৫ সালের ১০ই নভেম্বর), সৈয়দ শাহনুর (জন্ম ১৭৩০ মৃত্যু ১৮৫৬ সালে), পীর আছদ আলী, দীনহীন, কালা শাহ (জন্ম ১৮২০ সালে মৃত্যু ১৯৬৯ সালে), সূফী শিতালং শাহ (জন্ম মে ১৭০০সাল মৃত্যু ১৭৮৯ সালে), আরকুম শাহ (জন্ম ১৮৭৭ মৃত্যু ১৯৮১ সাল), আছিম শাহ(জন্ম ১২৫০ বঙ্গাব্দ আশ্বিন মাসে মৃত্যু ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ ২৬ আশ্বিন), শেখ ভানু (জন্ম ১৮৪৯সাল মৃত্যু ১৯১৯ সাল), মস্তান শাহ, কাছিম আলী পীর, ইব্রাহিম তসনা এবং দীন ভবানন্দ।^৩

সংগীত জীবন

কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ ১৯৩৫ সাল থেকে পাণ্ডুলিপি আকারে গান লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ বেতারের অনুমোদিত গীতিকারের মর্যাদা লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'ক' শ্রেণির গীতিকার হিসেবে তালিকাভুক্ত হন।^৪ ১৯৭৫ সালে ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস আয়োজিত জাতীয় লোক সংগীত উৎসবে, ১৯৮৫ সালে সার্ক সম্মেলনে, ১৯৮৭ সালের সিরডাপ সম্মেলনসহ বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'রজনীগন্ধা', 'বর্ণালী', 'একতারা' প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গিয়াস উদ্দিনের লেখা সারিগান, বিয়ের গান, শাহজালাল, শাহপরানের উপর রচিত গান পরিবেশিত হয়। যেসব শিল্পীগণ এসব গান পরিবেশন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন— রাশ বিহারী চক্রবর্তী, রামকানাই দাস, সুবীর নন্দী, রুনা লায়লা, আকরামুল ইসলাম, শুভ্রদেব, লতিফা হোসেন, হিমাংশু বিশ্বাস, হিমাংশু গোস্বামী, দুলাল ভৈমিক, সাবিনা ইয়াসমিন, শেফালী ঘোষ, শাকিলা জাফর, মলয় কুমার গাঙ্গুলী, বিপুল ভট্টাচার্য, সরদার আশরাফ উদ্দিন

বাবুল, সোহরাব হোসেন, জামাল উদ্দিন হাসান বান্না, শফিকুন নূর, প্রখ্যাত মরমী শিল্পী মরহুম আবদুল আলীমের সুযোগ্য সন্তান জহির আলীম, আসগর আলীম, আছিয়া আলীম ও আখতার নাহার আলীম, ইয়ারুল্লাহ প্রমুখ।^৫

কবিতা ও গানের প্রকৃতি

মরমী সংগীত শিল্পী গিয়াস উদ্দিন আহমদ বিভিন্ন প্রকৃতির গান ও কবিতা রচনায় ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। যেকোনো বিষয়ে তাৎক্ষণিক গান ও কবিতা রচনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর স্বভাবই ছিল তাৎক্ষণিক গান ও কবিতা রচনা করা। নিম্নোক্ত ঘটনায় কবি গিয়াসের উপস্থিত গান রচনার অসাধারণ প্রতিভার স্ফূরণ দেখতে পাওয়া যায়। সে ঘটনাটি কবির ভাষায়— “স্বাধীনতার পর পরই বিখ্যাত শিল্পী আবদুল আলীমকে ছাতক আনা হয় একক একটি গানের অনুষ্ঠানে। তাঁর গাওয়া ‘সর্বনাশা পদ্মানদী’ গানটি শুনেই কবি গিয়াস উদ্দিন মঞ্চে বসে তাৎক্ষণিকভাবেই রচনা করেন— ‘শুধাই তোরে সুরমা নদী/নাই কি তোর কিনারা...’। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বরজিত দে মিলন গানটি গান। গানটি শুনে আবদুল আলীম মুগ্ধ হন এবং গীতিকার গিয়াস উদ্দিনকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।^৬ গীতিকার গিয়াস উদ্দিন আহমদ যেসব বিষয়ে গান ও কবিতা লিখেছেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো— হামদ, নাত, পীর-মুর্শিদী, মর্সিয়া, মারফতী, মরমী, জারি, সারি, বিয়ের গান, ধামাইল, নৌকা-বাইচ, আধুনিক, দেশাত্মবোধক, ছাঁদপেটানো গান, পল্লীগীতি, কীর্তন, আঞ্চলিক, পীর-আওলিয়া প্রেমের গান, ছড়া গান, ভোটের ব্যঙ্গ গান ইত্যাদি।

অন্যান্য সাহিত্য কর্ম

গান রচনা ছাড়াও কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ নাটক, কেচ্ছা-কাহিনি ও গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ‘সানাউল্লাহর বউ’ নামক তাঁর একটি নাটক সিলেট বেতারে প্রচারিত হয়।^৭ কবি গিয়াস উদ্দিন রচিত “বিনন্দেও কিচ্ছা” দিয়ে সিলেট বেতারের কিচ্ছা-কাহিনি ভিত্তিক অনুষ্ঠান ‘শাপলা শালুক’ শুরু হয় যা এখনো শ্রোতাদের কাছে একটি জনপ্রিয় এবং নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন উন্নতমানের একটি অনুষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। উক্ত অনুষ্ঠানে কবির রচিত প্রায় পঞ্চাশোর্ধ কিচ্ছা প্রচারিত হয়।^৮ গান লেখার পাশাপাশি গীতিকার গিয়াস উদ্দিন আহমদ সাংবাদিকতা, সমাজসেবা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও খেলাধুলার সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে ‘যুগভেরী পত্রিকার’ মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন।^৯ সাংবাদিকতায় কবি গিয়াস উদ্দিনের অন্যতম অবদান হলো—ছাতক প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠা। তিনি পর পর তিনবার প্রেস ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।^{১০} এছাড়া তিনি ধূমপান বিরোধী সংগঠন ‘আধুনিক’ এবং ছাতক ‘খেলাঘর’-এর অন্যতম সংগঠক ছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতিক অঙ্গনেও তাঁর সরব উপস্থিতি ছিল। তিনি ‘গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি ডিগ্রী কলেজ’, ‘গোবিন্দগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়’ ও ‘শিবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়’র প্রতিষ্ঠার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।^{১১} গীতিকার কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচটি: ১. গিয়াস গীতিসম্ভার-১, ২. মরিলে কান্দিস না আমার দায় (১৯৯৬), ৩. ভোটের বয়ান (২০০১), ৪. গিয়াস গীতিসম্ভার-২ এবং ৫. শেষ বিয়ার সানাই (২০০৫)।

পুরস্কার ও সন্মাননা

শিল্পী গিয়াস উদ্দিন আহমদ সংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৪ সালে সিলেট বেতারের এবং ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘ক’ শ্রেণির গীতিকারের মর্যাদা লাভ করেন।^{১২} গুণী এই শিল্পিকে বিভিন্ন সংগঠন বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে। ১৯৮৯ সালে ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষ থেকে সম্মাননা, ২০০৫ সালে নীলম সংগীতালয় ও শাপলা শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।^{১৩} এছাড়াও কবি গিয়াস উদ্দিন তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য পুরস্কারস্বরূপ মহাকবি সৈয়দ সুলতান সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদের ‘মরমী সাহিত্য পুরস্কার ২০০১’ লাভ করেন।^{১৪}

মৃত্যু

মরমী কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার গিয়াস উদ্দিন আহমদ ২০০৫ সালে ১৬ এপ্রিল, ৩ বৈশাখ ১৪১১ বঙ্গাব্দ শনিবার ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। শিবনগর জামে মসজিদ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।^{১৫}

কবির দর্শন

দীর্ঘ দেহের অধিকারী, সদালাপী, নম্র, ভদ্র, বিনয়ী এবং অত্যন্ত সহজ সরল স্বভাবের মানুষ কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ ছিলেন সূফি দর্শনে বিশ্বাসী। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলামে সূফিবাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা সম্পর্কে প্রেমবাদ। এ প্রেমবাদে আশেক-মাশুক হচ্ছেন মানুষ ও আল্লাহপাক। অর্থাৎ রব ও আবদ। তাঁর লেখা অসংখ্য গানে উক্ত সূফি তত্ত্বের শাস্ত্র রূপ ফুটে উঠেছে। নিচের কবিতাংশ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

“দমের জিকির পড় নিরালা, মন পাগেলা
দমের জিকির পড় নিরালা।

...

দমের জিকির কর সার, গিয়াসে কয় মনরে আমার
গব ছাড়িয়া হইয়া ফানাফিল্লা, মন পাগেলা ...।^{১৬}

জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অন্তর্মুখী। বিরাট কেউকেটা হবার শখ তার কোনো দিনই ছিল না। তিনি ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকতে পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে “দুঃখের তপস্যাইতো জীবন। অন্তত মানুষের জন্য দুঃখের প্রয়োজন আছে। একজন কবির জন্য আরো বেশি প্রয়োজন। তাঁর বিশ্বাস, দুঃখ ছাড়া কেউ লিখতে পারে না। দুঃখ ছাড়া জীবনকে তিনি জীবন বলে মনে করেন না। দুঃখ তাঁর কাছে পরশ পাথরের মতো। মানুষের জীবনে দুঃখ ভালোবাসার মতোই গভীর।^{১৭} মৃত্যু চিন্তা সবসময়ই কবিকে আচ্ছন্ন করে রাখত। তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতায় মৃত্যু চিন্তার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন: ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায় রে যাদু ধন’, ‘শেষ বিয়ার সানাই বাজিল, ডাকছে কাল সমনে’, ‘আমার বাসর হবে গো সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে প্রাণ বন্ধুর সনে’ প্রভৃতিতে তাঁর মৃত্যুর কথাই প্রতীয়মান হয়।^{১৮}

কবি গিয়াস উদ্দিনের মতে, “মানুষের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক তা যেমন প্রেমের, তেমনি বিচ্ছেদেরও। মানুষের এ সম্পর্ক আধ্যাত্মিকও।^{১৯} মানুষ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, “মানুষ যুদ্ধবাজ, মানুষ খুনি, মানুষ শোষক- তবু মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস অটল। আমি বিশ্বাস করি,

১২৬ মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদের কবিতা ও গানে ইসলামি ভাবধারা : একটি পর্যালোচনা

এইসব হত্যাযজ্ঞ পেরিয়ে মানুষ একদিন ভালোবাসা শিখে নেবে, মানুষ মানুষের হাতে হাত রাখবে।^{২০}

গিয়াস উদ্দিনের কবিতা ও গানে ইসলামি ভাবধারা

মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ অত্যন্ত ধর্মভীরু ও সুফি দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। ইসলামী সুফি দর্শনের মূল সূত্রেই তিনি তাঁর জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মানুষের জীবন মৃত্যু, পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্যে, সৃষ্টি রহস্য, ইহকাল-পরকাল, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা, পরিবার-পরিজন সবকিছুই গানে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। মৃত্যু চিন্তায় তিনি সব সময় বিভোর থাকলেও কোনো দিন বৈরাগ্যভাব গ্রহণ করেননি। সংসারের যাবতীয় কাজে আবদ্ধ থাকলেও পার্থিব ভোগ-বিলাস তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি কোনোদিন। সদা সহজ-সরল জীবন যাপনকারী এই স্বার্থক মরমী কবি অন্তরের পবিত্রতাকে সব কিছুর উপরে স্থান দিতেন। তাঁর রচিত অসংখ্য কবিতা ও গানে তিনি ইসলামী ভাবধারাকে সমুজ্জ্বল রাখার চেষ্টা করেছেন।

কাব্য জীবনের শুরুতে কবি গিয়াস উদ্দিন হযরত শাহজালাল, শাহ পরান ও ওলি-আওলিয়াদের নিয়ে গান রচনা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ওলি-আওলিয়াগণই নবী-রাসুলগণের স্বার্থক উত্তরসূরি। তাঁর সুরে ভেসে উঠেছে:

আওরে সবাই মিলিয়া
গীর আউলিয়ার গুণ গাই, প্রেমে নাচিয়া।^{২১}

আধ্যাত্মিক সাধক কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদের কবিতা ও গানে আল্লাহর নাম, নিয়ামত, আল্লাহর অস্তিত্ব, ইবাদত-বন্দেগি, পরকাল, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া এবং রাসুল (স.)-এর নাত ও প্রশংসা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

১. আল্লাহর নামে প্রশংসা

আধ্যাত্মিক সাধক কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদ আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,

আল্লাহ, লিল্লাহ, লাহ, হু
জপরে মন আল্লাহ।
এ নামটি করিলে সাধন
পরিষ্কার হবে রুহ।
জপরে আল্লাহ।^{২২}

অন্যত্র বলেন:

আল্লাহর আলিফ ছেড়ে দিলে,
লিল্লাহকেও আল্লাহ বলে,
জপরে মন দীলে দীলে,
আল্লাহ, ইয়া লিল্লাহ।^{২৩}

...

আল্লাহর নাম জপ করা সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾

“আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন এবং একত্রিচিন্তে তাতেই মগ্ন হন। তিনি পূর্ব-পশ্চিম উভয় প্রান্তের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকে আপনার কার্য নির্বাহক হিসেবে গ্রহণ করুন।”^{২৪}

মহান আল্লাহর বিভিন্ন সত্তা ফুটে উঠেছে তাঁর নিম্নলিখিত গানে—

তুমি আল্লাহ রহিম রহমান, তোমার মত নাই দয়াবান
তুমি যে হও গফুর ও গাফফার।
তোমার এই সব নামের গুণে, পুইড়োনা আমায় আগুনে,
গিয়াসে চায় পবিত্র দীদার। আল্লাহ পরোয়ার।^{২৫}

২. আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে

মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা এবং তাঁর সৃষ্টি রহস্য সম্যক উপলব্ধিসহ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করার চেষ্টা কবি গিয়াস উদ্দিনের গানে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর ভাষায় :

কি খেলা খেলিছ আপন মনে গো এলাহী,
কি খেলা খেলেছি আপন মনে।
কেউ বুঝি না তোমার লীলা, পাতিয়াছ এমন খেলা,
চলাইতেছ থাকিয়া গোপনে গো এলাহী।
কি খেলা ...।
পৃথিবী করিয়া সৃজন, সৃষ্টিতে রয়েছে গোপন,
কেউ তোমারে দেখিনা নয়নে।
সর্বজীবে আহর জোগাও, কেউরে হাসাও কেউরে কান্দাও,
কেউ বাঁচিনা তোমার দয়া বিনে গো এলাহী
কি খেলা ...।^{২৬}

অন্যত্র বলেছেন :

মালিক তুমি রাজাধীরাজ
জ্ঞান গরীমায় গুরু গুরু।
সবার জ্ঞানের শেষ যেখানে,
সেখান থেকেই, তোমার গুরু।
প্রশংসা কি করব আমি,
তুমি কি-তা জান তুমি,
তোমার সৃজন বিশ্বভূমি,
জ্বিন ফেরেশতা মানব গুরু।^{২৭}

৩. আল্লাহর নিয়ামত

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মানুষের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের কথা বিনীত চিন্তে প্রকাশ পেয়েছে মরমী কবি গিয়াস উদ্দিনের অনেক কবিতা ও গানে। তিনি বলেন :

“দয়ালরে : জন্ম দিতে পারতে মোরে, জঙ্গলের প্রাণী
মানব কোলে জন্ম দিলে, হাজার মেহেরবানী,

১২৮ মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদের কবিতা ও গানে ইসলামি ভাবধারা : একটি পর্যালোচনা

জন্মের পরে দিলে দুঃখ, মা জননীর শুনে।
চুষিয়া চুষিয়া খাইলাম, তোমার দেওয়া জ্বানে।
দয়ালরে : জন্ম দিতে যদি আমায়, জন্মাদ্ধ করিয়া,
সুন্দর ভূবন দেখিতাম না, দু নয়ন ভরিয়া,
বোবা করে জন্ম দিলে, এই সুন্দর জাহানে।
মনের কথা মনে রইত, ফুটত না জ্বানে।
দয়ালরে : হাবিবের উম্মতে জন্ম দিয়াছ আমায়,
এত নিয়ামত পাইয়াও আল্লাহ, চিনলাম না তোমায়;
সব কিছু দিয়াছ তুমি, জানি তনে মনে,
গিয়াসেরে তরাইও আল্লাহ, হাশরের ময়দানে।^{২৮}

৪. আল্লাহর অস্তিত্ব

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র জড় ও জীব জগতের সর্বত্রই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রভাব ও অস্তিত্ব বিদ্যমান। তিনি যে মানুষের অন্তরেই বিরাজমান এবং তিনি যে অন্তর্যামী তা কবি গিয়াসের কবিতা ও গানে সরাসরি প্রতিফলিত হয়েছে।

আমার মাঝে আছ তুমি পাক হাদীছে শুনি তাই
তবে কেন খুঁজলে পরে তোমারে না পাই।
আছ তুমি প্রাণে প্রাণে, পাওয়া যায় প্রমাণে
বিরাজিত সর্বস্থানে, কোন জায়গা বাকী নাই।
সর্বজীবে দেখ তুমি, তুমি অন্তর্যামী
তোমায় দেখতে চাইলে আমি, শুধু কেন্দ্রে বুক ভাসাই”।^{২৯}

৫. নবীজির নাত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রশংসায় কবি গিয়াস উদ্দিন অনেকগুলো নাতে রাসুল (সা.) রচনা করেছেন যা ইসলামি ভাবধারায় সমুজ্জ্বল। তাঁর লিখনীতে ফুটে উঠেছে :

“নবীজির উপরে ভেজি, দুঃখ ও সালাম।
(যার) সাফায়াতে তরে যাবে, গুনাহগার তামাম।
নবীজির উপরে ...।
পাপী উম্মৎ তরাইতে, এলেন যিনি দুনিয়াতে,
নিয়ে এলেন মে'রাজ হতে, নিজ ধর্ম ইসলাম।
নবীজির উপরে ...।^{৩০}

অন্যত্র বলেন :

নবীজির প্রশংসা করা
অধমের কি সাধ্য আছে।
এর প্রশংসা আল্লাহ তালা
কালামুল্লায় করিয়াছে।^{৩১}

৬. ইবাদত সংক্রান্ত

কবি গিয়াস উদ্দিনের গানে ও কবিতায় ইসলামের মৌলিক ইবাদত তথা- ইমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে যা থেকে কবির ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ইমানি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কণ্ঠে শুনা যায় :

“রোজা রাখ নামাজ পড়, ওরে মোমিন মুসলমান,
তিন ফরজ গরীবের জন্য, নামাজ, রোজা আর ঈমান।
ঈমান রাখিয়া ধড়, রোজা রাখ নামাজ পড়,
পরিনন্দা গুমান ছাড়, যা বাপে কর এহসান।
বড়দেরে সম্মান কর, ছোটকে মহব্বত কর,
রোগীকে সেবা কর, এই তো বেহেস্তি নিশান।”^{৩২}

এছাড়াও তাঁর অসংখ্য কবিতা ও গানে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত তথা ধর্মীয় বিধানাবলি যথাযথ পালন করার তাগিদ দৃঢ়ভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে।

৭. ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ও ক্ষণস্থায়ী জীবন ও যৌবন

বাউল কবি গিয়াস উদ্দিনের গানে ও কবিতায় আমরা দেখতে পাই, দুনিয়াদারীর অসারতা এবং আখিরাতের জিন্দেগির স্থায়িত্ব। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন :

ভেঙ্গে যাবে একদিন তোর এই মায়ার মেলা।
কার দিকে তুই চাইয়া রইলে, ওরে আমার মন পাগেলা।
এত স্নেহের স্ত্রী পুত্র ধন, সঙ্কটে তোর কেউ নয় আপন
চেয়ে থাকবে পরের মতন যমে যেদিন ধরবে গলা।^{৩৩}

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃত বসবাসের স্থান হলো আখিরাত; বরং তোমারা তো এই দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতের জীবন এর চেয়ে কতই না উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী।”^{৩৪}

মানুষের জীবন যে কেবল শিশিরের মতই ক্ষণস্থায়ী এবং যৌবন, ধন-সম্পদ এগুলো কোনো কিছুই পরকালে কাজে আসে না এসব যে কেবলই মোহ আল-কুরআনের এই মর্মবাণী তাঁর নিমোক্ত কবিতায় বিধৃত হয়েছে-

নিশির শিশির যেমন মানুষের যৌবন, পাগল মন।
সবুজ রঙ্গের দুর্বায়, কি সুন্দর দেখা যায়,
ঝরিয়া পড়ে যায়, আসিলে পবন।
পাগল মন ... ।।
ধন আর যৌবনের গৌরব মিছে কর ময়না,
উভয়ই চিরকাল কারো কাছে রয়না।
ক্ষণিকের জন্য এসে, কি সুন্দর ঝলসে,
পাগল মন... ।।^{৩৫}

১৩০ মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদের কবিতা ও গানে ইসলামি ভাবধারা : একটি পর্যালোচনা

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَوَّىٰ النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

“যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, তাঁর ঠিকানা হবে জাহান্নাম; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ারকে ভয় করে এবং স্বীয় নফসকে কু-কাজ থেকে বিরত রাখে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।”^{৩৬}

৮. পাপ-পুণ্যের হিসাব

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে। তিনি (আল্লাহ) মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব নয়: বরং মানুষের আনুগত্য চান, কারণ তিনি রহীম ও রহমান। তিনি চাইলে পাপীকেও ক্ষমা করতে পারেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“হে রাসুল! আপনি আমার সেসব বান্দাদেরকে বলুন, যারা নিজের উপর নিজেরাই অপরাধ করে সীমা অতিক্রম করেছে তারা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয় (যদি তারা কায়মনোবাক্যে, অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে) নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইচ্ছা করলে) সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন।”^{৩৭}

আল-কুরআনের এই অমোঘ বাণীর প্রতি আমল করে কবি গিয়াস উদ্দিন তাঁর পাপ-পুণ্যের জন্য নিরাশ না হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন যা তাঁর অসংখ্য গানে ফুটে উঠেছে এভাবে—

আমার মত পাপী তাপী, কেউ নাই আল্লাহ দুনিয়ায়,
বড় আশা আছে দীলে, রহিম রহমান নাম থাকায়।^{৩৮}

আবার বলেছেন:

আমার আল্লাহ খুশি, ডাকলে গুনাহগারে
ডাকো কাতরে ... ।।
আল্লাহ খুশি, ডাকলে গুনাহগারে।
এটাই তার প্রেমের খেলা, যার জন্য জগৎ সৃজিলা,
পাপী ছাড়া মাফ দিবেন আর কারে!
ডাকো কাতরে ... ।।
গুনাহগারের চোখের পানি, আল্লাহর কাছে খুব সম্মানী,
আরশে আল্লাহ কাঁপে বারে বারে।
দয়াল আল্লাহর সহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গে দেন ঘোষণা।
আর কাঁদিস না, দিলাম ক্ষমা করে।
ডাকো কাতরে ... ।^{৩৯}

৯. পরকালের প্রতি বিশ্বাস

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, إِنَّ آئِدْتُمْكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا “আমি তোমাদেরকে অনাগত দিনের আসন্ন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি।”^{৪০} পবিত্র কুরআনের এই বাণীর মর্মার্থই হলো পরকালের প্রতি

বিশ্বাস। গীতি কবি ঘিয়াস উদ্দিন তাঁর গীতি কবিতায় পরকালের বিশ্বাসকেই প্রতিস্থাপন করেছেন। তিনি পরপারের মাঝিকে আহ্বান করেছেন এভাবে—

“(আমায়) পার করে নাও, দয়াল নামের গুণে।
ওপারের কাভারী দয়াল, তাই ভরসা মনে।
পার করে নাও ...।।
কালো মেঘে সাজ করেছে, দেখে প্রাণে ভয় লেগেছে,
তুমি ছাড়া আরকে আছে, বাঁচাবে তুফানে।
পার করে নাও ...।^{৪১}

১০. কবরের আজাব

মৃত্যুর পর কবরের আযাব এবং সে আযাব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং রাসুলের উম্মতের বদৌলতে ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা কবি গিয়াস উদ্দিনের বহু কবিতা ও গানে ফুটে উঠেছে। কবির লেখনিতে সে প্রত্যাশা নিম্নরূপ :

প্রাণ কান্দে সেই ডরে আল্লাহ, মন কান্দে সেই ডরে
কেমনে থাকি মু আমি একলা কবরে রে।
প্রাণ কান্দে সেই ...।
দুনিয়ার সুখ-দুঃখে পাইতাম, ভাই বন্ধু সবারে
তুমি বিনে ভরসা নাই কবরের ভিতরে রে।
প্রাণ কান্দে সেই ...।
তোমার হাবিবের উম্মত, এই আশা অন্তরে
গিয়াসে মাফ কইরো তোমার, হাবিবের খাতিরে রে।
প্রাণ কান্দে সেই ...।^{৪২}

এছাড়াও আপন ও পর, আত্মসমালোচনা, মৃত্যুচিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহুমাত্রিক শত সহস্র গান ও কবিতা রচনা করেছেন যেগুলো প্রত্যেকটিই ইসলামি ভাবধারায় সমুজ্জ্বল।

কবি গিয়াস উদ্দিন সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীগণের মন্তব্য

প্রথিতযশা গীতি কবি গিয়াস উদ্দিনের গান সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে অনেক মনীষী অনেক মন্তব্য করেছেন, যা কবির কাব্য জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। তন্মধ্যে ১৯৭৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় লোক সংগীত উৎসবে গীতিকার গিয়াস উদ্দিন আহমদের পরিবেশিত সারি গান ও বিয়ের গীতিনক্সা শুনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পল্লিকবি জসীম উদ্দীন অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেন: “লোকগীতির যে ভঙ্গি, যে সুর ... তা এই নক্সার প্রতিফলিত হয়েছে জীবন্তভাবে।^{৪৩} বিশিষ্ট মরমী সাধক ও গবেষক মোস্তফা কামাল বলেন : “সিলেটের লোক সংগীত ও মরমী সাহিত্যের অব্যাহত ধারার সফল উত্তরাধিকার বহনকারীদের মধ্যে হাল আমলে গিয়াস উদ্দিন আহমদ স্বনামেই দেশ-বিদেশ সুপরিচিত। গিয়াস উদ্দিন আহমদ লোক কবি, স্বভাব কবি এবং মরমী মনের অধিকারী। তাঁর হৃদয় স্পর্শকারী গানে শোনা যায় সিলেটের মরমী মানসের সমর্পিত আত্মার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় আবহমান কালের সিলেটের হৃদয় উৎসারিত সুরময় ভুবনের আহাজারি যা ভাবুকজনের কানে ও প্রাণে ঢেলে দেয় সঞ্জিবনী সুধা।^{৪৪} প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদ বলেন : “আমার একটি প্রিয় গান আছে, গিয়াস উদ্দিন সাহেবের

১৩২ মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন আহমদের কবিতা ও গানে ইসলামি ভাবধারা : একটি পর্যালোচনা

লেখা, মরণ সংগীত, 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়'। প্রায়ই ভাবি আমি মারা গেছি, শবদেহ বিছানায় আছে, কেউ একজন গভীর আবেগে গাইছে, 'মরিলে কান্দিস না আমার দায় ...'।^{৪৫}

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, মরমী কবি গিয়াস উদ্দিন সুখ্যাতি ও সর্ব মহলে পরিচিতি না পেলেও তাঁর কবিতা ও গান তথা গোটা সৃষ্টিকর্ম ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভের দাবি রাখে। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনভর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে আল্লাহরই উপাসনা করেছেন। তিনি তাঁর কবিতা ও গানে শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের উদাত্ত আহ্বান জানানোর পাশাপাশি পরকালের শান্তি ও পরিণামের বিষয়টি শৈল্পিকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সর্ব সাধারণকে নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ড পরিহারের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। তাঁর জীবন পরিক্রমা ও সৃষ্টিকর্ম বর্তমান প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

- ১ রুহুল ফারুক, ছাতকের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১-২০০১) (সিলেট: সিটি অফসেট প্রেস, ১ম প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ২৭৬
- ২ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, গিয়াস উদ্দিন গীতিসম্ভার (সিলেট: গিয়াস গীতি প্রকাশনা পর্ষদ, ১৯৯৬) পৃ. ৩
- ৩ রুহুল ফারুক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭
- ৪ প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৭৬
- ৫ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, শেষ বিয়ার সানাই (সিলেট : সুরমা প্রিন্টার্স, ২০০৫), পৃ. ১২-১৩
- ৬ রুহুল ফারুক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০
- ৭ নাজমুল আলবাব সম্পাদিত, কর্ণে শুনাইও বন্দুর নাম (সিলেট : গিয়াস উদ্দিন আহমদ গীতি সংসদ, ২০০৭), পৃ. ৪
- ৮ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, লেখক পরিচিতি অংশ
- ৯ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, ভোটের বয়ান এবং ইত্যাদি (সিলেট : সুরমা প্রিন্টার্স, ২০০১), পৃ. ১১
- ১০ রুহুল ফারুক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪
- ১১ নাজমুল আলবাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
- ১২ পূর্বোক্ত
- ১৩ পূর্বোক্ত
- ১৪ পূর্বোক্ত
- ১৫ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২
- ১৬ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, মরিলে কান্দিস না আমার দায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
- ১৭ রুহুল ফারুক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮
- ১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১
- ১৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

- ২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১
- ২১ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, মরিলে কান্দিস না আমার দায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
- ২২ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, শেষ বিয়ার সানাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
- ২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-২৪
- ২৪ আল-কুরআন, ৭৩: ৮-৯
- ২৫ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, শেষ বিয়ার সানাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২
- ২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬
- ২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
- ২৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
- ২৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
- ৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
- ৩১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯
- ৩২ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, শেষ বিয়ার সানাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭
- ৩৩ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
- ৩৪ আল-কুরআন, ৮৭: ১৬-১৭
- ৩৫ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, মরিলে কান্দিস না আমার দায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
- ৩৬ আল-কুরআন, ৭৯ : ৩৭-৪১
- ৩৭ আল-কুরআন, ৩৯: ৫৩
- ৩৮ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, মরিলে কান্দিস না আমার দায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
- ৩৯ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, শেষ বিয়ার সানাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
- ৪০ আল-কুরআন, ৭৮ : ৪০
- ৪১ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, শেষ বিয়ার সানাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
- ৪২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০
- ৪৩ মোহাম্মদ মোমিনুল হক, সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত (লন্ডন : ব্রিকলেন সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ, ১৯৯৩), পৃ. ৩০
- ৪৪ পূর্বোক্ত
- ৪৫ রুহুল ফারুক, পূর্বোক্ত, লেখক পরিচিতি

ইসলামি দৃষ্টিকোণে ব্যবসায় ক্রেতা-বিক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য: একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ নুরুল আমিন*
মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসাইন রাসেল**

Abstract

Business is closely related to people's livelihood. The virtues of business and the qualities of an honest businessman are described in holy books al-Quran and al-Hadith. After all, Islam has defined the duties and responsibilities of both buyers and sellers in terms of business. The proposed study followed qualitative research methodology among the basic methods of research. Following this method, the duties and responsibilities of the buyer and seller have been reviewed in the light of the principles of al-Quran, al-Hadith and al-Fiqh. In this study, the responsibilities of both buyers and sellers were reviewed in the light of Islamic guidelines. A positive change will be achieved in the business sector in the consideration of buyers and sellers in the reflection of Islamic guidance among the majority Muslim population of Bangladesh.

চাবিশব্দ: ব্যবসায়, পণ্য, ক্রেতা, বিক্রেতা, ক্রেতার দায়িত্ব, বিক্রেতার দায়িত্ব

ভূমিকা

মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও আল-হাদিসে ব্যবসার মর্যাদা ও একজন সৎ ব্যবসায়ীর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বোপরি, ইসলাম ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। সুষ্ঠু ব্যবসা পরিচালনায় একজন বিক্রেতার যেমন করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় রয়েছে, তেমনি একজন ক্রেতারও করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় রয়েছে। এ গবেষণায় ইসলামি নির্দেশনার আলোকে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হলো। প্রবন্ধের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলামি নির্দেশনার প্রতিফলনে ক্রেতা ও বিক্রেতা বিবেচনায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে। এছাড়াও প্রবন্ধে নির্দেশিত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে নৈতিকতার চর্চা ও সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণা পদ্ধতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গবেষণা সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সম্পর্ক রয়েছে। এ গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো—

১. ইসলামি দৃষ্টিকোণে একজন ক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য তুলে ধরা।

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

** পিএইচডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

২. ইসলামি দৃষ্টিকোণে একজন বিক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য তুলে ধরা।

৩. ব্যবসায় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি করা।

৪. ক্রেতা-বিক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য বিবেচনায় করণীয় সুপারিশমালা প্রস্তুত করা।

উপরিউক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকে পরিচালিত এ গবেষণায় গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research) অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে কুরআন, হাদিস ও ফিকহের মূলনীতির আলোকে ক্রেতা ও বিক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণে ক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য

ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে ক্রেতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাই সুষ্ঠু ব্যবসায় পরিচালনায় ইসলাম ক্রেতার বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। তন্মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো হলো:

১. অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য হস্তান্তরের শর্ত: ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায় এই ধরনের লেনদেনকে বায় সালাম বলা হয়। মদিনায় এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু নবি করিম (সা.) এতে কতগুলো শর্ত আরোপ করেছেন যা পালন করার মাধ্যমে শরী'আতের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা পায়। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানকার লোকেরা এক, দুই এবং তিন বছরের জন্য খেজুর অগ্রিম বিক্রি করতেন। এ সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “যারা খেজুর অগ্রিম বিক্রি করবে, তাদের উচিত হবে আগে থেকেই পরিমাপ যন্ত্র, ওজন ও সময় নির্ধারিত করে নেওয়া।”^১ অর্থাৎ, অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য হস্তান্তরের নির্দিষ্ট সময়, পণ্যের গুণগতমান, পণ্যের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক চুক্তি করা ক্রেতার দায়িত্ব।

২. কারো দর দামের উপর দর-দাম না করা: ক্রেতার অন্যতম দায়িত্ব হলো কারো দর-দামের উপর দর-দাম না করা। অনেক সময় দেখা যায় একজন একটা পণ্যের দরদাম করছে পাশ থেকে অন্যজন এসে বেশি দামে পণ্যটি নিয়ে গেছে। এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ইসলামি শরী'আ এটাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। অথচ সমাজে প্রতিটি পাইকারী ব্যবসায় এ ধরনের দরদামের প্রচলন লক্ষ করা যায়। ক্রেতা বিক্রেতার কথা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত অন্য কেউ যেন তার উপর দামাদামি না করে। কেননা বিক্রেতা ক্রেতার সংখ্যা বেশি দেখলে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর দ্বারা সাধারণ মানুষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রাসুল (সা.) এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপরের দামের উপর দাম চড়িয়ে কোন বস্তু ক্রয় না করে।”^২

৩. দোষত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়ে পণ্য ক্রয় করে ফেরত না দেওয়া: কোন পণ্যের দোষত্রুটি ক্রেতার জানা থাকা সত্ত্বেও যখন তা ক্রয় করা হয় তখন উক্ত পণ্য গ্রহণ করা ক্রেতার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায় এবং কোন পূর্নবিবেচনার অবকাশ থাকে না। তবে যদি পণ্যের দোষত্রুটির কথা ক্রেতার অজানা থাকে এবং পরে তা জানতে পারে তাহলে তখনও চুক্তি শুদ্ধ ও বৈধ হবে, তবে বাধ্যতামূলক হবে না। সে ক্ষেত্রে ক্রেতার স্বাধীনতা থাকবে। ক্রেতা ইচ্ছা করলে পণ্য ফেরত দিয়ে তার মূল্য নিয়ে আসতে পারবে। ইসলামি পরিভাষায় এ জাতীয় লেন-দেনকে خِيَارُ الْعَيْبِ (খিয়ারুল আঈব)^৩ বলে। خِيَارُ الْعَيْبِ-এর সময়সীমা ক্রেতার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়টি

(مُصَرَّاة) মুসাররাত^৪ ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানের সাথে কিয়াস করা হয়েছে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুসাররাত সম্পর্কে জানার পর ক্রেতা ইচ্ছা করলে উক্ত বিক্রয় বহাল রাখতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে (مُصَرَّاة) মুছাররাত প্রাণি বিক্রেতার নিকট ফেরত ও দিতে পারবে।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ক্রেতার জন্য خِيَارُ غَيْبٍ (খিয়ারুল আঈব) তাৎক্ষণিকভাবেই কার্যকর হবে। পরবর্তীতে কোনো অবস্থাতেই বিক্রেতাকে পশু ফেরত দিতে পারবে না। এ সম্পর্কে রাসুল (সা.)-এর বাণী, “আবু হুরাইরাহ্ (রা.) নবি (সা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তোমরা উটনী ও বকরীর দুধ (স্তন্যে) আটকিয়ে রেখ না। যে ব্যক্তি এরূপ পশু ক্রয় করে, সে দুধ দোহনের পরে দুটি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভাল মনে করবে তাই করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে ক্রয় করা পশুটি রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরত দিবে এবং এর সাথে এক সা’ পরিমাণ খেজুর দিবে।”^৫

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.)-এর মতে, এ ধরনের ধোঁকা মূলক বিক্রিতে ক্রেতার জন্য তিন দিনের خِيَارُ (খিয়ার-ইচ্ছাধিকার) থাকবে। এর মধ্যে সে ইচ্ছা করলে প্রাণিটি রেখে দেবে আর অপছন্দ হলে ফিরিয়ে দেবে এবং দোহনকৃত দুধের বিনিময়ে এক সা’ খেজুর দিয়ে দিবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুছাররাত প্রাণি ক্রয় করবে তার ওপর তার তিন দিন পর্যন্ত খিয়ার বা ইচ্ছা থাকবে। সে ইচ্ছা করলে নিজের কাছে রেখে দিতে পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে ফেরতও দিতে পারবে। তবে ফেরত দেবার সময় এক সা’ পরিমাণ খেজুর প্রদান করতে হবে।”^৬

সুতরাং পণ্যের দোষ-ত্রুটি পূর্ব থেকে জানা না থাকলে ক্রয়ের পর দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ফেরত দেয়া যাবে।

৪. বিক্রেতার সাথে ধোঁকাবাজি না করা: যখন কোনো বিক্রেতা ক্রেতাকে ধোঁকার মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি করে ঠিকায় তখন সেটা তার জন্য হারাম। তেমনি পণ্যের মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে ঠিকায় সেটাও তার জন্য হারাম। ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে জাল টাকার মাধ্যমে পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করা অর্থ্যাৎ পণ্যের মূল্য বৈধ অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। জাল টাকার মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে না। ইসলাম সকল ক্ষেত্রে ধোঁকাবাজি হারাম করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, “ওহে ব্যবসায়ী! এ কি ব্যাপার?” ব্যবসায়ী বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।’ তিনি বললেন, “ভিজাগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে মানুষে দেখতে পেত? (জেনে রেখো!) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”^৭

৫. পণ্য বিনষ্ট হলে ক্রেতার করণীয়: বিক্রিত পণ্য যদি ক্রেতার কোন কাজ কর্মের কারণে পুরোপুরিভাবে অথবা আংশিকভাবে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় বাতিল হবে না; বরং বহাল থাকবে এবং ক্রেতা পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। আর যদি ক্রেতার নিকট হস্তগত হওয়ার পূর্বে পণ্যের কোনো ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, ফলের ক্ষতি যদি এক-তৃতীয়াংশের কম হয়। তবে মূল্য

কর্তন ওয়াজিব নয়। আর যদি এক-তৃতীয়াংশ বা তার বেশী ক্ষতি হয় তবে মূল্য কর্তন ওয়াজিব হবে এবং ক্ষতির দায়-দায়িত্ব বিক্রেতার দিকেই বর্তাবে। তবে ইমাম আবু হানীফাহ্, আল লায়স বিন সা'দ (রহ.) এবং অন্যান্যরা বলেন, ফল নষ্টের দায়ভার ক্রেতার দিকে বর্তাবে এবং এর জন্য মূল্য কর্তন আবশ্যিক নয়, তবে মুস্তাহাব হবে। আর শাফি'ঈ (রহ.)-এর প্রথম মতে এবং এক দল আলিমের মতে, এটা বিক্রেতার দায়িত্ব থাকবে এবং এর জন্য মূল্য কর্তন ওয়াজিব। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। নবি (সা.) কোনো গাছের বা বাগানের ফল কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মূল্য কর্তনের ব্যবস্থা রেখেছেন।”^৮ ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বলেন, ‘এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ক্ষতিপূরণের কথাটি নবি (সা.)-এর দিকে সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়।

৬. মজলিসে থাকা অবস্থায় ক্রেতা চুক্তি বহাল রাখা না রাখার অধিকার: ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন পণ্য, বিক্রির জন্য উভয়ে চুক্তি সম্পাদন করে তখন তারা উভয়ে যতক্ষণ ঐ মজলিসে আছে ততক্ষণ ঐ চুক্তি বহাল রাখা ও বাতিল করার অধিকার উভয়ের থাকবে। তবে চুক্তির মধ্যে যদি এই অধিকার উভয় পক্ষের সম্মতিতে বাতিল করা হয়ে থাকে তাহলে এই অধিকার থাকবে না। অনেক সময় দেখা যায় দু পক্ষের কোন এক পক্ষ তাড়াহুড়ার মধ্যে প্রস্তাব দিয়ে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে সে বুঝতে পারে যে চুক্তিটি কার্যকর না করাতেই তার মঙ্গল। এই জন্য শরী‘আ তাকে এই অধিকার দিয়েছে যাতে তাড়াহুড়ার কারণে তার যে ক্ষতি হচ্ছিল তা পূরণ হয়। ইসলামি পরিভাষায় এ ধরনের অধিকারকে خيار المجلس (খিয়ারুল মজলিস)^৯ বলে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “হাকিম বিন হাযম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাবে, ততক্ষণ তাদের (চুক্তি ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দুজনই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দুজনের এই ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা দুজনে মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ গোপন করে তাহলে তাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের বরকত দূর হয়ে যাবে।”^{১০}

৭. অর্ডার অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করা: ক্রেতার দায়িত্ব হলো অর্ডার অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করা। অর্থাৎ ক্রেতার আদেশ মোতাবেক তৈরিকৃত পণ্য ক্রয় করা। তবে ক্রেতা যেন অর্ডার অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করে এবং অর্ডারের বানানো পণ্য কম নেওয়া যাবে না। কেননা এর দ্বারা বিক্রেতার ক্ষতির সম্ভবনা থাকে। এটি চুক্তি ভঙ্গ করার শামীল। ইসলাম ক্রয়-বিক্রয়সহ সকল ক্ষেত্রে চুক্তি রক্ষায় গুরুত্বারোপ করে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, “হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।”^{১১}

হাদিসে কথা দিয়ে কথা না রাখা ও চুক্তি ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করীম (সা.) বলেন, “চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে, ২. কথা বললে মিথ্যা বলে, ৩. চুক্তি করলে ভঙ্গ করে এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশীল গালি দেয়।”^{১২}

৮. হালাল পণ্য ক্রয় করা: ক্রেতার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো হালাল পণ্য ক্রয় করা। কেননা মুমিনদের পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র ইত্যাদি হালাল হওয়া জরুরি। এ সম্পর্কে

হাদিসের বাণী, “আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, “যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে ওঠে তার জন্য জাহান্নামই উত্তম আবাস।”^{১৩} এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ঈমানদার ব্যক্তির জন্য হারাম ভক্ষণ করা এবং হারাম দ্বারা জীবন যাপন করা সমীচীন নয়।

৯. বিক্রেতার সাথে বিশুদ্ধ ও ন্যায্যনুগ ব্যবহার করা: ক্রেতার অন্যতম দায়িত্ব হলো বিক্রেতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরন থেকে অবশ্যই বিরত থাকা। বিক্রেতাকে জাল টাকা দেওয়া অথবা তাকে টাকা না দিয়ে পণ্যের মূল্য পরিশোধের দাবি করা। পণ্য চুরি করা অথবা পণ্যের মূল্য নিয়ে বিক্রেতার সাথে খারাপ ব্যবহার না করা। বিশুদ্ধ ও ন্যায্যনুগ ব্যবহার সম্পর্কে কুরআনের বাণী, “তুমি ক্ষমাপরায়ণতার নীতি গ্রহণ করো, সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান করো এবং অজ্ঞদের উপেক্ষা করো।”^{১৪}

বিক্রেতার আচরণে কষ্ট পেলেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে, গালি-গালাজ করা যাবে না। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, “যদি তোমরা ভালো কিছু প্রকাশ কর, কিংবা গোপন কর অথবা মন্দ ক্ষমা করে দাও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, ক্ষমতাবান।”^{১৫}

১০. মহিলা ক্রেতাদের বাজারে যাওয়ার ক্ষেত্রে পর্দা পরিপালন: ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা সাধারণভাবে বাজারে গমন করা থেকে বিরত থাকবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা বলেন, “আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলি যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।”^{১৬} যদি তাদের একান্তই প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে দেওয়ার কেউ না থাকে এবং তারা বাজারে যেতে বাধ্য হয় তাহলে তারা শরি’আর বিধান মান্য করে নিরাপদ সময়ে বাজারে গমন করবে।

১১. বাজারে মহিলাদের থেকে এড়িয়ে চলা: ক্রেতার অন্যতম দায়িত্ব-কর্তব্য হলো বাজারে আগত মহিলাদের দিকে তাকানো থেকে চোখকে সংযত রাখা। তাদের সাথে মিশে যাওয়া এবং তাদের ভিড়ের মধ্যে না গিয়ে তাদের এড়িয়ে চলা একজন পুরুষ ক্রেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তা’আলা বলেন, “মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।”^{১৭}

একইসাথে নারী ক্রেতার পুরুষদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে। ভিড়ের মাঝে যাবে না। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী, “ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে।”^{১৮}

১২. চোরাই দ্রব্য ক্রয় না করা: ক্রেতার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো আত্মসাৎ করা বা চুরি করে আনা কোন পণ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকা। যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয়েছে কিংবা মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া হয়েছে তা জেনে-শুনে ক্রয় করা হারাম। কেননা তা করা হলে অপহরণকারী, চোর ও ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করলো, সে তার অন্যায় কাজে ও গুনাহে শরীক হয়ে গেল।”^{১৯} চুরি করা পণ্যের ওপর যদি

দীর্ঘদিনও অতিবাহিত হয়, তাহলেও তার গুনাহ দূর হয়ে যায় না। কেননা ইসলামে সময়ের দীর্ঘতা হারামকে হালাল করে দেয় না। প্রকৃত মালিকের হক নাকচ করে না।^{২০}

ইসলামি দৃষ্টিকোণে বিক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য

ইসলাম সুষ্ঠু ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমণ্ডল নিশ্চিত করতে বিক্রেতার বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. পণ্য পরিমাপে ঠিক দেওয়া: ইসলাম ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য পরিমাপে ঠিক দেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। পণ্য পরিমানে কম অথবা বেশি দেওয়া যাবে না। পণ্যে পরিমানে কম দেওয়া খুবই নিন্দনীয় কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।”^{২১} মহান আল্লাহ আরো বলেন, “আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিও না এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।”^{২২}

২. পণ্যের দোষ গোপন না করা: পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন না করা বিক্রেতার অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব। কেননা ইসলাম ব্যবসায় পণ্যের দোষ গোপন রাখতে নিষেধ করেছেন। দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে পণ্য বিক্রি হলেও সে ব্যবসায়ে বরকত উঠে যায়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “হাকিম বিন হাযাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাবে, ততক্ষণ তাদের (চুক্তি ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দু'জনই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দু'জনের এই ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা দু'জনে মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ গোপন করে তাহলে তাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত দূর হয়ে যাবে।”^{২৩}

৩. মিথ্যা কসম না করা: ব্যবসায়-বাণিজ্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে ব্যবসায়ি এবং ক্রেতা উভয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই জন্য আল্লাহর রাসুল (সা.) ব্যবসায়ীদেরকে মিথ্যা বলা পরিহার করার নির্দেশ দেন। শপথ করে পণ্য বিক্রি করার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আবু যর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কোনো ধরনের কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তাদের একজন- যে তার ব্যবসায়িক পণ্যকে মিথ্যা কসম খেয়ে বিক্রি করে।”^{২৪}

৪. হারাম পণ্যের ব্যবসা বর্জন করা: যে সব পণ্য ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে অথাৎ যেসব পণ্য খাওয়া বা পান করা হারাম সেসব পণ্যের কারবার বর্জন করতে হবে। যথা-মদের ব্যবসা, দেহ ব্যবসা, ভাগ্য নির্ণয়ের ব্যবসা ইত্যাদি। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোনো জাতির উপর কোনো খাবার হারাম করেন, তখন তার মূল্যও হারাম করেন।”^{২৫}

৫. মজুদদারি ও কৃত্রিম সংকট তৈরি না করা : অধিক মুনাফা লাভের আশায় অনেক অসাধু ব্যবসায়ী পণ্য মজুদ করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। যার ফলে ব্যবসায়িগণ সাময়িক লাভবান হলেও সাধারণ জনগণের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং সমাজে দারিদ্র্যের পথ খুলে যায়। এ

সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “উমার উবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে (বা সমাজে) খাদ্যদ্রব্য মজুতদারি করে, আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ ও দরিদ্রতার কষাঘাতে শাস্তি দেন।”^{২৬}

৬. অনিশ্চিত কিছু বিক্রয় না করা: ব্যবসায় সবধরনের জটিলতা এড়িয়ে চলতে হবে। সবার স্বার্থ এবং সুবিধা-অসুবিধা দেখতে হবে। এমন কোন অবস্থার সম্মুখীন হওয়া যাবে না যাতে অনিশ্চয়তার আশংকা থাকে। অথাৎ সরল ও সহজ পথে ব্যবসা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে হাদিসের বাণী, “আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) গবাদি পশুর গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসবের পূর্বে, পশুর স্তনের দুধ পরিমাপ না করে, পলাতক গোলাম, গানীমাতের মাল বণ্টনের পূর্বে, দান-খয়রাত হস্তগত করার পূর্বে এবং ডুবুরীর বাজির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।”^{২৭}

ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, আওযায়ী (রহ.)-সহ একদল আলেমের মতে, ফলরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর গাছে থাকা অবস্থায় ফল কাচা হোক অথবা পাকা হোক এরূপ ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “জাবির ইব্ন আদিল্লাহ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ফলসমূহ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যে পর্যন্ত না লাল হয়, হলুদ হয়, খাওয়ার উপযুক্ত হয়।”^{২৮}

হাদিসের বর্ণনার আলোকে ফল পরিপক্ব হওয়ার সময়ে উপনীত হলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, যাকে ফিকহী পরিভাষায় بَدُوُ الصَّلَاح বলে।^{২৯} হাদিসে ফল বিপদমুক্ত হলেই বিক্রি বৈধ বলে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কাঁচা পাকা সকল অবস্থাতেই ফল উপাদেয় হলে বিক্রয় করা বৈধ।

৭. পণ্য হস্তগত হওয়ার আগে বিক্রি না করা: ব্যবসায় কোন পণ্য নিজে মালিকানা না পেয়ে অথবা নিজের আয়ত্বে আসার আগে বিক্রি করা ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছেন। কেননা পণ্য হস্তগত হওয়ার আগে পণ্য বিক্রি করলে তা বিক্রেতার নিকট কখনো হস্তান্তর করা যাবে না। পণ্য হস্তান্তর করতে না পারলে তা কখনো বিক্রি বলে ধরা যাবে না। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করলো সে যেন তা হস্তগত করার আগে বিক্রয় না করে। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি মনে করি, প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য।”^{৩০}

৮. সততা ও আমানতদারিতা থাকা: ব্যবসায়ীদের মধ্যে সততা ও আমানতদারী থাকতে হবে। সততা ও আমানতদারিতা দ্বারা ক্রেতা কখনো প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। সবাই বিশ্বাসের সঙ্গে ক্রয় করতে পারবে এবং তাদের ব্যবসা বরকতময় হবে। ব্যবসায়ীগণ তাদের সততার কারণে পরকালে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাতারে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আবু সাঈদ খুদরি (রা.) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবি, সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।”^{৩১}

৯. ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করা: বাজারজাতকরণের সাথে মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামি আইনে মূল্য নির্ধারণ বলতে পণ্যের এমন একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ বোঝায় যাতে

লভ্যাংশ থাকবে যেন পণ্যের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আবার উক্ত পণ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী গোষ্ঠীর যেন ক্রয় করতে কষ্টসাধ্য না হয়। বিক্রেতা তার উৎপাদন খরচের সাথে আনুমানিক খরচ যোগ করে লভ্যাংশসহ পণ্য বিক্রয় করে। বর্তমান সমাজে অনেক সময় বিক্রেতা অধিক মুনাফার আশায় নিজ খেয়াল-খুশিমতো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। বাজার ব্যবস্থা স্বাভাবিক গতিতে চললে পণ্যের মূল্যও স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেননি। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (সা.)-এর যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা এসে বললো : ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! আমাদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন নবি (সা.) বললেন, প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা। তিনিই মূল্যবৃদ্ধি করেন, তিনিই সম্ভা করেন। রিয়কদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এ অবস্থায় যে, তোমাদের কারো রক্ত বা ধন-সম্পদের ব্যাপারে কোনোরূপ অন্যায়া-অবিচারের দাবি আমার উপর থাকবে না।”^{৩২}

এ সম্পর্কে আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বলেন, “উপরোক্ত হাদিসের অর্থ এ নয় যে, সর্বাবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ। জুলুম করে যদি জনসাধারণের উপর এমন মূল্য চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে তারা সম্ভ্রষ্ট নয় তবে এ ধরনের মূল্য নির্ধারণ হবে হারাম। একইসাথে জনগণের মাঝে ন্যায্যবিচার কার্যকর করার জন্যে যদি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়, যেমন, প্রচলিত দামে বিক্রয় করতে বিক্রেতাকে বাধ্য করা অথবা প্রচলিত মূল্যের চেয়ে বেশি নেয়া থেকে বাধা দেয়া হয় তবে তা শুধু জায়েয-ই নয়; বরং ওয়াজিবও বটে।^{৩৩} সর্বোপরি, মুসলিম সরকার জনগণের সার্বিক কল্যাণ (মাসলাহা) বিবেচনায় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে।

১০. জোর করে পণ্য বিক্রি না করা: ব্যবসার অন্যতম শর্ত হলো ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্ভ্রষ্টি। অর্থাৎ ক্রেতার পণ্যটি নেয়ার আগ্রহ থাকবে। বিক্রেতারও তা বিক্রির আগ্রহ থাকতে হবে। বিক্রেতা যদি জোর করে ক্রেতার উপর কোনো জিনিস চাপিয়ে দেন অথবা ক্রেতা যদি জোর করে বিক্রেতার সম্ভ্রষ্টি ছাড়াই তার জিনিসটি নিয়ে নেয় তাহলে তা ব্যবসা হবে না। উভয়ের ধার্যকৃত মূল্যে সম্ভ্রষ্ট থাকলে তবেই তাদের ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, “হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়াভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।”^{৩৪}

১১. ব্যবসার সাথে সুদের সম্পৃক্ততা না করা: ব্যবসার সাথে সুদের সম্পৃক্ততা করে হালাল ব্যবসাকে হারামে পরিণত করা যাবে না। ব্যবসার ক্ষেত্রে সুদ দেওয়া নেওয়া বা ব্যবসার সাথে সুদের কোন সম্পর্ক রাখা যাবে না। সুদের কোন ঋণ নিয়েও ব্যবসা করা যাবে না। কেননা সুদের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনো লেনদেন অভিশপ্ত। এতে কোন ধরনের বরকত থাকে না। আল্লাহ সুদকে নিষিদ্ধ করে দেন ও সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। মোটকথা সুদের সাথে সব ধরনের লেনদেনই মহান আল্লাহ তা’আলার বরকত থেকে বঞ্চিত। সত্যিকার অর্থে সুদি লেনদেন বা সুদ সংযুক্ত ব্যবসায় বাহ্যিকভাবে লাভ দেখা গেলেও তা হয় অন্তঃসার শূন্য। মহান আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ সুদকে

মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোন অতি কুফরকারী পাপীকে ভালবাসেন না।”^{৩৫}

১২. পণ্যে ভেজাল না দেওয়া: বিক্রেতার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো পণ্যে ভেজাল না দেওয়া। ভেজাল একটি গর্হিত অপরাধ। ভেজাল বলতে পণ্য সামগ্রীতে বর্জ্য পদার্থ বা বিষ মেশানোকেই বোঝায় না বরং ব্যবসায়িক লেনদেন ক্রয়-বিক্রয়ে বস্তুর দোষত্রুটি গোপন করাও পণ্যের ভেজালের অন্তর্ভুক্ত। পণ্যের ওজনে কম দেওয়া, মিথ্যা তথ্য দেওয়া ভালোমানের পণ্যে নিম্নমানের পণ্য মিশ্রণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করাও খাদ্যে ভেজালের অন্তর্ভুক্ত। আর খাদ্যে সব ধরনের ভেজাল ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন, “আর তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে হককে গোপন করো না।”^{৩৬}

ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং অসুস্থ হয়ে কষ্ট পায়। আর মানুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, “আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোন অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।”^{৩৭} যারা খাদ্যে ভেজাল দিবে তারা অসাধু ব্যবসায়ী। তারা মহাপাপী। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

“ইসমাঈল ইবনু উবাইদ ইবনু রিফাআ (রা.) হতে পালাক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (রিফাআ) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ঈদের মাঠে রাওয়ানা হলেন। তিনি (রাসুলুল্লাহ সা.) লোকদের কেনা-বেচায় জড়িত দেখে বলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিল এবং নিজেদের ঘাড় ও চোখ উঠিয়ে তাঁর দিকে তাকালো। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসিক বা গুনাহগাররূপে উঠানো হবে, কিন্তু যেসব ব্যবসায়ী আল্লাহ তা’আলাকে ভয় করে, নির্ভুলভাবে কাজ করে এবং সততা ধারণ করে তারা এর ব্যতিক্রম।”^{৩৮}

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, প্রতারণা ও গুদামজাত করার কারণে সরকার ইচ্ছে করলে বিক্রেতাকে অন্যদেশে সাময়িক ও চিরস্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে পারে। যাতে সমাজে কেউ ভেজাল প্রতারণা, চুরি করার সাহস না পায়।^{৩৯}

১৩. ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ফেরত নেওয়া: বিক্রেতা তার বিক্রিত পণ্যের দোষ-ত্রুটি থাকলে তা অবশ্যই ক্রেতাকে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় তার কেনা-বেচা শুদ্ধ হবে না। ক্রেতা কোন পণ্য ক্রয় করার পর তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। পণ্যের দোষ থাকলে তা না বলে বিক্রি করা ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ বিক্রেতা পণ্যের যে গুণের বর্ণনা দিয়েছেন তার বিপরীত প্রমাণিত হলে এক্ষেত্রে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার অধিকার রাখে। ইসলামি পরিভাষায় এ বিষয়কে خِيَارُ الْعُيُوبِ (খিয়ারুল আঈব) বলে।

১৪. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে সাক্ষী রাখা : ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই সাক্ষী রাখতে হবে। অথবা লেখার মাধ্যমে কোন ডকুমেন্ট রাখতে হবে। বিশেষত, বাকীতে বা অগ্রীম কোনো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লিখিত প্রমাণ রাখা আবশ্যিক। আল্লাহ তা’আলা বলেন, “হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে।”^{৪০}

১৫. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা: বিক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতার সাথে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তা অবশ্যই তাকে পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।”^{৪১}

১৬. অপরিপক্ব ফল বা শস্য বিক্রয় না করা: গাছে থাকা ফল অথবা দানা জাতীয় শস্য অপরিপক্ব থাকা অবস্থায় বিক্রয় করা যাবে না। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসুল (সা.) খেজুর গাছের ফল না পাকা পর্যন্ত এবং দানা জাতীয় শস্যের ছড়া থেকে পরিপক্ব না হওয়া ও পোকা লাগা থেকে নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন।”^{৪২}

১৭. অনুমান করে বিক্রয় না করা : অনুমান করে ক্রয় বিক্রয় করলে ক্রেতা ও বিক্রেতার যেকোনো একজন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) অনুমান ভিত্তিক বা স্তূপ আকারে পণ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেন। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সা.) অজ্ঞাত পরিমাণ খেজুরের স্তূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।”^{৪৩}

১৮. ক্রেতার ক্ষতি না করা: ইসলামে ব্যবসায় বাণিজ্য করা হয় মানুষের উপকার করার জন্য। অর্থাৎ ব্যবসায় মানুষের উপকারের মানসিকতা থাকতে হবে। কারও ক্ষতি যেন না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, “আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারো ক্ষতির কারণও হওয়া যাবে না।”^{৪৪}

ব্যবসায় মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে শুধু অর্থ উপার্জন হচ্ছে তা নয় বরং পণ্যের আদান প্রদানে পরস্পরের সেবা হচ্ছে। এখানে বিক্রেতার প্রয়োজন টাকা এবং ক্রেতার প্রয়োজন পণ্য। এটা আদান প্রদান হচ্ছে ব্যবসার মাধ্যমে। এখানে কোনভাবেই ক্রেতার ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

সুপারিশমালা

ক্রেতা-বিক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামি নির্দেশনা পর্যালোচনা শেষে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করছি। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিবেচনায় ইসলামের আলোকে এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে, বাংলাদেশে ব্যবসায় নৈতিকতা সংরক্ষণ সম্ভব হবে।

১. পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় না নেয়া।
২. ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা।
৩. পণ্যের কোনো ত্রুটি থাকলে তা লুকিয়ে বিজ্ঞাপন না দেয়া।
৪. পণ্যে ভেজাল রোধে ইসলামি শাস্তি আইনের আলোকে কঠোর আইন প্রণয়ন।
৫. পণ্য উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় সুদের সংস্পর্শ না থাকা।
৬. পণ্যে ভেজাল রোধে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষকে সচেতন করা।

৭. মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে জুমআ'র খুতবায় ক্রেতা-বিক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা।
৮. রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকায় ব্যবসায় ক্রেতা-বিক্রেতার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত ইসলামি নির্দেশনার প্রচার ও প্রসার।

উপসংহার

জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জন প্রয়োজন। আর মহান আল্লাহ ইবাদতের পরপরই উপার্জন করতে আদেশ দিয়েছেন। মানুষ যে সকল মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তন্মধ্যে ব্যবসা অন্যতম। ব্যবসায় উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় এ তিনটি পরিভাষায় সম্পর্কিত। এ তিনটি উপাদানের একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার নাম ব্যবসা। ব্যবসা পরিচালনায় ইসলামের নির্দেশনার আলোকে ক্রেতা ও বিক্রেতা তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হলে ক্রেতা-বিক্রেতাসহ এর সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিক, মালিক সর্বোপরি, রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক উপকৃত হবে। আর এটিই ইসলামি অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। ব্যবসায়-বাণিজ্যে বেশি বেশি মুনাফা অর্জনই কোনো মুসলিম ব্যবসায়ীর একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে নিজের পণ্যের মিথ্যা প্রশংসা করতে, ধোঁকা দিয়ে বিক্রি বা ক্রয় করতে, মাপে কম দিতে এবং পণ্যে ভেজাল মেশাতে। সর্বোপরি ইসলাম নৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতার করণীয় নীতিমালা অনুসরণ করে মুনাফা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

- ১ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّغْرِ السَّنَيْنِ [আবু দাউদ সূলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানি, আস সুনান (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ২৬৭, বাব: বাবু ফি কাসবিল ইমায়ি, হাদিস নং : ৩৪২৭]
- ২ عَنْ ابْنِ عُمرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَغْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغْضِي [আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আন নিসাপুরী, আস সহিহ (বৈরুত : দারু ইহইয়া আত তুরাছ আল আরাবী, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ১১৫৪, বাব : বাবু তাহরিমি বাইয়ির রাজুলি আলা বাইঈ আখিহি....., হাদিস নং : ১৪১২/৭]
- ৩ ক্রেতা যদি ক্রয়কৃত মালের মধ্যে এমন ক্রটি দেখতে পায় যার কারণে এর নির্ধারিত মূল্য হ্রাস পেয়ে যায়, এমতাবস্থায় ক্রেতা চুক্তি বহাল রাখতে পারে এবং বাতিলও করতে পারে। এই ইখতিয়ারকে ফিক্‌হের পরিভাষায় خِيَارُ الْعَيْبِ (খিয়ারুল আঈব) বলে।
- ৪ মুসাররাত (مُصَرَّاة) ঐ ছাগী, গাভী বা উটনকে বলা হয়, যাকে বিক্রি করার জন্য মালিক দু-চারদিন পূর্ব হতে তার দুধ দোহন বন্ধ করে দেয়। যাতে স্তনে দুধ জমা হয়ে ভারি যা স্ফীত দেখায় এবং যাতে

৫ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُصَرُّوا إِلَّا لِلَّهِ وَالْعَنَمَ فَمَنْ اِئْتَابَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ يَخْزِي السُّطْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ
[আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাদিল বুখারি, আস সহিহ (মিশর :
দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), খ. ৩, পৃ. ৭০, বাব: বাবুন নাহঈ লিলবাইঈ আন লা
ইউহাল্লিফুল ইবিলা ওল বাকারা....., হাদিস নং : ২১৪৮]

৬ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اِئْتَابَ شَاةَ مُصَرَّاةٍ فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ
شَاءَ اِئْتَسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
[ইমাম মুসলিম, প্রাণ্ডক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৫৮, বাব :
বাবু তাহরিমি বাইয়ির রাজুলি আলা বাইঈ আখিহি....., হাদিস নং : ১৫২৪/২৪)

৭ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا
فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ
[ইমাম মুসলিম, প্রাণ্ডক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৯, বাব: বাবু কাওলিন নাবিঈ সা.
মান গাসসানা ফালাইসা মিন্না, হাদিস নং : ১০২)

৮ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَى عَنْ بَيْعِ السَّيِّئِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَاحِ
دَاوِدَ، [ইমাম আবু
দাউদ, প্রাণ্ডক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫৪, বাব: বাবু ফি বাইঈস সিনীন, হাদিস নং : ৩৩৭৪)

৯ خیار المجلس (খিয়ারুল মজলিস) হলো এমন ধরনের ইচ্ছাধিকার, যাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা যে
বৈঠকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করে ঐ বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখা
অথবা বাতিল করার অধিকার।

১০ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَاحٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِئْتَبَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرِكَ
[ইমাম মুসলিম, প্রাণ্ডক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৬৪, বাব:
বাবুস সিদকি ফিল বাই'য় ওয়াল বায়ান, হাদিস নং : ১৫৩২/৪৭)

১১ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (আল কুরআন, ৫ : ১)

১২ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ
مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْيَقَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ
فَجَرَ [ইমাম বুখারি, প্রাণ্ডক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬ বাব: বাবু আলামাতুল মুনাফিক, হাদিস নং : ৩৩)

১৩ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ جَسَدٍ نَبَتْ مِنْ
[আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন মুসা আবু বকর বায়হাকী, শুআবুল ইমান
(রিয়াদ : মাকতাবাতুর রাশেদ লিলনাশর ওয়াততাওয়া, ২০০৩), বাব: ফসলুস সালিসু ফি তীবিল
মুতদঈম ওলমাবলাসি ও ইজতিনাবিল হারামি ও ওততিকায়িশ শুবহাত, খ. ৭, পৃ. ৫০৪, হাদিস নং :
৫৩৭৫)

১৪ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُلَيْنِ (আল কুরআন, ৭ : ১৯৯)

১৫ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (আল কুরআন, ৪ : ১৪৯)

- ১৬ (আল কুরআন, ৩৩ : ৩৩) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
- ১৭ (আল কুরআন, ২৪ : ৩০) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
- ১৮ (আল কুরআন, ২৪ : ৩১) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
- ১৯ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ اشْتَرَى سَرَقَةً، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرَقَةٌ، فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَائْتِمَافِهَا» شَرْحُيْلُ هَذَا هُوَ ابْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ سَيِّئَ الرَّأْيِ فِيهِ [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল হাকিম, আল-মুসতাদরাক আল্লাস সহীহায়ন (বৈরুত : দারু কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১৯৯০), খ. ২, পৃ. ৪১, বাব: ওআম্মা হাদিস আবু হুরায়রা, হাদিস নং-২২৫৩]
- ২০ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, মুফতী যোবায়ের হোসাইন রাফীকী অনূদিত (ঢাকা : দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৬), পৃ. ৩৬৪
- ২১ (আল কুরআন, ৮৩ : ১-৩) وَيَلِلْ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
- ২২ (আল কুরআন, ২৬ : ১৮৩) وَلَا تَنْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
- ২৩ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَافٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّبِيعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورُكٌ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتُمَا مَجُوعٌ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا [ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৬৪, বাব: বাবুস সিদকি ফিল বাই'য় ওয়াল বায়ান, হাদিস নং : ১৫৩২/৪৭]
- ২৪ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُنْظَرُ لَهُمْ وَلَا يَرْكَمُهُمْ (ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২, বাব: বাবু বয়ানি গিলাযি তাহরমি ইসবাবিল ইজার.., হাদিস নং ১০৬/১৭১)
- ২৫ [আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন মুসা আবু বকর বায়হাকী, আস সুনানে কুবরা (বৈরুত : দারু কুতুবুল ইলমিয়াহ, ২০০৩), খ. ৬, পৃ. ২১, বাব: বাবু তাহরমি বাইঈঙ্গল খামরি ওলমাইমাতি ওলখিনজীর ও আসনাম, হাদিস নং : ১১০৫১]
- ২৬ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ [আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, আস সুনান (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৭২৯, বাব: বাবুল হকরাতি ওয়ালজালবি, হাদিস নং : ২১৫৫]
- ২৭ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. عَنْ شِرَاءٍ مَا فِي بَطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا كِبِيلٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ أَبْقَى وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُفْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ

- الغَائِصِ (ইমাম ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৪০, বাব: বাবুল হুকরাতি ওয়ালজালবি, হাদিস নং : ২১৯৬)
- ২৮ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُبَاعَ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشَفَّحَ (ইমাম বুখারি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭৭, বাব: বাইঈছ ছিমারি কাবলা আই ইবদুআ সালাহুহা, হাদিস নং : ২১৯৬)
- ২৯ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، قَالَ ابْنُ الْمُسَلَّمَ (ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৫৯, বাব : বাবু বুতলানি বাইঈল মাবিঈ কাবলাল কাবদি, হাদিস নং : ১৫২৫/২৯)
- ৩১ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّدِيقِينَ. [আবু সৈদা মুহাম্মদ বিন সৈদা আত তিরমিযী, আস-সুনান (মিশর : শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাতাতু মুসতফা আল বালী আল হালী, ১৩৯৫৪ হি.), খ. ৩, পৃ. ৫০৭, বাব: বাবু মা যাআ ফিত তুজজারি ও তাসমিয়াতিন নাবিঈ সা. ইয়য়াহুম, হাদিস নং : ১২০৯]
- ৩২ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ فَسَعِرَ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْعِرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَطْلَمَةٍ فِي دِمٍّ وَلَا مَالٍ (ইমাম আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭২, বাব: বাবু ফিত তাসঈর, হাদিস নং : ৩৪৫১)
- ৩৩ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭
- ৩৪ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (আল কুরআন, ৪ : ২৯)
- ৩৫ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّينَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (আল কুরআন, ২ : ২৭৬)
- ৩৬ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ (আল কুরআন, ২ : ৪২)
- ৩৭ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (আল কুরআন, ৩৩ : ৫৮)
- ৩৮ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ ". فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ . إِنَّ التَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَرَاءَ إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَتَزَوَّدَ . (ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫০৭, বাব: বাবু মা যাআ ফিত তুজজারি ও তাসমিয়াতিন নাবিঈ সা. ইয়য়াহুম, হাদিস নং : ১২১০)
- ৩৯ প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী, “মুনাফাখোরী মজুদদারী দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় : ইসলামি দৃষ্টিকোণ”, ইসলামি আইন ও বিচার, বর্ষ-৬, সংখ্যা-২১, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃ. ৪৪-৪৫

- ৪০ (আল কুরআন, ২ : ২৮২) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسٰٓئٍ فَاَكْتُبُوْهُۥ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
- ৪১ (আল কুরআন, ৫ : ১) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ
- ৪২ عَنْ ابْنِ عُمرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَرْهُو، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيِضَ، (ইমাম মুসলিম, প্রাপ্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৬৫, বাব: বাবুন নাহঈ আন বাইঈছ ছিমারি কাবলা বুদুঈ সালাহিহা বেগাইরি শারতিল কাতঈ, হাদিস নং : ১৫৩৫/৫০)
- ৪৩ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا، (ইমাম মুসলিম, প্রাপ্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৬২, বাব: বাবু তাহরিমি বাঈ সুবরাতিত তামরিল মাজহ্লাতিল কাদরি বেতামরিন, হাদিস নং : ১৫৩০/৪২)
- ৪৪ (ইমাম ইবনে মাজাহ, প্রাপ্ত, বাব : বাবু মান বানা ফি হাককিহি মা ইয়াদুররু বিজারিহি, হাদিস নং : ২৩৪১) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

সৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব : ইসলামি দৃষ্টিকোণ

মোহাম্মদ রেজাউল হোসাইন*

মনজুর আহমদ**

Abstract

Man is a wonderful creation of almighty Allah among the various creations of the world. He organized the universe for man. All the arrangements of the universe are to fulfill various needs of man. Almighty Allah has given him a special status over other all creations with various advanced features including structural perfection, performance and ability to expression themselves. In this regard, Allah himself has declared, 'I have made man dignified'. (Quran, 17:70). The characteristic due to which Allah has given superiority to Human Being, those who are the main attraction of creation, due to the qualities human being are 'ashrafal makhluqat' - those characteristic are not permanent. Almighty Allah reminded the human being after declaring him the best creation; they can descend to the lowest level of creation due to their actions. Rather, in some cases, man can reach a lower level than quadrupeds. Human excellence is not limited to physical appearance. All the qualities, characteristics and abilities of human that keep them eternally in the seat of excellence in creation have been discussed in the light of Qur'an-Sunnah from the point of view of facts and logic in this article.

চাবিশব্দ: মানুষ, সৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, শ্রেষ্ঠত্ব

ভূমিকা

মানুষ মহান আল্লাহ তা'আলার অতি ভালোবাসার সৃষ্টি। সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রাণীর নাম মানুষ। মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা করবার জন্যই মূলত অন্য সকল মাখলুকাতের সৃষ্টি। সে হিসাবে সৃষ্টিজগতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষ। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত হিসেবে ঘোষণা করে বলেছেন— وَالْقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَلَدِ وَالْبَحْرِ وَرَفَعْنَاهُمْ مِّنَ الطُّبُغَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا “আর আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদায় সমাসীন করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদের দিয়েছি উত্তম রিজিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছি”^১। মানুষ পৃথিবীতে এসে অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে নিজের অবস্থান ভুলে যায়। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হয়েও মানুষ সাহায্যের জন্য তার থেকে দুর্বল এমনকি জড়পদার্থের কাছেও নত হয়। নিজের তৈরি প্রতিমা কিংবা গাছ, তরু-লতা, চন্দ্র-সূর্যকে মানুষ তার কষ্ট লাঘবের মালিক মনে করে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কোরআনে ইরশাদ করেন— وَأَتَّخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ “তারা এই আশায় আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে যে তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে”^২। আবার কোনো কোনো সময় মানুষ নিজেকে এতো বেশি ক্ষমতাধর ভেবে বসে যে, সে নিজেকে স্বয়ং প্রভু ঘোষণা করে বসে। মানুষের নিজেকে তুচ্ছ ভেবে জড়বস্তুতে

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ফজলুল হক মহিলা কলেজ, ঢাকা, বাংলাদেশ

নিবেদন কিংবা নিজেকে স্রষ্টার আসনে বসানো কোনোটাই তার জন্য শোভন নয়। বরং মানুষের রয়েছে আলাদা পরিচয়, অবস্থান এবং মর্যাদা। সৃষ্টির সূচনা থেকেই মানুষ তার আপন পরিচয় এবং অবস্থান ভুলে বার বার হেটেছে ভিন্নপথে। তাই মানুষের পরিচয়, অবস্থান এবং সৃষ্টিজগতে তার মর্যাদার নির্ণয়ান সর্বসময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক। আলোচ্য প্রবন্ধে কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে মানুষের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার মাধ্যমে সৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে সেই শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার উপায় আলোচনা করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে ভালবাসার সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির সূচনা থেকেই নিজের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছেড়ে, নিজের আসল গন্তব্য ছেড়ে হেটেছে ভিন্নপথে। তাকে যে মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হয়েছে সেই মর্যাদা ও সম্মানের অবস্থান ত্যাগ করে মানুষ নিজেকে নিয়ে অহংকারী হয়েছে অথবা নিজেকে তার কৃতকর্মের কারণে নামিয়েছে চতুস্পদ জন্তুর চেয়েও নিম্নতম স্তরে। মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে বিভিন্ন যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে। যুগে যুগে মহান আল্লাহ মানুষকে তার সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান চেনাতে এবং মানুষের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বুঝাতে নবি রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবি হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে নবুয়্যাতের ধারা সমাপ্ত হয়েছে এবং কোরআন মাজিদের মাধ্যমে আসমানি গ্রন্থেরও সমাপ্তি হয়েছে। কোরআন ও হাদিসের আলোকে যুগ যুগ ধরে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে অসংখ্য বার। তবুও মানুষ তার মর্যাদা ভুলছে প্রতিনিয়ত। শুধু মর্যাদা ভুলেই মানুষ ক্ষান্ত হয়নি বরং নিজেকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে মানুষের চরিত্র হারাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই গবেষণায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্লেষণ করে সেই শ্রেষ্ঠত্ব স্থায়ী করার সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি মৌলিক পদ্ধতি সমূহের মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক ও গুণাত্মক গবেষণা (Qualitative Research) অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক আলোচনায় আবরোহ পদ্ধতি এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪. সাহিত্য পর্যালোচনা

মানুষ যেহেতু সৃষ্টিকূলের অন্যতম সৃষ্টি। সেহেতু মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়টি আলোচিত হয়েছে প্রতি শতাব্দীতে। মানুষ তার নিজের বড়ত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছে যুগে যুগে। প্রত্যেক যুগ ও সময়ের পারিপার্শ্বিকতার সাথে সাদৃশ্য রেখে প্রতি যুগ থেকে শতাব্দী মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মানুষের আলোচনা প্রতি যুগে যুগেই প্রাসঙ্গিক। যুগে যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সাথে সাথে, পার্থিব সামগ্রিক নব নব উদ্ভাবনে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণেও এসেছে ভিন্নতা। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অগণিত লেখনী রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মানুষের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে কাজ হওয়ার ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষাও অনেক আলোচনা ও গবেষণা রয়েছে। সেখান থেকে নিকটতম অতীতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে হওয়া কয়েটি গবেষণাকর্ম নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা ভাষার অন্যতম পাক্ষিক পত্রিকা 'আহমদী'তে প্রখ্যাত

প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ'র 'মানব মর্যাদা' নামক প্রবন্ধে তিনি কোরআন মাজীদ থেকে ও হাদিস শরীফ থেকে মানুষের মর্যাদার প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।^৩

প্রকৌশলী মো: শামসুল হক চৌধুরী তার 'কুরআনে কিয়ামত ও শেষ বিচার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে 'মানুষের পরিচয়' শিরোনামে কুরআন ও হাদিস থেকে মানুষের পরিচয় ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি মানুষের মর্যাদা তুলে ধরে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতী হওয়া উপায় আলোচনা করেছেন।^৪

পারভেজ আহমেদ তার 'মদিনা' গ্রন্থে মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার কিছু উপায় আলোচনা করে মানুষের মর্যাদা নিরূপণ করেছেন।^৫

উল্লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থে সৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আলোচিত হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। মানুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার কিছু উপায় আলোচনা করলেও সুনির্দিষ্ট ভাবে আলোচিত হয়নি।

তাই উপরোক্ত সাহিত্যকর্ম থাকা সত্ত্বেও কুরআন ও হাদিসের সাথে সাথে মানুষের সৃষ্টিগত ভিন্নতাকে সামনে রেখে আধুনিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে মানুষের মর্যাদা পুনর্নিরূপণ এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার সুনির্দিষ্ট উপায় নির্দেশ করা সময়ের চাহিদা। তাই কুরআন ও সুন্নাহ'র সাথে আধুনিক বিজ্ঞান এবং বাস্তবতার নিরিখে সৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে সেই শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার সুনির্দিষ্ট গুণাবলি উল্লেখ করত প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. মানুষের পরিচয়

৫.১ শাব্দিক পরিচয়

মানুষ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ মানব, মনুষ্য, মনুজ, নৃ, নর ইত্যাদি।^৬

আর ইংরেজিতে Man, Human being, Human, Grown up and competent. OXFORD এ বলা হয়েছে- A man, Woman or Child of the species Homo sapiens, distinguished from the other animals by superior mental development, power of articulate speech and upright stance.^৭

মানুষ শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হিসেবে লিসানুল আরবে এসেছে—

المفكر الحي الكائن الانسان - والمؤنث مفكر المذكر مخلوق حي المخلوق الرائد انسان^৮

৫.২ পারিভাষিক পরিচয়

উকিপিডিয়াতে মানুষের পরিচয়ে বলা হয়েছে— মানুষ বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী জীব। মানুষ হোমিনা উপজাতির একমাত্র বিদ্যমান সদস্য। স্থলচর প্রাণী হিসেবে তাদের বৈশিষ্ট্য হল স্থির খাড়া অবস্থান এবং দ্বিপদী চলৎশক্তি, অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন এবং ভারী সরঞ্জাম ব্যবহারে সক্ষমতা, অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জটিলতর ভাষার, আকারে বৃহত্তর ও জটিল মস্তিষ্ক এবং খুবই উন্নত ও সংঘবদ্ধ প্রাণী।^৯

বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ আব্বাস মাহমুদ ইক্বাদ তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল ইনসান ফিল কোরআন’ এ মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-সৃষ্টিজগতে মানুষ হলো এমন জীব যাকে আল্লাহ তা‘আলা খলিফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।^{১০}

মানুষের পরিচয়ে আমরা বলতে পারি যে, মানুষ সৃষ্টিজগতের এক অনন্য শক্তিশালী সৃষ্টি যাকে বিবেকের মতো মূল্যবান বিষয় দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। এবং তার বিবেকের আলোকে সকল কর্মের জন্য আখিরাতে জবাবদিহিতা করতে হবে।

৬. মানুষের সৃষ্টি

পৃথিবীতে মানব জাতির আগমন কীভাবে হলো অথবা মানুষের সৃষ্টির আদি ইতিহাস কী এ নিয়ে বিভিন্ন বস্তুবাদী গবেষক, দার্শনিক নানা বক্তব্য-বিবৃতি দিয়েছেন। এর মধ্যে বিজ্ঞানী ডারউইনের দেওয়া থিওরি সবচেয়ে আলোচিত। তিনি দাবি করেন মানব গোষ্ঠীর আদিরূপ ছিল বানর বা শিমপাঞ্জি। ডারউইনসহ বস্তুবাদীদের অসার মতের বিপরীতে মহান আল্লাহ তা‘আলা মানব সৃষ্টির উপদান উল্লেখপূর্বক স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন যে— وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ — “কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা”^{১১} অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন— وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ خَمٍّ مَسْنُونٍ — “আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি গন্ধযুক্ত কর্দমের গুচ্ছ ঠনঠনা মৃত্তিকা হইতে”^{১২} সুরা ছোয়াদে আল্লাহ ঘোষণা করেন ‘আমি মানুষকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি’^{১৩}

তাহলে আল্লাহ তা‘আলার একাধিক ঘোষনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহ আদম (আঃ) কে নিজ কুদরতি হাতে মাটির সারংশ থেকে সৃজন করেছেন। আর মা হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টি নিয়ে আল্লাহ বলেন—

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا نَصْرَفُونَ

“তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে, অতঃপর তা থেকে তাঁর জোড়া (হাওয়া আ.) সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তু থেকে তোমাদের জন্য দিয়েছেন আট জোড়া। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে; এক সৃষ্টি থেকে আরেক সৃষ্টি, ত্রিবিধ অন্ধকারে, তিনিই আল্লাহ; তোমাদের রব; রাজত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তারপরেও তোমাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে।^{১৪}

সুরা নিসাতে আরোও স্পষ্ট করে বলেছেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুইজন থেকে অগণিত নারী-পুরুষ”^{১৫}

অন্যত্র বলেন-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীণীকে তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য রয়েছে নির্দেশনা”।^{১৬}

মহান আল্লাহ আদম (আ.) এর বাম পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে একেবারে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা যদি তা সোজা করতে যাও, ভেঙে ফেলবে। আর যদি তা ছেড়ে দাও তবে তা সব সময় বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীর সঙ্গে উত্তম ও উপদেশমূলক কথা বলবে”।^{১৭}

পৃথিবীতে প্রথম মানব আদম (আ.) মাটি থেকে এবং প্রথম মানবী হাওয়া (আ.) আদমের পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত সকল মানব-মানবী এক ফোঁটা অপবিত্র তরল অর্থাৎ বীর্য থেকে অদ্যাবধি সৃষ্টি হয়ে চলছে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

فَالإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عِلْفَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّئَنَّكُمْ

“অতঃপর আমি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণ আকৃতি ও অপূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য।”^{১৮}

এভাবেই আল্লাহ মানব বংশবিস্তারের ধারা অব্যাহত রেখেছেন বিবাহ-বন্ধন ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্যবস্থার মাধ্যমে।

৭. যে সকল কারণে মানুষ সৃষ্টিজগতে অনন্য

৭.১ আল্লাহ প্রদত্ত ঘোষণা: বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ নিজেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করে বলেছেন—

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, তাদেরকে স্থলভাগে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অধিকাংশের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি”।^{১৯}

প্রষ্টা নিজেই যখন তাঁর ভালবাসার সৃষ্টিকে অন্য সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সেখানে তিনি মানুষের মধ্যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হওয়ার যাবতীয় যোগ্যতাও দিয়েছেন।

৭.২ ইলম বা জ্ঞান: মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্থায়ী ও অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন। অন্য সকল সৃষ্টি থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের যে সকল কারণ রয়েছে জ্ঞান হলো তার প্রথম ও প্রধান। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) জ্ঞানের এক পরীক্ষায় ফেরেশতাদের পরাজিত করার পর আল্লাহ তা'আলা এ শ্রেষ্ঠত্বকে নিরঙ্কুশ করে রাখার জন্য ফেরেশতাদেরকে হযরত আদম (আঃ) কে সিঁজদা করার আদেশ করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে এসেছে-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ:

“আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শেখালেন, এরপর তা ফেরেশতাদের সামনে রাখলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও”।^{২০}

কিন্তু ফেরেশতাদের সেই আদেশ মানার যোগ্যতা ছিল না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেই যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। এ কারণে তারা তাদের মূর্ত্তাসূলভ বক্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করল। জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শুধু প্রাণীজগৎ নয় বরং ফেরেশতাদের উপরও মর্যাদা দান করেছেন। মানুষের এই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব যে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য মহা আল্লাহ মানুষের ওপর জ্ঞানার্জন ফরয করে দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন- طلب العلم فريضة على كل مسلم

“প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয”।^{২১} জ্ঞানী মানুষের মর্যাদাও জ্ঞানহীন মানুষের চেয়ে বেশি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ يَرْفَعُ اللَّهُ- “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন”।^{২২} অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَلَنْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ- “বলুন যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি কখনো সমান হতে পারে?”^{২৩}

তাফসীরে কাবীরে ইলম বা জ্ঞানকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, বৃষ্টি যেমন আসমান থেকে নাযিল হয় জ্ঞানও তেমন আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়, যা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। বৃষ্টির কারণে যেমন অনাবাদী জমি ফুল-ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয়, তেমনি ইলম বা জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ নৈতিক গুণাবলি অর্জন করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। জমিনে বৃষ্টি না হলে যেমন আবাদ করা যায় না, ঠিক ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকলে মানুষ দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তির জন্য আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে না। বৃষ্টিপাতের আগে বজ্র ধ্বনি ও বিদ্যুতের ফলে যেমন বৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে জান্নাতের আশা আর জাহান্নামের ভয়ে মানুষ তার অন্তর পবিত্র করে ইলম অর্জন করে। বৃষ্টি যেমন অনেক সময় উপকারী এবং অনেক সময় অপকারী, ঠিক তেমনি ইলমও ক্ষেত্র বিশেষ উপকারী এবং অপকারী। মানুষ তখনই আল্লাহ তা'আলার দরবারে জ্ঞানের জন্য সম্মানিত হয় যখন জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে।^{২৪}

সুতরাং মহান আল্লাহ মানুষকে নিজে জ্ঞানদান করে সমগ্র সৃষ্টির উপর মর্যাদা এবং সম্মানদান করেছেন।

৭.৩ খলিফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা দান

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা নিজ খলিফা বা প্রতিনিধির মর্যাদায় বিভূষিত করেছেন। মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে খিলাফাতের মহান দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীকে আল্লাহ এমন সুমহান মর্যাদা দান করেন নাই। মানুষে সৃষ্টির পরিকল্পনাতেই মহান রাক্বুল আলামিন মানুষকে মর্যাদা দানের এ বিষয়টি নিশ্চিত করে ঘাষণা করেছেন, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً “যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি”^{১৫} অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ - “তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একের উপর অন্যকে দিয়েছেন মর্যাদা”^{১৬}

সুতরাং খিলাফাতের মর্যাদা মানুষকে সৃষ্টির গোড়া থেকেই অন্য সকল সৃষ্টির উপর আধিপত্যের নির্দশন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭.৪ ওহি প্রেরণ

ওহির মতো মহাপবিত্র এবং মহা সম্মানিত বাণী কেবল আদম সন্তান মানুষের উপরেই নাযিল করা হয়েছে। সৃষ্টির কোন প্রাণীকে কেন্দ্র করে ওহি নাযিল হয়নি কিংবা মানুষ ভিন্ন অন্য কোনো জাতির উপর ওহি নাযিল হয়নি। ওহি এমন মহান বোঝা যা বৃহদায়ত পাহাড় বহনে অযোগ্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দয়ার সৃষ্টি মানুষের উপরেই আল্লাহ ওহি প্রেরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনে এসেছে- “আমি যদি এ কোরআনকে পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তবে পাহাড় ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে বিগলিত হয়ে যেতো”^{১৭}

সুতরাং আকৃতিতে সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্য মহাসম্মানিত ফেরেশতার মাধ্যমে অহি প্রেরণ মানুষের মর্যাদারই পরিচায়ক।

৭.৫ নবি-রাসুল হিসাবে মনোনয়ন

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য থেকেই পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। মাখলুকাতে মধ্য কেবল মানুষকে আল্লাহ নবি- রাসুল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ফেরেশতা এবং জীন থেকে কোন নবি হওয়ার দৃষ্টান্ত না থাকলেও কেবল মানবজাতি থেকে এক লক্ষ মতান্তরে দুই লক্ষ নবি-রাসুল আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করে সৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদার আসন উচ্চকিত করে দিয়েছেন।

৭.৬ গঠনগত বৈশিষ্ট্য

উৎকৃষ্ট গঠনকাঠামোতে সৃষ্টি করে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। কোন কোন প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে, কোন প্রাণী চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে মাথা নিচু করে চলে। প্রাণী জগতে কেবল মানুষই দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে চলাচল করে। এ ছাড়াও মানুষের অনুপম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য যে কোন প্রাণীর তুলনায় ভিন্নতর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ “আমি অবশ্যই মানুষকে সুন্দরতম দৈহিক আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি”^{১৮}

আল্লাহর এ ঘোষণার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মানুষের মজ্জা ও স্বভাবকে অন্যান্য সৃষ্টি জীবের তুলনায় উন্নত ও উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব ও আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সকল প্রাণীর

চেয়ে সুন্দরতম করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন- **الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي آيَاتِهِ** “যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সূঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন, যে আকৃতিতে গঠন করার সেই আকৃতিতে গঠন করেছেন”।^{৯০}

মানুষ এমন এক ধরনের সৃষ্টি যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজাহানের বিস্তৃত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকগণ মানুষের মধ্যে সমুদয় জগতের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করেছেন। যেমন তার চোখ হল চাঁদ ও সূর্য, মাথার চুল ও গায়ের লোম হলো বাগান, ঘাস, বন-জঙ্গল এবং পিঠ হলো মরুভূমি। এমনিভাবে নদীনালা, পর্বত, সমভূমি সবকিছুর দৃষ্টান্ত রয়েছে মানুষের মধ্যে। মানুষ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আর কোন সৃষ্টির মধ্যে এমন বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় না।^{৯১}

৭.৭ সম্মানের জীবিকা: মানুষকে মহান আল্লাহ যতভাবে সম্মানিত করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল পবিত্র ও বিশুদ্ধ রিযিক। তারা যেন অপবিত্র রিযিকের দারস্থ হয়ে নিজেদেরকে কুলষিত না করে এইজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও অসম্মানের সকল জীবিকা হারাম ঘোষণা করে ইরশাদ করেন- **يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ** “হে মানুষ! পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র যা আছে তা থেকে খাও আর শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন”।^{৯২}

পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর জন্য এমন করে হালাল ও পবিত্র জীবিকা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। সকল সৃষ্টির উপর মানুষের মর্যাদা ও সম্মান প্রমাণের জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য পবিত্র জীবিকা গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। এবং এ কারণেই পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী হিসেবে মানুষের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ওপর মানুষের পূর্ণ এখতিয়ার দিয়েছেন। জীবিকা হালালের বিধানকে আল্লাহ এমন প্রবল করেছেন যে ইবাদাত কবুল হবে কি হবে না, ব্যক্তি জান্নাতে যাবে কি যাবে না তা একান্তভাবে রিযিক হালাল হওয়ার উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এমনকি মানুষের জন্য হালাল উপার্জনকে ফরয করে দিয়ে নবিজি সা. ইরশাদ করেন- **طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ** “হালাল উপার্জন করা ফরযের পরে ফরয”।^{৯৩}

পবিত্র জীবিকা গ্রহণের তাকিদ দিয়ে আল্লাহ সুরা আল বাকারায় আরও বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“তোমরা উত্তম ও পবিত্র বস্তু আহার করো, যা আমি তোমাদের জীবিকারূপে দিয়েছি এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করো আল্লাহর, যদি তোমরা একান্তই তার ইবাদাত কর”।^{৯৪}

সুতরাং পবিত্র জীবিকা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে অন্য সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭.৮ অন্য সৃষ্টির উপর আধিপত্য

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পৃথিবীর অন্যান্য সকল প্রাণীর উপর দিয়েছেন আদিপত্য বিস্তারের জ্ঞান ও ক্ষমতা। মানুষের চেয়ে কয়েকগুণ বড় প্রাণী হাতি অথচ তার নাকে রশি দিয়ে ঘুরানোর কৌশল মানুষকে আল্লাহ শিক্ষাদান করেছেন। সমুদ্রের সুবিশাল জলরাশিকেও মানুষ কাজে

লাগানোর কৌশল জানে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, দৈহিক কাঠোমোয়, সৌন্দর্যে এবং খিলাফতের মর্যাদায় মানুষের এ মর্যাদা ও আধিপত্যকে তিনি অবিসংবাদিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে দান করেছি মর্যাদা। তাদেরকে স্থলভাগে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকে উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি”।^{৩৫}

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন- “তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করেছেন”।^{৩৬} মূলত বিশ্বজাহানের সকল সৃষ্টিকে মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য সৃষ্টি করে এবং সবকিছুর উপর মানুষের আধিপত্য দান করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনন্য সম্মানে ভূষিত করেছেন।

৭.৯ পৃথিবী সৃষ্টির উপলক্ষ্য

মানুষের জন্যই আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে তার ভালবাসার সৃষ্টি যেন নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে মানুষের আওতাধীন করেছেন। মূলত মানুষের ভোগ,ব্যবহার কল্যাণের জন্য সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টির ঘোষণা মানুষের অনন্য মর্যাদার পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-“তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সকলকিছু সৃষ্টি করেছেন”।^{৩৭}

৭.১০ নিরাপদ ও নির্ধারিত আবাসস্থল

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপদ ও নির্ধারিত আবাসস্থল দিয়েছেন। পৃথিবীর অন্যসকল প্রাণী যেখানে রাত সেখানে কাত হলেও মানুষের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট আবাসস্থল। তারা যেন নিরাপদে, উত্তম ব্যবস্থাপনায় নিজেদের মানবীয় প্রকৃতির যথার্থ বিকাশ ঘটাতে পারে। মাবন শিশু যেন বেড়ে উঠতে পারে নিভাবনায় শান্তি ও শৃঙ্খলায়। মানুষ ছাড়া সৃষ্টিজগতের অন্যকোন প্রাণী এমন উত্তম এবং নির্ধারিত আবাসিক সুবিধা লাভ করে না। শুধু তাই নয়, মানুষ যেন নিরাপদে, নির্বিবাদে নিজ নিজ গৃহে বসবাস করতে পারে সেইজন্য আল্লাহ তা'আলা বিনা অনুমতিতে কারোও ঘরে প্রবেশ করতে না পারে সেইজন্য আইন করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُدْكَرُونَ

“হে ইমানদারগণ তোমরা নিজেদেরবাড়ি-ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে তার অধিবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করবে না। আর এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর”।^{৩৮}

৭.১১ কর্তব্য পালন

মাখলুকাতের মধ্যে কেবল মানুষকে পৃথিবীতে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক মানুষের জন্যই আলাদা আলাদা দায়িত্ব নির্ধারিত করেছেন আল্লাহ তা'আলা। মানুষ পালনীয় কাজ না করলে তার জন্য জবাবদিবহতার বিষয় তাকে সতর্ক করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন—

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِنَّمَا الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فكلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, ইমাম বা নেতা, যিনি জনগনের ওপর দায়িত্ব- তিনি তার অধীনদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন। আর ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সদস্যদের উপর দায়িত্বশীল-সে তার পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী দায়িত্বশীল তার স্বামীর পরিবারের সদস্যদের ও সন্তান-সন্ততির। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর দাস ব্যক্তি তার মনিবের সম্পদের উপর দায়িত্বশীল এবং সে এই সম্পদের দায়িত্ব সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবে। কাজেই সর্বত্র হও! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (পরকালে আল্লাহর নিকট) জিজ্ঞাসিত হবে”।^{১৮}

৭.১২ মানুষ এক জাতিভুক্ত: মানুষের মর্যাদার একটা বিশেষ দিক হলো আল্লাহ তা’আলা তাকে এক জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর অন্যকোন সৃষ্টির ব্যাপারে এমন কোন ঘোষণা না থাকলেও মানুষের জন্য রয়েছে স্পষ্ট করেই আল্লাহ বলেন: وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ “নিশ্চয়ই মানুষ একই উম্মত”।^{১৯}

যদিও মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে মানুষের মধ্যে জন্মগত বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইসলাম কখনো তা সমর্থন করেনি। মানুষের এই এক জাতিভুক্ত হওয়া নিঃসন্দেহে তার মর্যাদার পরিচায়ক।

৭.১৩ চিন্তা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা: মানুষকে আল্লাহ তা’আলা মুক্ত এবং স্বাধীন করে অনন্য মর্যাদায় বিভূষিত করেছেন। পৃথিবীর সকল জীবজন্তু আল্লাহ তা’আলার হুকুমমতো চলতে বাধ্য। একমাত্র মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে মর্যাদাবান করা হয়েছে। মানুষকে ভালো ও মন্দ জ্ঞান দান করে তার মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার এখতিয়ার এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। মানুষ ভিন্ন এমন দৃষ্টান্ত মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী ক্ষেত্রে দেখা যায় না। মহান আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন,

قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“এরপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে এবং যারা সেই হিদায়েত অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা অস্বীকার করবে এবং আমরা আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে”।^{২০}

৭.১৪ উৎকৃষ্ট মানবিক গুণাবলি

আল্লাহ তা’আলা মানুষকে উৎকৃষ্ট মানবিক গুণাবলি দিয়ে সৃজন করেছেন। উন্নত মেধা, নীতিবোধ, চিন্তা ও কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশীলতাসহ অসংখ্য ভালো ভালো গুণ দিয়ে আল্লাহ তা’আলা মানুষকে

শ্রেষ্ঠত্বেও আসন দিয়েছেন। এমনকি তার মধ্যে সীমিতার্থে হলেও নিজের সুন্দরতম গুণ ও সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটিয়েছেন। আর একারণেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন- صِبْغَةً - “তোমরা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও। রঙে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে”।^{৪১}

৭.১৫ পোশাক পরিচ্ছদ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানুষকেই পোশাক পরিয়েছেন আর কোন প্রাণীর পোশাক পরার বিধান ও ব্যবস্থা রাখেননি। শ্রীলতা ও অশ্রীলতার জ্ঞান, নগ্নতা থেকে মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে মুম্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্যত্ব করে তুলেছে এ পোশাক। পোশাক মানব জাতির ভূষণ। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে মানুষকে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোশাক পরিধান করতে উৎসাহিত করা হয়েছে মানুষের মর্যাদার জন্যই।

আল্লাহ তা'আলা নিজেই এ বিষয়ে বলেছেন-

يَبْنَىءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْرَى سَوْءُكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ الْتَقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ
ءَاتَيْتِ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“হে আদম সন্তান! তোমাদেরলজ্জাছান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক দিয়েছি আর তাকওয়ার পোশাক, এটাই সর্বোত্তম”।^{৪২}

৭.১৬ কর্ম ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানুষকেই আল্লাহ কাজ করে জীবিকা অর্জনের শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষই পৃথিবীতে শ্রমনির্ভর প্রাণী, তাদের উন্নতি ও অবনতি তাদের কাজের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ- , “এরপর যখন সালাত আদায় শেষ হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তাল্লাশ করো”।^{৪৩}

জীবিকা অর্জনের আদেশ দিয়েই আল্লাহ থেমে থাকেননি বরং মানুষকে কর্মক্ষম করেছেন। কেবল মানুষই যে কোন কাজ চাইলে করতে পারে। মানুষকে পৃথিবীর সমস্ত করণীয় কাজের সম্যক যোগ্যতা দিয়েই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। আদি পেশা কৃষি থেকে শুরু করে মহাকাশ ভ্রমণেও মানুষ সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। এটা মূলত মানুষের মর্যাদার নির্দেশক।

জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য হালালপন্থা অবলম্বনের তাকিদ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন: “পবিত্রতা ছাড়া ইবাদাত কবুল হয়না আর হারাম অর্জিত মালের সাদাকা কবুল হয় না”।^{৪৪}

৭.১৭ পরকালীন পুরস্কার ও তিরস্কার

পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের জীবন সমাপ্ত হয়ে যায়। পৃথিবীর কাজ-কর্মের বিনিময়ে পরবর্তীতে স্থায়ী কোন কিছু লাভ করার ব্যবস্থা তাদের জন্য রাখা হয়নি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আখিরাতের স্থায়ী ও অনন্ত জীবন দান করে চির সম্মানিত করেছেন। পৃথিবীর কাজের ভিত্তিতে পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার পর তিনি মানুষের জন্যই অনন্ত জীবন দানের অঙ্গীকার করেছেন। সে জীবনে কেউ শাস্তিতে থাকবে কেউ পাবে চির জাহান্নাম। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন

سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

“যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যে তা উপেক্ষা করবে সে নিতান্তই হত্যাভাগ্য। সে চিরজাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না। নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করবে সে, যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করেও সালাত কায়েম করে। কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও অথচ আখিরাতেরই উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী।”^{৯৫}

৮. মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে করণীয়

আল্লাহ তা‘আলার অশেষ কৃপা, গঠনগত বৈশিষ্ট্য, জ্ঞান সর্বোপরি আল্লাহর ঘোষণায় অর্জন করা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব চিরস্থায়ী নয়। কেননা উত্তম মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য সর্ব নিকৃষ্ট প্রাণীতেও রূপান্তরিত হতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

رَدُّنَا عَنْهُ سَفِيلِينَ “এরপর আমি তাকে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে”।^{৯৬}

সুতরাং মানুষের মর্যাদার এই আসন স্থায়ী করার জন্য মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর আদেশমতো জীবন পরিচালনা করতে হবে। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে যে সমস্ত গুণাবলি মানুষের জীবনে থাকা একান্ত আবশ্যিক তার মধ্য থেকে নিম্নে কিছু তুলে ধরা হলো-

- ক. নিয়মিত কোরআন কারীম অধ্যয়ন করতে হবে।
- খ. রাসুল সা. এর হাদিস অধ্যয়নের মাধ্যমে বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে।
- গ. জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে।
- ঘ. ব্যক্তি চরিত্রকে সুন্দর করতে হবে।
- ঙ. অন্যের কল্যাণকামী হওয়ার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে কাজ করে হওয়া।
- চ. সকল কাজেকর্মে আমানতের সুরক্ষা করতে হবে।
- ছ. নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে সদাচারণ করতে হবে।
- জ. মানুষের সাথে সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করার মাধ্যমে নিজের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে হবে।
- ঝ. উত্তম প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে।
- ঞ. সকল অবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে।
- ট. যেকোনো পরিস্থিতি ধৈর্যশীল হতে হবে।
- ঠ. সদা সত্যকথা বলা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

৯. প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা

উপরোল্লিখিত আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ সৃষ্টির অন্য সকল প্রাণীর ওপর মর্যাদাবান। কোনো ধরনের সন্দেহ ও সংশয় ব্যতিরেকে মানুষই সৃষ্টির মূল উপলক্ষ্য। মানুষ তার সৃষ্টিগত নৈপুণ্য, আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা এবং আসমানি বিধানের আলোকে নিজেকে আলোকিত করার মাধ্যমেই সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে সৃষ্টির সবচেয়ে সম্মানিত মূল্যবান সৃষ্টি।

বক্ষ্যমাণ আলোচনা যেমনিভাবে আমাদের মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ঠিক তেমনিভাবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার পথনির্দেশ করে। আলোচনার ভিত্তিতে প্রমাণিত শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ ও অমর করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে নিমোক্ত সুপারিশ করা হল—

১. মহান আল্লাহ তা'আলার বান্দাহ হিসেবে তাঁর যাবতীয় হুকুম আহকাম মেনে চলা।
২. সৃষ্টির সর্বোশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর সুমহান চরিত্রে নিজেকে চিত্রিত্বান করা।
৩. মানবীয় গুণাবলির যথাযথ সংরক্ষণ ও চর্চা করা।
৪. পরকালীন জবাবদিহিতা এবং তিরস্কারের বিষয়টি সবদা স্মরণ রেখে মানুষের হক বা অধিকারের বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা।
৫. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উত্তম আচরণে অভ্যস্ত হওয়া।

১০. উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি যে, মানুষ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অনন্য এক সৃষ্টি। যাকে আল্লাহ তা'আলা আশরাফুল মাখলুকাতে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। তবে মানুষের এই মর্যাদা চিরস্থায়ী নয়। মর্যাদা মূলত নির্ভর করে মানুষের বিশ্বাস, কর্ম, আচরণের উপর। মানুষ যতক্ষণ তার মহান স্রষ্টার গোলামিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, ততক্ষণই মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের অবস্থানে থাকে। আবার যখন তার বিশ্বাস মন্দ হয় এবং তার কর্ম আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্য সৃষ্টির জন্য নিবেদিত হবে, তখন সে পৃথিবীতে মানবাকৃতি হলেও মূলত পশুর চেয়ে অধম। তাই আমাদের আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রদত্ত নিয়ম-নীতি জীবনে বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে।

তথ্যনির্দেশিকা

- ১ আল-কুরআন, ১৭: ৭০
- ২ আল কোরআন, ৩৬:৭৪
- ৩ পাক্ষিক আহমদী, নব পর্যায়ে ৪২ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৫ আগস্ট ১৯৮৮, ঢাকা
- ৪ শামসুল হক চৌধুরী, কুরআনে কিয়ামত ও শেষ বিচার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০১২), পৃ. ১১৩-১১৭
- ৫ পারভেজ আহমেদ, মদিনা (ঢাকা: আদর্শ পাবলিকেশনস, ২০২০), পৃ-৫৫
- ৬ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল-মুজামুল ওয়াফী (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ২২৪৫
- ৭ Shorter Oxford English Dictionary, Vol-3, 15th Edition (Newyork: Oxford University press, 1993), P-468
- ৮ ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব, বৈরুত, খণ্ড-১০, পৃ-৩০৪

- ৯ <https://bn.wikipedia.org>, (12 february 2023)
- ১০ আব্বাস মাহমুদ ইকাদ, *আল ইনসান ফিল কোরআন* (করাচি: পাকিস্তানি কিতাব, ১৯৯৬), পৃ. ১০৩
- ১১ আল কোরআন, ৪১:৭
- ১২ আল কোরআন, ১৫:২৬
- ১৩ পূর্বোক্ত, ৩৮:৭৫
- ১৪ পূর্বোক্ত, ৩৯:৬
- ১৫ আল কোরআন, ৪:১
- ১৬ আল কোরআন, ৩০:২১
- ১৭ ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদিস নং-৩০৮৫ (দিল্লি: কুতুবখানা রাশিদিয়া, ১৪০৯ হিজরী) ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭।
- ১৮ আল কোরআন, ২২:৫
- ১৯ আল কোরআন, ১৭:৭০
- ২০ আল কোরআন, ২:৩১
- ২১ ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস সুনান*, তাহকীক: মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায়: ইফতিতাল্ল কিতাব ফিল ইমান ওয়া ফাযায়িলুস সাহাবা ওয়াল ইলম (বৈরুত, তা:বি), হাদিস নং-২২৪
- ২২ আল কোরআন, ৫৮:১১
- ২৩ আল কোরআন, ৩৯ :৯
- ২৪ ইমাম ফখরুদ্দিন আররাযী, *তাফসীরে কাবীর* (বৈরুত, তা:বি, খণ্ড ১১), পৃ-৩৪৪
- ২৫ আল কোরআন, ২:৩০
- ২৬ পূর্বোক্ত, ৬:১৬৫
- ২৭ পূর্বোক্ত, ৫৯: ২১
- ২৮ পূর্বোক্ত, ৯৫:৪
- ২৯ আল কোরআন, ৮২: ৭-৮
- ৩০ ড. রাশেদুল আলম, *ধর্মদর্শন* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ৫৩
- ৩১ আল কোরআন, ২:১৬৭
- ৩২ ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ: ফি হুকুমিল আওয়ালিদ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১০ হি.), হাদিস নং-৮৭৪১

- ৩৩ আল কোরআন, ২:১৭২
- ৩৪ পূর্বোক্ত
- ৩৫ আল কোরআন, ৩৫: ৩৩
- ৩৬ পূর্বোক্ত, ২:২৯
- ৩৭ আল কোরআন, ২৪:২৭
- ৩৮ ইমাম আল বুখারী, আস সহীহ, অধ্যায়: আল আহকাম, পূর্বোক্ত, হাদিস নং-৬৭১৭
- ৩৯ আল কোরআন, ১০:১৯
- ৪০ পূর্বোক্ত, ২: ৩৮-৩৯
- ৪১ পূর্বোক্ত, ২:১৩৮
- ৪২ পূর্বোক্ত, ৭ :২৬
- ৪৩ পূর্বোক্ত, ৬২: ১০
- ৪৪ ইমাম আত তিরমিযি, আস সুনান, কিতাবুত ত্বাহারাত (বৈরুত, তা:বি) হাদিস নং-২৬৮২
- ৪৫ আল কোরআন, ৮৭: ১০-১৭
- ৪৬ আল কোরআন, ৯৫:৫

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে মুসলিম শিক্ষার্থীদের ভাবনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোঃ ইব্রাহীম খলিল*

Abstract

Terrorism is the destructive and terrible enemy of humanity. Islam never supports terrorism. It gives instructions to eradicate terrorism and formulates special programs for the eradication of terrorism. This program of Islam is Jihad. About jihad in today's world there are many misconceptions. Some are promoting terrorism and jihad as one and the same thing. This misconception has also spread among young Muslim students in Bangladesh. The study was conducted among university students to expose the speed and nature of these misconceptions about Jihad. Many highly educated young Muslims do not have the correct knowledge of Jihad. This situation has been created as there is no opportunity to acquire deep knowledge about Islam in the conventional education system in Bangladesh. This study has proven the need to make the basic teachings of Islam compulsory for all Muslim students.

চাবিষক: জিহাদ, সন্ত্রাসবাদ, প্রপাগান্ডা, ভ্রান্তধারণা, ইসলামিক আইন, প্রতিকার

ভূমিকা

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মানবতার এক মহাশত্রু। বিত্ত ও ক্ষমতার প্রতি দুর্বিনীত অপ্রতিহত অন্যায় লোভ যুগে যুগে, দেশে দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের জন্য দিয়েছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সৃষ্ট সন্ত্রাস মানুষের জীবনের সকল পর্যায়ে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে। জীবন ও সম্পদের ক্ষতি করেছে। শিক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহণ এমনকি ধর্মাচার পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়েছে। সন্ত্রাসের কুফল সম্পর্কে অবহিত থাকার পরও এমনকি সন্ত্রাস প্রতিরোধে অসংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেও সমাজকে সন্ত্রাসের কালোথাবা থেকে মুক্ত করা যায়নি। বরং ধর্মের নামে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদ মানুষের জীবনে নবতর বিভীষিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে বিপদসঙ্কুল এ পথে বাংলাদেশেরও ভীতিকর যাত্রা শুরু হয়েছে। অবস্থা ও প্রচারণা এমনই বিরূপ যে, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলায় উদ্যোগী হওয়ার চেয়ে মানুষ ইসলামের মহান কর্মসূচি জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণার শিকার হচ্ছে। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেকে অকারণ বিদ্বেষ বা অজ্ঞানতাজনিত কারণে শান্তির পক্ষে ইসলামের নীতি, দর্শন ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। সাধারণ মুসলিমরা পর্যন্ত জিহাদ ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করছে না। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ মুসলিম শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে জিহাদ ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের স্তর নিরূপণ করা হয়েছে। তারা যা জানে সেটি ইসলামের জিহাদ ও জঙ্গিবাদ নীতির আলোকে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে তরুণ মুসলিম শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যমান ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য ইসলামের জিহাদ ও জঙ্গিবাদ বিষয়ক দর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

২. তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা পদ্ধতি

দৈবচয়নের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একশত তরুণ মুসলিম শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। এরা সবাই ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি কবি নজরুল, ইডেন মহিলা ও ঢাকা কলেজের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থী। একাধিক বিকল্প উত্তরসহ ১০টি প্রশ্ন সংবলিত একটি আবদ্ধ প্রশ্নপত্র^১ তৈরি করে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগভিত্তিক কোনো অনুপাত নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে কোনো কোনো বিভাগ থেকে বেশি সংখ্যক এবং কোনো কোনো বিভাগ থেকে কম সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। কিছু কিছু বিভাগ বাদও পরে গেছে। ইসলাম সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে বলে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি বিভাগের শিক্ষার্থীদের এ সমীক্ষাভুক্ত করা হয়নি। সংগৃহীত উপাত্ত যাচাই ও মূল্যায়নপূর্বক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রবন্ধ প্রস্তুত করা হয়। প্রবন্ধে উপস্থাপিত তথ্যে বাংলাদেশের তরুণ মুসলিম শিক্ষার্থীরা সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ সম্পর্কে প্রকৃত পক্ষে কী ধারণা পোষণ করে তা উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর আলোকে তরুণদের বিদ্যমান ধারণায় কী কী ত্রুটি রয়েছে সেগুলো শনাক্ত করা হয়েছে। সাথে সাথে জঙ্গিবাদ ও জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের নীতি তুলে ধরা হয়েছে। ফলে প্রবন্ধটি যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করবে তেমনি তরুণ মানসে বিদ্যমান ভুল ধারণা নিরসনেও ভূমিকা পালন করবে।

৩. জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ

জিহাদ আরবি শব্দ। এর অর্থ সংগ্রাম, কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা। তবে সচরাচর ইসলামি পারিভাষিক অর্থে ‘জিহাদ’ কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।^১ আল-কুরআনে জিহাদের কথা ৪১ বার উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে ‘আল্লাহের পথে সংগ্রাম করা’ অর্থে ‘জিহাদ’ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।^২ জিহাদের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে মুজাহিদ বলা হয়। জিহাদকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রাচ্যবিদ বার্নার্ড লুইসের মতে, কুরআন ও হাদিসের অধিকাংশ জায়গায় জিহাদ শব্দটি ধর্মযুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।^৩ বার্নার্ডের এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি পরিভাষাটি ব্যবহারে পক্ষপাতদুষ্ট সরলীকরণ করেছেন, অথচ সাধারণভাবে জিহাদ কেবলই ধর্মযুদ্ধ নয়। জিহাদকে তখনই ধর্মযুদ্ধ বলা যায়, যখন আত্মরক্ষার জন্য আক্রান্ত মুসলিম রাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইয়াহিয়া ইবন শরাফ আল-নাদভী বলেছেন, জিহাদ অর্থ সমাজের সবার সামগ্রিক দায়িত্ব হলো ন্যায্য প্রতিবাদে অংশ নেয়া, ধর্মের সমস্যা দূর করা, স্রষ্টার আইনের কথা জানা, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা ও অন্যায়কে দূর করা।^৪ কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্থানভেদে জিহাদের তিন রূপ হতে পারে, (ক) পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য স্বীয় কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ, (খ) মুসলিম সমাজকে উন্নয়নের সংগ্রাম এবং (গ) যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম^৫ যা থেকে বুঝা যায়, ইসলামে জিহাদ শব্দটি ব্যাপকার্থক। আল্লাহ তাআলার হুকুম এবং রাসুলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ অনুসারে মানবজাতির বিশ্বাস, আচরণ ও জীবনধারার আমূল পরিবর্তন সাধন জিহাদের লক্ষ্য। প্রতিজন ব্যক্তির কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলামকে জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শ দ্বারা সকলের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

^১ পরিশিষ্টে প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি সংযুক্ত করা হয়েছে।

মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার বিপক্ষে ইসলামের প্রচার করা, প্রসার ঘটানো ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা নির্দেশিত ও রাসুলুল্লাহ সা. প্রদর্শিত পথে আদর্শিক ব্যাপক চেষ্টা, সংগ্রাম এবং সর্বশেষ উপায় হিসেবে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সীমার মধ্যে থেকে শক্তি প্রয়োগের নাম জিহাদ। ‘জিহাদ তাই চেষ্টা, সংগ্রাম ও শক্তি প্রয়োগের সমষ্টিগত নাম।’^{১৬} অর্থাৎ কখনোই শুধু শক্তি প্রয়োগ নয় এবং সে শক্তি প্রয়োগও অন্যায়ভাবে নয়।

রবিনসন লিখেছেন, “Fighting and warfare might sometimes be necessary, but it was only a minor part of the whole jihad or struggle.”^{১৭} যুদ্ধ এবং জিহাদ সমার্থক নয়। যুদ্ধ (হারব, কিতাল, war) জিহাদের একটি অংশ মাত্র। অনেকেই পবিত্র যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ বা holy war শব্দসমষ্টিকে জিহাদের অর্থ বলে প্রচার করে থাকেন, যা সঠিক নয়। কুরআন বা হাদিসে কোথাও পবিত্র যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ বা holy war শব্দসমষ্টি (হারবে মুকাদ্দাসা) ব্যবহৃত হয়নি।^{১৮} আরবি ভাষায় হারব শব্দটি যুদ্ধ বা war শব্দের সমার্থক। এই ভুল অর্থে ব্যাপক প্রয়োগের কারণে সারা বিশ্বে জিহাদ শব্দটি সন্ত্রাস বা ইসলামি সন্ত্রাস শব্দের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।^{১৯}

সন্ত্রাস হলো কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা।^{২০} যেকোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বা বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা।^{২১} ব্যক্তি বা সামষ্টিক অপরাধ মনোবৃত্তি হতে সংঘটিত নিষ্ঠুর কাজ বা কাজের হুমকি, যে প্ররোচনা বা লক্ষ্যেই তা হোক না কেনো, যা দ্বারা মানুষের মাঝে ভীতি সঞ্চার করা হয় বা তাদেরকে কষ্ট ফেলার হুমকি দেয়া হয় বা তাদের জীবন, তাদের স্বাধীনতা, তাদের নিরাপত্তাকে ধ্বংসের মুখে ফেলা হয় বা পরিবেশকে ক্ষতির মুখোমুখি করা হয় অথবা বেসরকারি বা সরকারি সম্পত্তি ছিনতাই করা, দখল করা, নষ্ট করা হয় অথবা কোনো রাষ্ট্রীয় উৎস ধ্বংসের মুখে ফেলা হয়।^{২২} কাজেই অন্যায় কোনো কাজ সম্পাদন বা অবৈধ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পেশি, লেখনী, মেধা, রাষ্ট্রীয় বা সাংস্কৃতিক শক্তি কাজে লাগিয়ে যে কোনোভাবে চাপ প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে নতি স্বীকারে বাধ্য করানোর প্রথা ও পদ্ধতিই সন্ত্রাস।

সন্ত্রাসবাদের একটি আঞ্চলিক রূপ জঙ্গিবাদ। প্রকৃতিগতভাবে বিষয় দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে না জানা ও কম জানা, পক্ষপাতদুষ্ট হলুদ সাংবাদিকতা এবং ইসলামবিদ্বেষের কারণে জঙ্গিবাদ বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে মনে হয়, ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক রয়েছে।^{২৩} যেমন হিবুত তাহরীর, জামাআতুল মুজাহিদ্দীন বাংলাদেশ বা জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি বাংলাদেশ বা হুজি, হিবুত তাওহীদ, উলামা আঞ্জুমান আল-বাইয়্যিনাত, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি বা আইডিপি, ইসলামি সমাজ, তৌহিদ ট্রাস্ট, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ বা জেএমজেবি, শাহাদাত-ই-আল-হিকমা, তাআমির উদ্দীন বা হিজাব আবু উমর, আল্লাহর দল ইত্যাদি দলগুলো বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে।^{২৪} অথচ এ জাতীয় দলগুলোর কাজের সাথে জিহাদের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। তারা যা করেছে বা করছে তা নিতান্তই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং ইসলামের জিহাদ এদের মতো জঘন্য সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও। সাধারণ সন্ত্রাসীদের চেয়ে এ জাতীয় সন্ত্রাসবাদীদের অধিকতর ঘৃণ্য কেননা তারা ধর্মভীরু মুসলমানদের

আবেগকে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের অশুভ প্রত্যয়ে নিজেদের বীভৎস কর্মকাণ্ডকে জিহাদ নামে পরিচালিত করে সর্বসাধারণকে বিভ্রান্ত করে চলেছে।^{১৫}

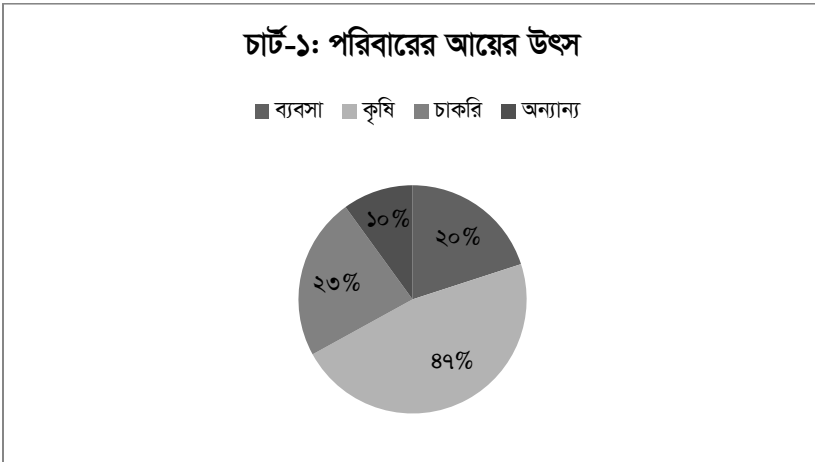
কুরআন মজীদে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের সমার্থক পরিভাষা হিসেবে ফিতনা ও ফাসাদ^{১৬} শব্দ দুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ফিতনা অর্থ পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শিরক, কুফর, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি।^{১৭} ফাসাদ হলো বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি। তাই দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লড়াই, বাগড়া এবং এমন কাজ হলো ফিতনা-ফাসাদ যাতে মানুষের সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়।^{১৮}

৪. প্রশ্নপত্রের উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

সমীক্ষা পরিচালনার জন্য তৈরিকৃত প্রশ্নপত্রে তথ্যদাতা তরুণের নাম, পিতার নাম, জন্ম তারিখ, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, পরিবারের প্রকৃতি, পরিবারের আয়ের উৎস, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগের নাম, ব্যাচ, সেল ফোন নম্বর ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিরোনামে সাধারণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪.১ পারিবারিক আয়ের উৎস

পরিবারের আর্থিক আয়ের উৎস ব্যক্তির চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। এ কারণে ব্যবসায়ীর সন্তানের সাথে কৃষকের সন্তানের চিন্তায় পার্থক্য দেখা যায়। একইভাবে চিন্তা করে না ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবির সন্তানেরা। তাদের স্বপ্ন, জীবন নিয়ে প্রত্যাশা ও ভাবনাও আলাদা হয়ে থাকে। সমীক্ষায় তাই শিক্ষার্থীদের পারিবারিক আয়ের উৎস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নের সারণিটি তৈরি করা হয়েছে।

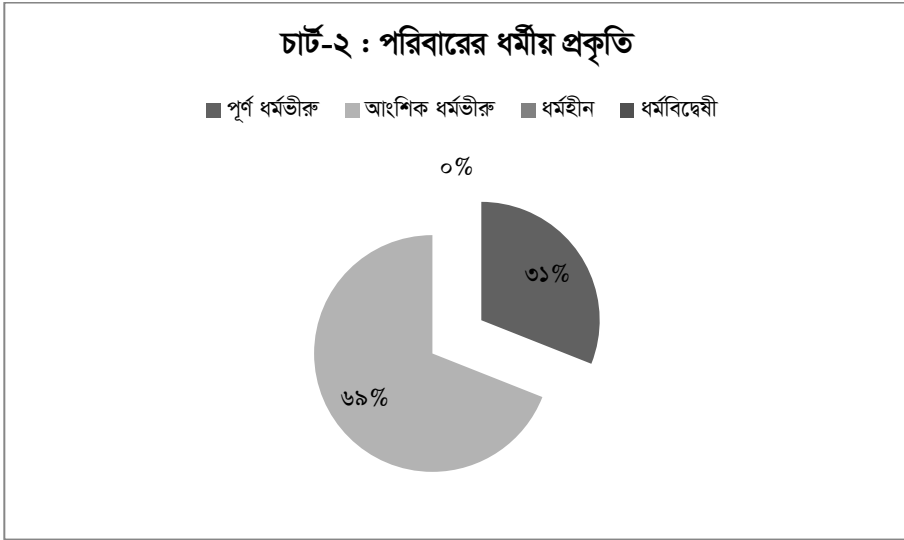


তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

তথ্যদাতা তরুণদের ৮৯% জানিয়েছে, তাদের পরিবারের আয়ের উৎস কৃষিজ উৎপাদন। ২০% তরুণের মাতা-পিতা দেশে-বিদেশে চাকরি করেন এবং চাকরি থেকে প্রাপ্ত অর্থে তাদের পরিবারের ব্যয় মেটানো হয়। ২০% তথ্যদাতার পারিবারিক আয়ের উৎস ব্যবসা। অবশিষ্ট ১০% তরুণের পরিবার এ উৎসগুলো বাদে অন্যান্য উৎস থেকে আয় করে থাকে। এর মধ্যে অনেক তরুণের মাতাপিতা শ্রমজীবী। কোনো কোনো তরুণ নিজেই শ্রমজীবী।

৪.২ পরিবারের ধর্মীয় প্রকৃতি

মানুষের প্রথম ও প্রধান বিদ্যালয় তার পরিবার। মানবিক আচরণ ও অভ্যাসের অধিকাংশই মানুষ পরিবার হতে লাভ করে। পরিবারের রুচি, আচার, চিন্তন পদ্ধতি ও অভ্যাস বংশপরম্পরায় পরিবারের সদস্যরা বহন করে থাকে। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রেও একই ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়। এ কারণে সমীক্ষায় শিক্ষার্থীদের পরিবারের ধর্মীয় প্রকৃতি উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্ণ ধর্মভীরু, ধর্মভীরু, ধর্মহীন ও ধর্মবিদ্বেষী বিকল্পসমূহের আলোকে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে তাদের পরিবারের ধর্মীয় প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। তারা ধর্মভীরু বলতে যা বোঝে, তাতেই আস্থা রাখা হয়েছে। গবেষণায় একে সংজ্ঞায়ন করা হয়নি। তাদের দেয়া উত্তরগুলোর আলোকে নিচের সারণিটি তৈরি করা হয়েছে।



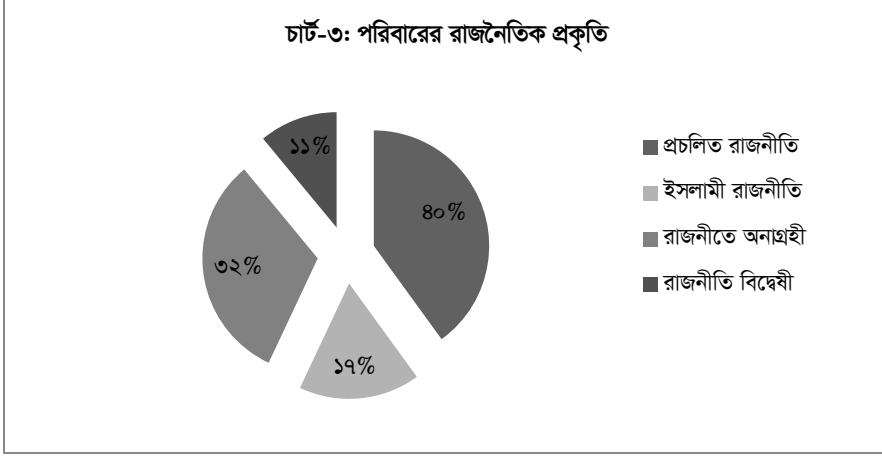
তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনো পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত নামায আদায় করলে এবং নারী সদস্যরা বোরখা পরলে সেটিই ধর্মভীরু পরিবার হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ধর্ম মানার বিষয়টি অধিকাংশ বাঙালি মুসলিমের জীবনেই অনুপস্থিত। সমীক্ষা থেকেও বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়। সমীক্ষায় অংশ নেয়া একজন শিক্ষার্থীও নিজ নিজ পরিবারকে ধর্মহীন বা ধর্মবিদ্বেষী বলেনি। ৩১% ভাগ জানিয়েছে, তাদের পরিবার পরিপূর্ণভাবে ধর্মভীরু পরিবার আর ৬৯% ভাগ বলেছে, তাদের পরিবার আংশিক ধর্মভীরু। এ কারণে পরিবার হতে জিহাদ ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বা শিক্ষা তারা লাভ করেননি। সমীক্ষার পরবর্তী অংশ থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হতে পারে।

৪.৩ পরিবারের রাজনৈতিক প্রকৃতি

বাংলাদেশের মানুষ রাজনৈতিক আলোচনা পছন্দ করে, ভালোবাসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে না। তারা বুঝে বা না বুঝে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে

অদৃশ্য বিভাজন তৈরি করে রাখে। পরিবারের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও ব্যক্তির মানস গঠন ও চিন্তন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। সমীক্ষায় তাই মুসলিম শিক্ষার্থীদের পরিবারের রাজনৈতিক প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে নিচের সারণিটি।

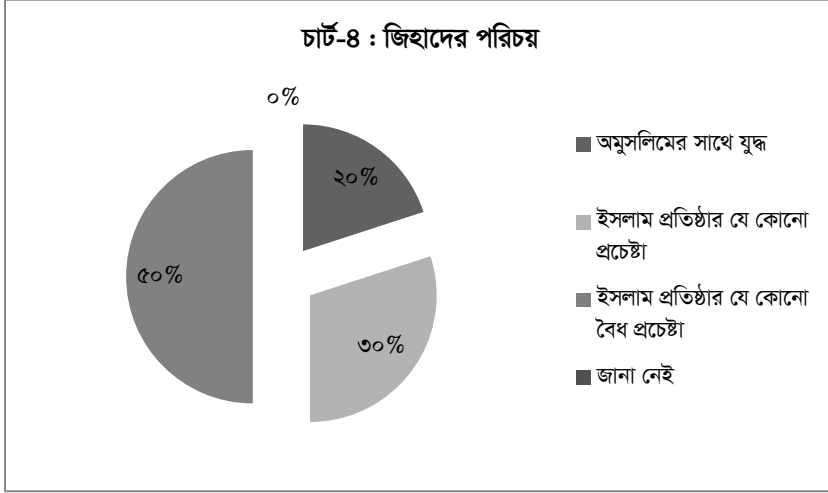


তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

সমীক্ষায় প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ১১% ভাগ পরিবার রাজনীতি পছন্দ করে না। ৩২% ভাগ পরিবার রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহী নয়। অর্থাৎ ৪৩% ভাগ পরিবারের রাজনীতি নিয়ে আগ্রহ নেই। অবশিষ্ট ৫৭% ভাগ পরিবার রাজনীতি-সচেতন বা কোনো-না-কোনোভাবে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। এদের ১৭% ভাগ ইসলামি রাজনীতির সাথে জড়িত আর ৪০% ভাগ জড়িত প্রচলিত সাধারণ রাজনীতির সাথে, যাতে বাংলাদেশের কোনো না কোনো জাতীয় নেতার জীবনদর্শন ও আদর্শকে মূল উপজীব্য হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এর অর্থ হলো, জঙ্গিবাদ ও জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে পারিবারিক আবহে সর্বোচ্চ ১৭% ভাগ শিক্ষার্থীর ধারণা পাওয়ার সুযোগ ছিলো বলে মনে হয়। অবশিষ্ট ৮৩% শিক্ষার্থীর পরিবার থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা না পাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

৪.৪ জিহাদের পরিচয়

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, ইসলামে জিহাদ বলতে যুদ্ধ বুঝানো হয় না। জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও অপপ্রচারের মূলভিত্তি হলো যুদ্ধের সাথে জিহাদকে গুলিয়ে ফেলা। ইসলাম বিদ্বেষী প্রচারমাধ্যম, গবেষক ও লেখকরা এটা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সাধারণ মানুষতো বটেই এমনকি শিক্ষিত মুসলিম তরুণরা পর্যন্ত এ ভুল ধারণা লালন করে। নিম্নের চার্টে সে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

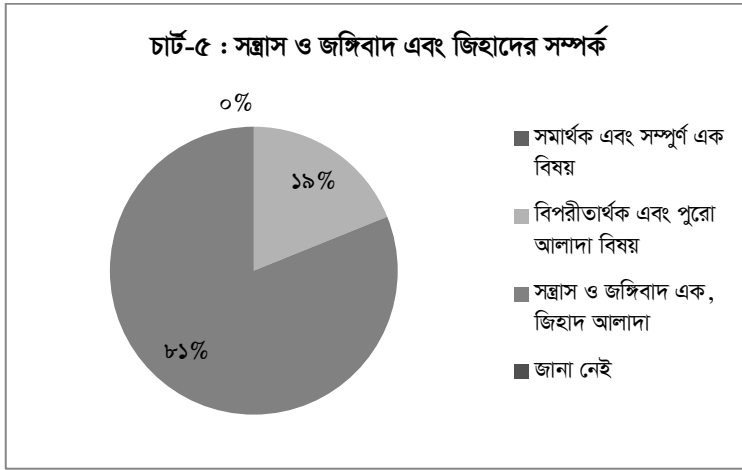


তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ২০% ভাগ মুসলিম তরুণ জিহাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করে। তাদের ধারণা অনুসারে জিহাদ হলো অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ। অথচ জিহাদের দূরতম অর্থের সাথেও এ ধারণার সম্পর্ক নেই। ৩০% ভাগের ধারণা ক্রটিযুক্ত। তারা মনে করে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে কোনো প্রচেষ্টাই জিহাদ। অথচ মহান আল্লাহ অনুমোদন করেননি ও তাঁর রাসুল (সা.) অনুশীলন করেননি এমন কোনো পদ্ধতির চেষ্টাকে জিহাদ বলা যায় না। ৫০% ভাগ শিক্ষার্থীর ধারণা প্রকৃত সত্যের অনুরূপ। এর অর্থ হলো ন্যূনতম ৫০% ভাগ শিক্ষিত মুসলিম তরুণ জিহাদের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে অবগত নয়।

৪.৫ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক

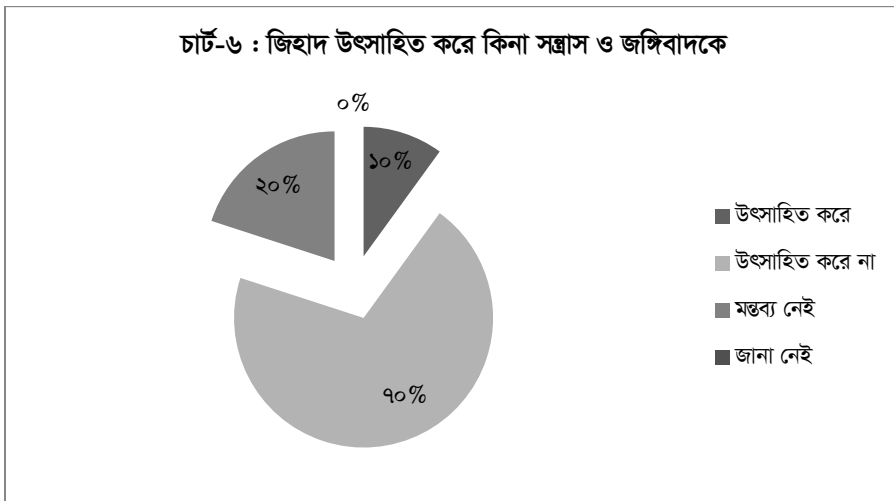
প্রকৃতি ও পদ্ধতি অনুসারে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা কর্মপদ্ধতিতে কোথাও কোথাও ভিন্নতা থাকলেও মানবতার জন্য দুটিই মহাহুমকি। জিহাদ এ দুটো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। মুসলিম তরুণরা এ প্রশ্নে তাদের প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে। তারা কেউ-ই জিহাদের সাথে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে সমার্থক বা একীভূত বিষয় বলে বর্ণনা করেননি। সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় কোনো মুসলিম তরুণ শিক্ষার্থীই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে সমার্থক এবং সম্পূর্ণ এক বিষয় বলেনি। ১৯% ভাগ শিক্ষার্থী তিনটি বিষয়কে আলাদা এবং বিপরীতার্থক বলেছে। ৮১% ভাগ শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসকে অভিন্ন মনে করে আর জিহাদকে জানে এ দুটি থেকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে। ইতঃপূর্বের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান গ্রহণীয় স্তরের বলেই প্রতীয়মান হয়।



তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

৪.৬ জিহাদ কি সন্ত্রাসবাদের উত্সাহদাতা?

জিহাদ কর্মসূচির মূলকথা হলো পৃথিবী থেকে অশান্তি নির্মূল করা, শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষের জীবন, সম্মান ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ হিসেবে জিহাদ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে কাজ করে। কোনোভাবেই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টিতে উত্সাহ দেয় না। কিন্তু সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মুসলিম শিক্ষার্থীদের এ সংক্রান্ত জ্ঞানের স্তর আশংকাজনক।



তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

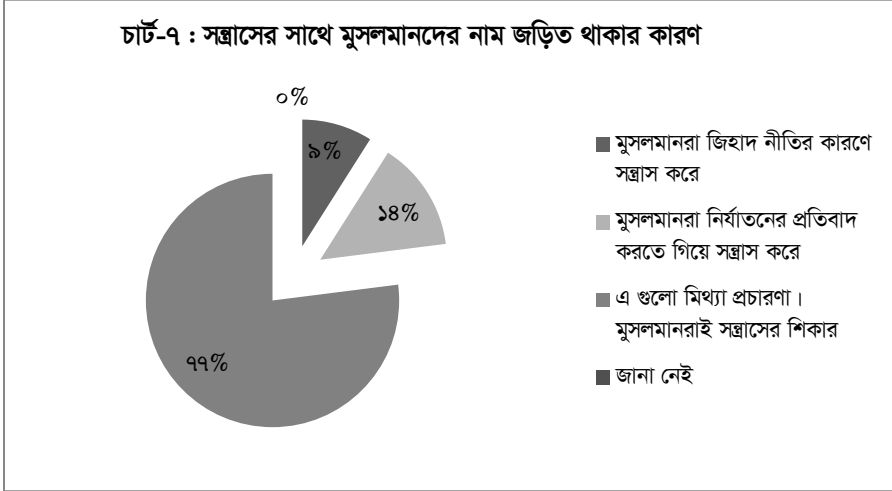
৭০% শিক্ষার্থী বলেছে, জিহাদ কোনোভাবেই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করে না। ২০% ভাগ কোনো মন্তব্য করেনি। প্রশ্নপত্রে 'জানা নেই' বিকল্প ছিলো কিন্তু তারা সেটি পূরণ করেননি। তারা মন্তব্য নেই বিকল্প গ্রহণ করে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখায় মনোযোগী হয়েছেন। আর ১০% ভাগ সরাসরি বলেছে, জিহাদ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মুসলিম শিক্ষার্থীরা যদি এমন ধারণা পোষণ করে, তাহলে অমুসলিম শিক্ষার্থী এবং অশিক্ষিত মুসলিম তরুণদের জিহাদ বিষয়ে জ্ঞানের স্তর নিঃসন্দেহে আরও ভীতিপ্রদ হওয়ার কথা।

৪.৭ জিহাদ সম্পর্কে অধ্যয়ন

শিক্ষার্থীরা জিহাদ সম্পর্কে কোন উৎস থেকে জেনেছে বা তাদের জ্ঞানের উৎস কী তা শনাক্ত করার জন্য প্রশ্নপত্রে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদেরকে জিহাদ সম্পর্কে অধ্যয়নকৃত ন্যূনতম ১টি গ্রন্থের নাম লেখতে বলা হয়েছিলো। ৬৯% ভাগ শিক্ষার্থী জানিয়েছে, তারা এ সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ পাঠ করেনি। ৩১% ভাগ ন্যূনতম ১টি বইয়ের নাম লিখেছে সত্য কিন্তু বেদনাদায়কভাবে সে বইগুলোর ২৩টিই জিহাদ সম্পর্কিত বই নয়। ৮জন শিক্ষার্থী একাধিক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলো গ্রহণীয় মানের বই। এ তথ্য ভীষণ ভীতিকর। মুসলিম তরুণ শিক্ষার্থীরা ইসলাম সম্পর্কে কুরআন মজীদ বা হাদিস কিংবা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে জানছে না, জানার সুযোগও পাচ্ছে না। ফলে অদূর ভবিষ্যতে অমুসলিমদের চেয়ে শিক্ষিত এ সকল তরুণরাই ইসলামের বিপক্ষে প্রবল শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

৪.৮ সন্ত্রাসবাদের সাথে মুসলমানদের নাম জড়িত থাকার কারণ

পৃথিবীতে কোনো মুসলিম দেশ সামরিক বা আর্থিক দিক দিয়ে এতোটা শক্তিশালী নয় যে, অমুসলিম দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। প্রতিটি মুসলিম দেশই অসংখ্য অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত এবং একান্তভাবে অমুসলিম পরাশক্তিগুলোর সমর্থন প্রত্যাশী। তা সত্ত্বেও দেশে দেশে নানা সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে মুসলিমদের নামই প্রচারিত হয় বেশি। মুসলিম তরুণদের জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতার বিষয়টি এখানেও উঠে এসেছে। ৭৭% ভাগ বলেছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এগুলো মিথ্যা প্রচারণা। আসলে মুসলমানরাই সন্ত্রাসের শিকার। অবশিষ্ট ২৩% ভাগ শিক্ষার্থীর বক্তব্য বিপরীত বার্তা প্রদান করে। ৯% ভাগ তো মনে করে মুসলমানদের জিহাদ নীতির কারণে তারা সন্ত্রাস করে এবং এ কারণে সন্ত্রাসের সাথে তাঁদের নাম জড়িত থাকে। অর্থাৎ এরা জিহাদকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নিয়ামক বিষয় মনে করে। বাকী ১৪% ভাগ মনে করে, মুসলমানরা নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরে বলেই এভাবে তাদের নাম জড়িত হয়। অথচ বাস্তবতা হলো, নিপীড়িত মুসলিমরা জাতিগতভাবে পৃথিবীর কোথাও প্রতিবাদ করার অবস্থায় নেই। কোনো কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত, তবে সেটা ধর্মীয় কারণে নয় বরং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে, যেমন সন্ত্রাসের সাথে জড়িত পৃথিবীর বিভিন্ন মাফিয়া গোষ্ঠী, ইসলাম ধর্ম বা মুসলিম জাতির এগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।



তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

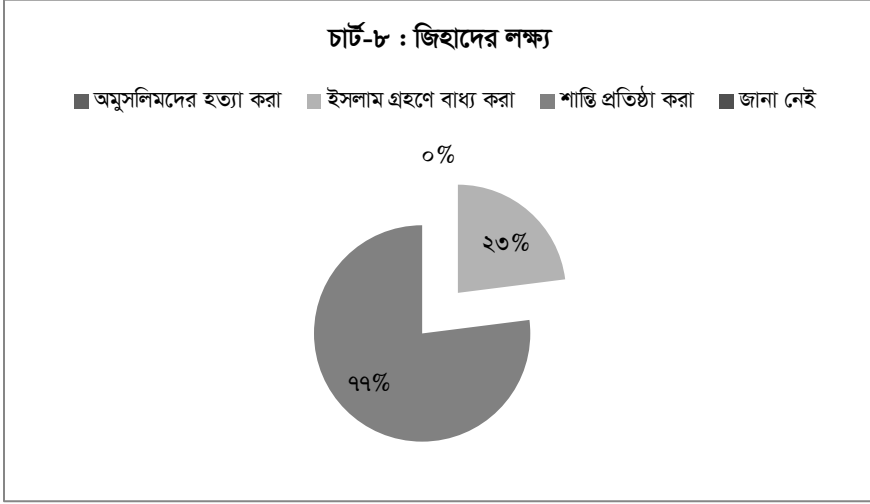
৪.৯ জিহাদের লক্ষ্য

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা জিহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান অশান্তি দূর করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া জিহাদ। কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা জিহাদের লক্ষ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ আপনার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পৃথিবীর সব লোকই ঈমান আনত। তাহলে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জোর প্রয়োগ করবেন?”^{১৯}

অথচ ২৩% ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থী এ সম্পর্কে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত রয়েছে। তারা মনে করে, জিহাদ পরিচালনার লক্ষ্য হলো অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা। নিম্নে চার্টে বিষয়টির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।



তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

৪.১০ যুদ্ধের সময় যাকে হত্যা করা বৈধ

ইসলামে হত্যাযোগ্য অপরাধে আইনগতভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া ব্যতীত কোনো মানুষ হত্যা করা নিষেধ। ধর্ম, বর্ণ, বয়স, জাতি, বিভ্র, ক্ষমতা কোনো বিবেচনাতেই মহান আল্লাহ মানুষ হত্যার অনুমতি প্রদান করেননি। তিনি বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করলো, সে যেনো সকল মানুষকে হত্যা করলো।^{২০}

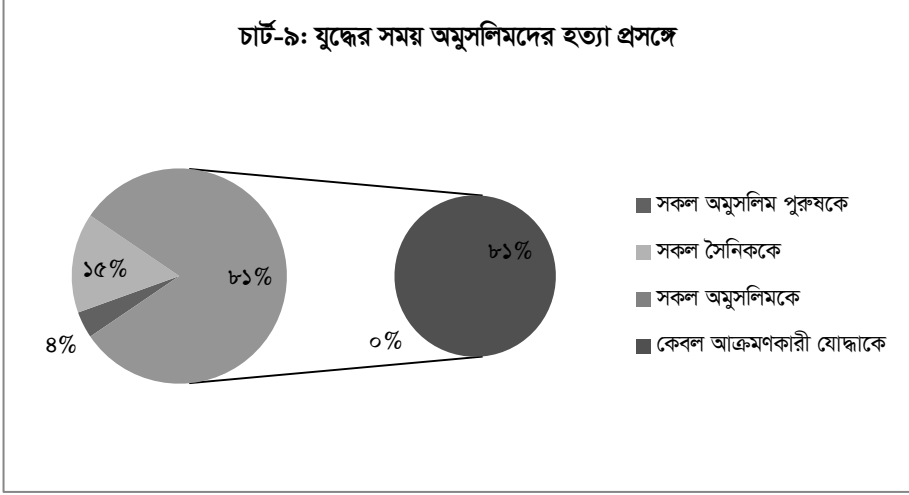
তাই স্বাভাবিক অবস্থায় বেআইনীভাবে কাউকে হত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। তবে কেউ যদি অপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। যুদ্ধ একটি ব্যতিক্রমী অবস্থা। এ সময় একপক্ষ অন্যপক্ষকে পরাজিত করার লক্ষ্যে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে জড়িয়ে যায়। এ অবস্থায়ও ইসলাম কেবল যুদ্ধে জয়লাভের জন্য নির্বিচারে অমুসলিম নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ এবং বিশ্রামকারী শত্রুসেনাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করে না। এমন নাজুক সময়ও ইসলাম কেবল তাদেরকে হত্যা করারই বৈধতা প্রদান করে, যারা মুসলিমকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

অর্থাৎ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে সীমালংঘন কর না।^{২১}

মুসলিম তরুণদের এ সংক্রান্ত ধারণায়ও যথেষ্ট বিদ্রান্তি রয়েছে। যেমন,

চার্ট-৯: যুদ্ধের সময় অমুসলিমদের হত্যা প্রসঙ্গে



তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

৮১% ভাগ শিক্ষার্থী কেবল আক্রমণকারী অমুসলিম যোদ্ধাকে হত্যা করার কথা বললেও ১৯% ভাগ বলছে ভিন্ন কথা। তাদের ৮% ভাগ সকল অমুসলিমকে হত্যার পক্ষে আর ১৫ ভাগ মনে করে আক্রমণ করুক বা না করুক, সৈনিকদেরকে অবশ্যই হত্যা করা যাবে। বাস্তবে বিষয়টি এমন নয়। বাস্তবে কেবল আক্রমণকারীকেই মুসলিমরা হত্যা করতে পারবে।

৪.১১ সন্তাসবাদ সম্পর্কে ইসলামের বিধান

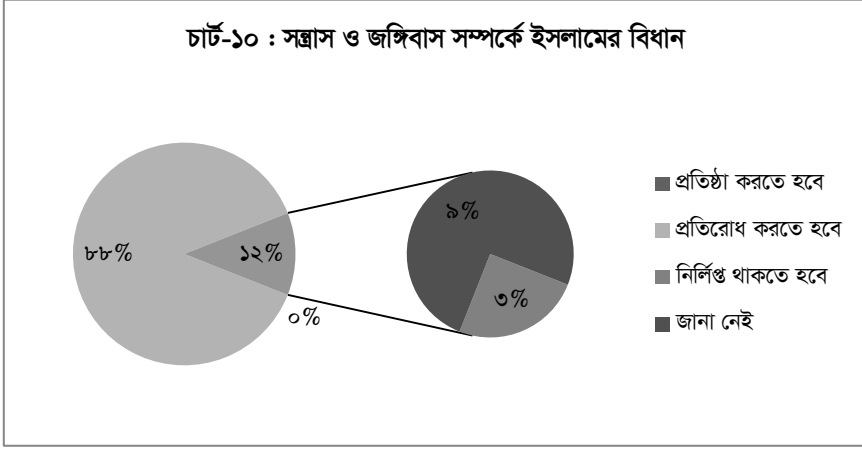
ইসলাম সন্তাস ও জঙ্গিবাদ মূলোৎপাটনকে মুসলমানদের আবশ্যিক কর্তব্য বলে ঘোষণা করে। সমাজে যারা বিশৃঙ্খলা-অরাজকতা সৃষ্টি করে তাদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ত্রুশবিদ্ধ করা হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এটা হলো তাদের পার্থিব শাস্তি। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।^{২২}

অন্যত্র রয়েছে: যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিশম্পাত।^{২৩}

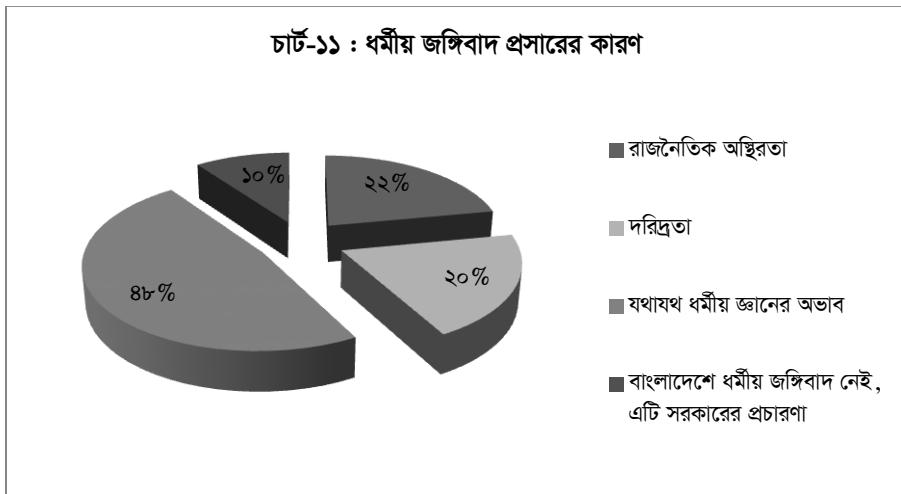
৮৮% ভাগ শিক্ষার্থী সন্তাস প্রতিরোধের কথা বললেও ১২% ভাগ শিক্ষার্থী এ ব্যাপারে ভিন্ন কথা বলেছে। ৯% ভাগ বলেছে, এ সম্পর্কে ইসলামের কী বিধান তা তারা জানে না আর ৩% ভাগ বলেছে, এমন অবস্থায় মুসলমানদের নির্লিপ্ত থাকা কর্তব্য। উভয় বক্তব্যই ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান ও বক্তব্য বিরোধী। চার্টে শিক্ষার্থীদের বক্তব্যের চিত্র দেখানো হয়েছে।



তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

৪.১২ বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ প্রসারের কারণ

আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ নামে যে অপতৎরতাকে পরিচিত করা হয়েছে তা নিতান্তই সন্ত্রাসবাদ। ধর্মের সাথে এর কোনো সংশ্লিষ্ট নেই। কেননা ইসলাম সকল ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে নির্মূল করার লক্ষ্যে জিহাদ প্রবর্তন করেছে আর সে জিহাদের অপব্যখ্যা করে দেশে দেশে ইসলামবিদ্বেষী অশুভ শক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের নামে বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে এবং করছে, ইসলামের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশেও এ জাতীয় কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করা যায়।^{২৪} ইসলামের অবস্থান সরাসরি জঙ্গিবাদের বিপক্ষে হওয়ার পরও দেশে এভাবে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ প্রসারের কী কারণ হতে পারে, তার উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে তরুণ মুসলিম শিক্ষার্থীদের নিকট।

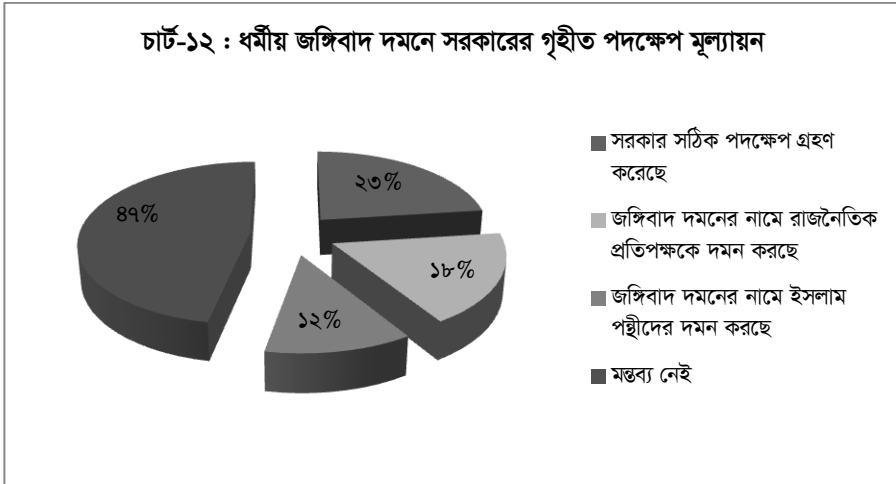


তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

৯০% ভাগ শিক্ষার্থী বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ প্রসারের নেপথ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দরিদ্রতা এবং যথাযথ ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এ কারণগুলোর সবই যৌক্তিক। আসলে একক কোনো কারণে নয় বরং অনেকগুলো যৌগিক কারণের ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলাদেশে ধর্মের নামে জন্ম নেয়া জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। ১০% ভাগ শিক্ষার্থী অবশ্য পুরোপুরি বিপরীত বক্তব্য দিয়েছে। তাদের মতে, দেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ নেই, এটি সরকারের প্রচারণা।

৪.১৩ ধর্মীয় জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সরকারের পদক্ষেপ

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় জঙ্গিবাদী তৎপরতার সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। সরকার স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এ সকল তৎপরতা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাৎক্ষণিক অভিযানে অধিকাংশ জঙ্গি নিহত হয়েছে, কেউ কেউ আইনের অধীনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। ধর্মীয় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে। সরকারের এ নীতি ও পদক্ষেপের ব্যাপারে তরুণ মুসলিম শিক্ষার্থীদের ধারণা তুলে ধরা হয়েছে নিচের চার্টে।



তথ্য উৎস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জানুয়ারি ১৫-১৯, ২০২০

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত ধর্মীয় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের মূল্যায়নে তরুণ মুসলিম শিক্ষার্থীদের মতামত সে অর্থে জানা যায়নি। কারণ ৮৯% ভাগ শিক্ষার্থী এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি। ২৩% ভাগ সন্তোষ প্রকাশ করেছে। ১৮% ভাগ মনে করছে এর মাধ্যমে সরকার মূলত তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করছে আর ১২% ভাগের ধারণা ধর্মীয় জঙ্গিবাদ দমনের নামে সরকার মূলত ইসলাম-পন্থীদের দমন করছে।

৫. উপসংহার

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মুসলমানরা সাধারণভাবে ধর্মভীরু হিসেবে খ্যাত হলেও তাদের অধিকাংশের ধর্মভীরুতার ভিত্তি জ্ঞান নয়। তারা নিজেরা কুরআন, হাদিস ও ইসলামি সাহিত্য অধ্যয়ন করে ইসলামকে জেনে ও বুঝে ইসলামের হুকুম-আহকাম মেনে চলেন না। বরং তারা

চালিত হন ধর্মীয় আবেগ দিয়ে, উদ্বুদ্ধ হন বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত ধর্মীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে। ধারণা করা হয়েছিল, এ ধারণা নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের ক্ষেত্রে সত্য হলেও উচ্চশিক্ষিত মুসলিম তরুণদের ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু 'জিহাদ এবং সম্মেলন ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে মুসলিম শিক্ষার্থীদের ভাবনা : ইসলামের আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি মূল্যায়ন' শীর্ষক সমীক্ষা ও মূল্যায়ন এ ধারণা পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে, বাংলাদেশের আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই যে সকল শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে, মাদরাসা শিক্ষা বা উচ্চতর পর্যায়ে ইসলাম শিক্ষা গ্রহণ করেনি, ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণাও সুস্পষ্ট নয়। সমীক্ষার প্রশ্নপত্র পূরণে তারা জ্ঞানের চেয়ে তাদের উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করেছে বেশি, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের জবাব ইসলাম-সম্মত হয়েছে কিন্তু মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে তা প্রতিফলিত হয়ে ওঠেনি। যেমন জিহাদ সম্পর্কে তাদের ৯২% ভাগ কোনো মৌলিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেনি। জ্ঞানের এমন দীনতা নিয়ে, ইসলাম সম্পর্কে এত কম জ্ঞান নিয়ে উচ্চশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা নিজেদের উন্নত নৈতিক আদর্শ গঠনে যেমন ব্যর্থ হচ্ছে তেমনি ইসলামের কালজয়ী আদর্শ জীবনে ধারণ করার মহাসৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে, যার পরিণাম হিসেবে দেশে দুর্নীতি-বিরোধী, দেশ ও দেশের জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত এবং চূড়ান্তভাবে মহান আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার প্রবল চেতনায় উদ্ভাসিত প্রত্যয়ী ও নীতিবান তরুণদের সেবা থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থা প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামের আদর্শিক শিক্ষা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকা আবশ্যিক। এটি করা সম্ভব হলে সম্মেলন ও জঙ্গিবাদ নিরসনে সরকারের নিয়মিত বাহিনীগুলোর পাশাপাশি ইসলামের আদর্শিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ মুসলিম শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে সামাজিক উদ্যোগে সম্মেলন ও জঙ্গিবাদ নিরসনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবে। এভাবে সমন্বিত উদ্যোগে বাংলাদেশে অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

- ১ Josef W. Meri, *Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia* (Routledge : 2005) p. 419
- ২ Wendy Doniger (Editor), *Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions* (Merriam-Webster : 1999), p. 571
- ৩ Bernard Lewis, *The Political Language of Islam* (University of Chicago Press : 1988), p. 72
- ৪ Shaykh Hisham Kabbani, 'Jihad - A Misunderstood Concept from Islam', *The Muslim Magazine* (http://www.sunnah.org/fiqh/jihad_judicial_ruling.htm), 16.08.2006
- ৫ http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/jihad_1.shtml 'Jihad' (BBC), 2009-08-03
- ৬ John Esposito, *Islam: The Straight Path* (Gallup: 2007), pp. 93

- ৭ B.A. Robinson, 'The Concept of Jihad Struggle in Islam' *Ontario Consultants on Religious Tolerance*, (http://www.religioustolerance.org/isl_jihad.htm) August 16, 2006
- ৮ Mahmoud Al-Batal, *Al-Kitaab fii Tacllum al-Arabiyya*, Part II (Washington, DC: Georgetown University Press, 2006, ISBN 978-1-58901-096-3), p. 46
- ৯ M. Amir Ali, Ph.D. *Islam, Jihad, and Terrorism*, (http://www.aboutjihad.com/terrorism/islam_jihad_terrorism.php) 25.12. 2012
- ১০ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০০), পৃ. ১১১৩
- ১১ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, মে ১৯৯৭), পৃ. ৬৬১
- ১২ ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে আরব রাষ্ট্রগুলোর স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত সংজ্ঞা।
- ১৩ প্রথম আলো, যুগান্তর, ইত্তেফাকসহ প্রায় সকল পত্রিকায় এবং বিটিভি, এনটিভি, চ্যানেল আই, এটিএনসহ সকল প্রচারমাধ্যমে ১ জুলাই ২০১৬ তারিখে হলি আর্টিজেনে হামলার যে ব্রিফিং ও সংবাদ প্রচারিত হয়েছে তাতে একে জঙ্গিবাদী হামলা হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। একইভাবে ইতোপূর্বের যশোরে ১৯৯৯ সালে ৬ মার্চ উদীচীর অনুষ্ঠানে হামলা, ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট প্রতি জেলায় একযোগে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদিকে জঙ্গিবাদ নাম দিয়ে এগুলোর সাথে ধর্মের একটি সংযোগ অবিস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ এগুলো সম্ভ্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য হওয়াই যথার্থ ছিল। দেখুন: জাতীয় দৈনিকসমূহ, ২ জুলাই ২০১৬; ৭ মার্চ ১৯৯৯; ১৮ আগস্ট ২০০৫
- ১৪ সাপ্তাহিক ২০০০ (ঢাকা: ৩০ অক্টোবর ২০০৯, বর্ষ ১২ সংখ্যা ২৫), পৃ. ১২
- ১৫ দেখুন: ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের বিধান : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ* (ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অক্টোবর ২০১৭), পৃ. ২২৫-২৬
- ১৬ দ্রষ্টব্য: আল-কুরআন, ২: ১১ ও ১৯১
- ১৭ তরজমা ও সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল করীম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ২০১০), পৃ. ৪৭, টীকা-১৩৩
- ১৮ প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, *তানভীরুল কুরআন* (ঢাকা: অবেষা প্রকাশন, ২০০৯), পৃ. ২৭
- ১৯ আল-কুরআন, ১০: ৯৯
- ২০ আল-কুরআন, ৫: ৩২
- ২১ আল-কুরআন, ২: ১৯০
- ২২ আল-কুরআন, ৫: ৩৩
- ২৩ আল-কুরআন, ১৩: ২৫
- ২৪ গুলশানের হলি আর্টিজেন নামক রেস্তোরাই ১ জুলাই ২০১৬ রাত আটটায় আকস্মিকভাবে কয়েকজন জঙ্গি সশস্ত্র অবস্থায় ঢুকে পড়ে। তারা রেস্তোরাইর সকলকে জিম্মি করে। রেস্তোরাইর অবস্থানরত ইতালি ও জাপানসহ ২২জন বিদেশি নাগরিককে গুলি করে হত্যা করে, পরে জবাই করে। ২ জুলাই সকালে

সেনাবাহিনীর কমান্ডো ইউনিট রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে সকল জঙ্গিকে হত্যা করে জিম্মি দশার অবসান ঘটায়। অভিযানের শুরুতে জঙ্গিদের হেনেড়ে পুলিশের ২ জন কর্মকর্তা নিহত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ জাতীয় হত্যাকাণ্ডের এটিই প্রথম এবং বড় ঘটনা। সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক ইত্তেফাক, ০৩ জুলাই ২০১৬, পৃ. ১

নমুনা প্রশ্নপত্র : লিখুন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক মার্ক দিন

১. নাম :
২. পিতার নাম :
৩. মাতার নাম :
৪. জন্ম তারিখ :
৫. সেল ফোন নম্বর :
৬. বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় :
৭. শিক্ষাবর্ষ :
৮. পরিবারের আয়ের উৎস :
ক) ব্যবসা খ) কৃষি গ) চাকুরি ঘ) অন্যান্য
৯. পরিবারের ধর্মীয় প্রকৃতি :
ক) পূর্ণ ধর্মভীরু খ) আংশিক ধর্মভীরু গ) ধর্মহীন ঘ) ধর্মবিদ্বেষী
১০. পরিবারের রাজনৈতিক প্রকৃতি :
ক) প্রচলিত রাজনীতি খ) ইসলামী রাজনীতি গ) রাজনীতিতে অনাগ্রহী ঘ) রাজনীতি বিদ্বেষী

সমীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন

১. কোনটি জিহাদ?
ক) অমুসলিমের সাথে যুদ্ধ খ) ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে কোনো প্রচেষ্টা
গ) ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে কোনো বৈধ প্রচেষ্টা ঘ) জানা নেই
২. সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও জিহাদের সম্পর্ক কী?
ক) এগুলো সমার্থক এবং সম্পূর্ণ এক বিষয় খ) এগুলো বিপরীতার্থক এবং পুরোপুরি আলাদা বিষয়
গ) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ এক, জিহাদ পুরো আলাদা ঘ) জানা নেই

মিথের বিনির্মাণ: চাঁদ বণিকের পালা

সান্জীদা মাসুদ*

Abstract

Dramatist Shambhu Mitra's self-created artistic belief & thought has manifested itself in the play *ÔChad Baniker Pala*. In this play, he assumed the interesting and popular myths of Chand-Mansa, Behula-Lakshinder as a medium to portray the reality of the society and to seek for the innermost human being. This play cherishes the fact that it can extend to all times and cultures without being a part of any particular era, time and civilization. Literally, this play reflects the aesthetic expression of the dramatist. I have tried to analyze the myth of this play through Jacques Derrida's theory of deconstruction. Shambhu Mitra shows his individuality, uniqueness and skill in the construction of drama-narratives, character renovation, linguistic diversity and the inspiration of modern consciousness.

চাবিশব্দ: মিথ ও মনসামিথ, বিনির্মাণবাদ, বহুস্বর, লোকপুরাণ, আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা

ভূমিকা

শম্ভু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭) যে অফুরান প্রাণশক্তি নিয়ে থিয়েটার-জার্নি শুরু করেছিলেন, ভারতীয় নাট্যজগতে তা অনন্য। ‘নবনাট্য’, ‘গণনাট্য’-এর আদর্শ ধারণ করে উপাত্তে সেটিকে ছাড়িয়ে একক প্রতিভাবলে নবনাট্যধারা নির্মাণে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যয়ী, আন্তরিক, পরিশ্রমী এবং সফল। রাজনীতির টালমাটাল পরিমণ্ডল, ব্যক্তিক আক্রমণ-আক্রোশ এবং অসূয়া-পক্ষিল আবেষ্টনী থেকে তিনি নিজে মুক্ত হতে চেয়েছেন আর সেই সঙ্গে মুক্তধারায় এগিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছেন বাংলা নাটকের পালা-বদলের যাত্রাবিন্দুকে। তাঁর স্বসৃজিত শিল্পবিশ্বাসের একটি নান্দনিক প্রকাশ *চাঁদ বণিকের পালা* (১৯৭৭)। তাঁর মিথ-ব্যবহারের ভাবানুশঙ্গ প্রকৃতপক্ষে নবসৃষ্টির উন্মাদনা। তিনি এ নাটকে চাঁদ-মনসা, বেহুলা-লখিন্দরের আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় মিথকথাকে স্বকাল ও সমাজের বহির্বাস্তবতার চিত্রায়ণে এবং মানুষের অন্তর্দর্শের অনুসন্ধানের আয়ুধ হিসেবে গ্রহণ করেন। আমাদের অতি পরিচিত একটি আখ্যানকে কীভাবে নতুন পটে প্রাসঙ্গিক করে তুললেন, কীভাবে এর মধ্যে বহুপাঠের সম্ভাবনা সঞ্চারিত করলেন এবং সর্বোপরি কীভাবে এর বহুস্তর বিশিষ্ট প্রকরণকে পুনর্বিন্যাস-সম্ভব করে তুললেন- বর্তমান প্রবন্ধে রয়েছে এসবেরই নিবিড় বিশ্লেষণের প্রয়াস।

২. মিথ ও মিথের বিনির্মাণ

মিথের প্রতি রয়েছে মানুষের সুতীব্র আকর্ষণ। সাহিত্যিক তাঁর নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য-মিথকথা, শিল্প-সংস্কৃতি থেকে কোনো কিছু সৃষ্টির অনুপ্রেরণা ও উপকরণ আহরণ করেন। আধুনিক জীবন-জটিলতায় আটকে-পড়া মানুষ জীবনের অর্থ খুঁজে ফেরে নানা উৎসে। সংরক্ত সমকালীনতার সংস্পর্শে এসে মিথ তার সুপ্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে জীবনের নতুন অর্থ ও তাৎপর্য আনে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), ডব্লিউ বি ইয়েটস্ (১৮৬৫-

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

১৯৩৯), জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১), টি এস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), সুবীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)-সহ দেশ-বিদেশের অধিকাংশ লেখকের রচনার একটি বড় উপাদান হিসেবে মিথ ব্যবহৃত হয়েছে।

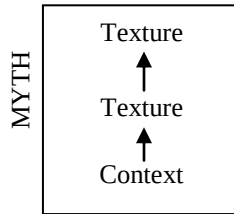
২.১

আধুনিককালে মিথ বলতে সুপ্রাচীনকালের সত্য, বিশ্বস্ত ও পবিত্র বলে ব্যক্তি ও সমাজ মনস্তত্ত্বে প্রোথিত ঘটনা বোঝায়। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য, জন্ম-পুনর্জন্ম ও মৃত্যু, অলৌকিক-অতিলৌকিক ঘটনা, দেবনির্ভর অনুষ্ণ মিথের পরিধিভুক্ত। মিথ এক অর্থে মানব ইতিহাসের চেয়েও পুরনো। মানব সংস্কৃতির মৌল উপাদান মিথ। প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব মিথ-জগৎ থাকে। বিশ্বে এমন কিছু বিষয় বা ঘটনা রয়েছে, যেগুলো মানুষের অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে এবং সেগুলোর যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা নেই। অব্যাক্ষাত ও অনভিজ্ঞতার জগৎকে কল্পনাশক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে মীমাংসায় পৌছতে চায় মানুষ। এ থেকেই মিথকথার সূচনা। “লেভি স্ট্রাস দেখিয়েছেন যে, মানুষের সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক জগতের রহস্যের ব্যাখ্যায় মিথ মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছে এবং এটি মানব মনের মৌলিক প্রবণতা- যার সূচনা দেখা যায় আদি যুগে।^১ জোসেফ ক্যাম্ববলের মতে, মিথ মানবজীবনের আত্মিক সম্ভাবনার সংকেত চাষি।^২ অপরদিকে পাশ্চাত্য নৃতাত্ত্বিকদের অভিমত অনুসারে, মিথ হলো সমগ্র মানবজাতির আদি-ইতিহাসের অংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য “The myth is the central informing power that gives archetypal significance to the ritual and archetypal narrative to the oracle.”^৩ সুতরাং মানুষের অভিব্যক্তি ও কল্পনার সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি চেতনার নাম মিথ, যা একই সঙ্গে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের চেতনাকে ধারণ করে। অর্থাৎ, অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র গড়ে তোলে। এটি মানব জীবনের অন্তঃশায়িত সত্যের রূপকায়িত কাঠামো।

২.২

সমাজ-সংস্কৃতি মিথের পুনর্মূল্যায়ন করে, পুনর্জন্ম দেয়। মিথের রূপান্তর ঘটেছে মধ্যযুগেই। আদি রামায়ণ ও মহাভারত পুরাণের আশ্রয়ে লেখা কাব্য। বিভিন্ন জাতকের কাহিনি, লোককাহিনিরও রূপান্তর ঘটেছে। মিথ রূপান্তরিত হয় গানে, প্রবাদে, বাগধারায়। আসলে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির ভিতরই মিথের রূপান্তর-প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে। মিথের রূপান্তর প্রক্রিয়াটি এমন:

“



এই তিনটি স্তরকে যথাক্রমে ‘অন্তলীন প্রেক্ষিত’ [পরিপ্রেক্ষিত অর্থে ব্যবহৃত], ‘মূল উপজীব্য’ এবং ‘বহির্বিন্যাস’ বলে অভিহিত করা যায়। মিথের অন্তলীন প্রেক্ষিতটি ‘শিকড়’, মিথের কাহিনিটি হচ্ছে ‘ঐতিহ্য’ আর বহির্বিন্যাসটি হলো ‘আধুনিক রূপান্তর’। ... যখনই মিথের মূল কাহিনিকে ভেঙে চুরে কেউ লেখেন, তখনই তাতে নতুন একটি তাৎপর্য এসে সংযুক্ত হয়। এই ভাঙাচোরার ফলে মূল অভিজ্ঞানটি বহুলাংশেই হয় রূপান্তরিত।”^৪ রামায়ণের কাহিনি-অংশকে নিয়ে রচিত দণ্ডকারণ্য নাটকে মুনীর চৌধুরী মূল কাহিনি থেকে সরে এসে এক নারীতে আকৃষ্ট দুই পুরুষের মন-জটিলতার আখ্যান তৈরি করলেন। একটি গুরুগম্ভীর বিষয়কে হালকা চালে, কমেডির চাপল্যে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক দণ্ডকারণ্যকে আধুনিক দণ্ডকারণ্যে রূপান্তরিত করলেন। আবার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পথের পাঁচালী-অপরাজিত উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাস করেন মিথকথার প্যাটার্নে। চাঁদ বণিকের পালা- তেও মিথের নান্দনিক রূপান্তর ঘটেছে, যা প্রবন্ধের বিবেচ্য বিষয়।

৩. মনসা মিথ: রূপ ও রূপান্তর

মিথ সময় পেরিয়ে, ভূগোল-সীমা ছাড়িয়ে ও সমাজ-কাঠামোর পালাবদলে অভিনব অর্থ তৈরির সামর্থ্য লাভ করে। মানবচেতনায় বদ্ধমূল থাকা মিথকথার সঙ্গে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার মিশেলে সাহিত্যিক শিল্পের নতুন ব্যাখ্যান তৈরি করেন। প্রসঙ্গত, বুদ্ধদেব বসু তপস্বী ও তরঙ্গিনী, ইক্কাকু সেন্নিন নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের আশ্রয় নিয়েছেন একেবারেই দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি ভারতীয় ঋষ্যশৃঙ্গকে জাপানের ইক্কাকুর অবতার বলেছেন। “...‘ইক্কাকু সেন্নিন’ থেকেই বোঝা যায়... হিন্দু রসবস্তুর কেমন চমকপ্রদ নতুন রূপে সাজিয়েছিলেন। কিন্তু শুধু রূপান্তর নয় এটাকে জন্মান্তর বলেও অত্যাতি হয় না।”^৫ প্রকৃতই “যুগপৎভাবে কবিতার কাব্যসত্য, ছোটগল্পের গভীরতা ও ব্যাপ্তি এবং অনির্বচনীয় নাট্য মুহূর্তের আকস্মিকতা ও অনির্ণেয় রহস্যময়তার ঐশ্বর্যে ঋষ্যশৃঙ্গ পুরাকাহিনি সমৃদ্ধ।”^৬ একইভাবে, কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ ও ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতার শিব ধ্বংস ও সৃজন বেদনায় চঞ্চল; আর ‘মানুষ’ কবিতার শিব শান্ত, শাশানচারী, উদাসী। অতএব, মিথ রূপান্তরিত হয় এবং সৃজন করে নতুন জীবনবেদ, সুর-স্বর-গন্ধ-স্বাদ। একটি বিশিষ্ট মিথিক উৎস হিসেবে মনসা মিথও নানানভাবে ব্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনা রাখে।

মনসার পূজার প্রসার-বিষয়ক আখ্যানধর্মী রচনা মনসামঙ্গল কাব্য। চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্ব ও বেহুলার সমাজ-প্রত্যাশিত পরীক্ষামূলক এ কাব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলা সাহিত্য মনসা-চাঁদ মিথের বৈচিত্র্যমণ্ডিত প্রয়োগে সমৃদ্ধ। মৈমনসিংহ গীতিকা-র ‘মল্লয়া’, ‘মলুয়া’, ‘কমলা’, দেওয়ানা ভাবনা’ ‘দস্যু কেনারামের পালা’ প্রভৃতিতে মনসা মিথের উল্লেখ রয়েছে। আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ “বাংলার মুখ আমি” (রূপসী বাংলা) কবিতায় বাংলার নিসর্গের অংশ হিসেবে লোকপুরাণের চাঁদের ডিঙা, বেহুলার ভেলা, গাঙুর নদী, চাঁদ শব্দপ্রতীকে যেন সময়াতীত জগতের সঙ্গে সমকালের যোগাযোগ স্থাপন করেন। আবার, শামসুর রাহমানের ‘চাঁদ সদাগর’ (মাতাল ঋতুক) কবিতার চাঁদ এখানে পরাজয় না-মানা ব্যক্তিচরিত্রের প্রতিরূপক হিসেবে চিহ্নিত। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মনসা মিথানুধঙ্গী চেতনা। তাঁর ‘বেদিনী’, ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পে এবং হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী প্রভৃতি উপন্যাসে মনসা মিথের স্মরণ তাৎপর্যপূর্ণ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ‘পরাজয়’ গল্পে চরাঞ্চলের স্থাপদসংকুল প্রতিবেশে কুলসুমের স্বামী ছমিরের সর্পদংশনে মৃত্যুর কাহিনি লিখে পাঠককে যেন মনসা মিথের কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন। অমিয়ভূষণ মজুমদার এবং সেলিনা হোসেন উভয়েই

চাঁদবেনে নামে উপন্যাস লেখেন, যেখানে মনসা মিথের আধুনিক রূপায়ণ ঘটেছে। আবার অশ্রুকুমার সিকদার “বারে বারে চম্পকনগর” প্রবন্ধে (চোখের দুটি তারা) সাহিত্যে মনসামিথের নান্দনিক প্রয়োগ নিয়ে আলোকপাত করেন।

মনসা মিথের রূপান্তরক্ষমতা ও বহুপার্ঠের সম্ভাবনা তাত্ত্বিক কাঠামোয় বিশ্লেষিত হলে এর তাৎপর্য আরও নিবিড়ভাবে অনুধাবন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গেই আসে জ্যাক দেরিদার (১৯৩০-২০০৪) বিনির্মাণ তত্ত্বের কথা। দেরিদার বিনির্মাণবাদ (Deconstruction) এমন একটি সাহিত্য-প্রত্যয় যা সাহিত্য সমালোচনার পূর্বতন ধারণাসমূহ আমূল পালটে দেয়। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে উদ্ভূত এ তত্ত্বকে দেরিদা পাঠ-ব্যাখ্যা ও লেখার একটি বিশেষ রীতি হিসেবে চিহ্নিত করেন। আকরণবাদীদের লোগোসেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, কোনো একটি বিষয় বা ঘটনার নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকবে। দেরিদা এই চূড়ান্ত, নির্দিষ্ট ও একক সর্বস্বতার দাবিকে নাকচ করে অসংখ্য কেন্দ্র তৈরির সম্ভাবনার কথা বলেন। তিনি বলেন, নতুন পাঠানুসন্ধানের জন্যই এককেন্দ্রিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কেননা একটি পাঠ নানা অর্থমাত্রা নিয়ে পাঠকের নিকট প্রতিভাত হতে পারে। এই নানা অর্থমাত্রাকেই সর্বোচ্চ মূল্য দেয় দেরিদার বিনির্মাণবাদ। তিনি পাঠ বলতে সকল কিছুকেই বোঝান। টেরি ইগলটন তাই যথার্থই বলেন : “Deconstruction constitutes a liberalism without a subject”^৭ এর ফলে প্রচলিত অর্থকাঠামোটির আবেদন নিঃশেষিত হয়। এ তত্ত্ব সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাও রয়েছে। কিন্তু দেরিদার ডিসকন্স্ট্রাকশন আসলে পাঠের নান্দনিক বহু সম্ভাবনাকে ধারণা করে নবতর অর্থদীপ্তিতে ভাস্বর হতে চায়। প্রকৃতপক্ষে “Deconstructive readings find that meaning is context bound – a function of relation within or between texts—but that context itself is boundless : there will always be new contextual possibilities that can be adduced, so the one thing we cannot do is set limits.”^৮ অর্থাৎ, পুরনো ধারণা ভেঙে নতুন ব্যাখ্যা তৈরির সামর্থ্যকে শনাক্ত করতে চান দেরিদা। এটির সঙ্গে বাখতিনের পলিফনির সাজুয্য রয়েছে। বাখতিনের সঙ্গে দেরিদার পার্থক্য ব্যাখ্যা প্রদানে এবং ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়ায়। দেরিদার চিন্তার একটি বড় অংশ মুক্তক্রীড়া (Free play)। একটি পাঠ আদৌ একাধিক পাঠের উপযোগী কিনা সেটিই ছিল তাঁর বিবেচ্য। একটি পাঠকে নতুনতর ব্যাখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রেই মুক্তক্রীড়ার প্রসঙ্গ বিজড়িত। অর্থাৎ পূর্বের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ব্যাখ্যাকারী স্বাধীনভাবে নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারছেন কি-না- সেটি তাঁর নিকট গুরুত্বপূর্ণ। দেরিদা কখনের চেয়ে লিখনকে গুরুত্ব দিলেন। কখনে কথক প্রধান হয়ে ওঠেন, লিখনে লেখকের ক্ষেত্রে সেটি ঘটে না। তাছাড়া লিখনের পুনঃপাঠ সম্ভব। দেরিদা তাই মনে করেন, লিখনের স্থায়ীরূপেই ভাষার প্রকৃত অবয়ব পাওয়া যায়। তিনি কখনকে লিখনের একটি রূপ হিসেবে দেখেন।

চাঁদ বণিকের পালা-য় শঙ্খ মিত্র মনসা মিথের বিনির্মাণ করেন আধুনিক জীবনবোধের আশ্রয়ে। আধুনিক জীবনযাত্রা ও জীবনজিজ্ঞাসার প্রতীকী চিহ্নায়নকল্পেই নাট্যকার মঙ্গলকাব্যের ফ্রেমটি বেছে নেন। নাটকে ব্যবহৃত মনসা মিথ বহুপার্ঠের সম্ভাবনা তৈরি করে : প্রথমত, ভূমিজীবী শ্রেণির সঙ্গে বৈশ্যশ্রেণির সংঘাতের চিত্র হিসেবে ; দ্বিতীয়ত, আর্থায়ন সম্পর্কিত দ্বন্দ্বসংঘাতের চিত্র হিসেবে। শিব হচ্ছেন কতকটা আর্থ দেবতা মহেশ্বর, কতকটা ভূমিজীবী মানুষের কাছের দেবতা। মনসা একেবারেই ভূমিজীবন-সংশ্লিষ্ট। তৃতীয়ত, এ সবকিছু ছাপিয়ে একটা নতুন পাঠ হচ্ছে

নারীবাদী ব্যাখ্যা, যেখানে বেহুলার ভোগান্তি (sufferings) বিশেষ গুরুত্ব পায়। সুতরাং মনসা মিথ বিবিধ অর্থদীপ্তি লাভ করে এবং মুক্তকণ্ঠের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

৩.১

ধর্ম কখনোই অবিমিশ্র ধারায় প্রবাহিত হয়নি। ধর্ম তার নিজস্বতা তথা স্বকীয়তা বজায় রেখেই সময়ের প্রয়োজনে নানা ভাবচেতনা গ্রহণের মাধ্যমে নতুন গতিপথ তৈরি করে নিয়েছে। এই নতুন পথের সঙ্গে সবসময়ই সংঘর্ষ বেঁধেছে প্রচল ধর্মভাবনার। ফলে আর্থদের আগমন ও তাঁদের বৈদিক ধর্মের প্রভাব এখানকার অনার্য মানবপ্রবাহের জীবনে অনিবার্য ছিল। আবার আর্থ-ধর্মজীবনও অনার্য-ধর্মচেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল; অসংখ্য ব্রাহ্মণ অনার্য দেবদেবীর পূজা করছেন। আর্থ-অনার্য সমাজের অভ্যন্তরগত শ্রেণিগত-ধর্মীয় বিরোধ সমাজদেহে বাহিত হয়েছে বহুকাল। আর্থদের প্রবল প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও অনার্যগণ নিজস্ব ধর্মমতের অঙ্গীকারকে জিইয়ে রেখেছে। বস্তুত, মানবীয় সত্তার টান দু-দিকে : এক. পুরোনো ভাবাদর্শ আঁকড়ে থাকা; খ. নতুনের প্রতি আকর্ষণ— এ দুয়ের দ্বন্দ্ব-জটিলতায় এবং সমন্বয়ে আর্বিভাব ঘটে নতুন সত্তার। প্রতিকূল পরিবেশে শিব যখন নিষ্ক্রিয়, তখন মানুষ মনসার আরাধনা করেছে। কালক্রমে মনসা মূল হিন্দু ধর্মের অংশ হলেন। তিনিই হলেন ব্রাত্য মানুষের আরাধ্য দেবী। বস্তুত, আর্থসমাজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই অনার্য সমাজে মনসা মিথের উত্থান। এ নাটকেও আমরা দেখব ‘পাতালবাসিনী’, ‘আন্ধার নাগিনী’, ‘চ্যাংমুড়ি কানী’ হিসেবে পরিচিত অনার্য দেবী মনসার বিপরীতে চন্দ্রধরের সংগ্রামশীলতার চিত্র।

৩.২

বাংলার নদীবহুল ও জঙ্গলাকীর্ণ পূর্বাঞ্চলে সাপের প্রবল প্রাদুর্ভাব ছিল। সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে লোকসমাজে মনসা-বন্দনা শুরু হয়। মনসা ক্রমশ দেবিত্ব লাভ করতে লাগলেন। মনসা মূলত গ্রাম-দেবী অর্থাৎ অনার্য দেবী। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ‘আর্থ চন্দ্রকেতু গন্ধবণিক ওরফে চাঁদ সওদাগর মনসার দেবিত্বকে কিছুতেই মেনে নিবেন না। মনসাও তাঁর পূজা পাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফলে বাধল সংঘর্ষ। ...পুত্রবধূ বেহুলা মৃত স্বামী লখাইকে মনসার বরে পুনর্জীবিত করে চাঁদ সওদাগরকে মনসার পূজা দিতে বাধ্য করলেন। এক্ষেত্রে লোকায়ত ধর্মের কাছে আর্থ বৈদিক ধর্মের হার মানার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। মনসাকে মহাদেবের মানস-কন্যা অথবা সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্ন ধরে বৈদিক দেবী হিসাবে তাঁর যোগ্যতার দাবীকে আজ ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।’^৯ পৌরাণিক এ দ্বন্দ্ব শিল্প মিত্র নাট্য-উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেন।

৪. চাঁদ বণিকের পালা: নাট্য-আখ্যানের বিনির্মাণ

চাঁদ বণিকের পালায় নাট্যকার ষাটের দশকের সমাজ ও জীবনকে মিথিক্যাল অনুষঙ্গে উপস্থাপনে প্রয়াসী হন। এর বহিরাবরণে মিথকথা, অন্তরাবরণে সমকালীনতা। এ নাটকে তিনি যেন আধুনিক পরশুরাম, পরশুরামের কুঠার দিয়েই ছিনভিন্ন করে দেন চাঁদ-মনসার লোকগাথা; সৃজন করেন এপিকতুল্য আধুনিক মানবজীবন-সংশ্লিষ্ট সর্বকালীন আখ্যান। “বস্তুত, ‘রক্তকরবী’র প্রকাশের পর, এই প্রথম আমরা পেলাম সর্বঙ্গীণ কোনো নাট্যসৃষ্টি, যা একই সঙ্গে সমসাময়িক এবং চিরায়ত।”^{১০}

৪.১

চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্ব, মনসা কর্তৃক চাঁদের সামূহিক ক্ষতিসাধন, সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু ও বেহুলার আত্মত্যাগ, চাঁদের পরাজয় এবং মনসার নিকট নত-মাথা— মঙ্গলকাব্যের মৌলিক ফ্রেমটি গ্রহণ করেও নাট্যকার আখ্যান নির্মাণে বেশ স্বাধীনতা নিয়েছেন। “যেহেতু নাটককার চাঁদ বণিককে এবং তার সমূহ পরাজয়কে একটি রূপক বা অ্যালিগরি হিসেবে গড়ে তুলতে চান, হয়ত ষাট ও সত্তরের বছরগুলিতে ভারতের তাই রাজনৈতিক বাতাবরণের একটি রূপকশরীর তৈরি করতে চান – তাই আখ্যান কল্পনায় তিনি নিজের মতো স্বাধীনতা নিয়েছেন। এ স্বাধীনতা তাঁর প্রাপ্য।”^{১১} মধ্যযুগীয় বস্তুনিষ্ঠাকে পেছনে ফেলে তিনি মন্যায় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এগিয়েছেন।

মনসামঙ্গলে লৌকিক দেবীর সঙ্গে মানুষের সন্ধিস্থাপনের একটি প্রয়াস দেখা গেছে : “যেখানে দেখতে পাই মানুষ শুদ্ধতার অস্তিত্বের জন্যই পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত এবং সংগ্রামে তার সমরোপকরণের অপ্রাচুর্য এবং দুর্বলতার জন্য সে অন্যবিধ উপায়ে প্রতিপক্ষের কৃপাদৃষ্টি লাভের চেষ্টায় ব্যাপ্ত।”^{১২} এ নাটকের চাঁদ সদাগর মনসার উদ্দেশ্যে সংগ্রামী ও দ্রোহী। চাঁদের আকাজক্ষিত ওষধি উপবন ধ্বংস করা, ছয় পুত্রের প্রাণ নাশ, সপ্তডিঙা ডুবিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ক্ষতিসাধনে উন্মুখ হয়ে ওঠে মনসা। শৈবধর্মের চেতনাধারী চাঁদ মনসার পূজা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন চাঁদ ও তার একান্ত অনুসারীরা। নাটকের শুরুতেই চাঁদ তাই ‘পাড়ি দেওয়ার’ জন্য প্রবলভাবে আগ্রহী ও সক্রিয়। মনসামঙ্গলের মৌল প্রবণতা মনসার পূজা প্রতিষ্ঠা, আর এখানে আলোর সন্ধানে অন্তহীন অভিযাত্রা –

“এক: ভাইরে, – আমরা সমুদ্রের বুক পাড়ি দিবই দিব–

অপর: ভাইরে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা নাও ভাসেয়া হুই দুরান্তের পথে পাড়ি দিয়া গেছে। সেই পূর্বপুরুষের মর্যাদা আমরা ফিরেফির জয় করয়ে নিবই নিব–...”^{১৩}

বর্তমানের জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে সংগ্রামের বিকল্প নেই। চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার চিত্রে একটি অসহায় মানবমন ও প্রতিকূলতার মধ্যে সেই মনের সংগ্রামী অভিযাত্রার ইঙ্গিত বিদ্যমান। এ আখ্যান তাই সমগ্র মানবের সংগ্রামশীলতার আখ্যান হয়ে ওঠে। এ সংগ্রামশীলতা পুরো আখ্যানজুড়ে শেষপর্যন্ত অব্যাহত থাকে, এমনকি মনসাকে পূজার অর্থ প্রদানেও “আমি বেলপাতা দিয়া মনসার পূজা দিব।”^{১৪} শিবের পূজার উপকরণ দিয়ে মনসার পূজার আয়োজনেও প্রচলন রয়েছে দ্রোহভাব।

এ নাটক রচনাকালে গোটা ভারতবর্ষে নব্য ধনিকতন্ত্র বিকশিত হচ্ছিল। উনিশ শতক থেকেই লোহা, লবণ, নুড়িপাথরের ব্যবসায় ও দালালি করে ক্রমাগত পুষ্ট হয়ে-ওঠা বেনিয়াগোষ্ঠী দুই বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে বণিকতন্ত্র আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রকারান্তরে বাজারমুখী পুঁজিবাদেরই প্রসার ঘটে চলে। শম্ভু মিত্রের চাঁদও তো বণিক গোষ্ঠীভুক্ত; তিনি তাঁর নাটকের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই চরিত্রকে একজন বেনিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে কোনো-না-কোনোভাবে পুঁজিবাদের অমোঘ অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিলেন। আবার এমন বিবেচনারও সুযোগ রয়ে যায় যে, দূর অতীতের বাংলা অঞ্চলের বৈশ্যশ্রেণির যে আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযান সূচিত হয়েছিল, নাট্যকারের সমকালে বিকশিত পরজীবী বণিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি সেই ঋত-ঐতিহ্যের পুনরুত্থান প্রত্যাশা করেছেন। এ কারণেই তিনি মনসার প্রভাবকে শিথিল করে তুললেন নাট্য-আখ্যানে। নাটকে

বারংবার চাঁদের পাড়ি দেয়ার কথা বলা হচ্ছে, সব হারিয়ে তার হতদশার চিত্রও পাওয়া যায়; কিন্তু মনসামঙ্গলের মতো এখানে স্পষ্ট করে বলা নেই চাঁদ আসলে কি নিয়ে পাড়ি দিচ্ছে। চাঁদকে কি তাহলে তিনি সমাজের দুষ্টতন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বভিমানের প্রতীকী রূপায়ণ করতে আগ্রহী হলেন; আর তাই নাটক পাঠ শেষে এ সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে মনসার চেয়ে প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে চাঁদ সদাগর।

মনসামঙ্গলের যেখানে পরিসমাপ্তি, এ নাটক সেখানে বেহুলা-লখিন্দরের বিষপানের ঘটনার মধ্য দিয়ে নতুন গতিপথ পেয়েছে। ফলে চাঁদ কর্তৃক মনসাপূজা প্রদান আর প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে না। পিতার পরাজয় এবং বেহুলা কর্তৃক নৃত্যগীতে দেবতাদের তুষ্ট করে প্রাণ ফিরে পাওয়া- দ্বিতীয় জীবনপ্রাপ্ত লখিন্দরকে স্বস্তি দেয় না। এমনকি বেহুলাকেও। আত্মধিকারে জর্জরিত বেহুলা-লখিন্দর আত্মমুক্তির সন্ধান পেয়েছে বিষপানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রিক পুরাণের অর্ফিউস-ইউরিডাইসের গাথায় মৃত স্ত্রীর প্রাণ ফিরে পেতে পুরুষকে সংকটের মুখোমুখি হতে হয়; ভারতীয় পুরাণে হতে হয় নারীকে। লখিন্দরকে উদ্দেশ্য করে বেহুলার উচ্চারণ—

“... বাসরের রাতে তুমি যেই বেহুলারে দেখেছিলে, সেই পরিচয়টাই যেন থাকে চিরকাল।
আমারে বাঁচ্যালে আজ আমারেই হত্যা করা হবে, এইটুকু ভেবে দেখো তুমি।”^{১৫}

বেহুলার অন্তর্বেদনার চূড়ান্ত পরিণতিই আত্মহনন। এখানে ‘বেহুলার আত্মহনন’ একটি মুক্তকীড়া। শম্ভু মিত্র সমাজের সঙ্গে একধরনের সমঝোতা করলেন। সমাজে টিকে থাকা সহজ ছিল না বলেই তিনি বেহুলা চরিত্রে এমন পরিণতি দিলেন। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী থেকে শম্ভুর বেহুলা পর্যন্ত অচলায়তনেই বন্দি রয়ে গেছে। নারীই কেবল প্রশ্নবিদ্ধ হয়— এ সংস্কার থেকে শম্ভু মিত্র হয়তো বের হতে পারলেন। কিন্তু সমাজে প্রচলিত সত্যকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। সেই যুগসত্যকেই তিনি বেহুলার আত্মহননের মধ্যে ধারণ করলেন।

মনসামঙ্গলে বিষহরির আজ্ঞানুসারে লখিন্দর বাসর রাতে প্রাণ হারায়। নাট্যকার মনসার এই কর্তৃত্বকে মেনে নিতে নারাজ। মঙ্গলকাব্যে যা দৈব-নির্ভর; নাটকে তা বাস্তবিক। তিনি আধুনিক মানবীয় দুর্বুদ্ধিকে আশ্রয় করলেন: তারাপতি ও ভয়িলকে অর্থ-মদের প্রলোভন দেওয়ার ব্যবস্থা রেখে বাসর ঘরে ছিদ্র রাখা এবং সাপ ঢোকানোর বন্দোবস্ত করেন। আবার বেহুলার মনসা-ভক্তি দেখে নেতা ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে বেহুলা ও মৃত লখিন্দরকে স্বর্গে পৌঁছে দেন। এ নাটকে বেহুলার স্বর্গ-গমনের বিষয়টি সুস্পষ্ট, লখিন্দর মর্ত্যে না স্বর্গে ছিল সেটি অস্পষ্ট থেকে গেছে। নাট্যকার সচেতনভাবেই এ অস্পষ্টতা রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এ অস্পষ্টতা যুগে যুগে অনিশ্চয়তায় ঘেরা মানবভাগ্যের একটি প্রতীকী রূপ। অপরদিকে, ধর্মসংশ্লিষ্ট আখ্যানে নাট্যকার সমকালীন রাজনৈতিক চালচিত্র সংযুক্ত করেন—

“... দেশটায় কোনো নেতা নাই। হেন একটা নেতা — যার পানে সশ্রদ্ধায় চাওয়া যাবে, যারে বীর বলে মনে হবে?... আজকাল দেশের যা হাল হয়েছে না, — বেণীতে তাড়্যাল, করালী ভৈরব এল— সব কথা আজকাল ফুকুরে তো কওয়া যায় নাক।”^{১৬}

সমকালীন যোগ্য নেতৃত্বহীন বাঙালির সমাজ-সংকট নাট্যকার আখ্যানের গ্রন্থনায় সংযুক্ত করেন। এ সংকট সকল কালের। এভাবে বাঙালি জীবনের আবেগ-অনুভূতির নান্দনিক প্রকাশে এ আখ্যান

বিশিষ্ট। এছাড়া সভ্যতার বিকেন্দ্রীকরণের সংকট, আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান, নারীর যথাযথ মূল্যায়ন, স্বাধিকারচেতনা প্রভৃতি ভাবনা নাট্য-আখ্যানকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন:

“চাঁদ: কিসে শান্ত হইরে সনকা।... ধর্মপত্নী যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয় – হায়-হায়, ভগবান, মানুষের মন তবে কোথায় ভরসা পাবে? বিশ্বাস কোথায়? ...

সনকা: সদাগর, অবিশ্বাসী নই আমি। আমারে বিশ্বাস যাও। যা কিছু কর্যেছি আমি সবই মাত্র কল্যাণের তরে।”^{১৭}

চাঁদ ও সনকার এ সংলাপে আধুনিক পরিবার-কাঠামোর ক্রমভঙ্গুরতার কারণ চিহ্নিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, মিথ কথার চেতনধর্মকে স্বকালের সংরক্ত চেতনাবাহী করে তোলার ক্ষেত্রে নাট্যকার নানা চিন্তার শিল্প-সমন্বয় করেন। সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রিকতায় তাঁর আখ্যানভাগ আটকে নেই। মনসা-চাঁদের দ্বন্দ্ব, বেহুলা-লখিন্দরের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সনকার দ্বৈতসত্তাকেন্দ্রিক টানাপড়েন, চাঁদ ও তার অনুসারীদের সংগ্রামশীল জীবনদৃষ্টি কিংবা বেগীনন্দনদের ভূমিকা প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় নাট্যকার এমনভাবেই মনসা-মিথের আধারে শিল্প-সন্নিবেশিত করেন যে, নাটকটি কোনো একটি বিশেষ ভাবের আখ্যান হিসেবে আর বিবেচনার দাবি রাখে না। ফলে দেরিদার বহুকেন্দ্রিক ভাবনার শিল্পপ্রয়াস আখ্যান হিসেবে নাটকটি পাঠ করা যায়।

৪.২

এ নাটকে মধ্যযুগীয় চরিত্র আধুনিক চেতনায় উজ্জীবিত। সদাগর, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর, মনসা এবং নেতা – পৌরাণিক চরিত্রসমূহ পুরাতন মূল্যবোধ ভেঙে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মনসামঙ্গলের একরৈখিক চরিত্রগুলো এখানে অস্থির, চঞ্চল ও স্বয়ংক্রিয় হয়ে ধরা দিয়েছে। মধ্যযুগের পরিবেশ থেকে উঠে এসে চরিত্রগুলো নিজেরাই নতুন জীবন প্যাটার্নে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। মধ্যযুগের বেহুলা-সনকার আত্মপরিচয়বোধ, ব্যক্তিত্ব-মর্যাদা ও স্বাধীন নির্বাচনের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এ নাটকের সনকা চাঁদকে অবলীলায় বলে চলে :

“তুমি মোরে চিরকাল অবজ্ঞা করোছ সদাগর। ছোট বল্যে, হীন বল্যে। আজ প্রমাণিত হয়্যা গেছে তুমিও তো ছোট। হীন।... পুরুষের নির্মিত সমাজে নারী তার আপন চরিত্র হতে ভ্রষ্ট হয়্যা গেছে।”^{১৮}

নারী এখানে ব্যক্তিত্বে সুদৃঢ়, কর্তব্যে আন্তরিক, আত্মমর্যাদায় বলীয়ান, সর্বোপরি আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রবলভাবে সক্রিয়। মধ্যযুগের স্লেহময়ী সনকা নিজগুণেই ধারণ করেছে আধুনিক প্রতিবাদী নারীসত্তা। পুরুষশাসিত সমাজে স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা হারিয়ে-ফেলা সনকার পক্ষে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে ‘কম্প্রমাইজ’ করে সংসার করা সম্ভব হয় না। তাই সে প্রথমে বেদনাহত এবং পরক্ষণেই প্রতিবাদী। অপরদিকে, আধুনিক জীবন-মনস্ক বেহুলা দেবসভায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। স্বর্গের নৃত্যগীত-পটীয়সী বেহুলার তুলনায় মর্ত্যের বেহুলার স্বরূপই প্রবল এই নাটকে। দেবসভার অভিজ্ঞতায় বেহুলার হৃদয় যন্ত্রণাবিদ্ধ। বেহুলার আধুনিক সম্ভ্রমহারা নারীজীবনের প্রতীক। শঙ্কর বেহুলা আধুনিক; সে যতটা না পৌরাণিক, তার চেয়ে অধিক জাগতিক—

“কোথাও তা শিখি নাই। দেখিনি কোথাও। তবু যেন আমারি অন্তর থিক্যা আমারি প্রকৃতি হাতে ধর্যা আমারে শিখিয়ে দিল-কেমনে তাক্যাত হবে, ... তেত্রিশ কোটির চোখের সুমুখে লাস্য নৃত্য কর্যেছে বেহুলা।”^{১৯}

নাটকের মধ্যে চরিত্রগুলোর বিচরণ দেখে মনে হয় তারা নাট্যকারের নিয়ন্ত্রণের ধার ধারে না। মধ্যযুগের চরিত্রগুলোকে আধুনিক পরিবেশে প্রতিস্থাপন পর্যন্তই যেন নাট্যকারের ভূমিকা। চরিত্রগুলো আন্তর্জাতিক থেকেই স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। ‘মুক্তকীড়া’য়, মুক্তপক্ষে তাদের অবগাহন। প্রত্যেকটি চরিত্রই যেন স্ব-বিকশিত। তাই দেখা যায়, *মনসামঙ্গল*ের নিষ্ক্রিয় লখিন্দর আত্মআবিষ্কারের সংকট অনুভব করে। বেহুলার চারিত্রিক শুদ্ধতা, সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রতি সে উদাসীন। সে কেবল আইডেন্টিটি অনুসন্ধান করে। আধুনিক এ বোধ তার স্বোপার্জিত। –

“আমার অজ্ঞাতে যেন কীসব ঘটনা ঘটে আমার ভিতরে, আর আমি যেন শুধু তার প্রতিক্রিয়াতেই কখনোবা রাগ করি, কখনো-বা ভালোবাসি! কিন্তু আমি কে? আমারে তো খুঁজে আমি পাই না কখনো।...কী এটা হয় যেন-অত্যন্ত অস্থির লাগে-...”^{২০}

লখিন্দরের আত্মআবিষ্কার কখনো সনকার অতি-খেয়ালে, কখনো সমাজ-বৈরিতায় ধ্বস্ত হয়েছে। প্রতিপার্শ্বের ‘ইতরতা’, ‘বিষ্ঠাকুণ্ড’ লখিন্দরের চৈতন্যে অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে। লক্ষণীয়, পিতার বীরত্বে গৌরবান্বিত হলেও লখিন্দর পিতার মতন বীরের আইডেন্টিটি চায়।

নাট্যকারের চাঁদ চরিত্র পরিকল্পনায় *দ্য গ্লড ম্যান এন্ড দ্য সী*-এর উক্তিটি স্মরণীয়: ‘Man may be destroyed, but not defeated.’ নাটকের সংগ্রামীশীল চরিত্র চাঁদ। ‘চ্যাংমুড়ি কানী’-মনসার বিপরীতে নাট্যকার চাঁদের ‘পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য’কে স্থাপন করেন। সমুদ্রযাত্রাকে উপজীব্য করে চাঁদ মনসারূপী অন্ধকারের বিপরীতে আলোকের সন্ধানে নেমেছেন। পরাজিত, বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ মানুষকে মিথ ফিরিয়ে আনতে চায় সমাজের কেন্দ্রে, সমষ্টির মধ্যে। এ নাটকে পরাজিত-নিঃসঙ্গ চাঁদ সমষ্টির কেন্দ্রে থেকে পাড়ি দেয়ার ব্রত থেকে চ্যুত হয় না। এই উৎকেন্দ্রিকতাই মূলত চাঁদকে বিনির্মিত এক মানুষ তথা চরিত্রে প্রতীকায়িত করে। পাড়ি দেয়ার “এই সিদ্ধান্তে শুধু চাঁদই তার জীবন থেকে আঁধারকে অপসারণ করবে না, সেই সঙ্গে অপসৃত হবে সমগ্র চম্পকনগরীর অন্ধকার। আসবে আলোর উৎসারণ।”^{২১} চম্পকনগরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে সে-আলোর প্রদীপ্ত শিখা।

অতীত-ঐতিহ্য দিয়ে বর্তমানের অনুসন্ধান নাট্যকারের অন্য আশ্রয় শিব ও মনসা। নাট্য-আখ্যানে এদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। তবে কাহিনি-স্রোতে এদের প্রবল পরোক্ষ-প্রভাব অগ্রাহ্য করা চলে না। শিব ও মনসার এই অশরীরী উপস্থিতি কী আমাদের এ কথা স্মরণ করায় না যে, “The importance of god or hero in the myth lies in the fact that such characters; who are conceived in human likeness and yet have more power over nature.”^{২২}

নাটকের চরিত্রায়ণে রয়েছে এক ধরনের এলোমেলো ভাব যা চরিত্রগুলোর নিজের মতো করে বিকাশিত হবার ফল। প্রথাবদ্ধ নাট্য-চরিত্রের মতো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নাট্যকার চরিত্রগুলো নির্মাণ করেননি। কাহিনির প্রয়োজনে তিনি কিছু চরিত্র লোকপুরণ থেকে নিয়েছেন আর কিছু নতুন চরিত্র সংযোজন করেছেন। কোন চরিত্রটি প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে উঠবে-চাঁদ, বেহুলা নাকি সনকা; তিনি তা বিবেচনা করেননি। বরং প্রতিটি চরিত্রের বিকাশপথ উন্মুক্ত রেখেছেন। ফলে পাঠকমাত্রই অসংখ্য কেন্দ্রের মুখোমুখি হন। প্রতিটি চরিত্রকে সমান স্পেস দিয়ে তিনি চরিত্রায়ণের অনন্যকেন্দ্রিক ধারণা থেকে সরে আসলেন। আলোকিত-স্বল্পালোকিত প্রতিটি চরিত্রই আত্মআবিষ্কারের তৃষ্ণায়, আধুনিক মূল্যবোধে প্রায় সমানভাবে উদ্দীপিত হয়েছে। প্রকৃতই “

চাঁদবণিকের পালা-র শ্রুতিরূপ বা পাঠ যাঁরা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে মনে করতে পারবেন এর প্রত্যেকটি চরিত্রই তাদের ভয়ভীতি বা অকুতোভয়, তাদের বিশ্বাস বা বিশ্বাসহীনতা, তাদের ভালোবাসা বা ঝ্রুরতা, তাদের বাঁচার আনন্দ আবার নিদারুণ অসহায়তা-ইত্যাদি সমস্ত কিছু নিয়েই তারা রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ। তাদের নিজের নিজের জীবনদর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা এক একজন পরিপূর্ণ মানুষ। সে যতই ক্ষুদ্র চরিত্রই হোক না কেন।”^{২৩}

৪.৩

নাট্যনির্দেশক ও প্রযোজক হিসেবে নাটকে সংলাপের গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন শম্ভু মিত্র। স্বয়ং শম্ভু মিত্র পাঠককে জানানোর প্রয়োজনে এর ভাষা সম্পর্কে ভূমিকায় বলেন : “বইটি পড়তে গিয়ে কোনো পাঠক কিছু শব্দের বর্ণবিন্যাসে বিভ্রান্ত হতে পারেন। অভ্যাসের বশে চলিত লিপির সাহায্যে আমরা উচ্চারণটা অনুমান করে নিই। ...ধ্বনিশাস্ত্রের চিহ্ন দিয়ে সঠিক উচ্চারণ লেখা যদি-বা যায়, সেটা দেখতে ভালো নয় আর সাধারণ পাঠকের পক্ষে পড়াও কঠিন। তাই এগুলো খানিকটা পাঠকের ওপরেই ছাড়তে হয়, তাঁরা বুঝে নেবেন।”^{২৪} অর্থাৎ, নাট্যকার ভাষাকে বিনির্মাণ করেন পাঠকের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই। এর চিহ্ন নাটকের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে : কেটো, দিয়েছি, ভিক্ষা, থিক্যা, হার্যায়ে, ঐক্যেবৈক্যে, বেহুলাট্যারে, ডেক্যা, পাখালেয়্যা, লেগ্যে, বেঁচে, চায়্যা, ছেড়ো, বাঁচায়্যা, এস্যা, ধুয়ো, বেক্যো, মেগ্যে, কানদুট্যা, টেন্যেটুনে, নিন্দ্যা, যেট্যা, দেশট্যা, ফেড়ো প্রভৃতি। তিনি বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে আসামের চম্পকনগরীর বাংলা কথ্যরীতির ক্রিয়াশব্দের গঠনরীতিকে নাটকের অঙ্গসৌষ্ঠবে প্রয়োগ করেন। লোকপ্রতিহের এ অনুশঙ্গকে প্রাণবন্ত করতে তিনি পুরনো ও লুপ্তপ্রায় তৎসম, আরবি, ফারসি শব্দকে জীবন্ত করে তোলেন। এদের কয়েকটি উদাহরণ : গব্বাটে, গুল্লা, আতিপাতি, দুরন্তুর, রঙমতি, সুপ্লার, শৌক্লিল, গাউইয়া, আফ্কেট, সাবহিত, হেতাখে, আগারে।

রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব প্রমুখের দৃশ্যত গদ্যভাষায় রচিত নাটকগুলো কবিতার প্রবল উত্তাপে কাব্যনাট্যে উন্নীত হয়েছে। গদ্যভাষায় তাঁরা কাব্যগুণ সঞ্চারিত করেন মান বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করেই। শম্ভু মিত্রও গদ্যভাষায় কাব্যময়তা এনেছেন, তবে তা মান বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে নয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর অবলম্বন উপভাষা। উপভাষা বিশেষ অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা। তিনি মৌখিক ভাষারূপের লিখিতরূপ সৃষ্টি করলেন নাটকে। মান বাংলার একটি সমৃদ্ধ ধারা শম্ভু মিত্রের সামনে ছিল। তথাপি তিনি উপভাষারূপকে আশ্রয় করলেন। কারণ অরিজিনাল, অকৃত্রিম এ ভাষাকাঠামোতে নাট্যকার একধরনের আত্মতৃপ্তির বোধ খুঁজে পেলেন—

“এ এক অদ্ভুত দেশ দেখি-চম্পকনগরী। কেউ কোনো ইতিহাস জানেনাক! চাঁদ সদাগর বল্যে এট্টা লোক ছিল কি ছিল না, বেঁচে আছে কিংবা মর্যা গেছে, ভিটাট্যা কোথায় ছিল,-এইতো, তুমি কে বট-হে?...কথা কয়নাক। ওহে এইট্যাই যদি চাঁদ বণিকের ভিটা হয়, তারে এট্টা সম্বাদ দেও তো। কও বহু দূর দেশ থিক্যা এক যুবক এয়েছে, সে তার কাহিনীট্যারে শুনবারে চায়।”^{২৫}

একটি মৌখিক ভাষারূপকে এভাবেই লিখনরূপের মধ্যে স্থায়ী করে তোলায় প্রয়াসী হলেন নাট্যকার। এটাও একধরনের বিনির্মাণ যে, যেখানে মান বাংলায় লেখার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙেছেন। ভেঙে ফেলে তার ভেতরে আবার ঔপভাষিক গুণসম্পন্ন ভাষাকে এমনভাবেই ব্যবহার করছেন, যাতে আধুনিকতার গুণ ক্ষুণ্ণ না হয়। এখানেই তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব।

পদ্যে রচিত *মনসামঙ্গলের* কাহিনি এ নাটকে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে গদ্য-পদ্য সম্মিলিত আশ্রয়ে। আধুনিক মানুষের আত্মিক সংকট ও তা থেকে উত্তরণের সুতীব্র বাসনাকে নাট্যকার রূপায়ণ করেন পয়ারের ঢঙে। গদ্যের ঠাসবুননির মধ্যে পদ্যের এমন কারুকার্য নাটকটিকে একটি নান্দনিক উচ্চতাস্বাদু কাব্যনাট্যের মর্যাদা প্রদান করেছে। সূত্রধারের কণ্ঠে—

স্বামী কেড়ে নেছ তুমি, কেড়ে নিছ ঘর।
আমার জীবন তুমি করেছ ধূসর।।
একমাত্র আশা ছিল পুত্র লখিন্দরে।
তারেও ফুসলায়্যা তুমি পাঠ্যাও সাগরে।।^{২৬}

সনকার মানসিক বিপর্যস্ত দশার স্বরূপ উন্মোচনে এমন কাব্যিক ভঙ্গিমা একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। পদ্য ও সংগীতময় সংলাপের পাশাপাশি গদ্যের স্বচ্ছন্দ বিন্যাস পাঠককে প্রাত্যহিক সাহিত্যপাঠের অভ্যস্ত জগতের বাইরের আশ্বাদ এনে দেয়—

“তার চেয়ে ঢের ভালো, তুমি আমি, আমাদের ভালোবাসা।... দেবী তুমি। দেবী, নারী, কামিনী, গৃহিণী,— সমস্ত জীবন ভর্যা যাক তোমার মোহের জালে, তোমার সিংগনে—”^{২৭}

বেহুলার প্রতি লখিন্দরের আত্মনিবেদনের সুতীব্র বাসনার অকপট প্রকাশে গদ্যভঙ্গিমা বিশেষ গতি পেয়েছে। এছাড়া বাঙালির ঘরোয়া ভাষায় সংলাপ নির্মাণেও নাট্যকার বেশ স্বচ্ছন্দ— “চাঁদ : সনকা, তুমি কি এখনো পূজাঘরে আছো?”^{২৮} মধ্যযুগের সনকা চরিত্রের আধুনিক সংস্করণ নির্মাণে নাট্যকারের অন্যতম হাতিয়ার এ জাতীয় ভাষারীতি। মূলত সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলোকে একটি বিশেষ মাত্রা প্রদানে সমর্থ হন নাট্যকার। কখনোবা ইংরেজি ভাষারীতিতে বাক্যবিন্যাস করে ভাষায় ডাইমেনশন এনেছেন— আমরা হই জুয়ান”^{২৯} অর্থাৎ, একাধিক ভাষায় কথা বলে একধরনের ভাষিক বৈচিত্র্য তৈরি করেছে এ নাটকের চরিত্রগুলো। মূলত ভাষিক বৈচিত্র্যই বহুস্বরিকতা সৃষ্টি করে।

সংলাপে সংগীতের প্রয়োগে অভিনবত্ব রয়েছে এ নাটকে। নাট্যকার সংলাপে সংগীতের যোজনা করেন কখনও নাট্যাংকষ্ঠার মধ্যে পাঠককে স্বস্তি প্রদানে, কখনোবা পাঠককে ঘটনাটি বুঝিয়ে বলবার চেয়ে সংগীতের যোজনাকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করেন। নাট্যবিবর্তি কিংবা দৃশ্যবিভাগের বিকল্প হিসেবে থ্রিক কোরাস, জুড়িগান, সূত্রধারের ভূমিকার নবরূপায়ণ করেন। নাটকের দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি ও তৃতীয় পর্বের সূচনায়, তৃতীয় পর্বের প্রথমাংশের সমাপ্তি ও শেষাংশের সূচনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নাট্যকার নির্দেশক হিসেবে সংগীতের আশ্রয় নেন—

সূত্রধার: শেষ মাত্র আশা ছিল ভবিষ্যকল্পনা
বিধাতার পরিহাসে তাও তারে বাঁচালো না
কোথা যে কী ভুল হোল জানে না আবর।

(জুড়িরা ধুয়াটা ধরে) এইবার কিবা করে চাঁদ সদাগর।^{৩০}

সংগীতের এমন আয়োজনের মধ্য দিয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবাবেগ আরও সুস্পষ্ট হয়েছে। সমাজ-রাজনীতি ও সমকালীন জীবনবোধ ছুঁয়ে-ছেনেও তাঁর গীতময়, ছন্দোময় সংলাপসমূহ নতুন নাট্যভাষা নির্মাণ করেছে। নতুন নাট্যভাষায় নানা ভাষারূপ গ্রহণ করেন শঙ্খ মিত্র। গদ্য, পদ্য কিংবা আঞ্চলিকতা কোনোটির কেন্দ্র-বলয় তৈরি হয় না। কেননা একটি বিশেষ ভাষারূপ-কেন্দ্রিক

চিন্তা নাট্যকারের নিকট অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা বলে মনে হয়েছে। এ নাটকের ভাষারূপগুলো একটি অপরটির কেন্দ্রিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়। শেষপর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট ভাষাকেন্দ্র এখানে তৈরি হয় না।

৪.৪

শম্ভু মিত্র নাটক বলতে আবহ-আলো-মঞ্চ-চরিত্র-অভিপ্রায়-অভিনয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক ‘সংযুক্ত শিল্প’কে (Composite art) বুঝতেন। এ কারণেই এ নাটকে তিনি আবহ-আলো-মঞ্চ নিয়ে নতুন পরীক্ষায় নেমেছেন— “...এই পালায় প্রয়োজনানুযায়ী যেটুকু সুবিধা আবশ্যিক বলে মনে হয়েছে তা কল্পনায় রেখেই এ পালা রচিত হয়েছে।”^{৩২} তিনি এই অভিনব মঞ্চপরিকল্পনায় একই সঙ্গে দুই যুগের প্রতিবেশ নির্মাণ করেন।

দেশীয় ভাবশৈর্যকে নাট্যকার লোকায়ত নাট্যাঙ্গিকে উপস্থাপনের প্রয়াসে পাশ্চাত্য নাট্যশিল্পসূত্র পরিবর্তন করেন। নাটকের নামকরণে মূলধারার নাট্য-আবহ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন ‘পালা’ শব্দটি সংযুক্ত করে। আবার ‘চাঁদ’ নামটির মধ্যেই গ্রহণ ও গ্রাসের একটা ইঙ্গিত রয়েছে কি? গ্রস্ত হওয়া বা মুক্ত হওয়ার কোনো বিষয় আছে। এ বিষয়টি শম্ভু মিত্রের বিবেচনায় এসেছিল। ‘চাঁদ’ কি মানুষের অমোঘ নিয়তি, যা ঘুরে ঘুরে আসে। ‘চাঁদ’ কি একক ব্যক্তি নাকি সে সমগ্র মানবের প্রতিনিধিত্ব করছে। বেগীনন্দন কী চাঁদের এই সামর্থ্য দেখে ভীত? — “তাই প্রভু, একপারে আমি, অন্যপারে চাঁদ।”^{৩৩} এ চাঁদ কী তাহলে স্বয়ং শম্ভু মিত্র, প্রচলিত নাট্য-কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে যাঁকে একটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। নিজের ভেতরের নাট্য-মানসকে ভেঙে আধুনিক পালাকারের পরিচয়ে পরিচিত হবার বাসনা থেকেই সংগ্রামশীল এ পথ বেছে নিলেন তিনি।

অন্ধ বিভাজনে পশ্চিমী রীতি অনুসরণ তো করেন না, বরং নাট্যবিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নতুন নাট্যরূপ গড়েন। বাংলা নাটকের প্রচলিত ফর্ম ভেঙে দিলেন। প্রচলিত নাটকের ‘অন্ধ বিভাজন’ টার্মটি পরিত্যাগ করে ‘পর্ব’-এর সূচনা করলেন। নাটকের পর্ব বিভাজনে এবং দৃশ্যান্তরের ক্ষেত্রে তাঁর আশ্রয় আলো ও সংগীত। অন্ধকারে মোড়ানো মঞ্চের আলোর প্রদীপ্ত শিখা জ্বলে ওঠে; দাঁড়িয়ে যায় নাবিকেরা, তাদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় পাড়ি দেয়ার অঙ্গীকার। — “...-প্রস্তুত সবাই? হৈ-ঈ-ঈ-য়াঃ! কতো বাঁও জল দেখ্। তল নাই? -দেও পাড়ি।”^{৩৪} সূচনায় নাট্যকার যে ‘হৈ ঈয়াঃ’ বলে দূস্তর পথে পাড়ি দেয়ার আহ্বান জানান; নাটকের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তা প্রতিধ্বনিত। মঞ্চনির্দেশনার শেষাংশটি অনেকাংশেই চিত্রকল্পময় হয়ে ওঠে: “সম্পূর্ণ অন্ধকার মঞ্চের এইটুকু আলোকিত ছবি যেন মঞ্চের গভীরে পিছিয়ে যেতে যেতে অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে যায়।”^{৩৫} এখানে সংগ্রামী ও প্রতিশ্রুতিশীল বাঙালি জাতির হার না-মানা জীবনভাবনার প্রতীকী রূপ প্রকট হয়েছে। সমগ্র নাট্য-আখ্যানজুড়ে যে আলোর অন্বেষণ করলেন, সে-অন্বেষণের সচিট্র শিল্পবয়ান তৈরি না করে নাট্যকার যেন স্বস্তি পান না। সমকালের অযৌগ্য দেশনেতাদের স্বরূপ উন্মোচনেও নাট্যকারের অবলম্বন শিল্পিত ভাষা :

“দেশময় যেন শকুনের মতো এটা অকাল নেমেছে।”^{৩৬}

ওপরের সংলাপটির মধ্যে নিহিত অসাধারণ দৃশ্যময়তা পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়কে সচকিত করে তোলে। পাঠক সুস্পষ্টভাবে নাট্যকারের বিশ্বাসের জগতের সন্ধান পান। এখানে যুগে যুগে

রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রে-থাকা আধিপত্যবিস্তারকামী বেণী-বল্লভদের কুচক্রী, ঘৃণ্য মানসিকতা উন্মোচিত হলো এখানে। একইভাবে, বাঙালির স্বভাবধর্মের কথা ব্যক্ত করেন আলঙ্কারিক ভাষায়:

“আমরা কেবলি অপরের কুৎসা করি, -খালি অপরেরে দোষ দেই, -খালি শৃগালের মতো যেন খিড়কির দুয়োরের কাছাকাছি যায়্যা ধূর্তামি করি-!”^{৩৭}

বাঙালির নিকৃষ্ট, অকল্যাণকর ও কাপুরুষোচিত স্বভাবের প্রতি একধরনের ক্ষোভ ছিল নাট্যকারের। এমন টুকরো টুকরো দৃশ্যময়তার সূত্রে নাট্যকার এ মেসেজ দেন যে, ষাটের দশকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে স্বধর্ম হারিয়ে-ফেলা বাঙালিকে আত্মশক্তিতে পুনরায় বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে। আশাবাদের চিত্রময় উপস্থাপনায় এ আখ্যান বিশিষ্ট হয়ে ওঠে-

“দ্বীপের কুমারী তুমি, নিবিড় দ্বীপের মতো শান্ত হয়্যা থেকে তুমি। আমার এ অস্ত্রির নরক হতে দেখি যেন সবুজ টিয়ার মতো আশ্বর্ষ কোমল দ্বীপ আয়ত নয়ন পেতে মোর পানে চায়্যা আছে।”^{৩৮}

যে আশ্রয় ‘বনলতা সেন’-এর মধ্যে অনুসন্ধান করেছিলেন জীবনানন্দ, নানাবিধ সংকটজালে জর্জরিত লখিন্দর বেহুলার আয়ত নয়নে খুঁজে পেল সেই আশাটুকু, শেষ ভরসাটুকু। আসলে “চিত্রকল্পে শিল্পীর ভাববিশ্ব আলঙ্কারিক ভাষায় উপস্থাপিত হওয়ায় কখনো একক ভাব, কখনো-বা ভাবপুঞ্জ সম্মিলিত প্রয়াসে সৃজন করে এর অবয়ব।”^{৩৯} তাই শম্ভু মিত্র জীবনের গভীর উপলব্ধির প্রতীকী রূপায়ণের জন্যে মিথের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মিথের অন্তর্দেশেই তিনি খুঁজে পান সংকট উত্তরণের উপাদান। আশাহীন জীবনপটে আশাবাদের বাণী প্রকটিত হলো মিথ-প্রতীকে। চম্পকনগরী অরাজকতায় পরিপূর্ণ ভূ-খণ্ডের প্রতীক। দেশমাতৃকার প্রতি অপরিসীম অনুরাগের প্রতিরূপক হিসেবে বেহুলা চরিত্র বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে বেহুলা যেন ‘অনিমেঘ আলোর বলয়’। অন্ধকার-মৃত্যু-ধ্বংস সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির যে সম্ভাবনার কথা দেরিদা বলেন, এ সংলাপ তারই ইঙ্গিতবহ। এ সম্ভাবনার আরও জীবন্ত রূপ পাওয়া যাবে ভবদেবের সংলাপে :

“বাঁপ দিয়্যা নিয়তির হাত হতে ভাগ্যেরে ছিন্যে আনা চাই, এই তো পিতিজ্ঞা।”^{৪০}

একদিকে মনসারূপী নিয়তির প্রতি প্রবল দ্রোহচেতনায় ধ্বংসকামী হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি, অপরদিকে সফলতার সমূহ সম্ভাবনা- নাট্য-আখ্যানের এ মৌল উপজীব্য এখানে ফুটে উঠেছে চিত্রকল্পময় পরিচর্যায়। ধ্বংস ও সৃষ্টির এ খেলায় পরিশ্রান্ত ব্যক্তিমানস নারীর গুণ্ণপ্রার্থী।

“আহত বিক্ষত এক মুমূর্ষু পশুর মতো যদি কোনো হতভাগা গুহার সন্ধানে আসে- যদি এতোটুকু শান্তি চায়, সেবা চায়- জ্বলন্ত ক্ষতের পরে এতটুকু শুশ্রূষা কামনা করে, - সেটা তার অপরাধ?”^{৪১}

সময় ও সমাজ-উদ্ভূত অশুভচেতনায় গ্রস্ত, জীবনযুদ্ধে পরাস্ত চাঁদের প্রতিতুলনায় নাট্যকার এখানে ‘আহত বিক্ষত এক মুমূর্ষু পশু’ প্রসঙ্গ এনেছেন। চাঁদের শেষ আশ্রয়স্থল অনুপ্রেরণাদায়িনী নারী, নারীই পারে শূন্যকে পূর্ণের রূপ দিতে। নারী আদ্যাশক্তিকে নাট্যকার মান্য করলেও মনসামঙ্গলের শক্তিশালী দেবী মনসার প্রভাবকে দেখেছেন অন্ধকারের প্রতিরূপকে। এভাবে লোকপুরাণের প্রতিটি স্তরে ভেঙে ভেঙে একটি নতুন ভাবনা ও সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেন শম্ভু মিত্র।

৫. উপসংহার

মিথ কোনো একটি বিশেষ কালের, বিশেষ সময় ও সভ্যতার অংশ না থেকে তা যে সর্বকালে ও সর্বসংস্কৃতিতে প্রসারিত হতে পারে শঙ্কু মিত্রের *চাঁদ বণিকের পালা*-সেই সত্যকেই লালন করে। অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার, আধুনিক মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট, সংকটময় বিশ্বে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিযাত্রা, স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা হারিয়ে-ফেলা নারীর বেদনা এবং একইসঙ্গে প্রতিবাদী জীবনদৃষ্টি, অন্ধকারের বিপরীতে আলোকে অন্বেষণ, বৈচিত্র্যময় ভাষারীতির প্রয়োগের মাধ্যমে বহুস্বরিকতা সৃষ্টি প্রভৃতি নাটকের কথাবস্তুতে সন্নিবেশিত হয়েছে মিথকথার আধারে। সামূহিক প্রতিকূলতার মধ্যে সংগ্রামশীল অভিযাত্রার বাণী নাট্যকার এ নাটকের মাধ্যমে জানান দেন প্রচলিত লোকপুরাণের নতুন রূপাবয়ব নির্মাণ করে। তাঁর বৈদম্ব্য ও সৃজনময় প্রতিভায় মিথ নান্দনিক তাৎপর্য লাভ করে। মিথস্রবণের মাধ্যমে জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থের সন্ধান লেখকের স্বকীয়তা ও সফলতা অনস্বীকার্য। সকল সংকট ও গ্লানি থেকে উত্তরণের আয়ুধ তিনি মিথের অন্তর্দর্শে খুঁজে ফেরেন। কাহিনি অসামান্য গ্রন্থনায়, চরিত্রের আধুনিক অনুভাবনায়, জীবনজিজ্ঞাসা-প্রসূত সংলাপে, ভাষাকাঠামোর বহুব্যঞ্জনায় মধ্যযুগের চেতনাকে পাশ কাটিয়ে সমকাল ছুঁয়ে-ছেন এ নাটক সর্বকালীনতায় পৌঁছে গেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. হাসনাত আবদুল হাই, “ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং মিথ”, ওবায়দ আকাশ সম্পাদিত *শালুক সাহিত্য ও চিন্তা-শিল্পের পত্রিকা* (ঢাকা: জনান্তিক, ২০১২), পৃ. ২৬
২. Joseph Campbell, *The Power of Myth* (New York: Doubleday press, 1988), P. 13
৩. Vincent B. Leitch, *The Norton Anthology of Theory and Criticism* (New York: w.w. Norton & company, 2nd edition 2010), P. 1311
৪. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, *মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি ২০১৫), পৃ. ২২-২৩
৫. দময়ন্তী বসু সিং সম্পাদিত, *বুদ্ধদেব বসু নাটক সমগ্র ১* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩) পৃ. ৪৫১
৬. ভীষ্মদেব চৌধুরী, “তপস্বী ও তরঙ্গিণী: একটি জনান্তিক পর্যবেক্ষণ”, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সিরাজ সালেহীন সম্পাদিত *বুদ্ধদেব বসু জন্মবার্ষিক স্মরণ* (ঢাকা: বর্ণায়ন, ২০১১), পৃ. ২৮৬
৭. গোপীচন্দ্র নারঙ, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত *গঠনবাদ, উত্তর-গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব* (কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৩), পৃ. ১৬৫
৮. Jonathan Culler, *The Literary in Theory* (Stanford University, 2007), P. 180
৯. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ‘নাথধর্ম’, রায়হান রাইন সম্পাদিত *বাংলার ধর্ম ও দর্শন* (ঢাকা: সংবেদ, ২০০৯), পৃ. ১১৯-১২০
১০. শঙ্খ ঘোষ, *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ১৮৫
১১. পবিত্র সরকার, *নাট্যমঞ্চ নাটরূপ* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮), পৃ. ৫৫১
১২. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯), পৃ. ৮২
১৩. শঙ্কু মিত্র, *চাঁদ বণিকের পালা* (কলিকাতা: এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ত্রয়োদশ সংস্করণ আশ্বিন ১৪২২), পৃ. ০১
১৪. তদেব, পৃ. ১৫৯

১৫. তদেব, পৃ. ১৬০
১৬. তদেব, পৃ. ১০১
১৭. তদেব, পৃ. ২৪
১৮. তদেব, পৃ. ১৩৩-১৩৪
১৯. তদেব, পৃ. ১৫৮-১৫৯
২০. তদেব, পৃ. ৪৭
২১. ড. জগন্নাথ ঘোষ, *শঙ্খু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালা* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ১০০
২২. William J Handy & Max Westbrook (ed.) (New Delhi, 1474), P. 242.
২৩. শঙ্খু মিত্র, তদেব, সামান্য নিবেদন অংশ
২৪. তদেব, ভূমিকা
২৫. তদেব, পৃ. ১৫০
২৬. তদেব, পৃ. ৯৮
২৭. তদেব, পৃ. ১২৭
২৮. তদেব, পৃ. ২২
২৯. তদেব, পৃ. ০১
৩০. তদেব, পৃ. ১৪৯
৩১. তদেব, ভূমিকা
৩২. তদেব, পৃ. ১১
৩৩. তদেব, পৃ. ১৬৩
৩৪. তদেব, পৃ. ১৬৩
৩৫. তদেব, পৃ. ১৪৯
৩৬. তদেব, পৃ. ০৩
৩৭. তদেব, পৃ. ১২৩
৩৮. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, *উপমা-চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ১৫
৩৯. তদেব, পৃ. ১৫৫
৪০. তদেব, পৃ. ১৭

Environmental Management Accounting Practices in Manufacturing Sectors of Bangladesh: An Empirical Analysis

Din Islam*

Muhammad Shahidullah Tasfiq**

Abstract

The focus of this study is on the manufacturing sectors of Bangladesh, where Environmental Management Accounting (EMA) is being put into reality. The objectives of this paper are to explain the need for environmental management accounting practices in the manufacturing sectors of Bangladesh, present status and identify the problems of implementing. This research is based on qualitative approach. The primary data for this article was gathered through a survey questionnaire. A five-point Likert scale was used for the survey's response options. The population collected in this research includes all those individuals in Bangladesh's manufacturing companies who perform their duties as top managers. There were 168 companies picked among them 3 responses were blank or spam, And 56 companies didn't fill up the questionnaire. Finally, in order to evaluate the study 109 questionnaires were used for the evaluation. It is found that the top management of these companies' care about EMAP and they are well-informed about the environmental issues, but they are not putting their knowledge into practice. The implementation of EMA is very poor in our country. In order to ensure EMAP in manufacturing sectors of Bangladesh, the government should make it mandatory for them. The regulatory agencies can also play significant roles by providing guidelines, ensuring strong monitoring systems and changes in the rules and regulations if necessary to implement EMA in manufacturing sectors of Bangladesh.

Keywords: Environmental Management Accounting, Environmental Financial Accounting, Environmental Costs and Benefits, Environmental Management Accounting Practices, Green Accounting

1. Introduction

The rising population and increasing industrial growth over the last few decades have contributed to environmental destruction, global warming, including acid rain, and ozone layer depletion, are becoming one of the world's biggest threats to civilization. One of the detrimental consequences of environmental issues that cannot be prevented is global warming. A danger to life is the drastic increase in temperatures and unpredictable climate change. Global warming causes weather disturbances, but also reduce the supply of clean water, impair food security, declines in public health safety, and rises in the temperature of water (Sales & De, 2019). The real influence of the industrial revolution is the current issues of global

* Assistant Professor, Department of Management Studies, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

** Associate Professor, Department of Management Studies, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

warming and climate change. Manufacturing in an industrial economy, which relies on fossil fuels and machines, represents a dramatic change brought about by industrialization (Sales & De, 2019). It's ironic that in certain countries, like the United Kingdom, industrialization is expanding without corresponding increases in environmental awareness and consciousness. It took the new world another three centuries after the industrial revolution was realized before it began to feel the negative effects of expansion and economic activity. The organization must prioritize stakeholder requirements in its development efforts due to environmental concerns and pressure from many groups. Companies should pay attention and win over stakeholders if they want to innovate environmentally friendly products and processes. If a company successfully implements a green product and green process innovation, it will receive widespread support from its constituents, who will see it as more trustworthy and more likely to use its products. Businesses' productivity would increase naturally as a result of the benefits. Companies are under increasing pressure from a wide range of interested parties to manage and report the environmental impact of their operations to shareholders, customers, employees, and government and regulatory agencies (Phan, Baird, & Su, 2017). EMA focuses on data collected from the organization's natural exhibit, allowing managers to assess many perspectives on the data. Informational and physical outputs include outputs, working materials, hardware proficiency, and waste. The EMA system's data on climate-related costs can help managers keep an eye on the bottom line while also keeping an eye on the environment. According to the findings of Ramli's research, the usage of EMA in businesses has a weak but significant favourable link with company performance.

1.2 Objectives of the Study

The objectives of the study are as follows:

- to assess the awareness of the need to protect the environment at the corporate level;
- to verify the present status of environmental management accounting practices in the manufacturing sectors of Bangladesh; and
- to identify the problem of implementing environmental management accounting and put suggestions for practicing EMA.

Using EMA can help businesses save a lot of money on operational costs, which is a welcome benefit for any business. Using EMA can also boost productivity and establish a clear competitive advantage. Environmental management accounting can be used to quantify non-financial expenses, such as those associated with damaged public relations, non-compliance, and health and safety issues (Tanc & Gokoglan, 2015). EMA is an initiative that seeks to harmonize the most cutting-edge ideas and methods in the fields of management accounting and environmental management. Environmental accounting is the process of incorporating ideas of environmental protection and conservation into reporting methods and cost/benefit analyses. An organization may examine how being green affects their supply chain and future building plans with the help of environmental accounting (Phan, Baird, & Su, 2017).

It lets accountants report on the financial impact of client decisions, which can then be used to inspire more responsible decision-making regarding processes that adhere to environmental rules and boost profits. The field of Environmental Management Accounting addresses the environmental consequences of an organization and the management knowledge gaps that arise from environmental impacts arising from company operations. Depending on the nature of the business, it may have repercussions on the environment through its effluent output, recycling efforts, water and power consumption, and carbon footprint.

2. Literature Review

In First World countries, environmental accounting is an important part of industrial decision-making, but there is a lack of commitment to the environment in Bangladesh. To many individuals in an organization, the idea of EMA is not explicit and is conceived as a framework that merely tracks and records environmental costs (Doorasamy, 2016). There is still slow and lagging EMA adoption. If they are made aware of the amount of money they could save by implementing safer manufacturing processes and technology, managers are hesitant to spend significant sums of money (Doorasamy, 2016). Companies miss out on major Cost-cutting Possibilities (CP) and ecological benefits of CP because of a lack of monitoring and data collection (Bengü & Can, 2009).

Environmental Accounting: Organizations can use EMA procedures to collect, categorize, and assess data on the effects of their operations on the environment and the security of their employees (Susanto & Meiryani, 2019). The term "environmental accounting" is used to describe the study of the interplay between accountants and ecology, the acquisition of information on environmental costs or agreed environmental costs, the distribution of satisfactory products and services, the execution of responsible business practices, and the development of long-term strategies for ensuring the viability of businesses (Tanc & Gokoglan, 2015). It is important to acknowledge the impact environmental issues have on more conventional areas of accounting by using environmental accounting, which ensures the improvement of financial and non-financial accounting systems, the assessment of negative environmental impacts, the identification, tracking, and reporting of environmental-related financial events (Tanc & Gokoglan, 2015). Many different types of consumers may make judgments based on the obtained data, making environmental accounting a particularly multifaceted field. In order to generate information in accordance with fact, the objective of environmental accounting can be articulated in an honest and unbiased way by considering the needs of the entire society and social responsibility. The main aim of environmental accounting, related to other accounting systems, is to produce and exchange information. Meanwhile, by sharing the knowledge gathered, environmental accounting attempts to illustrate connections between areas such as businesses and the environment and the economy (Leaa & Fredendall, 2002) .

Environmental Costs: When a company takes measures to safeguard the environment, prevent environmental problems, or lessen environmental damage, it incurs environmental costs. Another interpretation emphasizes the money saved in

meeting present and future emission standards. Some environmental costs are caused by the actions taken to preserve the environment, while others are directly attributable to the consumption of natural materials. The air pollution that these companies create is responsible for yet another chunk of these expenses. Cost reduction, operating expenses, and damage costs are the three main types of environmental costs.

This data should be prepared in the field of hotel operations and environmental costs reduction after EMA has determined the environmental costs for hotels based on the hotel's level and responded to the needs of hotel management regarding how it intends to use the information for decision making across a wide range of hotel-related activities and businesses. (Figge & Hahn, 2013) These statements are supported by the prevalence of environmental issues in both China and India. (Le, Nguyen, & Phan, 2019). The industrial sector is crucial to the economic growth of both China and India, two growing countries. Southeast Asian nations like Indonesia, Vietnam, and Thailand are more likely to experience environmental degradation. Worldwide, people are becoming more and more concerned about the impact that businesses have on the environment and the growing number of regulations they must comply with. This has led to an increase in the number of companies including environmental considerations in their strategic planning processes. (Pratiwi, Meutia, & Syamsurijal, 2020)

EMA Approach: The EMA method requires businesses to provide not just their fundamental environmental expenditures but also their material costs. Since environmental data is typically treated as a hidden or unnecessary cost in conventional management accounting systems, the use of EMA has become increasingly crucial (Le, Nguyen, & Phan, 2019). There has been a lack of focus on the importance of EMA implementation in dynamic and growing economies like those in Southeast Asia (Somjai, Fongtanakit, & Laosillapacharoen, 2020). Comparable economic contexts allow for a clearer understanding of the significance and variation in EMA adoption across nations. The degree of EMA required in high-risk industries like manufacturing and environmentally sensitive industries like chemicals, smelting, energy, and oil has been the focus of previous studies (Takakuwa, Zhao, & Ichimura, 2014). EMA can be defined as an administrative advancement of management principles and methods structured to help managers maximize resource performance (Ratnadi, Ariyanto, & Putra, 2020). The way that the cases are from various areas is an inescapable consequence of the self-application measure by which organizations showed their advantage and readiness in going about as a contextual analysis organization (Sidik, Yadiati, Lee, & Khalid, 2019). While this adds to the extravagance of viewpoints, an area explicit investigation would have given different freedoms, for example for additional similar investigation.

Effect of EMA Process: The effect of EMA processes, tools, and legislation on EMA implementation has been studied in some studies. According to UNDS (2000), a traditional accounting method would prohibit a corporation from correctly assessing environmental costs. To successfully make decisions that reduce

environmental costs while increasing profits, as well as to deal with the aforementioned constraints, businesses need a diverse set of abilities in areas such as management, finance, technology, accounting, and environmental issues. Environmental management accounting considers better reconciliation of ecological data into the current accounting frameworks (Latan, Jabbour, Jabbour, Wamba, & Shahbaz, 2017). As it expressly treats ecological expenses and tracks natural data, EMA - features covered up ecological expenses and advantages. In another examination, (Figge & Hahn, 2013) dissected the relationship of environmental responsibility with an association's monetary exhibition. Environmental management accounting (EMA), which is a subset of environmental accounting, is the focus of this investigation since it is seen as an enlargement of traditional management accounting. From a broad perspective, this study defines EMA as the gathering, analysis, and use of financial and physical (or monetary and non-monetary) climate-related data with the purpose of enhancing official monetary and natural performance (Huseno, 2018). Management's commitment extends to the shaping of business culture in ways that affect workers. To put it another way, management engagement will help the organization's environmental management in terms of environmental concerns, environmental practices, and environmental initiatives (Ratnadi, Ariyanto, & Putra, 2020). As a consequence, management engagement will inspire workers to participate in environmental projects. Environmental decision-making is also seen to benefit greatly from managerial participation. The study employs the concept of the "triple bottom line," which. The research looks at the impact of EMA on business sustainability across five different sectors in Bangladesh: mining, agriculture, construction, electricity, and textiles & apparel. The five manufacturing industries were chosen because of their close relationship to the consumption of raw materials. They do have a major impact on the environment and the people who live there (Burritt, Herzig, Schaltegger, & Viere, 2018). Environmental management accounting faces difficulties in guiding management decisions due to the scarcity and poor quality of data, the need to modify information gathered by existing management control systems, and the requirement to implement technology for information collection and sharing along supply chains (Huseno, 2018).

Environmental Management Accounting Practice (EMAP): The involvement of senior management commitment appears to be one of the most crucial aspects of EMAP deployment for improving environmental management, especially in the Bangladeshi manufacturing sector. As a result, management engagement is a critical component of EMAP's efforts to strengthen environmental management in the Bangladeshi manufacturing industry (Bartolomeo, Bennett, Bouma, Heydkamp, James, & Wolters, 2000). When it comes to the accounting industry, environmental management is only one of the many practices that have been put into action (Tanc & Gokoglan, 2015). He defined EMAP as a tool that organizations may use to provide better natural resource management and information to their business partners. Organizations have begun addressing partner worries about the association's environmental impact. This is because implementing EMAP is crucial for managing the environment in a way that has less of an impact on the planet's temperature. Companies are making efforts to become more powerful and efficient,

while also making use of available resources to ensure environmental control (Huseno, 2018)

EMAP in Bangladesh: Lack of coordination, lack of mandatory direction, lack of experienced personnel, extra cost participation, etc. are just a few of the environmental accounting difficulties that most businesses must contend with. These are making it harder to put EMA into practice in Bangladesh (Hossain, 2019). It proves that the implementation of EMA is poor in Bangladesh. The government's efforts are still insufficient to create a solid foundation of environmental accounting for the manufacturing sector. It has been noted that, due to the additional costs involved, input useful for EMA is not always readily available. There hasn't been a thorough cost-benefit analysis yet. Businesses in Bangladesh have not yet grasped the importance of analyzing Environmental Accounting with other parts of accounting (Hossain, 2019). There are also no universally acknowledged accounting standards, Regulations, Rules, etc. in Bangladesh, hence it is difficult to assess how well businesses are doing. Major obstacles to Environmental Accounting operations included a lack of marketing for its usage and a failure to collaborate between accountants and environmental management departments. (Hossain, 2019)

EMA Implementation in Bangladesh: Ecological Management Accounting (EMA) is a crucial component of executive accounting since it helps to reflect eco-related management actions. According to the International Federation of Accountants (IFA), Ecologically-Mature Accounting (EMA) is the administration of ecological and financial execution via the occurrence and utilization of suitable climate-related accounting frameworks and procedures (Sidik, Yadiati, Lee, & Khalid, 2019). EMAP can only be improved through legal compliance, which is why environmental regulation is essential, especially in Bangladesh's manufacturing sector. Bangladesh's economic growth is largely attributable to the contributions of its SMEs. Small and medium-sized enterprises (SMEs) make up the bulk of Bangladesh's business sector; they are regarded as a significant threat to the expansion of natural corruption (Aranda-Uson, Portillo-Tarragona, Scarpellini, & Llena-Macarulla, 2019). It appeared that there was a failure to understand the significance of environmental costs to the organization's bottom line (Alcouffe & Gibassier, 2018). This research aims to fill this knowledge gap by analyzing the roles of EMA and FES as intermediaries between environmental progress and the public profile of businesses in Bangladesh's industrial sector.

3.0 Methodology

3.1 Data Collection and Survey Framework

The primary data for this article was gathered through a survey questionnaire using a qualitative research approach. A five-point Likert scale ranging from "strongly disagree" to "strongly agree" was used for the survey's response options, which was asked by the respondents to check the acceptable choice based on their own experience and expertise.

3.2 Target Population and Sampling

The population collected in this research includes all those individuals in Bangladesh's manufacturing companies who perform their duties as top managers. Through zoom meetings and email, the suitable respondents were approached. There were 168 manufacturing companies picked for the interview process. Therefore, a mandatory test was conducted on questionnaires, allowing for static analysis of a high response rate. Among them 3 responses were blank or spam, so they were eliminated. And 56 companies didn't fill up the questionnaire. Finally, in order to evaluate the study hypotheses, 109 questionnaires were used for the evaluation. Microsoft Excel was used because by structuring it in a single test to perform a full research model since it is the right program for the study model. To get to conceivably rich information and to cover a wide scope of points of view, a few wellsprings of proof were utilized and cross - approved (information triangulation). Information assortment strategies included meetings, direct perception, documentation, authentic records, and a poll for the underlying choice of cases.

4. Results and Data Analyses

This study set out to explore the state of Environmental management accounting in Bangladesh's industrial sectors. A survey was taken for this purpose. 109 companies responded to this survey. Among them most of them were male. Maximum respondents were between 36-40 ages.

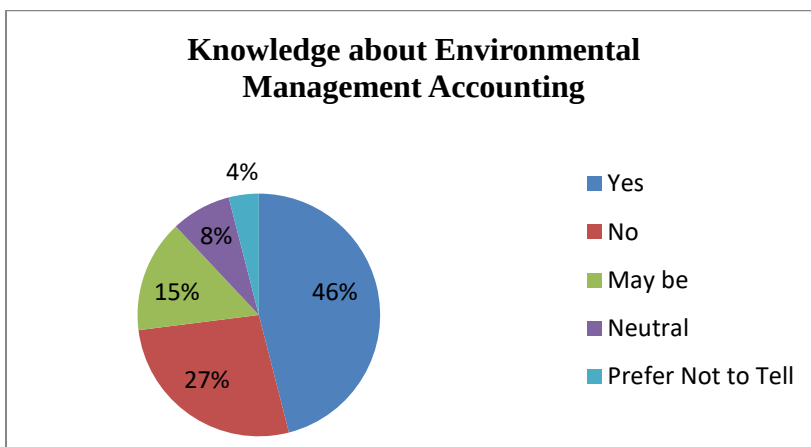
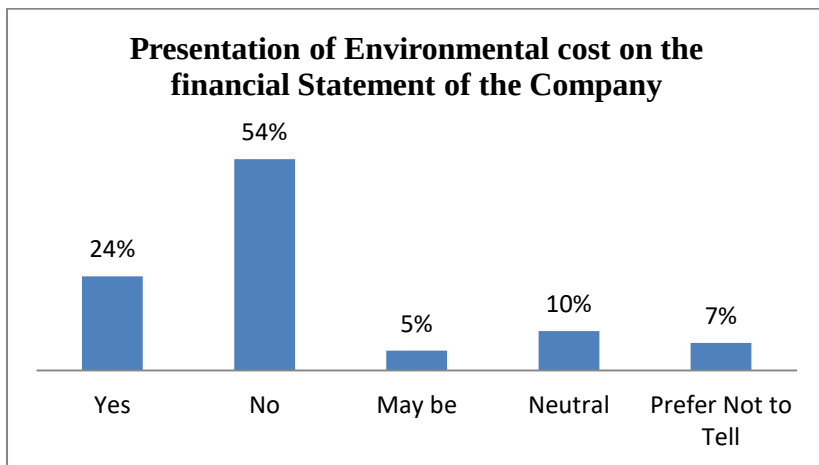


Figure 1

In figure 1, the data were collected to know about the knowledge on this respective field in an organization. Most responses were positive, which is 46%. And that's a good thing because, when used properly, Environmental Accounting can help organizations streamline their environmental management, reduce expenses, and improve their bottom line. But 27% companies responded that they don't have any knowledge about Environmental Accounting which is pretty high.

**Figure 2**

In figure 2, the respondents were inquired to find out that if they include or present environmental cost in their financial statement. Unfortunately most of the responses were negative. 54% companies replied that they don't include such type of costs. This is very alarming for the environment. Only 24% companies include environmental cost in their financial statements.

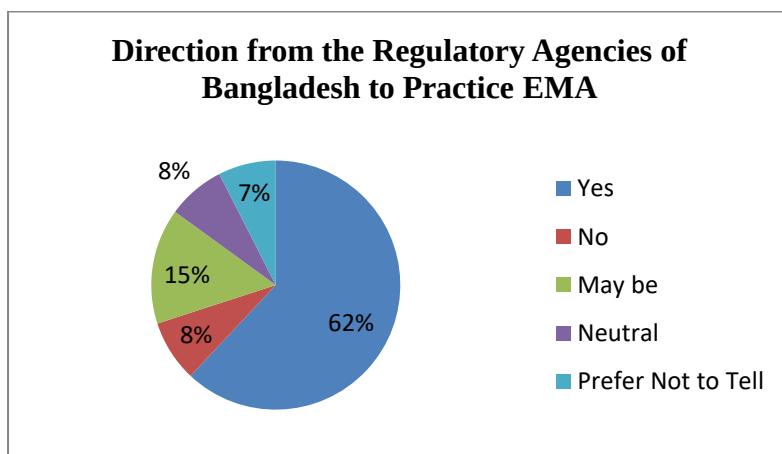
**Figure 3**

Figure 3 shows the data of opinions about the direction from the regulatory agencies of Bangladesh to practice EMA. Most of the respondents, about 62% agree that they have directions from the regulatory agencies to practice EMA. That concludes that even though they have directions to practice EMA, they don't practice it because there is no pressure.

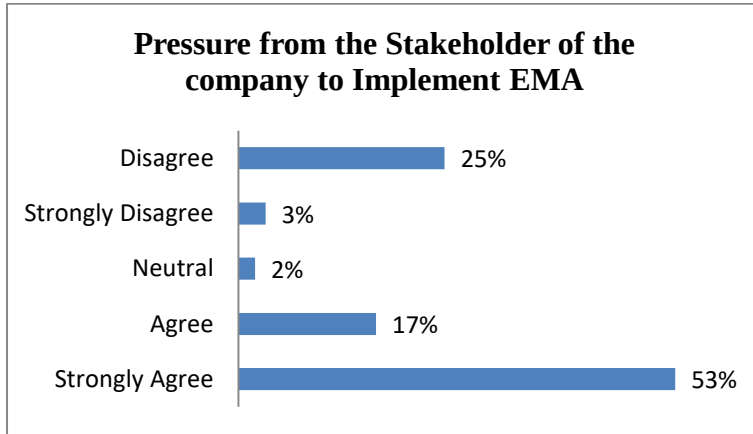


Figure 4

Figure 4 shows that there is a huge pressure from the stakeholder to implement EMA. 53% strongly agree and 17% agree that they have pressure from the stakeholder. This reflects positively for the company's future. Only 25% companies don't face any pressure from the stakeholder about it.

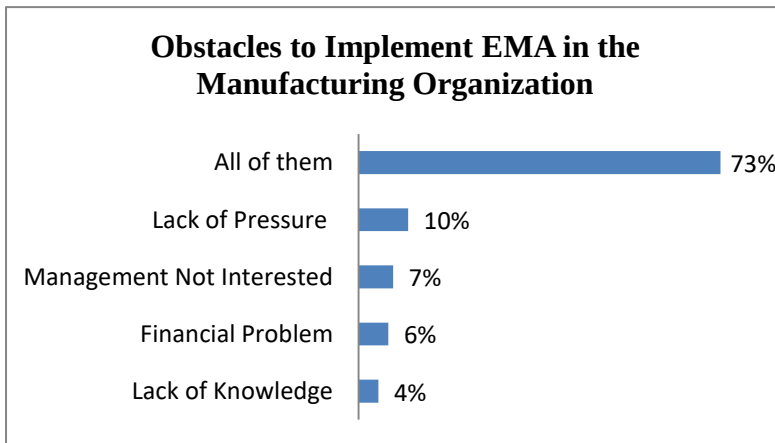


Figure 5

Figure 5 indicates the obstacles to implement EMA in manufacturing organizations. Huge amount of respondents, around 73% companies think that lack of knowledge, financial problem, uninterested management and lack of pressure is the primary barrier to widespread implementation of EMA.

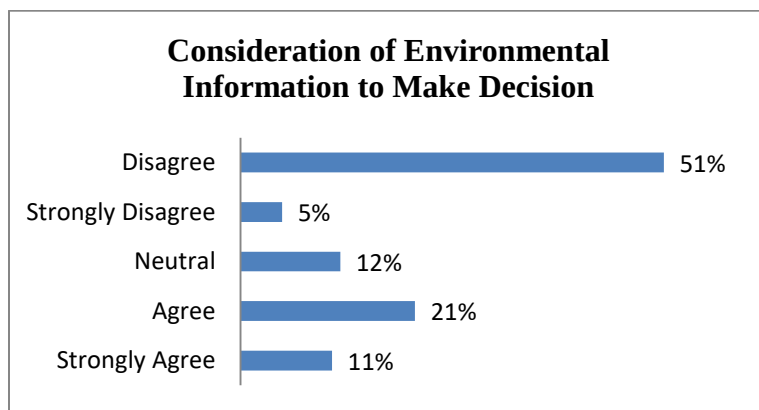


Figure 6

In figure 6, the respondents were asked if they consider environmental information to make decision. Unfortunately most of the responses were negative. 51% companies disagree on the fact that they consider environmental information to make decision. For the environment's well-being, this is a major red flag.

5. Discussion

When it comes to traditional and environmentally preferable budget estimates, environmental Management Accounting is concerned with the identification, compilation, measurement, evaluation, internal reporting, and utilization of energy and materials flow information, cost to the environment information, and other budget estimates. The activities of Bangladesh's corporate sector, especially the manufacturing industry, are causing significant environmental damage. Despite being directed by Bangladesh's Department of Environment (BDA), the majority of businesses still lack proper waste management systems. Furthermore, these businesses must bear the costs of pollutant waste recycling, because if these wastes are not recycled or handled properly, the country will be held liable in the long run. According to the Global Climate Risk Index, which many scientists believe is being exacerbated by climate change; Bangladesh is the most incredibly sensitive to extreme weather events. An economic evaluation of air pollution reveals that it costs Taka 124 billion per year in the capital alone in terms of lost human wellbeing and life. This amounts to 3-4% of the GDP of the entire country. After tallying the costs, it was determined that the loss of abundant resources cost over Taka 83 billion, that chronic bronchitis cost over Taka 20 billion, and that the loss of restrictive action days cost over Taka 5 billion. Asthma attacks cost 4 billion yen, respiratory clinic infections cost 153 million yen, emergency room visits cost 114 million yen, and respiratory side effects infections cost 11 billion yen. Since high levels of pollution inhibit photosynthesis, air pollution also reduces food production and timber harvests. The World Health Organization estimates that over 700,000 deaths per year may be avoided in developing countries if three primary air pollutants were lowered to more acceptable levels. These pollutants include carbon monoxide, suspended particulate matter, and lead. In 1995, the annual cost of urban discuss contamination

to human health in developing countries was estimated to be around US\$100 billion. Constant bronchitis accounted for roughly \$40 billion of that total. Bangladeshi industry has contributed to environmental degradation. Tanneries and the leather sector were judged to be the worst polluters of water, while the food industry was the worst offender of air quality. Extreme weather in Bangladesh caused \$2,189,000,000 in damage and a 1.81% drop in GDP between 1990 and 2008. An average of 8,241 individuals per year lost their lives. In addition to being a major driver of economic growth and poverty reduction, the manufacturing industry is also one of the most competitive in the economy. Failure to properly account for environmental considerations during the development of production procedures can have far-reaching effects. In addition to producing half of the world's carbon dioxide and ninety percent of its sulphur dioxide, industrial processes also consume 37 percent of the world's electricity. A more pressing issue, though, is the severity of certain of manufacturing's local effects and the steep price tag of rehabilitation. Much of Bangladesh's pollution problem may be traced back to the country's bigger factories. Environmental impacts range from those caused by the production of fertilizer and cement to those caused by the manufacturing of glass, ceramics, iron and steel, paper and pulp, and refineries. They contribute significantly to atmospheric nitrogen, sulphur, and carbon dioxide levels. Emissions of lead, arsenic, and chloride from the glass, iron, and metal products are quite dangerous. Water and soil are also contaminated by the waste products of these enterprises. Large-scale resource exploitation causes surface disruption and degradation. The annual report's middle portion, the Directors' Report, and a dedicated section of this report are just a few places where environmental data might be used. According to this research, most businesses don't include environmental cost in their financial reports. Only a few businesses, on the other hand, report this data in separate environmental sections of their annual reports and have included environmental details in its key financial statements. It is also found that several Bangladeshi manufacturing firms do not disclose in their financial statements or in the notes to the financial statements and in the supplementary schedules the costs, obligations, and profits that are directly or indirectly related to the state of the environment. A number of trained accountants were spoken who work in Bangladesh and discovered that they are unconcerned about these issues. Too far, the Securities and Exchange Commission (SEC) has not published definitive standards for how businesses should reflect the environmental impacts of their operations in their financial statements. Consequently, it is clear that in Bangladesh, the custom of disclosing an organization's environmental impact has not yet developed. Even though the focus of this article is on manufacturing firms that are mandated to report their financials, it is important to keep in mind that all businesses have some unavoidable influence on the world around them. From the perspective of the annual reports of several businesses doing business in Bangladesh, it is seen that the foundation for the treatment of natural costs and benefits within the monetary explanations has yet to be formed. This means that the budgetary justifications are not including information on how business activities influence the environment. In the end of the discussion it is proved that, our country has a terrible track record of EMA implementation. It's past time for organizations with ties to Bangladesh to start thinking about this.

6.0 Conclusions and Recommendations

6.1 Conclusions

The study's findings demonstrated that the Bangladeshi manufacturing sector is not robust and mature across all five of the key success variables for EMAP (natural expense, ecological guideline, ecological security, the board's accountability, and client centre). Since this study is limited in scope, it has been challenging to locate literature on EMAP in the Bangladeshi manufacturing sector. Another stumbling block is that this inquiry has so far only led to 60 Bangladeshi manufacturing firms. The authors are planning to further investigate the connection between EMAP, data infrastructure, and performance in the Bangladeshi manufacturing sector. Environmental accounting has not been established or practiced in Bangladesh as of now. By looking at annual reports, the authors are able to determine that none of the organizations operating in Bangladesh was disclosing any financial information related to environmental concerns. Therefore, the researchers have only attempted to provide an overview of ecological accounting, its significance, and the benefits of employing it, as well as suggestions for presenting this unique technique in Bangladesh.

The study's results show that businesses are well aware of the fact that environmental concerns would have a significant impact on business and industry in the immediate future. They are fully persuaded of the importance of environmental data. Despite this understanding, external environmental accounting does not exist. Companies in Bangladesh just don't have a proper environmental accounting scheme in place to assess the costs, benefits, assets, and liabilities associated with the environment. Companies typically provide only statutorily necessary, qualitative, and constructive environmental information in the absence of strict accounting proclamations from the ICAB and disclosure standards from regulatory authorities. It can be assumed according to the survey that environmental accounting and reporting operation in Bangladesh is minimal.

6.2 Recommendations

- Organizations in Bangladesh should review their ecological costs and maintain their approach to including environmental costs in budget summaries.
- The government may also use a hierarchical structure including some duly qualified professionals to create a variety of policy to practice EMA in the organization.
- The respective authority can provide incentives for enterprises to adopt EMA in manufacturing sectors of Bangladesh.
- Government regulatory agencies at different levels, such as Institute of Cost & Management Accountants of Bangladesh (ICMAB), Bangladesh Bank, and Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) can provide an appropriate methodology for promoting and enforcing EMAP by taking a variety of measures, such as developing a policy framework for EMAP implementation in manufacturing sectors, writing guidelines for enterprises etc.

- Experts in Bangladesh should support the announcing of natural issues in fiscal summaries while inspecting the financial statements, particularly those of organizations causing natural harms, and the ICAB should detail separate rules and articulate those to be carefully rehearsed to guarantee this.

In addition to these measures, the Government and other administrative bodies should prioritize the construction of waste management or reusing factories in order to protect the environment.

Reference

- Agustia, D., Sawarjuwono, T., & Dianawati, W. (2019). The Mediating Effect of Environmental Management Accounting on Green Innovation - Firm Value Relationship. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 09 (2), 399-406.
- Alcouffe, S., & Gibassier, D. (2018). Environmental Management Accounting: The Missing Link to Sustainability? *Social and Environmental Accountability Journal*, 38 (1), 1-18.
- Amir, M., & Chaudhry, N. I. (2019). Linking Environmental Strategy to Firm Performance: A Sequential Mediation Model via Environmental Management Accounting and Top Management Commitment. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, 13, 849-867.
- Appiah, B. K., Donghui, Z., Majumder, S. C., & Monaheng, M. P. (2020). Effects of Environmental Strategy, Uncertainty and Top Management Commitment on the Environmental Performance: Role of Environmental Management Accounting and Environmental Management Control System. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10 (1), 360-370.
- Aranda-Uson, A., Portillo-Tarragona, P., Scarpellini, S., & Llena-Macarulla, F. (2019). The progressive adoption of a circular economy by businesses for cleaner production: An approach from a regional study in Spain. *Journal of Cleaner Production*, 247, 1-11.
- Bartolomeo, M., Bennett, M., Bouma, J. J., Heydkamp, P., James, P., & Wolters, T. (2000). Environmental management accounting in Europe: current practice and future potential. *European Accounting Review*, 9 (1), 31-52.
- Bengü, H., & Can, A. (2009). Çevre Muhasebesinin Muhasebenin Temel Kavramlarından Sosyal Sorumluluk Kavramı Bağlamında Temellendirilmesi, *Celal Bayar Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7, 155-160.
- Burritt, R. L., Herzig, C., Schaltegger, S., & Viere, T. (2018). Diffusion of environmental management accounting for cleaner production: Evidence from some case studies. *Journal of Cleaner Production*, 224, 479-491.
- Burritt, R., & Christ, K. (2016). Industry 4.0 and environmental accounting: a new revolution? *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 1, 23-38.
- Cescon, F., Costantini, A., & Grassetti, L. (2019). Strategic choices and strategic management accounting in large manufacturing firms. *Journal of Management and Governance*, 23, 605-636.
- Chaudhry, N. I., Asad, H., Ch., M. A., & Hussian, R. I. (2020). Environmental Innovation and Financial Performance: Mediating Role of Environmental Management Accounting and

- Firm's Environmental Strategy. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, 14 (3), 815-837.
- Christ, K. L., & Burritt, R. L. (2017). Water management accounting: A framework for corporate practice. *Journal of Cleaner Production*, 152, 379-386.
- Christensen, B., & Himme, A. (2017). Improving environmental management accounting: how to use statistics to better determine energy consumption. *J Manag Control*, 28, 227-243.
- Christine, D., Yadiati, W., Afiah, N. N., & Fitrijiat, T. (2019). The Relationship of Environmental Management Accounting, Environmental Strategy and Managerial Commitment with Environmental Performance and Economic Performance. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9 (5), 458-464.
- Doorasamy, M. (2016). THE PERCEPTIONS OF MANAGEMENT ON THE BENEFITS OF ADOPTING AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM AS A WASTE MANAGEMENT TOOL. *Foundations of Management*, 08, 93-106.
- Doorasamy, M. (2015). THEORETICAL DEVELOPMENTS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING AND THE ROLE AND IMPORTANCE OF MFCA. *Foundations of Management*, 7, 37-52.
- Figge, F., & Hahn, T. (2013). Value drivers of corporate eco-efficiency: Management accounting information for the efficient use of environmental resources. *Management Accounting Research*, 24, 387-400.
- Fuzi, N. M., Habidin, N. F., Janudin, S. E., & Ong, S. Y. (2019). Critical success factors of environmental management accounting practices: findings from Malaysian manufacturing industry. *MEASURING BUSINESS EXCELLENCE*, 23 (1), 1-14.
- Herzig, C., Viere, T., Schaltegger, S., & Burritt, R. L. (2012). Environmental Management Accounting: Case studies of South-East Asian Companies. *Accounting forum*, 36, 310-312.
- Huang, H., Wu, D., & J, G. (2017). Chinese shareholders' reaction to the disclosure of environmental violations: a CSR perspective. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 2 (12), 1-16.
- Huseno, T. (2018). THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING (EMA) PERSPECTIVE CALCULATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ENVIRONMENT IN RIAU. *JJournal of Applied Management (JAM)*, 16, 714-721.
- Huyen-Tram, N. T., & Toan, P. N. (2018). Factors Affecting the Application of Environmental Management Accounting in Construction Companies in Ho Chi Minh City. *International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)*, 4, 487-492.
- Ismail, M. S., Ramli, A., & Darus, F. (2014). Environmental management accounting practices and Islamic corporate social responsibility compliance: evidence from ISO14001 companies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 343-351.
- Jamil, C. Z., Mohamed, R., Muhammad, F., & Ali, A. (2014). Environmental management accounting practices in small medium manufacturing firms. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 172 (2015), 619-626.
- Kumarasiri, J. (2017). Stakeholder pressure on carbon emissions: strategies and the use of management accounting. *Australasian Journal of Environmental Management*, 24 (4), 339-354.

- Latan, H., Jabbour, C. J., Jabbour, A. B., Wamba, S. F., & Shahbaz, M. (2017). Effects of environmental strategy, environmental uncertainty and top management's commitment on corporate environmental performance: The role of environmental management accounting. *Journal of Cleaner Production*, 180, 297-306.
- Latif, B., Mahmood, Z., San, O. T., Mohd, R., & Bakhsh, A. (2020). Coercive, Normative and Mimetic Pressures as Drivers of Environmental Management Accounting Adoption. *Sustainability*, 12, 1-14.
- Le, T. M., Dang, L. A., & Le, T. H. (2020). Factors affecting the environmental management accounting implementation and the quality of environmental information for making decisions of fishery processing enterprises in Vietnam. *Accounting*, 6, 401-412.
- Le, T. T., Nguyen, T. M., & Phan, T. T. (2019). *Sustainability*, 11, 1-32.
- Leaa, B.-R., & Fredendall, L. D. (2002). The impact of management accounting, product structure, product mix algorithm, and planning horizon on manufacturing performance. *Int. J. Production Economics*, 79, 279-299.
- Masanet-Llodra, & J., M. (2006). Environmental Management Accounting: A Case Study Research on Innovative Strategy. *Journal of Business Ethics*, 68, 393-408.
- Mokhtar, N., Jusoh, R., & Zulkifli, N. (2016). Corporate characteristics and environmental management accounting (EMA) implementation: evidence from Malaysian public listed companies (PLCs). *Journal of Cleaner Production*, 136, 111-122.
- Morton, H., Winter, E., & Grote, U. (2016). Assessing natural resource management through integrated environmental and social-economic accounting: The case of a Namibian conservancy. *Journal of Environment & Development*, 25 (4), 396-425.
- Nguyen, T. T. (2019). Practice environmental cost management accounting: The case of Vietnamese brick production companies. *Management Science Letters*, 9, 105-120.
- Nyide, C. J. (2019). Better resource management: A qualitative investigation of Environmental Management Accounting practices used by the South African hotel sector. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 8 (4), 1-10.
- Nyide, C. J. (2017). The role of environmental management accounting and voluntary self-regulatory initiatives in improving resource efficiency in South African hotels. *Environmental management accounting and voluntary self-regulatory initiatives*, 13 (1), 30-41.
- Phan, T. N., Baird, K., & Su, S. (2017). The use and effectiveness of environmental management accounting. *Australasian Journal of Environmental Management*, 24 (4), 355-374.
- Pratiwi, Y. N., Meutia, I., & Syamsurijal, S. (2020). The Effect of Environmental Management Accounting on Corporate Sustainability. *Binus Business Review*, 11, 43-49.
- Putra, Wahyuni, N., & Suyoso, Y. H. (2020). Towards understanding changes in management accounting in the manufacturing industry in Indonesia. *Growing Science*, 6, 1245-1252.
- Ratnadi, N. M., Ariyanto, D., & Putra, N. W. (2020). The Vitality of Employee Based Pharmaceutical Brands' Equity in Indonesia: Relationship between Environmental Management Accounting and Organization Performance. *Systematic Review Pharmacy*, 11 (1), 554-563.

- Sales, & De, I. L. (2019). THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING ON FIRM PERFORMANCE WITH GREEN INNOVATION AS AN INTERVENING VARIABLE IN EMPIRICAL STUDIES IN MANUFACTURING COMPANIES. *RJOAS* , 420-425.
- Sidik, M. H., Yadiati, W., Lee, H., & Khalid, N. (2019). The Dynamic Association of Energy, Environmental Management Accounting and Green Intellectual Capital with Corporate Environmental Performance and Competitive Advantages. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9 (5), 379-386.
- Somjai, S., Fongtanakit, R., & Laosillapacharoen, K. (2020). Impact of Environmental Commitment, Environmental Management Accounting and Green Innovation on Firm Performance: An Empirical Investigation. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10 (3), 204-210.
- Staniskis, J. K., & Stasiskiene, Z. (2005). Environmental management accounting in Lithuania: exploratory study of current practices, opportunities and strategic intents. *Journal of Cleaner Production*, 14, 1252e1261.
- Susanto, A., & Meiryani. (2019). Antecedents of Environmental Management Accounting and Environmental Performance: Evidence from Indonesian Small and Medium Enterprises. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9, 401-407.
- Susanto, A., & Meriyani, M. (2019). Antecedents of Environmental Management Accounting and Environmental Performance: Evidence from Indonesian Small and Medium Enterprises. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9 (6), 401-407.
- Takakuwa, S., Zhao, R., & Ichimura, H. (2014). Analysis of manufacturing systems using simulations in terms of material flow cost accounting. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 7, 44-51.
- Tanc, A., & Gokoglan, K. (2015). The Impact of Environmental Accounting on Strategic Management Accounting: A Research on Manufacturing Companies. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5 (2), 566-573.
- Zandi, G. r., & Lee, H. (2019). Factors Affecting Environmental Management Accounting and Environmental Performance: An Empirical Assessment. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9 (6), 342-348.
- Zandi, G. R., Ghani, E. K., Lestari, R. M., & Maimunah, S. (2019). The Impact of Management Accounting Systems, Eco-innovations and Energy Efficacy on Firm's Environmental and Economic Performance. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9 (6), 394-400.
- Zandi, G. R., Khalid, N., & Islam, D. M. (2019). Nexus of Knowledge Transfer, Green Innovation and Environmental Performance: Impact of Environmental Management Accounting. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9 (5), 387-393.

Exploring Information and Technological Impacts on Young Generation : A Study on Public University Students in Bangladesh

K. M. Sujauddin*
Md. Touhiduzzaman**

Abstract

This paper investigates the impact of Information and Communication Technologies (ICTs) on the behavior patterns and health of young students in public universities of Bangladesh. Data was collected using a purposive sample of 80 participants from three public universities namely Dhaka, Jagannath, and Jahangirnagar, through a survey research design with semi-structured interview schedules. The study found that most respondents (90%) use ICT for communication purposes, and spend over six hours per day using ICT, leading to health issues such as bad headaches. Additionally, excessive use of ICT is causing young people to become detached from their families (73.33%). The study highlights the need for greater awareness among young people about the risks associated with excessive use of ICT and the importance of maintaining a healthy balance in using technology. The results of this study have implications for the promotion of responsible use of technology for personal and academic purposes among youth.

Keywords: Communication, Technology, Youths, Detachment, Health

1. Introduction

Information and communication technologies (ICTs) are regarded as technologies, which are used for main purposes like sending any message, the store information that is jointly disclosed as email, SMS, text messaging, video chat, and online social media. Laptops, computers, and smartphones are used as devices that carry out a number of functions related to communication and information systems. These functions have a great contribution to reducing poverty and solving many social and economic problems (Perron et al, 2010). The concept of globalization is one that is mostly connected to ICT over the previous years and it has become used in most of the spheres of politics, business, media, and so on. As a result of using information and communication technology, it can be said that the term globalization became widely known on the tip of all people around the world. On the other hand, it is noticeable that globalization was not a buzzword but rather relatively unknown (Giddens, 2006).

Information, as well as Communication Technologies (ICTs), usually refers to a system that helps in establishing and using digital files in case of producing, storing, sending, and retrieving through which a process is maintained. This digital file

* Assistant Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

** Lecturer, Dhaka International University, Dhaka-1213, Bangladesh

covers a large amount of information that may be text, images, or sounds that may be both still and moving on. Information and communication technologies, specifically the internet, is altering as well as transferring all human activities from generation to generation through these types of technologies (Bartlett, 2002). Use of new technologies that carries information for the improvement of human quality of life for all the people in society like individuals, groups, and organizations. By using this technology someone is getting benefited and sometimes someone loses their destination. As the human activities are being altered by the technology, people are sometimes search everything in online to sort out their necessary products, these people very often order online and get benefited by the support of internet (Von Neumann & Morgenstern, 1994). Apart from that, demanding jobs in the present era of technology in our society require knowledge of their respective field and who are technologically savvy. In fact, ICT is a powerful and flexible tool to develop the self, desired to meet globalization challenges, enhance the economic and social status of our country, motivating and aiding their better learning (Rabah, 2015).

Youth are highly affected by the internet and media in the age of ICT. School-age children use these new technologies and are able to communicate with others and improve themselves in using technologies. Youth are also facing some difficulties and are also affected by some risks as well as injured by the misuse and overuse of internet technology. Sometimes communication gives false consciousness to the users. Youth are creating an unreal world by forming a relationship that is unstable and making their family bondage very low as they believe in online communication. And they build their communication with people who are from both within national boundaries and with outsiders (Fallahi, 2011). It has become an increasingly global concern that, in the modern age, the nature and characteristics of communication transmit messages across a wider distance with relative ease, so that information and communication have access to the mainstream and marginal people. Proliferating the network of electronic communication, distance has been eclipsed. Every person has the chance to interact with others in response to practical using contexts in day-to-day life even though they are located in a distance that may be from different parts of the world (Held & McGrew, 2007). Moreover, with the backdrop of technology related research, the present study is therefore designed to explore and analyzes the impact of ICTs on youths focusing on the behavioral patterns.

2. Research question and Objectives

Considering the research question, how does access to and use of communication technology impact the behavior patterns and health of young students in public universities in Bangladesh? the study mainly focus on technological impact on young generation. For more clarification the study has conducted following the specific objectives that include:

- a. To know the access of the young generation to communication technology.
- b. To explore the behavior patterns of the young generation influenced by communication technology

- c. To assess the impact of communication technology on the health of the young generation.

3. Methods and Materials

To enhance a profound knowledge and insight into the impact of technologies on youths, researchers have followed a method of triangulation approach. The field survey for this study had been conducted in three public universities in Bangladesh namely Dhaka University, Jagannath University and Jahangirnagar University. Purposive sampling had been followed as the method of the sampling procedure. Around 80 respondents had been selected for social survey and the information was collected from the three leading universities in Bangladesh. Moreover, 8 case studies, 2 Key Informant Interviews (KII), and one Focus Group Discussion (FGD) had been conducted purposively to complete the triangulation process. For the quantitative purpose, it followed a semi-structured questionnaire for taking a face-to-face interview, and for the qualitative method, a number of techniques and tools had been applied to collect qualitative data. The collected data had been analyzed through Statistical Program for Social Sciences (SPSS) version 22 and the gathered qualitative data has been analyzed following thematic analysis. Data coding and recoding have been held after the gathering of qualitative data.

4. Theoretical and conceptual framework

Communication and information technologies have significant impact on contemporary society. Technology shapes our lifestyle and changes our way of thinking, leading to individualism and alienation. New types of networks and communities increasingly replace traditional hierarchical structures. Media alters our sense ratio and has a powerful and direct impact on our beliefs, attitudes, and behaviors. Understanding the dynamics of networks and media is crucial in shaping our lives in the modern world.

Manuel Castells' theory of the network society describes a new type of society that has emerged as a result of the technological advances in communication and information processing. The network society is characterized by a dominant role of information and communication technologies in the organization of social, economic and cultural life. These technologies have created a global network of communication that transcends traditional boundaries of time and space. The rise of digital communication technologies has enabled the formation of new types of networks, including social networks, online communities and virtual organization. In the network society, social relations are increasingly organized around networks rather than traditional hierarchical structures. These networks can be based on shared interests, values or identities, and are often facilitated by ICTs. Castells argues that the network society is a more flexible and dynamic form of organization that can adapt more quickly to changing circumstances than hierarchical structures. Castells theory of the network society emphasizes the transformative impacts of digital communication technologies on contemporary society and highlights the importance of understanding the dynamics of networks in shaping our lives (Castells, 2010). In the Media Determinism theory Marshall McLuhan stated "Medium is the Message"

that focuses on the effect of the communication media which affect our habits of perception and thinking. He used a concept "sense ratio" that refers to the balance of our senses. Media alter the sense ratio or pattern of perception about the entire life of a human being. Smell, touch, hearing, sight and taste were emphasized by the primitive people but at present the passive audience are highly affected by the technology. Media determines everything in our society. And every medium has created their own audiences for different programs, sometimes it confirms what and how we will be given information by the medium. In modern society, both print media and electronic media have influenced our thinking and our visual way of feelings are separated from our thoughts that lead to the rise of alienation and individualism (Severin & Tankard, 1988). The Magic Bullet theory, proposed by Harold Lasswell, also known as the Hypodermic Needle model. In this theory, audiences are regarded as passive and receptive to the message, just like a hypodermic needle injecting medicine directly into the bloodstream. This theory suggests that media messages have a powerful and direct impact on individuals' beliefs, attitudes, and behaviors who receive them. People are not able to avoid the impact of messages that come from technology as it works directly as a magic bullet. The minds of the audience are manipulated by radio and television and people learn hedonism, and emotionalism to operate their lives which are greatly affected by media technology. In most cases, audiences' opinion is firmly cultivated by the effect of technology (Severin & Tankard, 1988). These theories can be conceptualized in the following (shown in the below graph) way which are linked to technological use and its impact on the young generation.

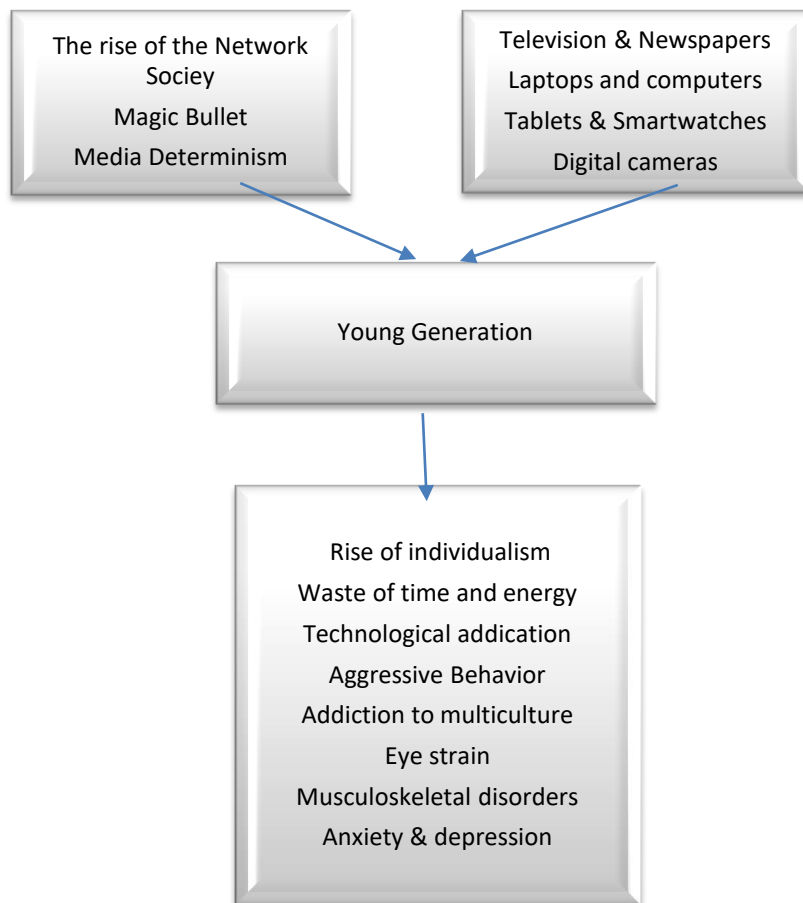


Figure 1: Conceptual frame prepared by the author

These theories highlight that both print and electronic media as well as modern technology shape our lifestyle. The most focused issues in these theories are that technology can change the way of thinking, perception, and way of life. These theories could be effective in explaining the technological impact on the young generation mostly for the passive audience. And determine a correlation between modern technology and changing habits of the audience. The impact of communication and information technologies on contemporary society is undeniable, and this paper aims to explore its effects on the young generation. Through the lens of Manuel Castells' theory of the network society, Marshall McLuhan's Media Determinism theory, and Harold Lasswell's Magic Bullet theory, this paper seeks to explore the extent of access the young generation has to communication technology; behavior patterns of the young generation influenced by communication technology; the impact of communication technology on the health of the young generation. By

examining these objectives, this paper aims to provide a comprehensive understanding of how communication technology shapes the lives of the young generation, and how society can address the potential negative effects of technology on their health and well-being.

5. Results and discussions

5.1 Socio-economic and Demographic Information

Through the study, many significant issues have emerged. The young generation with a diversified background including age, sex, marital status, religion and income have been discussed here. At the age structure of the young generation under the study, it is found that the highest number of respondents (60%) is within the age group of 21-25 and it is more than half of the respondents. Besides, more than one-fourth of respondents (21.25%) are within the age group of 15-20. In addition to this, about one-fourth of the respondents (18.75%) are within 26-30 age. On the other hand, in terms of gender identity, more than half of the respondents (53.8%) are male and nearly half of the respondents (46.2%) are female. At marital status, it has been seen that most of the respondents (92.5%) are unmarried, while very few (7.5%) are married, as all the respondents are students. Besides, in the context of religion, it is found that most of the respondents (87.5%) are from Islam and only a few (12.5%) are from Hinduism. It can be said that, in this study, there is no representation of respondents from other religions like Christianity, Buddhism, and so on as it is a Muslim country. Besides, the respondents' monthly income and expenditure also earned some amount in various ways. Here more than half of the respondents (56.25%) earned 1000-5000 taka per month. Still, more than one-fourth of the respondents (33.75%) earned 5001-10000 taka. Again, a few respondents (10%) earned from 10001 to 15000 taka per month.

5.2 Access to Communication Technology

This writing discusses several studies that investigate the access and use of communication technology among young people. The studies report high levels of daily internet and social media use with a majority owning a smartphone and spending significant time online. Similar trends were observed among university students. The access and use of communication technology among young generations have been widely studied in recent years. Several studies have investigated the access of young people to communication technology. Duggan et al. (2015) reported that 92% of American teens go online daily, and 71% of them use more than one social media platform. According to a study by (Anderson & Jiang, 2018), 95% of American teens aged 13-17 have access to a smartphone, while 45% of them say they are online "almost constantly". Nkhoma and Kambombo (2019) surveyed university students in Malawi and found that 96% of them own a smartphone, and 89% use social media. A study by Khan et al. (2020) found that the use of smartphones and social media is increasing among Pakistani university students, with 95% of them owning a smartphone and 89% using social media. Another study by Alzahrani et al. (2021) reported that 96.8% of Saudi Arabia

university students own a smartphone, and they spend an average of 4.74 hours per day using it for various activities.

Table-1: The access of the young generation to communication technology

Variable	Types	N= 80	%
Types of communication technology	Mobile	78	98.7
	Internet	74	93.7
	Email	51	64.6
	Telephone	23	29.1
Spend the time of the respondents	One hour	41.8	33
	Two hours	30.4	24
	Three hours	19.0	15
	Four hours	3.8	3
Purpose of communication technology	Education	70	87.5
	Entertainment	64	80.0
	Time Passing	39	48.8
	Communication	72	90
Communication of the respondents	Family members	76	95.0
	Friends	78	97.5
	Relatives	62	77.5
	Teachers	53	66.2
	Unknown	21	26.1
	Girlfriends	5	6.2
	Boyfriends	14	17.5

Source: field survey, 2012

The finding indicates the access of the young generation to communication technology. From the table, it has already been known that the young generation is connected with communication technology in several ways and their spending time, the purpose of communication, the people with whom they communicate the amount of spending money and the usefulness of using it has accelerated the access. The respondents used various types of technology to communicate with others. Like, about all respondents (98.7%) used mobile phones. Very close to a hundred percent of respondents (93.7%) used the internet. More than half of the respondents (64.6%) used mail and more than one-fourth of the respondents (29.1%) used the telephone as well. They spent a lot of time communicating too. More than one-fourth of the respondents (33%) spent one hour. Again, very close to one-fourth of the respondents (24%) spent two hours. Still, about one-fourth of respondents (15%) spent three hours. Besides these, a few respondents (3%) spent four hours as well. The purpose of this spending is also different. To refer to the purpose, about all (90%) used technology for communication and for education more than three fourth of the respondents (87.5%) used technology. Besides, somewhat more than three of the fourth respondents (80%) used technology for entertainment. When I asked a respondent about his activities or purposes of using technology, he stated, “I use various types of technology for educational purposes, including laptop, tablet, and smartphone. I use these devices to access online learning resources, such as e-books, journals, and academic databases. I allocate about three to four hours each day to educational activities, which include attending online classes, reviewing lecture

materials, and completing assignments. In addition to using technology for educational purposes, I also use it for other purposes such as entertainment, communication, and time passing with my close friends” (Male, 23, Student, JNU,). Again, about half of the respondents (48.8%) used technology for merely passing time. The respondents communicated with different ones through this technology. About all of the respondents communicated with family (95%) and friends (97.5%). More than three fourth of the respondents (77.5%) communicated with relatives. Besides, about three fourth of the respondents (66.2%) communicated with the teacher, one fourth (26.1%) were unknown. And few with boyfriends (17.5%) and very few respondents communicated with girlfriends (6.2%). The qualitative study somewhat supported the quantitative findings as a young girl said, *“I spend an additional hour or two each day using technology for entertainment purposes, such as watching videos, playing games, or browsing social media. When it comes to communication, I use technology to keep in touch with family members, friends, and classmates. I typically spend about an hour each day communicating with others via email, text messaging, and social media” (Female, 21, Student, DU).*

5.3 Impactful youth technology behaviors

This writing highlights several studies that explore the impact of communication technology on the behavior patterns of young people. Excessive social media use was found to be associated with a higher risk of addiction, symptoms of depression and anxiety, and decreased academic performance. Social media use also led to increased feelings of social isolation and loneliness, attention and concentration problems, and negative emotional well-being. However, some studies have reported positive effects of social media use on self-esteem and social support among college students. The influence of communication technology on the behavior patterns of young generations has been a topic of concern for many researchers. A study by Kuss and Griffiths (2017) explored the relationship between social media use and addictive behavior among young adults, and found that excessive social media use was associated with a higher risk of addiction. Pantic et al. (2012) found that excessive internet use was associated with symptoms of depression and anxiety among university students. Chang et al. (2019) investigated the relationship between smartphone use and academic performance among college students and found that high smartphone use was associated with lower GPA. Verduyn et al. (2017) found that social media use led to increased feelings of social isolation and loneliness, while Nesi et al. (2018) investigated the relationship between social media use and emotional well-being among college students. Lleras (2016) reported that multitasking with technology was associated with decreased academic performance among college students. Similarly, a study by Rosen et al. (2013) found that the constant use of technology may lead to attention and concentration problems among young people. In contrast, a study by Ellison et al. (2011) found that social media use could have positive effects on self-esteem and social support among college students.

From the below-mentioned table-2, it can easily be understood that communication technology highly influences the behavior and manner of the young generation. To refer to the change, the reduction of feelings to family, sleeping more, cultural hybridization and alienation are remarkable. Here more than three fourth of the

respondents (84%) became addicted to communication and reduced feelings for family. Again more than a three fourth of the respondents (88%) changed their mentality and became modern. About one-fourth (24%) felt bored and lost family feelings. Furthermore, nearly three fourth of the respondents (65%) slept more due to going to sleep late at night. Besides, more than half of the respondents (60%) slept more as they wanted to relax more. Again, more than one-fourth of the respondents (37.5%) were due to their habit to sleep more. One of the youths said that, *“I tend to sleep for a long time in the morning and daytime, and it's mainly due to my internet use at night. However, my primary reason for sleeping more is that I want to relax. It's the only time I can turn off my brain and find peace. Unfortunately, I've developed a habit of sleeping more, which is hard to break”* (Male, 19, student, DU).

Except these, cultural hybridization was the remarkable reason behind changing behavior. It has been found that about half of the respondents (52.5%) were Indian culture followers. About one-fourth (21.2%) is Bangladeshi culture and a few (10%) were American culture followers. As a result, alienation occurred. A student of Dhaka University said, *“Personally, I have a great appreciation for American culture, and I aspire to become more modern myself. I and my friends are constantly on the lookout for new trends and strive to stay ahead of the curve. However, I have a friend who enjoys Bangladeshi culture but finds spending time with family to be uninteresting, and another friend from Indian culture who is more addicted to other things”* (Female, 20, student, JU). To find out the reasons about a third of the respondents (73.33%) retorted that more connected with technology. Few respondents (12.50%) shared their opinion through increasing feelings towards their boyfriends. A few respondents (6.67%) made it a responsibility not to maintain time and very few respondents (8.89%) opined on the issue of increasing feelings for their girlfriend. While understanding the behavioral aspects of the young generation, a university student asserted that, *“I feel a strong connection to technology, and it often leaves me feeling somewhat alienated. I find myself spending a lot of time on my phone and social media, which can make it challenging to disconnect and engage with the world around me. Unfortunately, this also means that I struggle to manage my time effectively, which further contributes to my feelings of isolation. Additionally, my growing affection towards my girlfriend has started to take up more of my time and attention. While I am grateful for our relationship, I worry that my increasing focus on her may also contribute to my feelings of disconnection from other aspects of my life”* (Male, 25, Student, JU).

Table-2: The behavior patterns of young generation influenced by communication technology.

Variable	Types	N= 80	%
Reasons to reduce the feelings to family	More addiction	21	84.00
	Change mentality	22	88.00
	Become modern	22	88.00
	Boring	6	24.00
Reasons of sleeping more of the respondents,	Late night sleep	39	65.00
	Want to relax more	36	60.00
	Become habit	30	37.5
Cultural types of the respondents	American	8	10.0
	Bangladeshi	17	21.2

Reasons of alienation of the respondents	Indian	42	52.5
	More connection with technology	33	73.33
	Unable to maintain time	3	6.67
	Increasing feelings to girlfriend	4	8.89
	Increasing feelings to boyfriend	5	12.50

Source: field survey, 2012

5.4 Youth Communication health impact

This writing discusses the findings of various studies that have explored the impact of communication technology on the health of young people. The studies highlight the negative effects of increased Facebook and smartphone use on subjective well-being, self-esteem, and sleep quality. They also report on the negative impact of excessive technology use on relationships, body dissatisfaction, and physical health. However, a recent study found that social media use can have a positive impact on the mental health of Chinese university students.

Several studies have explored the impact of communication technology on the health of young people. Kross et al. (2013) found that increased Facebook use led to declines in subjective well-being and self-esteem, while Wang et al. (2018) reported that smartphone use was negatively related to sleep quality among college students. Rosen et al. (2013) investigated the impact of technology on relationships and reported that more than a quarter of young people have experienced relationship issues due to technology. Twenge and Campbell (2019) found that increased screen time is associated with higher levels of depression and suicidal ideation in young people, and Boutelle et al. (2017) studied the relationship between social media use and body dissatisfaction among adolescents. Another study by Thomee et al. (2010) reported that excessive use of computers and mobile phones can lead to musculoskeletal disorders, vision problems, and sleep disturbances among young people. On the other hand, a study by Lu et al. (2021) found that social media use can have a positive impact on the mental health of Chinese university students.

Table-3: The impact of communication technology on the health of the young generation

Variable	Types	N= 80	%
Types of health problems	Bad headache	41	60.29
	Disability to hear	12	17.65
	Problem in eyes	15	22.06
Types of victimization	Threat	36	54.55
	Sexual harassment	12	18.18
	Lost money	18	27.27

Source: field survey, 2012

As shown in the table-3, it has been detected that communication technology impacts negatively the young generation's health. More than half of the respondents (60.29%) have ensured that they suffered a lot from headaches due to using communication technology. Moreover, a few respondents (17.65%) faced hearing problems and about one-fourth of respondents (22.06%) felt problems in their eyes. Furthermore, the respondents became victims from several sides. Among them, the remarkable issue (54.55%) was a threat. More than half of the respondents felt a threat that was very

detrimental to their ordinary life. In addition, about one-fourth of respondents (18.18%) suffered from sexual harassment due to cyber sexual harassment. Besides, more than one-fourth of the respondents (27.27%) became sad due to losing money. As someone who has studied the impact of communication technology on young people, I've observed that it can have significant effects on both physical and psychological health. An MSS student of a renowned public university in Dhaka narrated, *"Spending too much time online can lead to a sedentary lifestyle, which can contribute to problems like weight gain, poor posture, and eye strain. At the same time, excessive use of technology has been linked to anxiety, depression, and feelings of isolation. To avoid these issues, it's important to find a healthy balance between our technology use and our overall well-being"* (Male, 25, Student, JU).

Conclusion and recommendations

Technology has become more important issues now-a-days as it helps in every sphere of life including communication, knowledge sharing, education, entertainment and so on. This study reviews that, information and communication technology is highly effective on the young generation and it has both positive and negative effects on individuals. In this study, negative effects of communication technology on the younger generation are highly considered. Young generations are highly connected with modern technology and they endeavor to use it in a different way as they spend a lot of time using such modern technology. They have to spend a lot of time since they sleep less at night, which hampers their study. As a result, they sometimes feel alienated from their family bonding. As technology have much impact on young generation, they should aware to use such technology and in this regards some recommendations could be suggested:

- Parents should monitor and guide their children's technology use.
- Youth need proper training on technology and its impact on behavior and health.
- Technological devices in educational institutions should be for educational purposes only.
- Access to technology for youth should be secure and restricted from negative websites.
- Good relationships between parents and children are important for managing technology use.
- Proper laws and monitoring cells should be established to control technology use among youth.
- Training on technology-related issues can help youth develop a sense of responsibility.
- Encouraging sports and limiting screen time can avoid negative impacts of technology.
- Youth should use technology for educational and academic purposes only.
- Developing online etiquette can prevent cyber bullying and respecting others.
- Caution should be exercised when sharing personal information online.
- Taking breaks from screens and engaging in physical activity is necessary for good health.

References:

- Anderson, M. & Jiang, J. (2018). Teens, social media and technology, Pew Research Centre. <https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/>
- Alzahrani, S., Alwagait, E., Alzahrani, N., Almutairi, A., & Alotaibi, N. (2021). Smartphone addiction among university students in Saudi Arabia: prevalence and associated factors. *Journal of Public Health*, 1-10.
- Bartlett, A. (2002). ICT and IMPM. In *Farmers, FAO and Field Schools*. Rome: FAO.
- Boutelle, K. N., Liang, J., Strong, D. R., & Harris, R. B. (2017). Association of social media use with body dissatisfaction among US young adults. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 117(9), 1465-1472.
- Castells, M. (2010), "The Rise of the Network Society", *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Vol. I, 2nd edition. Wiley-Blackwell.
- Chang, F. C., Chiu, C. H., Chen, P. H., Miao, N. F., & Lee, C. M. (2019). Smartphone use in the 21st century: Its impact on academic performance. *Journal of Educational Computing Research*, 57(6), 1417-1431.
- Duggan, M., Lenhart, A., Lampe, C., & Ellison, N. B. (2015). *Social media update 2014*. Pew Research Center, 19.
- Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2011). Connection strategies: social capital implications of Facebook-enabled communication practices. *New Media & Society*, 13(6), 873-892.
- Fallahi,V.(2011). Effects of ICT on the youth: A study about the relationship between internet usage and social isolation among Iranian students, *Procedia Social and Behavioral Sciences*. Volume 15, 2011, Pages 394-398. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811002898>
- Giddens, A. (2006). *Sociology, polity press*. https://books.google.com.bd/books?id=vbu2gis26C0C&printsec=frontcover&source=gb_s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Held, D and Mcgrew, A. (2007). *The Global Transformations reader: An introduction to globalization*.
- Khan, A., Khan, M., Ahmad, I., & Zeb, S. (2020). Smartphone addiction and its relationship with anxiety and depression among university students. *Journal of Education and Educational Development*, 7(1), 90-105.
- Kross, E., Verduyn, P., Demiralp, E., Park, J., Lee, D. S., Lin, N., ... & Ybarra, O. (2013). Facebook use predicts declines in subjective well-being in young adults. *PloS one*, 8(8), e69841.
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social networking sites and addiction: ten lessons learned. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(3), 311.
- Lleras, C. (2016). The multitasking mind. *Annual Review of Psychology*, 67, 63-87.
- Lu, Y., Cheng, Q., Wang, L., & Zhou, X. (2021). The relationship between social media use and mental health among Chinese university students: the mediating role of self-esteem and social support. *Frontiers in Psychology*, 12, 624178.
- Nesi, J., Prinstein, M. J., & Kiefer, S. M. (2018). A longitudinal study of social media use and depressive symptoms among university students. *Journal of Abnormal Psychology*, 127(2), 133-143

- Nkhoma, M., &Kambombo, D. (2019). Usage of social media by undergraduate students: A case study of Malawi. *Journal of Education and Practice*, 10(7), 93-100.
- Pantic, I., Damjanovic, A., Todorovic, J., Topalovic, D., Bojovic-Jovic, D., Ristic, S., &Pantic, S. (2012). Association between online social networking and depression in high school students: Behavioral physiology viewpoint. *PsychiatraDanubina*, 24(1), 90-93.
- Perron, B. E. et al. (2010). *Advances in social work*, Vol. 11, No. 2, 190-202.
- Rabah, J. (2015). *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*. Volume 14, issue 2.
- Rosen, L. D., Whaling, K., Rab, S., Carrier, L. M., & Cheever, N. A. (2013). Is Facebook creating "iDisorders"? The link between clinical symptoms of psychiatric disorders and technology use, attitudes and anxiety. *Computers in Human Behavior*, 29(3), 1243-1254.
- Severine, W.J. & Tankard, J. T. (1988). *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media* Subsequent Edition
- Thomee, S., Dellve, L., Harenstam, A. &Haberg, M. (2010). Perceived connections between information and communication technology use and mental symptoms among young adults - a qualitative study, volume 10, article number-66, <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-10-66>
- Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2019). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. *Preventive Medicine Reports*, 15, 100918.
- Verduyn, P., Ybarra, O., Resibois, M., Jonides, J. &Kross, E. (2017). Do Social Network Sites Enhance or Undermine Subjective Well-Being? A Critical Review: Do Social Network Sites Enhance or Undermine Subjective Well-Being? *Social Issues and Policy Review* 11(1):274-302, DOI:10.1111/sipr.12033, https://www.researchgate.net/publication/312437629_Do_Social_Network_Sites_Enhance_or_Undermine_Subjective_Well-Being_A_Critical_Review_Do_Social_Network_Sites_Enhance_or_Undermine_Subjective_Well-Being
- Von Neumann, J. and Morgenstern, O. (1994) *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, Princeton. [https://www.scirp.org/\(S\(i43dyn45teexjx455qlt3d2q\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1390697](https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1390697)
- Wang, C. W., Chan, C. L., Mak, K. K., Ho, S. Y., Wong, P. W., & Ho, R. T. (2018). The association between sleep quality and smartphone use among medical students in Hong Kong. *Journal of psychosomatic research*, 114, 38-44.

Date of Submission : 12.03.2023

Date of Acceptance : 04.06.2023

Perceived Threat to the Livelihood of Female Garment Workers during COVID 19 Pandemic: A Study in a Globalized City in Bangladesh

Md. Aminul Islam*
Mst. Afroza Yasmin Munni**

Abstract

The purpose of the present study is to explore whether female garment workers perceive any threat to lose their jobs during COVID 19 pandemic. Doing survey on female garment workers in Dhaka, the study findings reveal that 90 percent respondents perceive this type of threat. The study findings also depict that about 73 percent respondents perceive this threat as they hear about getting less order from foreign buyers whereas 63 percent respondents are fearful of losing job because of the closure of some factories during COVID 19 pandemic. About 33 percent respondents perceive to lose jobs as some of their colleagues or friends lost their jobs during this pandemic. Moreover, 77 percent respondents suffer from anxiety as their competent authority say something related to losing their jobs. In spite of the hardship, almost all of female garment workers stayed in Dhaka during lockdown period and most of the female garment workers relied on half a salary as well as borrowed money from relatives/friends. Some of them use savings; depend on husbands' income, food assistance from the government and father-in-law's income.

Keywords: Perceived threat, Livelihood, Female garment workers, Dhaka city

1. Introduction

Since 1976, Bangladesh's garment industry has been at the heart of the country's export boom ever. The industry has grown dramatically over the past 35 years, and today accounts for 81 percent of Bangladesh's total exports. There are now so many garment factories and the number of garment workers would be over three million. Among them, around 85 percent workers are women (Matsuura, 2020). Therefore, it is necessary to know how female garment workers managed to survive in Dhaka city during lockdown period due to the outbreak of COVID 19.

This is not unique for the industries of Bangladesh; rather the scenario is almost same globally, to rely on low-paid female labours to compete and maximization of profits in a highly competitive global market. The estimates of 1980s and 1990s suggest that 90 per cent of workers were women. The sector's expansion has specifically contributed to a rise in women's employment because the authority can pressurize women worker to do more and more work. In pursuing, Bangladesh's female labour force participation rate was up to 36.4 per cent in 2017. While this rate

* Associate Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

** MSS in Sociology, Bangladesh University of Professionals (BUP), Mirpur, Dhaka-1208, Bangladesh

is lower compare to South East Asia, it is higher than in other South Asian countries, such as India (20.8 per cent) (Matsuura, 2020).

According to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), 80 percent of the 4 million workers employed in its members' factories are women (Alam et al., 2011). It is clear to us that these women workers have significantly contributed to the development of the RMG sector, and to the growth of Bangladesh's economy in recent decades. Although the sector has evolved to become an important employment generation sector and an instrument of poverty reduction as well as a driver of economic growth, a number of significant concerns have been raised for making positive change for workers, particularly women workers, in terms of ensuring better working conditions as well as better living condition.

Statement of the problem

The COVID 19 pandemic has affected the livelihoods of 82 per cent of readymade garment workers in Bangladesh and more than half of the affected workers had been forced to spend savings and borrow money to cover their overall household expenditures, according to a survey released recently (Ahmed, 2020). Since 85 percent female workers are working in garment sector of Bangladesh, they might be in a persistent threat to lose their jobs during COVID 19 pandemic (Alam et al., 2011). The survey, conducted by the south Asian network on economic modeling and the microfinance opportunities, found that 51 percent of the workers had been sending money to their family before the COVID 19 crisis, but 18 per cent of the remittance senders were no longer sending money due to the pandemic. The vast majority of garment workers migrated from their place of birth, and most of them did it for work. It is found that 89 per cent of the respondents migrated at least once for any reason and of them 91 per cent of women reported they had migrated compared to 83 per cent of men (Ahmed, 2020). There are so many studies done on COVID 19 pandemic, but very few studies have particularly focused on perceived threat to the livelihood of female garment workers during COVID 19 pandemic. Therefore, the present study carries a significance to know the garment workers' perception regarding their job security.

Objectives of the study

General objective

The broad objective of the study is to know the perceived threat to the livelihood of female garment workers during COVID 19 pandemic.

Specific objectives

- To know about the demographic information of female garment workers.
- To know about the current working position of female garment workers.
- To know whether they perceived threat and if yes what types of threats to their livelihood because of COVID 19 pandemic
- To know how they cope with overall situation during COVID 19 pandemic.

Operational definition of the key concepts

Livelihood

Livelihood can be best defined as the methods and means of making a living in the world. The concept revolves around resources such as land/property, crops, food, knowledge, finances, social relationships, and their interrelated connection with the political, economic, and socio cultural characteristics of an individual community. A livelihood consists of capabilities, assets, and activities that are required for living (Islam et al., 2016).

Perceived threat to the livelihood

the study uses the term perceived threat to the livelihood means if the female garment workers are in a position to perceive that their job might be terminated any time during COVID 19 pandemic by showing the lame excuse of getting less order from foreign buyers.

COVID 19 pandemic

The COVID 19 pandemic of Corona virus disease 2019 (COVID 19) is caused by severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2). As the outbreak of this virus was worldwide, that's why it is called as COVID 19 pandemic. Bangladesh was also not out of its touch; rather this virus was confirmed to have spread to Bangladesh in March 2020. Since then, the pandemic has spread day by day over the whole nation and the number of affected people has been increasing (Wikipedia).

Globalized city

When a fairly large city takes an international fashion - multidimensional interconnectivity among other large cities of other countries in terms of social, economic, political and cultural aspects – then it is called a globalized city. This sort of city does have a fairly large population, have a dashing shopping malls with full of foreign countries' products, international airport, and world-renowned cultural institutions etc. Considering all these characteristics, we can definitely say that Dhaka fulfills all of the above traits, so we define Dhaka city as a globalized city and our study has been carried on in a part of this city.

Limitations of the study

To accomplish this study, the researchers have faced some limitations. These are as follows:

- a) Lack of sufficient theoretical knowledge on the proposed topic creates some problems to conduct this study properly or meticulously.
- b) Since corona virus situation was severe in that time prevailing in Dhaka city, the researchers have not been able to collect information from a large number of samples.
- c) Finally, lack of adequate money also creates some problems.

Review of related literatures and theoretical framework

Review of related literatures

Arif (2020) shows in a study that more than one million workers have either been fired or furloughed (sent home temporarily). Among them, 72.44 percent of the furloughed workers have no income while 80.40 percent of the workers have been paid no compensation. Islam et al. (2020) found in their study that both woven and knit items are facing a decreasing export trend since the beginning of the COVID 19 pandemic. Their study findings also reveal the total Readymade Garment (RMG) export of our country experience the same consequences. They also found that many orders were cancelled for RMG, many factories were closed and many workers lost their jobs etc. Many workers were sent back to their home without paying wages. Although they have hinted regarding livelihood threat, they did not mention about female garment workers' vulnerability separately. Hasan (2020) shows that orders worth USD 3.17 billion have been cancelled or suspended, threatening the employment and financial security of millions of workers, the majority of whom are women. Media reports suggest that by June 2020, 70,000 workers had lost their jobs and up to one million jobs were likely to remain at risk until the end of the year. This report also did not clearly depict about the uncertainty of female garment workers' job during COVID 19 pandemic.

Sakamoto et al. (2020) show that since many orders were cancelled by foreign buyers and the failure of buyers to pay for these cancelations, more than one million garment workers in Bangladesh have already been fired or furloughed (have been fired temporarily). Here, women's possible losses of job are not adequately discussed. Bhuiyan (2012) depicts in an article, titled "Present Status of Garment workers in Bangladesh: An analysis," that the garment workers, about 70 percent are women, who usually work dawn to dusk even up to late night although their wages are not in the satisfactory level. They cannot afford their foods, cloths, housing, and educations of their children or other dependent members nicely since they are paid a very meager amount by their employers. Chowdhury et al. (2010) in their research article titled "Socio-Economic Conditions of Female Garment Workers in Chittagong Metropolitan Area—An Empirical Study" opines that female garment workers cannot work peacefully in the garment for a longer period of time due to different types of occupational hazards and workplace stress. Moreover, most of the employers also do not prefer aged-experienced workers, especially female garment workers, in the factories for reducing the cost by employing fresh workers, mostly female workers, at low salary.

Matsuura (2020) shows that millions of workers are in the constant fear of being joblessness as new orders reduced because of the collapse in global demand for apparels whereas around one million workers have already been fired due to the slump in the flow of global demand, supply and distribution of apparels/garment products during COVID 19 pandemic in Bangladesh. BRAC University survey findings depict that 47 percent readymade garment workers expressed their concerns over not receiving their salaries and became anxious about the future of their job during the lockdown period because of COVID 19.

Research gap

The abovementioned literature reviews show that many studies have been done focusing on getting less order from foreign buyers and as a result many garment workers were terminated by their employers, but very few studies have specifically highlighted the perceived threat to female garment workers' livelihoods because of the negative impact of Corona virus. Therefore, we can claim that there is an importance to do research on this problem and eventually our study will fill up this gap.

Theoretical Framework

There might be several theories that can be applied to explain perceived threat to the livelihood of female garment workers in Dhaka city. However, we would like to explain this research problem by the theory of Karl Marx.

Marxist View

Karl Marx viewed struggle between social classes as inevitable as workers are exploited under capitalism economic system. In Marx's analysis, society was fundamentally divided into two classes that clashed in pursuit of their own interests. When he examined the industrial societies of his time, he saw the factory as the center of conflict between the exploiters (the owners of the means of production) and the exploited (the workers). Marx viewed these relationships in systematic terms; that is, he believed that a system of economic, social, and political relationships maintained the power and dominance of the owners over the workers (Schaefer, 2009).

Explanation of the research problem from the perspective of Karl Marx

The capitalist are the owners of the means of production and hold the possession of wealth, political power, and influential position in the society, they control and exploit the workers by providing them with lower wages as compared to the high profits of factories. By this way, they extract surplus value. Here, in relation to the researcher's study problem, it can be said that since the owners possess more power, they did not pay the workers' salaries during the period of lockdown due to the outbreak of Corona virus in Bangladesh. Moreover, although most of the female garment workers have re-joined their position, they are still in a continuous threat to lose their livelihood in the name of getting less order from foreign buyers. Again, as the owners are more powerful and they control over information regarding whether they are receiving less order or not, they sometimes spread this rumor among the garment workers and keep them on a constant threat to terminate their jobs. Therefore, it becomes evident that the researcher's study problem can clearly be explained by the abovementioned ideas of Karl Marx.

Methodology

To accomplish this study, the researchers have carried on survey in 2021. Generally, a survey is a study, in the form of an interview or questionnaire that provides researchers with information about how people think and act (Schaefer, 2009). It seemed to the researchers that survey would be the appropriate method for this study

as the researchers collected data physically from female garment workers. The researchers themselves conducted face to face interviews with female garment workers for collecting primary data. The researchers carried an interview schedule with them during interview session. The researchers conducted this study in different pockets of Mirpur, section- 2, Dhaka as many female garment workers live in this area. Therefore, it was convenient for us to reach them at their living places although many of them refused to talk to us because of the fear of being infected by Corona virus.

The population of the present study was all female garment workers who live in Dhaka. But as the researchers did not get any fund as well as there was a fear of getting infected by Corona virus, the researchers were eventually able to get consent from 30 samples to be the respondents of this study. As there was a very strict lock down in the whole country during the period of our study and all garments were shut down because of the alarming spread of Corona virus, it was very difficult to get consent from female garment workers for the interview. Statistically, 30 samples or more than 30 is considered large sample (Walsh, 1990). But it might produce better findings if we could increase our sample size a bit. The researchers relied on convenience sampling to accomplish this study as there was no adequate sampling frame. The fact was that during the lock down period people's movement was highly restricted and the researchers had to go to their door to door with wearing mask and keeping safe distance. And then the researchers asked respondents' consent and whoever agreed to be the participant of this study only those female workers were interviewed. Respondents also wore face masks and remained at safe distance during interview session. For these reasons, the researchers had to use convenience sampling technique to accomplish this study. Moreover, with a view to finishing the study smoothly, the researchers also relied on secondary data, such as, books, various online articles, journal articles, reports, newspaper reports, internet documents and periodicals etc. The study ensures that the identity of the respondents and the data provided by them will remain highly confidential.

Results of the study

Table 1: Percentage distribution of the respondents by demographic information

Age groups (yrs.)	Frequency (N=30)	Percentage (%)
18 to 25 years	14	46.7
26 to 33 years	12	40
34 to 41 years	4	13.3
Total	30	100
Educational Qualification	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Illiterate	8	26.7
up to primary	9	30
Class Six to nine	6	20
SSC	6	20
HSC	1	3.3
Total	30	100
Marital Status	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Married	21	70

Unmarried	6	20
Separated	2	6.7
Widow	1	3.3
Total	30	100
Type of the Family	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Nuclear	24	80
Joint family	6	20
Total	30	100
Family members	Frequency (N=30)	Percentage (%)
2-Jan	11	36.7
4-Mar	14	46.7
6-May	4	13.3
7+	1	3.3
Total	30	100
Religion	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Islam	29	96.7
Hinduism	1	3.3
Total	30	100

Source: Field Survey, 2021

Among the total respondents, about 47 percent respondents belong to the age group of 18 - 25 years while 40 percent are in between 26 - 33 years, and only about 13 percent of the respondents belong to the age group of 34 - 41. About 27 percent of the respondents are found illiterate whereas 30 percent of the respondents studied up to primary. Another 20 percent of the respondents continued their study from class six to nine while the same number (6) of the respondents completed their SSC and only 3.3 percent of the respondents finished HSC.

Moreover, the primary data depict that 70 percent of the garment workers of the present study are married while 20 percent are unmarried and only about 7 and 3.3 percent of the respondents are separated and widow respectively. It is found from the data that there are 80 percent of respondents' family structure is nuclear in nature. Besides, most of the respondents (96 percent) of the present study are Muslim while only about 3 percent respondents are from Hinduism.

Current working position of the respondents

Table 2: Percentage distribution of the respondents by current working position

Working position	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Sewing operator	5	16.7
Helpers	7	23.3
Quality	4	13.3
Machine operator	14	46.7
Total	30	100.0

Source: Field Survey, 2021

Table 2 shows that as many as 46 percent of the female workers interviewed for this study are employed as sewing operators, and nearly 23 percent as 'helpers', 16 percent as sewing operator and 13 percent are as quality operator. These are the

lowest paid jobs in the industry. Women in both positions undertake manual work and their level of education is low.

Monthly income of the respondents

Table 3: Percentage distribution of the respondents by monthly income

Monthly Income (tk.)	Frequency (N=30)	Percentage (%)
8001-12000	23	76.7
12001-17000	7	23.3
Total	30	100.0

Source: Field Survey, 2021

It is evident from the data of Table 3 that the monthly income of the respondent is so low. About 77 percent of the respondents mention that their income is in between tk.8001-12000 while only 23 percent respondents receive monthly salary in between tk.12, 001 to 17,000.

Perception about COVID19 Pandemic

Table 4: Percentage distribution of the respondents by perception about COVID19 pandemic

Knowledge on COVID 19	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Yes	30	100
No	0	0
Total	30	100
Covid19 is an infected disease	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Yes	23	76.7
No	7	23.3
Total	30	100
Whether you are at risk of CPOVID19	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Yes	19	63.3
No	11	36.7
Total	30	100
Whether everybody are at risk	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Yes	21	70
No	9	30
Total	30	100
Maintaining physical and social distance in private matters	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Yes	11	36.7
No	19	63.3
Total	30	100

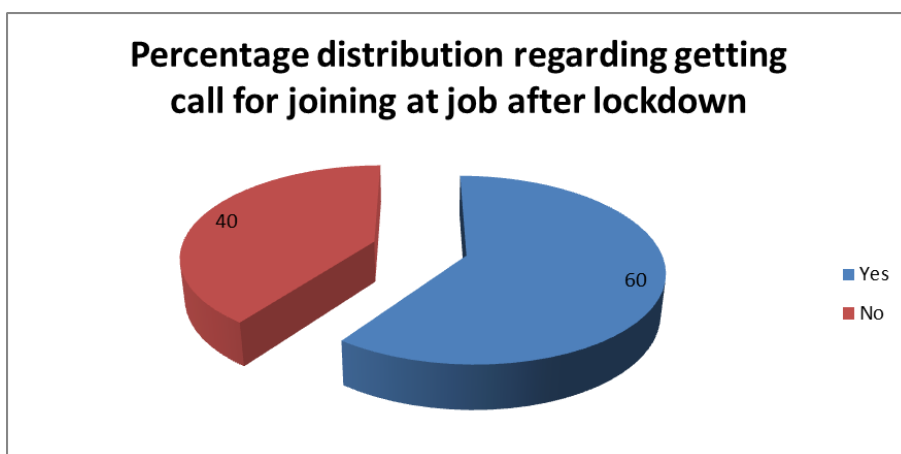
Source: Field Survey, 2021

The data of table 4 show that 100 percent of the respondents are familiar with COVID 19. About 77 percent of the respondents believe that COVID19 is an infected disease whereas about 23 percent of the respondents do not think so. As a result, 63.3 percent of the respondents perceive that they are at risk of COVID 19 while about 37 percent of the respondents do not perceive it as a threat. As it is an

infectious disease, 70 percent of the respondents perceive that everybody can get infected by this virus, but another 30 percent respondents do not believe about its nature of infectiousness. Most of the respondents are familiar with this virus, but surprisingly about 63 percent of the respondents are not maintaining any physical, social distance with their relatives, friends and near and dearest one during COVID 19 pandemic. It is important to note that the same number of respondents (about 63 percent) told that their authorities ensure physical and social distance at work place.

Getting call for joining at their jobs after lockdown

Figure 1: Percentage distribution of the respondents by getting call for joining after lockdown



Source: Field Survey, 2021

The data of figure 1 demonstrate that 60 percent of the respondents of the present study got call for joining at their jobs immediately re-opening garments after lockdown due to the rapid outbreak of COVID 19 whereas other 40 percent respondents said that they did not get the call because some of them lost their jobs and some other workers had to find jobs in different factories.

Getting full shift or half a shift after lockdown

Table 5: Percentage distribution of the respondents by getting full or half a shift after lockdown

Getting full shift after lockdown	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Yes	22	73.3
No	8	26.7
Total	30	100.0

Source: Field Survey, 2021

While conducting the study, the researcher found that about 73 percent of respondents are getting full shift after lockdown. Only about 27 percent respondents replied that they sometimes get half a shift.

Reasons for getting half a shift

Table 5.1: Percentage distribution of the respondents by reasons for getting half a shift

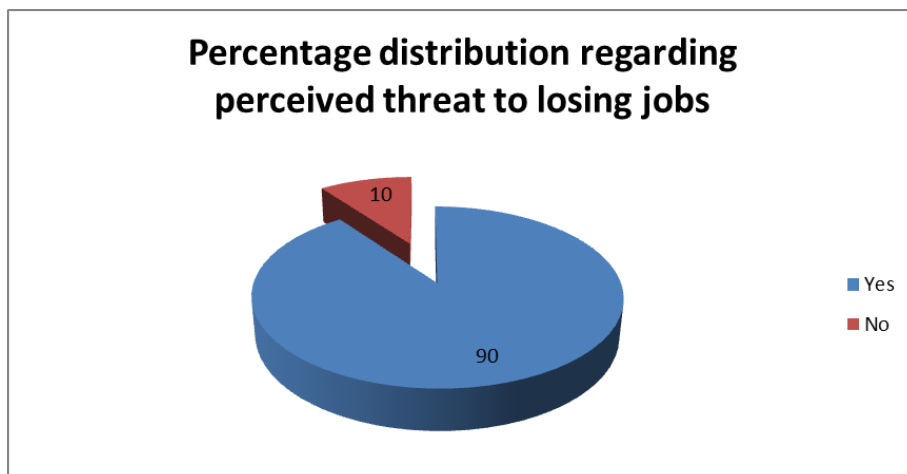
Reasons for getting half a shift	Frequency (N=8)	Percentage (%)
Getting less order from foreign buyers	7	87.5
Lack of importing raw materials	1	12.5
Total	8	100

Source: Field Survey, 2021

Basically this table is based on the table no 6. Among 8 respondents, 7 respondents (87.5 percent) said that as the factories' foreign orders are less in volume, they sometimes get half a shift. And only around 13 percent respondents mention that the reason of getting half a shift is lack of importing raw materials.

Perceived threat to losing jobs

Figure 2: Percentage distribution of the respondents by perceived threat to losing jobs



Source: Field Survey, 2021

Figure 2 shows that 90 percent of the respondents perceive that they have a sort of risk of losing their income earning opportunities while only 10 percent of the respondents do not think so. The BGMEA estimates that nearly 50,000 garment workers lost their jobs in smaller factories during Covid 19 pandemic (source: <https://cleanclothes.org/news/2021/live-blog-on-how-the-coronavirus-influences-workers-in-supply-chains>).

Reasons for perceiving threat to losing jobs

Table 6: Percentage distribution of the respondents by reasons of perceiving threat to losing jobs

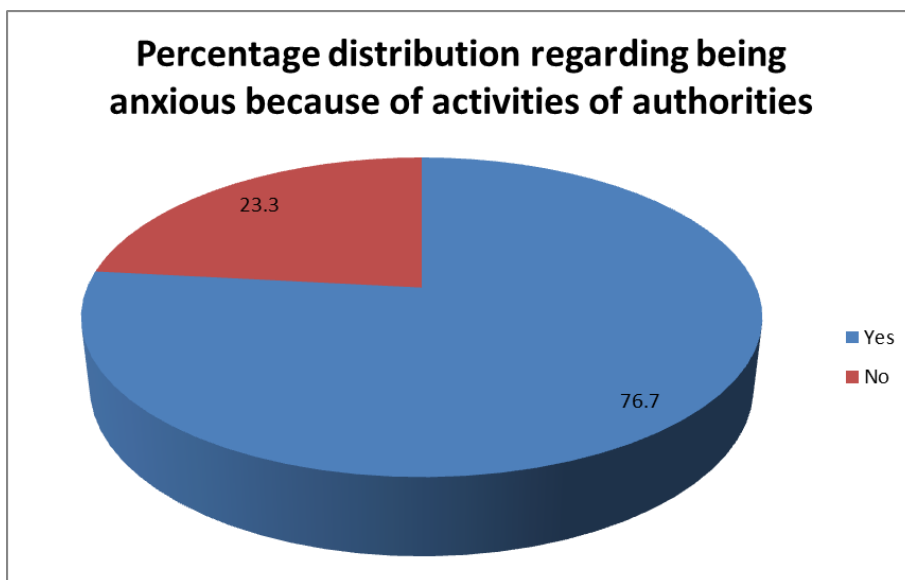
Reasons for perceiving threat to losing jobs*	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Some of my colleagues lost job	10	33.33
Factory gets less foreign order	22	73.33
Some factories have been closed	19	63.33
Misbehave of the authority	4	13.33

Source: Field Survey, 2021; *Multiple responses were found

The data reveals that most of the respondents (73.33 percent) perceive that they are in a possible threat as they sometimes hear about getting less foreign order whereas 33.33 percent perceive to lose jobs as some of their colleagues lost their jobs during the COVID 19 pandemic. About 63 percent of the respondents perceive that they are bearing this threat to some extent because of the closure of some factories during COVID 19 pandemic. Only around 13 percent respondents perceive so as they have observed that some of their colleagues experience misbehavior from the authority.

Being anxious because of the activities of authorities

Figure 3: Percentage distribution of the respondents by being anxious because of the activities of authorities



Source: Field Survey, 2021

The data of figure 3 shows that about 77 percent of the respondents opine that they sometimes become anxious as their competent authorities say something related to losing their jobs. Around 23 percent respondents reply in negative.

The ways authority increase anxiety

Table 7: Percentage distribution of the respondents by the ways authority increase anxiety regarding losing jobs

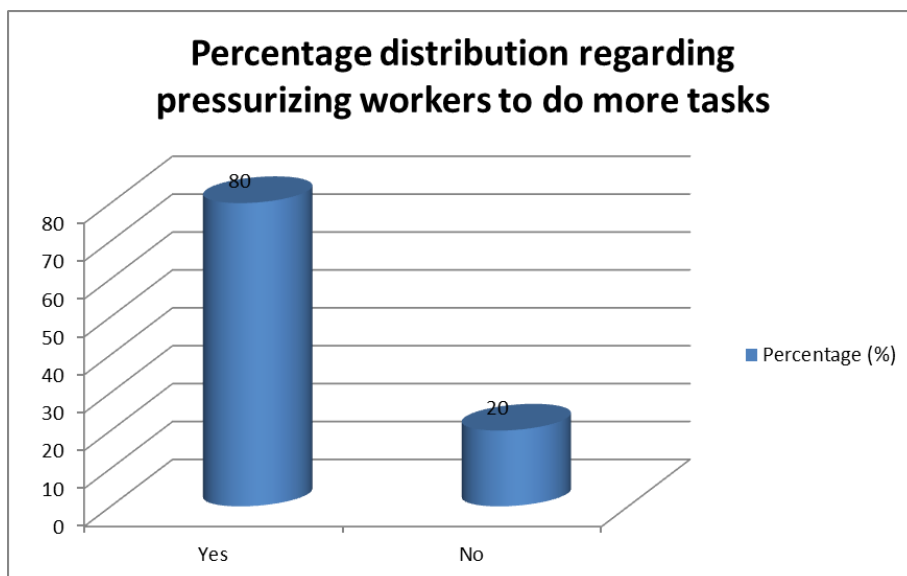
Ways authority increase anxiety regarding losing jobs*	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Appraise us regarding less order	17	56.67
If order doesn't increase, you may lose job	19	63.33
Continuous propaganda on dismissing from job	16	53.33
Misbehave of the authority	4	13.33

Source: Field Survey, 2021; *Multiple responses were found

Table 7 shows that 63.33 percent of the respondents opine that they sometimes become anxious whenever they are appraised that you may be terminated if foreign buyers' order does not increase while about 57 percent respondents' anxiousness emerge from hearing the news on decreasing the foreign buyers' order during COVID 19 pandemic. The data also reveal that about 53 percent of the respondents perceive that they become sometimes anxious of losing their jobs because of continuous propaganda on dismissing from job. On the other hand, 13.33 percent of the respondents express that they become anxious as they sometimes experience misbehave from the authority.

Pressurize to do more tasks

Figure 4: Percentage distribution of the respondents by pressurizing to do more tasks



Source: Field Survey, 2021

The data of figure 4 shows that 80 percent of the respondents are doing more task than earlier because of their competent authorities' continuous pressure on them while 20 percent respondents opine that they are not pressurized to do more tasks.

Paying extra-money for overtime work

Table 8: Percentage distribution of the respondents by getting extra money for overtime work

Pay Extra-money	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Yes	13	43.3
No	13	43.3
Total	26	86.7
System missing	4	13.3
Total	30	100.0

Source: Field Survey, 2021

The data of Table 8 show that 43 percent of the respondents express that they do not get any extra payment or money for their overtime work during COVID 19 while the same number of respondents receive overtime money regularly.

Get afraid of raising voice against the anomalies

Table 9: Percentage distributions of the respondents by getting afraid of losing job if the respondents raise voice against the authority

Get afraid of raising voice against the anomalies	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Yes	14	46.7
No reply	16	53.3
Total	30	100.0

Source: Field Survey, 2021

The data of this Table depicts that 43 percent of the respondents complain that they do not get any extra payment or money for their overtime work. Based on that data, it was asked whether they have courage to raise voice against the authority regarding the anomalies. In response to that about 47 percent of the respondents raise voices against anomalies, but expressed their fear that they might lose their jobs for raising voices while other 53 percent respondents did not say anything regarding this issue.

Where do they stay during the lockdown due the outbreak of COVID 19?

Table 10: Percentage distribution of the respondents by living place during lockdown due to outbreak of COVID 19

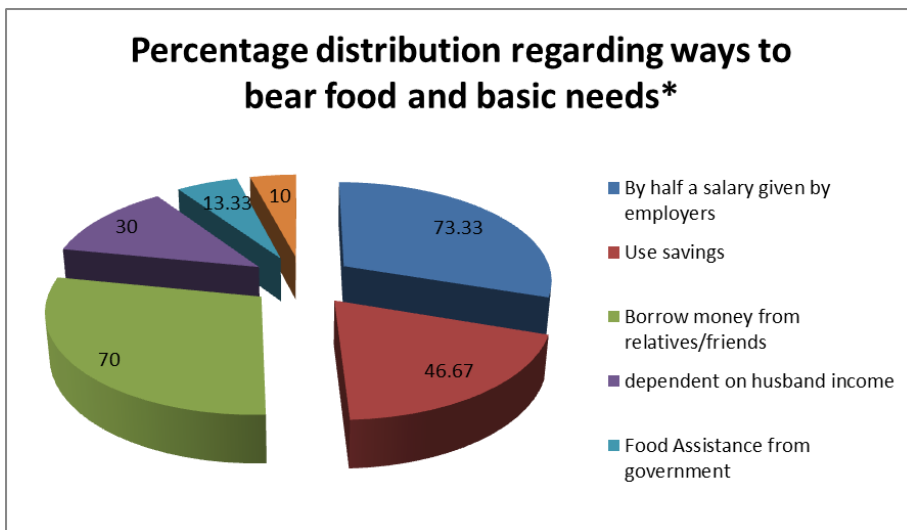
Did you live in Dhaka during lockdown due to outbreak of COVID 19?	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Yes	27	90.0
No	3	10.0
Total	30	100.0

Source: Field Survey, 2021

The data of this Table show that 90 percent of the respondents stay in Dhaka during this COVID 19 pandemic while only 10 percent respondents went there home district as they either were sacked by their employers or their factories were closed.

Ways to bear the expenses of food and basic needs

Figure 5: Percentage distribution of the respondents by ways of bearing food expenses



Source: Field Survey, 2021; *Multiple responses were found

The abovementioned data, multiple responses, of figure 5 show that both 73.33 and 70 percent of the respondents report that during this pandemic they bore their food expenses and basic needs by their half a salary that was given by their employers and borrowing money from their relatives/friends respectively. About 46.67 percent of the respondents managed their food expenses by their savings while 70 percent respondents borrowed money from relatives and friends. 30 percent respondents bore these expenses by their husband's income whereas only 13.33 percent respondents received the assistance which helped them to keep their body and soul together. Among the participants, 10 percent borrowed some money from father-in-law's income during the lockdown period for the outbreak of COVID 19.

Doing any part-time job other than their garments job

Table 11: Percentage distribution of the respondents by doing any part-time job other than their garments job

Doing any part-time job other than their garments job	Frequency (N=30)	Percentage (%)
Yes	7	23.3
No	23	76.7
Total	30	100
Types of part-time jobs	Frequency (N=7)	Percentage (%)

Domestic help	2	28.57
Selling	2	28.57
Sewing	2	28.57
Agriculture	1	14.29
Total	7	100

Source: Field Survey, 2021

The data of Table 11 depict that 77 percent of the respondents did not involve in any part time job. About 23.3 percent of the respondents involved in various types of part time jobs to earn extra money to bear all sorts of expenses of their family. Regarding part-time jobs, among 7 participants, the same 28.57 percent of the respondents involved in selling some necessary items locally, sewing and working as domestic help. Only 14.29 percent of the respondents did agricultural activities while they were in their home district during the lockdown for the outbreak of COVID 19.

Discussion

The study findings reveal that 90 percent of the respondents perceive that they have a sort of risk of losing their income earning opportunities/livelihoods while only 10 percent of the respondents do not feel any threat to lose jobs. The reflection of Karl Marx's theoretical insight is seen here in our country in case of terminating some female garment workers from their jobs without following formal procedures as the owners have money, owns the factories and that's why exercise power. Some earlier research findings also show a kind of similar result, such as, the BGMEA estimates that nearly 50,000 garment workers lost their jobs in smaller factories (Clean Clothes Campaign, 2021). It is also evident from the findings that most of the respondents perceive threat to losing jobs as the garment factories get less foreign orders during COVID 19 pandemic. Mahtani, the owner of Must Garment Corporation, describes that as foreign buyers cancelled so many orders, demanded discounts, and delayed shipments, we incur loss (Clean Clothes Campaign, 2021). As a result, some workers, in some cases, might be terminated (Clean Clothes Campaign, 2021). Findings also confirm that some respondents bear this threat to some extent because of the closure of some factories during COVID 19 pandemic. For example, in 2020, at least 300 small and medium garment factories that were BGMEA-members shut down (Clean Clothes Campaign, 2021).

Study findings also reveal that some female garment workers perceive so as they have observed that some of their colleagues lost their jobs during this pandemic period. Likewise, the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association reported that at least 70,000 people are estimated to have been laid off after \$3.5 billion-worth of clothing orders were cancelled or suspended (Aljazeera, 2020). For this reason, thousands of Bangladeshi garment workers who lost their jobs due to the corona virus pandemic are struggling to find work and are at risk of destitution without urgent support (Aljazeera, 2020). According to (BGMEA), many international buyers have either cancelled \$3.16 billion worth of shipments involving many factories that affecting around 2.26 million workers in Bangladesh. Karl Marx's theory is also pertinent to explain the fact that as the capitalists control the information, they might manipulate/camouflage the real information regarding

reduced orders received from foreign buyers. And by using this distorted information, sometimes the capitalists may terminate some of female workers' jobs.

Similarly, the secondary data confirm that millions of workers are in the constant fear of being joblessness as new orders reduced because of the collapse in global demand for apparels whereas around one million workers have already been fired due to the slump in the flow of global demand, supply and distribution of apparels/garment products during COVID19 pandemic in Bangladesh. BRAC University survey findings depict that 47 percent readymade garment workers expressed their concerns over not receiving their salaries and became anxious about the future of their job during the lockdown period because of COVID 19 (CARES, 2020).

The findings also demonstrate that most of the female garment workers of the present study got call for joining at their jobs immediately re-opening garments after lockdown due to the rapid outbreak of COVID 19 whereas less than half of the respondents said that they did not get the call because some of them lost their jobs and some other workers had to find jobs in different factories. Among the total respondents, majority of female garment workers are getting full shift after lockdown while only about one-fourth respondents still did not get full shift rather they are getting half a shift.

During the pandemic, most of the garment factories were closed 4 - 5 weeks during the lockdown because of the outbreak of corona virus. In that lockdown period, all garments remained shut down without providing monthly wages to the workers, which initiated unwanted financial instability in their daily life. Likewise, Karl Marx opines that the capitalists extract surplus value by giving less salary to the workers. And as the capitalists keep the labour class in constant conflict among themselves, they cannot form an all-out movement against the capitalists' exploitation. We can see the application of these ideas of Karl Marx in the garment sectors of Bangladesh. However, in the next time, whenever Bangladesh government has provided loan at lower interest to the employers, they started giving half of their salaries.

The findings also depicts that most of female garment workers are doing more task than earlier because of their competent authorities' continuous pressure on them while one-fourth respondents' experiences are different from them. About half of the respondents express that they do not get any extra payment or money for their overtime work during COVID 19 while the same number of respondents receive overtime money regularly. But surprisingly it is evident from the findings that if they raise their voices against these anomalies/against the employer, they might lose their jobs. An earlier survey finding depicts that female garment workers cannot work peacefully in the garment for a longer period of time due to different types of occupational hazards and workplace stress. Moreover, most of the employers also do not prefer aged-experienced workers, especially female garment workers, in the factories. For reducing the cost, the employers employ fresh workers, mostly female workers, at low salary (Chowdhury & Ullah, 2010). The findings of the current study demonstrate that, in the lockdown period, almost all of the female garment workers stayed in Dhaka during this COVID 19 pandemic while only 10 percent respondents went there home district as they either were sacked by their employers or factories

were closed. During the first trimester of COVID 19, all the factories were closed. As all the garments remained closed and that's why most of the employers did not pay monthly salaries, which created unwanted financial instability to the female garment workers' daily lives. These situations have never been faced by the female workers before. They wanted to return to their workplace to overcome their economic crisis without thinking of their possible health hazards. Moreover, they tried to get back their job again as they were uncertain about their next month's salary as well as about food and long term economic security (Ahmed et al., 2020).

Conclusion

Although many studies have already been done on the uncertainty of livelihoods of garment workers, very few studies have clearly focused on the perceived threat to the livelihood of female garment workers during COVID 19 pandemic. Our research joins the very sizable existing research on garment workers livelihood indicating that most of the female garment workers perceive a sort of threat to losing their income earning opportunities because of the negative impacts of COVID 19. The workers identified getting less foreign orders because of the disruption of global apparel markets' demand and supply chains as main reason to perceive livelihood threat. Besides, some factories have been closed and some of their colleagues lost their jobs as well as a continuous propaganda on dismissing them from job also work as constant threat to lose their livelihoods. The study also finds that during the COVID 19 pandemic most of the workers stay in Dhaka, but all the garments factories were closed during lockdown for the outbreak of corona virus in Bangladesh. When re-opens the factory many workers get half a shift because of less order from the foreign buyers. Sometimes the authority creates pressure on them to do more task than earlier, but the authority do not provide them with over time money properly. The workers continue working with having dissatisfaction, but do not dare to raise their voices against their employers because of fear of being terminated.

In spite of different kinds of uncertainty, the female garment workers managed to cope with the negative impact of COVID 19 pandemic. The study finds that they bear their food and other basic needs' costs with the help of half a salary received from the factory, borrowing money from the relatives/friends, depending on husbands' income and some of them managed these expenses from their savings. Moreover, only a negligible portion of female garment workers received some sorts of food and other household necessary items from Bangladesh government's city corporation representatives as well as different Non Government Organizations (NGO). Actually, the lives of many female garment workers have fallen in uncertainty and that's why their life is almost full of various kinds of struggles, especially during COVID 19 pandemic.

Recommendations

The study renders some recommendations to reduce female garment workers perceived threat to lose their livelihood. These are as follows:

- Government should take necessary action to formulate service rule for garment/female garment workers so that they do not perceive threat to lose their jobs anytime.
- Labour Union should play an active role so that no one from the management can spread any rumor regarding getting less order from foreign buyers.
- Promote a workplace free from violence and harassment by raising awareness about unacceptable behaviour and introducing stricter measures to address violence and harassment in the world of work
- Ensure women's access to training as part of lifelong learning.
- Promote non-discrimination practices, including by raising awareness on unconscious bias among human resources staff and managers, to advance gender equality at the enterprise level
- Promote regular dialogue on addressing challenges and set realistic production targets that allow enterprises to ensure decent work for all workers.

References

- Ahmed, M. (2020). COVID-19 affects livelihoods of 82pc RMG workers: survey. <https://www.newagebd.net/article/115610/covid-19-affects-livelihoods-of-82pc-rmg-workers-survey>
- Ahmed, N., Rony, R. J., & Zaman, K. T. (2020). Social distancing challenges for marginal communities during COVID-19 pandemic in Bangladesh. *Journal of Biomedical Analytics*, 3(2), 5-14. <https://doi.org/10.30577/jba.v3i2.45>
- Alam, K., Blanch, L. & Smith, A. (2011). Stitched Up. Women workers in the Bangladeshi garment sector. War on Want. ShepherdessWalk, London. <https://waronwant.org/sites/default/files/Stitched%20Up.pdf>
- Aljazeera. (2020). Thousands of Bangladeshi garment workers struggle amid job loss. <https://www.aljazeera.com/economy/2020/10/2/thousands-of-jobless-bangladesh-garment-workers-fear-for-future>
- Arif, K. (2020). COVID-19 And The Uncertain Future of The Garment Workers Of Bangladesh. Light Castle Partners. <https://www.lightcastlebd.com/insights/2020/05/covid-19-and-the-uncertain-future-of-the-garment-workers-of-bangladesh>
- Bhuiyan, Z. A. (2012). Present status of garment workers in Bangladesh: An analysis. *IOSR Journal of Business and Management*, 3(5), 38-44. DOI: 10.9790/487X-0353844
- (CARES) COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program. (2020). Covid-19 and the ready-made garments industry in Bangladesh. <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/54180-001-sd-04.pdf>
- Chowdhury, N. J., & Ullah, M. H. (2010). Socio-Economic Conditions of Female Garment Workers in Chittagong Metropolitan Area An Empirical Study. *Journal of Business and Technology (Dhaka)*, 5(2), 53-70. <https://doi.org/10.3329/jbt.v5i2.9935>

- Clean Clothes Campaign. (2021). Live-blog: How the Coronavirus affects garment workers in supply chains. <https://cleanclothes.org/news/2021/live-blog-on-how-the-coronavirus-influences-workers-in-supply-chains>
- Chowdhury, N. J., & Ullah, M. H. (2010). Socio-Economic Conditions of Female Garment Workers in Chittagong Metropolitan Area An Empirical Study. *Journal of Business and Technology (Dhaka)*, 5(2), 53-70. <https://doi.org/10.3329/jbt.v5i2.9935>
- Hasan, F. (2020). RMG industry of Bangladesh: Past, present and future. Retrieved on March 1, 2021 from <https://www.dhakatribune.com/uncategorized/2014/09/15/rmg-industry-of-bangladesh-past-present-and-future>
- Islam, M. R., Hassan, M. A., Hassan, M. S., Rahman, S., & Nargis, N. (2020). Impact of covid-19 pandemic on readymade garments (rmg) industry of bangladesh. *International Journal of Management (IJM)*, 11(7), 1125-1132. DOI: 10.34218/IJM.11.7.2020.100
- Islam, T. & Ryan, J (2016), in Hazard Mitigation in Emergency Management. Retrieved on September 16, 2020 from <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/livelihood>.
- Matsuura, A. (2020). Understanding the Gender Composition and Experience of Ready-Made Garment (RMG) Workers in Bangladesh. International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_754669.pdf
- Sakamoto, M., Begum, S., & Ahmed, T. (2020). Vulnerabilities to COVID-19 in Bangladesh and a reconsideration of sustainable development goals. *Sustainability*, 12(13), 5296. <file:///C:/Users/User/Downloads/sustainability-12-05296-v4.pdf>
- Schaefer, R. T. (2009). *Sociology* (10th Ed). MCGRAW-HILL, New York, USA
- Walsh, A. (1990). *Statistics for the social sciences: with computer applications*. Harper & Row.
- Wikipedia. (n.d.). COVID-19 pandemic in Bangladesh. https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Bangladesh

Joyeeta: A New Platform of Women Empowerment

Md. Ershadul Islam*
Muhammad Bayezid Husain**

Abstract

Women in Bangladesh, traditionally, are engaged in various types of unpaid household activities, where a limited number are involved in paid job sector, but appearance of women in entrepreneurship is a recent phenomenon. Joyeeta, an initiative of Ministry of women and child affairs of Bangladesh Government, is a platform where a number of women are affiliated and working for self-empowerment. After their engagement with Joyeeta, positive changes have come to all the parameters of the lives of the women may they are in personal, family, social or financial sectors. 80 respondents for social survey and 10 for case study have been drawn conveniently from Joyeeta Foundation, Rapa Plaza, Dhanmondi for this study to reveal how Joyeeta is contributing to the status of women in their life as a whole.

Keywords: Joyeeta, entrepreneurship, women, freedom, empowerment

1. Introduction

Over the past few decades, discussion of women entrepreneurship has become very much significant all over the world including Bangladesh. Development of women entrepreneurship is an important aspect to empower women economically and to incorporate women into economic development of any country. Now-a-days women entrepreneurship has become an important tool for women empowerment. The development of women entrepreneurship is vital for any country's development and is regarded as one of the solutions to achieving sustainable economic growth (Derera et al., 2020).

Like Global trend, in Bangladesh, women are increasingly entering into the field of entrepreneurship by launching small venture. The Bangladesh Industrial Policy 2010 encourages the participation of women in small and medium-sized enterprises (SMEs) by providing financial help to them through public private partnership. A report shows that nearly 50% of Enterprises established in between 2000 to 2010 were owned by women in Bangladesh (Rabbani & Chowdhury, 2013).

Entrepreneurship is widely recognized as a critical factor for economic development. Schumpeter viewed entrepreneurship as the major conductive factor to economic growth (Schumpeter, 1934 cited in Balasundaram et al., 2010). Entrepreneurship is often seen as a form of empowerment of women. Entrepreneurship promotes self-empowerment of women through giving autonomy, opportunity, confidence and self-expression among them (Gill and Ganesh, 2007). Policymakers recognized that empowerment of women can be achieved through effective engagement of women in

* Assistant Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

** M.S.S., Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

various creative sectors. And promotion of entrepreneurship plays a vital role in empowering the women. In reality, women bring motivation-they possess a vision which is different and realistic. So, promoting women's empowerment through entrepreneurship the government of any developing country can ensure equality in the society.

Comprehending the importance to turn women into successful entrepreneurs, Ministry of Women and Child Affairs of Bangladesh Government established Joyeeta in November, 2011 under the Societies Registration Act, XXI of 1860. Joyeeta deals with certain vision, mission and objectives. Building gender equality based society through empowering women economically is their vision. In their mission they include “Empowering women economically, following preferential approach towards women, by the ways of developing- a) a dedicated women friendly marketing network to be run and managed exclusively by women, b) dedicated value chains centering women friendly marketing network, from rural to urban, from production to marketing, through commercially employing women in different phases of the chain by building their capacity.”

Strategic Objectives of Joyeeta includes:

- Building capacity of Joyeeta Foundation, as a specialized institution mandated for empowering women economically.
- Enhancing business conductive institutional capacity of grass root level women associations working under the umbrella of Joyeeta Foundation.
- Building infrastructural facility (Marketing network) along with women business friendly congenial atmosphere and ensuring other enabling support services.
- Developing skills and competencies of women necessitate engagement in diverse business initiatives.

Over the last decade, the academic enthusiasm on entrepreneurship has resulted in a significant increase in the amount of research effort. But there is hardly any study regarding the activities of Joyeeta Foundation initiated by Bangladesh government to support countrywide female entrepreneurs and documents regarding the success of Joyeeta Foundation are hardly found as a result of lack in research initiatives. This paper tries to investigate how the status of women in decision making and facing domestic violence have changed after their association with Joyeeta Foundation and therefore, brought empowerment by enhancing personal, familial, social and economic life.

Literature Review

Research on female entrepreneurship and empowerment of women in the literature of entrepreneurship was found more than 30 years ago. However, there have been visible growth of literature examine the causal relationship of entrepreneurship on empowerment of women.

A significant number of economists, sociologists, behavioral scientists, development historians and practitioners tried to define entrepreneurship in their respective fields. A women entrepreneur is defined as a woman who has alone or with one or more partners, started, bought, or inherited a business, is assuming the related financial, administrative, and social risks and responsibilities, and is participating in the firm's day-to-day management. (LFS, 1996 cited in Morshed, 2015).

To develop entrepreneurship in a country, it requires a comprehensive effort that covers various activities right from the stimulation to its long term survival.

As Begum (2000) reveals that, new generation of women entrepreneurs are venturing as entrepreneurs and are contributing to the economic development of Bangladesh. Women entrepreneurs in Bangladesh represent a group of women who have broken the traditional route and exploring new dimension of economic participation.

Women are in need of effective enterprise management, a large quantity of co-operation and encouragement in the sphere of their activity at all levels- home and in society and from government and non-government organization. Krive and Kanitkar (1993) emphasize the importance of training approach to assist women in non-traditional, high skill, male dominated activities and also to boost self-confidence up among women to meet their requirements.

United Nations (2019) affirms the development of women entrepreneurship forms an integral part of women's economic empowerment as the fifth Sustainable Development Goal, which underscores the importance of "promoting gender equality and empowerment".

There are significant number of studies conducted designing the interrelationship between women entrepreneurship and empowerment of women. Sultana et al. (2010) in a study shows the process of women's empowerment through the development of micro entrepreneurship in rural Bangladesh. Women's participation in home typed, traditional business can significantly build social capital, create awareness and enhance their capability to uplift their position.

Women entrepreneurship development is instrumental to women empowerment. Empowerment leads to the self-fulfillment and women become aware of what they are going to do, what their position in the society is, their status; existence and rights; and women are becoming more empowered, socially and economically through business ownership (Balasundaram et al., 2010).

But, still, women entrepreneurs in Bangladesh are to face various challenges to initiate their business and to continue their business with success as the society of Bangladesh is male dominated. Derara et al. (2020) in their study show that challenges are more severe in developing economies. Women face gender related challenges (Henry & Treanor, 2010) that are often underpinned by economic, social, cultural and religious factors (Mordi et al., 2010). Other challenges are cultural barriers, lack of education, access to capital, lack of business skills, lack of training facilities, inability to own land, security problems and other key assets, family responsibilities and cumbersome business licensing and registration procedures.

To overcome these challenges and obstacles women entrepreneurs need encouragement and support from their families, social circles and most importantly the government. To uplift women's entrepreneurial potentials, ministry of women and child affairs of Bangladesh established Joyeeta Foundation in 2011. From the very beginning, Joyeeta Foundation tries to assist women through training opportunity, providing market place at very cheap rate, financial assistance and other necessary logistic support. But there is hardly any study to evaluate how the initiatives of Joyeeta contributed to the emancipation of women through their empowerment. The present study is an attempt to fill up this vacuum.

Objectives

The objective of this study is to understand how Joyeeta Foundation is contributing to the changing status of women empowerment in Bangladesh.

Methodology

This study is based on both qualitative and quantitative data with empirical and secondary sources. Empirical data have been collected through semi-structured interview scheduled as a part of survey method where 80 respondents have been conveniently selected from Joyeeta Foundation, Rapa Plaza, Dhanmondi. 10 Case Studies have also been done conveniently as a part of qualitative data to add a holistic picture in this study. The main reasons to use convenient sampling are the unavailability of the respondents in their showrooms and lack of interest in participating data collection procedure as the research incorporate some sensitive issues. The secondary information has been coined from different books, journals, articles, newspapers and relevant websites. Keeping the main purpose of this study in mind, necessary statistical tools have been used in analyzing the data.

Findings

Socio-Demographic Information

Socio-demographic characteristics of the respondents help to give a clear and holistic picture in social science researches. In this section an attempt has been taken to analyze some important characteristics of the respondents.

Table 1: Socio-economic and Demographic Profile of the Respondents (N=80)

Socio-demographic Characteristics	Respondents	Percentage
Sex		
Female	80	100
Age		
15-24	20	25
25-54	34	42.5
55-64	26	32.5
Total	80	100
Educational Qualifications	21	26.3

Socio-demographic Characteristics	Respondents	Percentage
Masters	19	23.8
Honors or Equivalent	10	12.5
HSC	12	15
SSC	14	17.5
High School	4	5
Primary School	80	100
Total		
Marital Status		
Married	65	81.25
Unmarried	10	12.5
Divorced	3	3.75
Widow	2	2.5
Total	80	100
Number of Family Members		
3-5	40	50
6-8	28	35
8+	12	15
Total	80	100
Daily Working Hours		
7-12	64	80
1-6	16	20
Total	80	100

Source: Field Survey, 2021

All our 80 respondents are female. Data shows that all the respondents are in prime working age between 15 to 64. No respondent under the age of 14 or above 64 was found. All our respondents can read and write. They are also capable of keeping various records. 50% of our respondents completed their graduation. The more the education level the more the ratio of success was found. Marital status is a major aspect in demographic presentation. 81% of our respondents are married, 3.75% are divorced, 2.5% are widow and 12.5% are unmarried. Number of family members impacts the overall lifestyle. 50% of our respondents are from nuclear family of 3-5 members. Most of our respondents (80%) work 7-12 hours per working day and only 20% work less than 6 hours a day.

Motivational Factors behind Entrepreneurship:

Table 2: Motivational Factors behind Entrepreneurship

	Frequency	Percentage
Source of Motivation		
Self	68	85
Family	9	11.25
Others	3	3.75
Cause of Entrepreneurship		

	Frequency	Percentage
Creating Own Identity	50	62.5
Bear Self-expense	11	13.75
Family Support	13	16.25
Passing Leisure	6	7.5

Source: Field Survey, 2021

As is stated earlier, human beings need motivation for doing something extraordinary. Among our respondents 85% were self-motivated where 11.25% got it from family and 3.75% got it from other sources. 62.5% of the respondents wanted to make their own identity and that's why they have chosen entrepreneurship as the earning medium. 13.75% wanted to bear self-expense where 16.25% wanted to increase family income and 7.5% choose it for passing leisure time.

Fatema, aged 58, informed "I used to perform all the indoor household duties but nobody treated my tasks as productive work. Therefore, I decided to do something that could bring money for me and create my own identity in my family and society. Now, nobody treats me as unproductive anymore."

Training and Working Condition/Environment in Joyeeta:

Table 3: Training and Working Condition/Environment in Joyeeta

Criteria	Frequency	Percentage
Training Type		
Embroidery and Stitch	55	68.8
Food Processing	20	25
Dice Designing	5	6.2
Training Environment		
Good	51	64
Outstanding	29	36
Bellow Satisfactory	00	00
Working Environment		
Good	54	67.5
Fairly Well	26	32.5
Bellow Satisfactory	00	00
Security Issue		
Secured	75	94
Mild Security Problem	5	6
Insecure	00	00

Source: Field Survey, 2021

Joyeeta offers various training opportunities including food processing, dice designing, embroidery and stitch etc. Among our respondents 68.8% took training in embroidery and stitch, 25% in food processing and 6.2% in dice designing. Proper training environment is a precondition for future success. It is notable that all the respondents are pleased at the training facilities provided by Joyeeta, in fact 36% marked it as "outstanding". Besides good training environment, Joyeeta also offers a sound working environment to its fellow women as we see all the respondents are positive in their responses in terms of the working environment there.

67.5% respondents marked it as “good” while 32.5% as “fairly well”. In the present circumstances of our society, the issue of safety for woman in work place is a vital one as various forms of harassments are very much common in picture. Joyeeta seems successful enough in this regard. 93.8% of the respondents feel no security related problems here while only 6.2% have the issue of minor security problems (although they didn’t reveal any specific problem).

Joyeeta and Economic Status/Solvency of the Fellow Women:

Economic status, by and large, determines life chances of a human being. Better economic condition is the heart of secured life. It is found in the study that 81% of the respondents were not economically solvent before their association with Joyeeta. But the scenario started to change after their involvement with it. 100% of the respondents reported that their economic condition is much better now. The monthly income became more than double to 90% of the respondents in comparison to their income before their incorporation to Joyeeta. The income range of 40% respondents is in between TK. 30-40 thousand per month while 20% earn in between TK. 40-50 thousand. Only 5% earn more than Tk. 70 thousand per month. 68% of the respondents didn’t have own fund to invest for their business. They (includes some others) got help from Joyeeta to get loan from different sources. Joyeeta also provided them with shops in a very cheaper rate with monthly fare of just Tk. 5000 per month.

Sumiya, aged in 45, informed, “With the limited income of my husband, we could not afford the basic needs of our children. We tried different ways to increase the family income, but we failed. Finally, I received training from Joyeeta Foundation and started my business. Now I earn more than my husband. My contribution in my family changed the whole scenario and we have no financial problems for last few years.”

Issue of Family Support

Family is the primary source of human up-gradation. In our conventional Bengali society female labor had always been unpaid and female endeavor for self-sufficient life had hardly been encouraged. 72% of the respondents reported that their family members were doubtful about their success but when they started to earn and contribute to the family, all their doubts were gone. Now the behavior of family members of 28% respondents is normal and remarkably 72% are inspirational in their behavior.

Keya, aged 48, informed, “Being motivated from the success of my friend Tahmina, I decided to start a business. I discussed the issue with my family members and they laughed at me. They couldn’t believe that a woman can become an entrepreneur in our society and become successful. I had to invite Tahmina to convince my family members. Although they gave me initial consent, they were in doubt about my success.”

Decision Making Capability

Decision making capability is one of the main criteria to understand someone's freedom and empowerment in a given circumstance. Some key indicators in decision making capability are shown here.

Decision Making Capability in Business Related Issues

Most of our respondents (84%) can run their business without facing any obstacle from their family. 92% respondents can maintain their entrepreneurship alone, even without any support from husband and other family members. It is the clear indication of women's ability, skills and power.

Decision Making Capability in Family Issues:

Table 4: Decision Making Capability in Family Issues

Criteria	Before the association with Joyeeta (in percentage)	After the association with Joyeeta (in percentage)
Family Affairs	12	85
Health Issues	10	65
Visiting Relatives	5	57
Children's schooling (among married respondents) N=65	7	74
Family expense	2	72

Source: Field Survey, 2021

Prior to their association with Joyeeta, 88% of the respondents didn't have the chance to participate in family decision making but now 85% have overcome the barrier and now can strongly participate in family decision making. It arguably indicates that the freedom of decision making in family affairs has increased remarkably. In health issues 65% respondents can take own decision and it was only 10% before their involvement with Joyeeta. In 57% cases the respondents can take the decision whether they would visit their relative's house or not; which was merely 5% earlier. In the case of family expense only 2% could give their opinion which is 72% at present.

Issue of Physical and Mental Torture

The family environment matters a lot to achieve success in life. Both physical and mental tortures are responsible for family strife that hampers productive and peaceful family tie.

Table 5: Changing pattern in Physical and Mental Torture

Types	Before the association with Joyeeta (in percentage)	After the association with Joyeeta (in percentage)
Physical torture	15	0
Mental torture	73	3

Source: Field Survey, 2021

Remarkable changes have taken place in the issues of physical and mental torture. In the case of physical torture, 15% of our respondents were physically tortured by their family members which has reduced to 0% now. In the case of mental torture, 73% of our respondents were tortured mentally which has become 3% these days. The data indicates that the more the women earn the less is the chance to be tortured physically and mentally by their family members and others.

Discussion based on findings:

The initiative of the establishment of Joyeeta Foundation was to empower women as a whole by upgrading their economic condition. It is manifested from the findings that the betterment in economic condition has brought about a remarkable change in various aspects of their life. Cent percent respondents reported that their economic condition became much better while 81% of the respondents were not economically solvent before their association with this platform. Decision making capabilities, one of the main pillars of empowerment, both in business and family related issues have remarkably been changed. Data show that 84% of the respondents don't face any obstacles from their family and 92% don't need any support from their family members to run their business. In family affairs, family expenses, visiting relatives and in health related issues women can strongly make decision in most of the cases after their involvement with Joyeeta Foundation. Decision making capability in family affairs has shifted from 12% to 85% while ability to decide in family expenses has changed 2% to 72% which are remarkable indicators of empowerment. Mrittika, aged in 41, reported her changed condition in family decision making in this way, *"I was a silent participant in family decision making discussions. In fact, I kept silence as my opinions were not given much value. But my importance in family discussion started to increase when I started to earn and contribute to my family. I am not a silent spectator anymore."*

Physical and mental tortures are common incidents for women in typical social structure in Bangladesh. Economic backwardness and vulnerable social position are believed as main determining factors behind this course. Data, in this research, show that great changes have come in this segment as physical torture has come down 15% to 0%, while mental torture from 73% to 3% after the association with Joyeeta Foundation which are very significant. Juthika (nickname), aged in 40, stated *"I was from a poor family and my father could not fulfill the demand of my in-laws". As a result, I had to suffer a lot. Mental tortures were part and parcel of my day to day life. I usually kept silent but if I protested some of their verbal assaults, I had to face physical tortures sometimes. But things started to change dramatically when I began earning and fulfill their demands. I have no more family crisis which I think is a result of my solvent life."*

Joyeeta Foundation provided good support to its fellow entrepreneurs by facilitating trainings in sectors like embroidery and stitch, food processing, dice designing and so forth. The respondents were very satisfied with the training and working conditions facilitated by the foundation with proper security. No issues of insecurity were reported. Rekha, aged in 40, narrated her experience about the working condition, *"I have been working here for last few years. I found no security issues."*

Working environment is very safe here. Joyeeta Foundation was very careful when they arranged training program for us. The training that they provided us is helping me in running my business successfully.”

Though an initiative like Joyeeta alone can't empower a group of people in every possible dimensions, the attachment with Joyeeta Foundation, as found in this study, has positively influenced in all the parameters set in this paper which can easily lead to the conclusion that Joyeeta Foundation is a remarkable attempt to empower women as a whole.

Conclusion and Recommendations:

A nation can't prosper without considering half of its population in financial sectors. Women in our country are lagging behind in economic sectors due to various stigma and prejudice. Joyeeta, no doubt, is a revolutionary initiative taken by Ministry of women and child affairs of Bangladesh government for the upliftment of the women folk of our country. With various training and allocation of financial aid, Joyeeta made an impact in their life in different dimension. Women of different age, educational qualification, social and financial background have greatly been benefited by their association with Joyeeta. Women, associated with Joyeeta, have earned remarkable financial freedom and their status in their family has changed a lot in every parameter. Decision making capability in personal, family and business related issues has greatly changed. As physical and mental torture has come to negligible mark, women can now enjoy more safe and sound family environment. They are no more in any identity crisis. However, this sector is not a bed of roses and that's why they need proper guideline and support from the concerning authority. On the basis of the findings and recorded documents some recommendations can be made:

- More business platforms like Joyeeta should be created.
- More effective and up to date training facilities should be ensured.
- New trendy business ideas can be considered.
- The volume of financial support should be increased and resourcing areas should be effectively increased.
- Procedure of sourcing bank loan should be easier and interest rate should be at affordable range.
- Psychological aid should be provided and yearly workshop should be facilitated on mental health.
- Strict security measures should be taken and implemented in the workplace.
- First aid and health facilities must be up to the mark.

References:

- Balasundaram, N., Absar, M. M. N., & Akhtar, S. (2010). Empowering Women Through Entrepreneurship Development in Emerging Economics: An Overview.
- Begum, R. (1993). Entrepreneurship in Small-scale Industry: A Case Study of Engineering Units. Dhaka University Journal of Business Studies, 14, 159.

- Bhattacharjee, S., Ali, M., & Talukder, A.K. (2017). Empowerment of Urban Women: A case study in Old Dhaka. *Janata Bank Journal of Money, Finance and Development*, 4(1).
- Derera, E., Core, F., Phiri, M., & O'Neill, C. (2020). Entrepreneurship and Women's economic empowerment in Zimbabwe: Research themes and future research perspectives. *The journal for Trans disciplinary Research in Southern Africa*, 16(1), a787.
- Gill, R. & Ganesh, S. (2007). Empowerment, Constraint, and the Entrepreneurial Self: A Study of White Women Entrepreneurs. *Journal of Applied Communication Research*, 35(3), 268-293.
- Kabeer, N. (2012). Women's Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labor Markets and Enterprise Development. SIG Working Paper 1, Department for International Development (DFID) and International Research Center (IDRC). Retrieved from <http://www.idrc.ca/EN/Documents/NK-WEE- Concept-Paper.pdf>
- Khan, T. H., Islam, M. E., Talukder, I. A., & Khan, M. B. (2013). Micro Credit-Women Empowerment Nexus Explored: A Study on the Women of Selected Rural Areas in Natore District. *Research on Humanities and Social Science*, 3(3), 110-121.
- Kirve, H. & Kantikar, A. (1993). Entrepreneurship at the Grassroots: Developing the Income-generating Capabilities of Rural Women. *The Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economics*, Entrepreneurship Development Institute of India, 2(2), 177-197.
- Madan, S., Gulyani, M., & Benson, S. (2014). Women Empowerment Through Entrepreneurship. *International Journal of Engineering and Management Research*, 4 (6).
- Mordi, C., Simpson, R., & Singh, S.M., (2002). The role of cultural values in understanding the challenges faced by female entrepreneurs in Nigeria. *Gender in Management: An International Journal*, 25(1), 5-21.
- Morsheed, F., & Haque, M. E. (2015). Impact of Women Entrepreneurship on Women Empowerment in Bangladesh. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(1).
- Nesa, M. (2015). Empowerment of Women Through Entrepreneurship: A Study On Women SME Entrepreneurs In Bangladesh. *Politics and Democracy Series*. Dictus Publishing, Dhaka.
- Rabbani, B., & Chowdhury, M. S. (2013). Policies and Institutional Supports for Women Entrepreneurship Development in Bangladesh: Achievements and Challenges. *International Journal of Research in Business and Social Science (IJRBS)*, 2(1), 31-39.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts (Also Reprinted: London: Oxford University Press, 1961).
- Sultana, B., Zaaba, Z. B., & Umemoto, K. (2010). Women's Empowerment Through the Development of Micro Entrepreneurship in Rural Bangladesh. *The Social Sciences* 5(1), 1-9.

Social Media, Advertising, and Consumer's Lifestyle: A Study of the False Needs and Moral Confrontations of Consumers in Dhaka City

Mohammad Hafizul Islam^{*}

Md. Shawn Sheikh^{**}

Md. Moinul Islam^{***}

Abstract

The study aims to explore business policy concerning media, consumerism, and false needs in Dhaka city, Bangladesh, and the moral judgment of it. The study has been conducted following both quantitative and qualitative methods based on primary data. With the advancement of the new capitalistic system, nowadays media is being used as an instrument to create false needs among consumers. Media has shifted and expanded its role from all the important issues of social importance to consumer culture as it is involved more in drawing the attention of the consumer by promoting commodities through attractive advertisements. Nowadays people are actively involved in social media like Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Youtube, etc. which greatly influence consumers through constant advertisements. As media is letting its role taken away by consumer industries and complying with them to promote their goods, people in their subconscious mind are becoming the followers of consumer society. The study will try to express why this approach of media creating unnecessary needs among consumers is morally condemned and what the limitations of it are.

Keywords: Consumerism, Urban Life, Advertisements, False Needs, Morality

1. Introduction

Consumption is a social, cultural, and economic process of choosing goods and services. Media content influences its audience to consumer culture, especially our Bengali culture like wedding ceremonies presented in lifestyle magazines that encourage people to consumerism (Hossain 1). Household income, expenditure, and consumption of Dhaka city have been increasing gradually over the years at a high annual rate. There has been a definite shift in the financial capacity as well as attitude towards life in the people of the capital city. A study by the Boston Consulting Group (BCG) revealed that two million Bangladeshis join in the rank of middle and affluent class (MAC) each year and by the end of 2025, the number of MAC will be tripled and will reach about 34 million. The psychological shift has taken place somewhat silently. "I have to live for others and not for myself: that's middle-class morality" — George Bernard Shaw's definition holds no more. From a savings-oriented and conservative culture, people have moved towards a more lifestyle-oriented culture. Their media use habits are changing and they are fast

^{*} Professor, Department of Philosophy, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

^{**} Graduate student, Department of Philosophy, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

^{***} Lecturer, Department of Sociology and Social Work, Gono Bishwabidyalay, Savar, Bangladesh

adopting technology (The Daily Star, 21 February 2018). Of the 54 million active internet subscribers, nearly 96% are on mobile, and 10 million use smartphones. With the growing internet connectivity, consumers are getting digitally attuned which eventually ends up having a profound impact on their consumption patterns. The economic capitalist system creates a culture industry in which people are destined to face false needs that are not vital to their well-being but are deemed to be vital by the creation of a society that bases success through material means (Ago 91).

News is increasingly being used as a tool to sell consumer goods. Consumers are becoming mentally equipped with the systematic and disciplined influence of the media to increase the level of consumption. Marcuse points out that socially created needs may have nothing to do with our basic needs. (Ago 89-90). Indeed, they may even work against our basic needs. From an egoistic point of view, the advertisement of a commodity may be justified as business companies are earning money, which is their sole purpose, and accumulating wealth which in turn increases their total amount of pleasure. They may argue that by maximizing their profit they contribute to society overall. According to Bentham's "greatest happiness principle," as they do not harm anybody, they are free from wrong. But the problem arises when they try to control consumers' minds by the propagation of their products. They emotionally blackmail consumers to fulfill certain social requirements by creating false needs through advertisements. Most of the business firms violate the second principle of Kant's categorical imperative "act only so that you always treat humanity as an end in themselves, never as a means." They treat consumers as a means to increase their wealth by insisting on buying their products through advertisement. The question then arises "should people behave solely in a self-interested (us) manner, or should their concerns also be with receivers of their persuasive messages (them)?" (Baker119)

Literature Review

Hossain and Asadi (2012), present a critical analysis of Bridal issues from lifestyle magazines that promote consumer culture to their consumers. In this study, different parts and concepts of the marriage ceremony have been analyzed. A large portion of that analysis revolved around the systematic marketing of bridal products through media. Media in all its forms, print or electronic, is a mirror of the times and society we live in, which has a tremendous impact on the way society conducts itself in the present, as well as the shape it would take in the future. They explain how elites of society always try to make new ideas to maintain their status. That's why they breed unnecessary needs of commodities that they are capable of buying to convince people about their status in society.

Al-Mukhaini (2015) conducted a study regarding the impact of social media on consumers buying behavior in Oman. From the survey, it is found that the percentage of Online Insiders (online shoppers) is 48%. Social Clickers (regular online users) shape 52% of the respondents. As the participants were asked questions regarding the factors that influence them to buy online, 61% of them said they are affected mainly by information factors associated with the products. The study focused on three common Social Media sites, Instagram, Facebook, and Twitter to help

participants choose the suitable one. Because data shows that these three sites are the most common and popular sites used by Omani people.

Hajli (2013) has conducted a study about the impact of social media on consumers and he finds out that recent advancements regarding the internet and the development of social media have facilitated the interconnectivity of consumers. Consumers are having social interactions through social media such as online forums, communities, ratings, reviews, and recommendations. These interactions provide different values for both businesses and consumers. Both are involved in the co-creation of value. Consumers, facilitated by social media, generate online social support for their peers. Consequently, these interactions establish trust in the networks used. The results show that trust, encouraged by social media, significantly affects the intention to buy.

Marcuse (1991), false needs are developed in society through advertisement and what propels this agenda is capitalism. This also creates a decrease in the importance of the individual's basic needs,

We may distinguish both true and false needs. "False" are those which are superimposed upon the individual by particular social interests in his repression: The result then is euphoria in unhappiness. Most of the prevailing needs like, to relax, to have fun, to behave and consume following the advertisements, to love and hate what others love and hate, belong to this category of false needs. (Ago91)

Theoretical Framework

The culture industry is a term coined by critical theorists Theodor Adorno and Max Horkheimer (1944) in the chapter "The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception" of their book *Dialectic of Enlightenment*. Culture today is infecting everything with the sameness. Film, radio, and magazines form a system. Each branch of culture is unanimous within itself and all are unanimous together. (Theodor Adorno & Max Horkheimer 94) They stated these over half a century ago and nothing could be more true than this in today's capitalistic society. Everything that we encounter via media is the propagation of commodities that contain hardly any necessity in our daily life. People are getting so triggered by the spreading of commodities through media that these commodities have become an automatic choice for them to buy. And unsurprisingly cunningly companies are introducing products by setting a standard that means a certain number of consumers will have the accessibility to buy the product in accordance with their spending capability through which a consumer can maintain his status quo. Consumers are divided up as statistical material into red, green and blue areas according to income group. (Theodor Adorno & Max Horkheimer 97) Consumers are losing their command of choice as they are out of the creation process. They are targeted by the producer to only consume. And consumption relies on what has been produced. For the consumer there is nothing left to classify since the classification has already been preempted by the schematism of production. (Theodor Adorno & Max Horkheimer 98)

Kant (1785) in his book *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals* states that act as to treat every human being including yourself as an end, never as means only. (Kant 25-26) This is the second categorical imperative of morality of Kant. It states the fact that no one should consider any person as a means to his motive. Now regarding social media advertisements, what is the importance of this principle to resist the media influence of commodities? Well, it is very much important as business people use consumer culture to boost their sales. Thus, they consider the consumer no more than an instrument of breeding money. They create unnecessary needs using media. So, from an ethical point of view, this Kantian principle helps to make a moral case against the promotion of commodities through advertisement using media influence. Kant's categorical imperative requires that as a matter of moral duty, one must identify and act upon correct principles—those maxims that one would want everyone to honor in similar situations. (Baker 121)

Objective of the study

The primary objective of the study is to explore the impact of social media and consumerism in Dhaka city, Bangladesh. And the specific aim of the study is:

1. To discover how social-media influence urban people's lifestyle to consume unnecessary things.
2. To make a moral judgment concerning business and media's influence on consumers.

Methodology of the study

The study on social media, consumerism, and false needs in urban life in the selected consumption areas in Dhaka city has been conducted following the triangulation method (both qualitative and quantitative approach). For the quantitative approach, the research has been conducted following a semi-structured interview questionnaire in which 300 respondents participated. The collected data have been analyzed through the statistical program for social science (SPSS), version-22. For the qualitative approach, 6 case studies have been taken to understand the experiences of the consumer of Dhaka city. The qualitative approach is sustainable to explore real aspects of social media and consumerism in urban peoples' lifestyles. The gathered qualitative data have been analyzed thematically. The study area is Dhaka city as most consumers both male and female are prevalent here. Three large shopping places have been chosen within Dhaka city namely Bashundhara Shopping Complex, Dhaka New-Market, and Jamuna Future Park. The following sample for the study is purposive sampling which represents a group of different nonprobability sampling techniques. In this study, selected critical case sampling has been considered as it focuses on specific characteristics of the sample.

Socio-demographic characteristics of the respondents (Respondent profiling)

This research emphasizes that socio-economic factors, such as gender, marital status, education, occupation, income level, and family expenditure, significantly impact consumer behavior in urban settings. The sample consists of both male (64%) and female (36%) participants. Marriage, a prevalent social institution in Bangladesh, is

considered, with 41% of respondents being married, while 59% are unmarried, and no separated or divorced individuals were included. Educational qualifications play a vital role in consumption habits, with 42% holding post-graduation degrees, 37% having graduated, 14% completing HSC, and 7% completing SSC.

Occupation is a significant determinant of consumption patterns. The majority of respondents (39%) are employed in the service sector, followed by students (37%), businessmen (12%), household workers (9%), and retired individuals (3%). Income and expenditure are crucial factors reflecting overall consumption habits. Respondents' earnings primarily fall within the below 25 thousand tk. range, with the fewest respondents earning between 50-75 thousand tk.

In terms of income, 35% of respondents earn below 25 thousand tk., 24% earn around 25-50 thousand tk., 20% earn around 50-75 thousand tk., and 21% earn 75 thousand+ tk. Family expenditure analysis indicates that 50% of respondents' families spend below 50,000 tk., 29% spend around 50,000-100,000 tk., 16% spend 100,000-150,000 tk., and 5% spend 150,000+ tk.

Table: Collected data of the respondents

Question	Variables	Frequency	Percentages (%)
Influence of media at the time of buying products	Yes	198	66
	No	102	34
Types of media playing important role in buying products through advertisement (multiple response)	Social media	219	72.9
	Mass media	81	27.1
The most important factors for popularizing products (multiple response)	Business persons	154	51.4
	Ownership of media	51	16.9
	Media artists	77	25.4
	Banks	11	3.5
	Multi-national companies	7	2.8
The impact of consumption on consumers	Positive	57	19
	Negative	243	81
The negative impact on consumers (multiple response)	Mental problem	86	35.11
	Social problem	88	36.17
	Human relationship	28	11.70
	Physical health	41	17.02
Reasons of increasing unnecessary consumption (multiple response)	Economy	246	78.1
	Politics	24	7.6
	Culture	36	11.4
	Religion	9	2.9
Media plays a role to create unnecessary demands	Yes	285	95
	No	15	5
Types of media to create unnecessary needs (multiple response)	Mass media	107	37.6
	Social media	178	62.4

Question	Variables	Frequency	Percentages (%)
Media is changing consumers' demands	Strongly agree	126	42
	Moderately agree	123	41
	Neutral	36	12
	Strongly disagree	3	1
	Moderately disagree	12	4
Reasons for attraction to unnecessary demands	Advertisement	153	51
	Illiteracy of consumer	117	39
	Lack of consumer law	3	1
	Limited consumer choice	9	3
	Scarcity of essential commodities	18	6

Source: Field data

Result and discussion

Advertisement and popularizing products: There are some reasons for the popularization of commodities and for attracting consumers' interest. From the study, we find that 66% of consumers believe that media significantly influences their buying habits, while 34% believe media has no impact on their purchasing decisions. Among the 66% who acknowledged media's influence, 27.1% attributed it to mass media (TV, Newspapers, Magazines), and 72.9% attributed social media (Facebook, YouTube, Instagram). On the other hand, the 34% who claimed media had no impact were mostly low-income individuals with monthly earnings below 25000 tk. and family expenditures less than 50000 tk. Financial constraints led them to prioritize essential needs over unnecessary buying. However, the study suggests that if they had more disposable income, they might be susceptible to media influence and engage in unnecessary buying. The study reveals a significant proportion of consumers acknowledging media's influence on their buying decisions, with social media playing a more significant role. Meanwhile, some low-income individuals seem more tied to financial constraints rather than the media's uselessness.

An undergraduate student said that social media provokes him to buy certain products, especially clothing. Constant advertisement in social media makes him vulnerable to buying products. He buys unnecessary products because of the provocative advertisement on social media. If there was no provocation involved, he never would have bought it. He said that because of his active involvement with social media, he has become part of consumer culture which he describes as an addiction. (Sojib, BA student, case-1)

A male consumer described the impact of media while buying products, he said that media provoked him to buy the product. He added that different types of advertisements presented by the media influence him when he tries to buy something. Media forces him to question the quality of a product that has not been advertised. So, he ends up buying what the media shows him. (Monirul, MA, job holder, case-2)

“How advertisement has become the most important factors for popularizing commodities” regarding the statement, of the respondents 51.4% said business persons, 16.9% said ownership of media, 25.4% said media artists, 3.5% said

banks, and 2.8 said multi-national companies are responsible. Survey data and case studies show that advertisement has exerted influence on popularizing the products and persuading consumers to purchase the products. The media and the producers of goods simultaneously work together to make a huge amount of profit and they execute it by establishing a culture industry in society. Marketers pay producers to integrate branded goods and services into scripts for TV, film or theatre. (Wasserman 231)

The negative impact of consumption on consumers: According to the study, consumption has two types of impact on consumers, positive impact and negative impact. The positive impact is not very prevailing among the consumers as data shows that it comprises 19% of the consumers. What makes an impact positive, according to the consumers, is that it brings some joy in their life while buying any commodity and also it helps them to establish their social identity. On the other hand, the negative impacts are alarming for the consumers as it comprises 81% of the consumers. The average American spends more time-consuming media and using technology via video, audio, and portable communication devices, than any other human activity, including eating and sleeping. (Bugeja242) The data provides us with the number that 35.11% of consumers said it causes a mental problem, 36.17% of consumers said it causes a social problem, 11.70% of consumers said it destroys human relationships, and 17.02% of consumers said it deteriorates physical health. Many consumers responded by choosing more than one option.

A female consumer stated that she faces two types of effects regarding consumption. She gets pleasure and mental satisfaction by consuming commodities but on the other hand, she gets sick by eating i.e., consuming foods from a restaurant. She said that most of the food from the restaurant is unhygienic which causes various diseases and makes people fat. (Ishrat, MBA, job holder, case-3)

Jansiz (2013) says in his study that the impact of consumerism is severe. It hampers both mental and physical health. People feel despair because of the unfulfilling desire that the media create for them. They do not acknowledge that media is the main culprit to create those unnecessary needs in their life which are not basic needs.

Economy promotes consumptions: Changing patterns of consumption in Dhaka city are happening by the influence of media and the economy. Data shows that the economy, politics, culture, and religion all are key factors for the increase in consumption. With the help of field study, collection of data shows that consumers responded with multiple answers where 82% of the consumers said the economy, 8% said politics, 12% said culture, and 3% said religion is the reason for the increase in consumption. As the financial capacity of the consumers is increasing media is promoting new products which is leading towards unnecessary buying. Now that media have turned into big business, the individual conscience is inadequate. (Bertrand 107)

A male consumer responded,

Cultural norms are the biggest factors for consumption. He emphasized on family income which is responsible for consumption patterns. The richer the family, the bigger the spending. Money pushes us to adopt luxurious life where the commodity is

the luxury to have. He said that financially enriched families are more likely to fall into consumer culture. (Jaman, MA, job holder, case-4)

As data shows, financial power helps to develop consumer culture. As money helps buying commodity, media helps to propagate it. Money along with media are responsible for the changing patterns in commodity. Films and radio no longer need to present themselves as art. The truth that they are nothing but business is used as an ideology to legitimize the trash they intentionally produce. (Theodor Adorno & Max Horkheimer 95)

The influence of social media for unnecessary consumers' demand: Media has the most important role to play in society in terms of raising awareness, creating social bonds, and educating people about their responsibility. But media is doing otherwise. Media plays a role to create unnecessary needs-this question was asked following the answer of 'yes' or 'no'. Of the consumers' 95% responded by agreeing (yes) that media plays a role to create unnecessary demands and 5% responded by disagreeing (no) that media has no contribution to the creation of unnecessary needs. Among 95% of the respondents, 37.6% said mass media, and 62.4% said social media create unnecessary demands.

In the research on media changing consumers' demands, the data shows that 42% of the consumers strongly agree with the statement, 41% of the consumers moderately agree, and 12% of the consumers are neutral. In regards to disagreement, 4% of the consumers moderately disagree and 1% of the consumers strongly disagree with the statement.

A male consumer responded,

The task of media is to govern people's interests. But nowadays media is alienating from the responsibility that it holds for the masses. There are many unnecessary commodities that we buy because of the influence of the media which bears hardly any value to our life. For example, we can take bath in a simple bathroom but because of the promotion of luxurious bathroom fittings in the media, people tend to buy luxury items for their bathroom to show their financial ability. He further added that we can make delicious food in our homes but because of the influence of social-media, we are almost forced to eat from restaurants to satisfy the social requirements. Social media creates these false demands that hamper us financially and mentally. (Shurov, MA, job holder, case-5)

Hossain and Asadi (2012) find out some crucial causes concerning false needs. They investigated the wedding ceremony in Bangladesh and commodities related to the ceremony. They discovered that bridal accessories were promoted in the name of famous brands and presented the products with lucrative features and designs. Thus, they manipulate their target consumers and convince their new consumers for buying their exclusive products. These brands focus on exclusivity to make their consumer feel that they belong to the superior class of society. As a result, people engage in various forms of consumption to maintain their status quo in society.

Reasons for attraction to unnecessary things: Consumers responded that there are some reasons why media contribute to consumer attraction to unnecessary things

such as advertisement, illiteracy of consumer, lack of consumer law, limited consumer choice, and scarcity of essential commodities. The data shows that 51% of consumers chose advertisement for consumer attraction, 39% of consumers chose illiteracy of consumer, 1% of consumers said lack of consumer law, 3% said limited consumer choice and 6% chose scarcity of essential commodities.

A male consumer described the impact of media, where he said that people are becoming automated by the influence of media which in turns changing their consumption patterns. Media popularizes new commodity to people which otherwise almost impossible to know about. Consistent promotion of a new product gives rise to a curiosity of using it even though it bears no necessary value to the person. (Shohidul, MA, job holder, case-6)

Non-media global advertisers desire media corporations with large-scale distributions for global campaign. (McAllister & Proffitt 331)

False Needs and Moral Confrontations: The study shows that social media influence urban people through attractive advertisements which in turn creates unnecessary needs. In most cases, business firms are responsible for the advertisement because of the money they put into it. They offer money to the media to promote their products as both media and business industries want to fill their pocket. Both are equally responsible for creating the culture industry.

Fundamentally, Europeans find it insufferable and seemingly immoral in the sense of "contrary to public service" that over two-thirds of the surface of dailies be occupied by ads, and that television programs be interpreted every nine or ten minutes by loud clusters of commercials in the U.S. (Bertrand 77)

The concern becomes why it is necessary to consider this approach of social media and business firm as unfitting for the society or in other words immoral. They can argue that they pose no harm to society rather they are fulfilling their needs by maximizing profit. That is an egoistic view of morality. *Egoistic ethical hedonism holds that what makes an action right is the fact that it causes the greatest possible amount of pleasantness to the doer of the action.* (Lillie 164) In this regard, they are free from all faults. Even though most companies create false needs through advertisements on social media, they can be proven innocent following the egoistic argument. Their motive for promotion is also justified by the utilitarian view proposed by Bentham. As Bentham emphasizes on the quantitative aspect of pleasantness. But in the view of J.S Mill's utilitarian principle, a qualitative approach to an action is justified as morally correct. Not only he focuses on the consequence of an action that produces the most amount of pleasure but also, he considers the amount of pain that can be mitigated.

The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain and the privation of pleasure. (Mill9)

His view most of the time will contradict the actions of business institutions and media as they often time do not focus on the feeling of consumers. Sometimes

consumers suffer mentally, physically, and financially from the decision of buying unnecessary commodities. In this regard, these sorts of activities from business people and media can be questioned on moral grounds of Mill's utilitarian principle.

Kant's second categorical imperative opposes this view as he says treat every human being always as an end, not as means. As business people target their consumers as a means to only earn money, it is not right according to the principle. The question may arise that most of our acts may turn out to be immoral as most of the time we use things and use people's labor as a means. But Kant here emphasizes that we shouldn't judge people based on the services they produce but rather on the person himself. Most business companies consider the consumer as an end. They make the consumers confuse regarding the product through advertisements whether they should buy it or not. Primarily, most of the time the consumer does not need it. But they feel in need of it because of advertisements. This causes mental and social illness if the consumer becomes unable to meet the demand. Now, why it is important to preserve Kant's moral principle when other moral theories justify the action of these business policies and media influence? Well, because it is the ultimate degradation of human value. Hardly anybody wants to be used as a means. But because of this type of action, everybody collectively is used as a means in one way or another. This should not be the case as human beings are worthy enough to be treated as an end. Business corporations introduce social norms as a requirement to fulfill their goal of selling products. They emotionally trigger consumers to buy their commodities. They control the mind of a consumer and propel it according to their will which should not happen on moral grounds. People have inherent rights to choose which should be honored and kept intact. That's why *we will probably always need the sanctions of the law and social pressure to provide additional reasons against serious violations of ethical standards.* (Singer 295)

We cannot discard the responsibility of consumers for being exploited by business institutions' provocation through media via advertisements. Consumers have rights and responsibilities placed on them. It's an obligation to know the rights. It is important because in the study we can see that the unawareness of consumers is the second most important reason for attraction towards unnecessary things. If the consumer doesn't apply his or her rule at the time of purchase, we should not only blame the media or business policies for the exploitation. A consumer should know about the quality of the product, should consider its environmental value, should bargain for the product, and should consider that other consumers will not be affected by his purchasing.

The burden for protecting the consumer's interest, should they have wanted to go ahead with purchase, therefore lay with the consumer, not with the party making the sale. So, under the rule of buyer beware, providing producers abided by the law, it was the consumer's responsibility to show due diligence in avoiding questionable products. If they were subsequently harmed or dissatisfied with a product or service, it was regarded as their fault. (Crane & Matten 342)

So, it is also very important that the consumers also need to know about their rights and responsibilities regarding consumption and act upon it to reduce exploitation.

Conclusion

In Satyajit Roy's film 'Herok Rajar Deshe' we see how the King enjoys absolute power. He never kills his protestors nor sends them to prison, even not expelling them from the country. He invents the brainwashing machine called 'Jantar-Mantar Ghor'. The King sends all the protestors into this machine for brainwashing. After a while, the brainwashed persons cannot think on their own, the king injects them with his idea so that the protesters cannot speak a word apart from what the king taught them to. (Mamun 63-64) Nowadays, media can be treated as 'Jantar-Mantar Ghor' where people's brains are equipped and tailored by media content. Media controls consumer demand and creates unnecessary demands through advertisement. Consumers are limited by the choice of what the producer makes as they do not participate in the process of creation. They are targeted only for consumption. It will be an unwise thing to do if we exclude the ignorance of consumers regarding the false needs created by business corporations with the aid of social media advertisements. So, both consumers and business people should be aware of the ethical motivation regarding their actions. To protect harmony in society, media and businesses should abstain from manipulating their consumers. Consumers also should take responsibility for their ignorance of participating in the purchase. By upholding Kant's moral principle, we will be able to uphold the dignity of the human being as a whole.

References

- Ago, Erbi. "Does Capitalism and the Culture Industry Create False Needs? A study of Marcuse, Adorno, and Horkheimer." *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*, Vol 1, No 2, July 2015, pp. 88-92.
- Al-Mukhaini, E., & Al-Dhuhli, I., & Ismael, S. "The Impact of Social Media on Consumer Buying Behavior." 2015, Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/275347329>.
- Bertrand, Claudia-Jean. *Media Ethics & Accountability Systems*. London: Transaction Publishers, 2000, pp.77-107.
- Baker, Sherry. "The Ethics of Advocacy: Moral Reasoning in the Practice of Public Relations" *The Handbook of Mass Media Ethics*. Edited by Lee Wilkins & Clifford G. Christians. New York: Routledge, 2009, pp. 115-128.
- Bugeja, Michael. "Digital Ethics in Autonomous Systems" *The Handbook of Mass Media Ethics*. Edited by Lee Wilkins & Clifford G. Christians. New York: Routledge, 2009, pp. 242-255.
- Crane, Andrew and Matten, Dirk. *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 342.
- Hajli, M. N. *A study of the impact of social media on consumers*. International Journal of Market Research Vol.56 Issue 3, 2013, pp. 387-405.

- Horkheimer, Max and W. Adorno, Theodor. *Dialectic of Enlightenment*. Stanford: Stanford University Press, 1944, pp. 94-136.
- Hossain, M. M., & Asadi, S., et al. "Promoting Consumerism through the Media: How do Life Style Magazines in Bangladesh Attract Wedding Shoppers?" *Stamford Journal of Media, Communication and Culture*, Issue 02, December 2012, pp. 1-17.
- Jansiz, A. *The Ideology of Consumption: The Challenges Facing a Consumerist Society*. Journal of Politics and Law; Vol.7, No.1, 2014, pp. 77-84.
- Kant, Immanuel. *Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals*. Translated by Thomas Kingsmill Abbott. 1785, E-book (<https://www.gutenberg.org/files/5682/5682-h/5682-h.htm>)
- Lillie, William. *An Introduction to Ethics*. London: Methuen & Co. LTD., 2003, p. 164.
- Mamun, A-Al, *Media and Myths of Power: Its Favour for Democracy or Threat* (in Bangla). Jogajog, Number-5, January 2003, pp. 63-76.
- Mill, J. S. *Utilitarianism*. Chicago: The University of Chicago Press, 1906. p. 9.
- P. McAllister, Matthew and M. Proffitt, Jennifer. "Media Ownership in a Corporate Age", *The Handbook of Mass Media Ethics*. Edited by Lee Wilkins & Clifford G. Christians. New York: Routledge, 2009, pp. 328-337.
- Singer, Peter. *Practical Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 295.
- The Daily Star*, Dhaka, Wednesday, The 21st February, 2018. Retrieved from <https://www.thedailystar.net/business/consumers-spending-more-diverse-products-nielsen-1537624>
- Wasserman, Edward. "Conflict of Interest Enters a New Age" *The Handbook of Mass Media Ethics*. Edited by Lee Wilkins & Clifford G. Christians. New York: Routledge, 2009, pp. 229-239.

The Contributions of National and International Islamic NGOs to Social Business Development in Bangladesh

Mohammad Nurullah*

Abstract

In present time, the role of NGOs in the developing world and the social business sector is a significant subject for discussion. Bangladesh is obviously not an exception. NGOs have emerged as the saviors of numerous individuals without food, clothing, education, and basic health care services. With the world's highest population density and a lack of skilled labor, Bangladesh faces a huge challenge in meeting the needs of her rapidly expanding population. Therefore, NGOs in Bangladesh can continue to play a catalytic role in achieving sustainable economic growth and social business development. It is noteworthy that Non-Governmental Organizations (NGOs) have formed with the purpose of delivering extensive public services to a country's people living in severe poverty in Bangladesh. Similarly, Islamic Non-Governmental Organizations (NGOs) in Bangladesh have a variety of activities and initiatives aimed at alleviating poverty and fostering national development. However, this study explores how Bangladesh's national and international Islamic non-governmental organizations (NGOs) have contributed to developing social businesses intending to create a society free of poverty. This article also highlights their limits, obstacles, and opportunities for promoting social business in Bangladesh compared to secular-based NGOs. This research concludes with possible recommendations for Islamic NGOs seeking to develop a sustainable model for social business.

Keywords: Islamic NGO, Social Business, Role, Obstacles, Recommendations

1. Introduction

Bangladesh is one of the least developed countries in the world, with problems such as population growth, unemployment, illiteracy, child mortality, socio-communal instability, and more. Due to its vulnerability to natural calamities, the traditional agricultural sector has not been able to provide enough support for the national economy. Moreover, the traditional agricultural industry has been subject to persistent pressures. As a result of river erosion, an increasing number of landless people are also exerting pressure on the national economy. The whole scenario illustrates the government's limited power to improve the current situation and provide new chances. In Bangladesh, non-governmental organizations (NGOs) have been performing supporting roles with the government, assisting with grassroots development projects. These projects have been seen as having good outcomes for the decrease of poverty among the rural poor, particularly in places where poverty remains severe. These efforts primarily target the very poor, who have limited access and chances to improve their living conditions and standards. The actions of the NGOs consist of organizing these populations, raising their awareness, inspiring them, and transforming them into improvement. All of these Organizations operate

* Professor, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

in line with the process of national-level development planning, but Bangladesh has lagged significantly behind other emerging countries in terms of sustainable poverty reduction. (Hassan & Forhad, 2013)

NGOs in Bangladesh are a dynamic entity that arose owing to government inadequacies in providing social services, but have grown into many other regions due to institutional dynamics and compulsions resulting from a participatory approach to grass-roots development. Zohir (2004) illustrates the extensive route taken by NGOs, which have been active in a variety of fields and may benefit from a broader space and a new kind of collaboration between traditional agents and NGOs. Policies are vital tools for expanding the contribution of NGOs to Bangladesh's economic and social development, but excessive involvement and regulation may impede the growth of an innovative sector like that of the NGOs.

NGOs (Non-Governmental Organizations) are crucial to the development of the political, economic, and sociocultural dimensions of life on earth that demonstrate in different sectors of this present age of globalization. NGOs are those organizations and associations that actively participate in the formal and informal processes of sociocultural and economic-political development. In Bangladesh, there are two main categories of NGOs that have made significant progress in reducing poverty in a wide range of different areas, including welfare, health, social business, and education. One of them is based on a commonly acknowledged secular outlook and western influence, the other is based on Islamic principles and values, which meet challenges from both the public and private sectors but play a more significant role in social business and social services in today's society. Nevertheless, throughout the past three decades in Bangladesh, poverty has been the greatest barrier to social growth and nation-building due to calamities like floods, hurricanes, tornadoes, and calamity changes. Therefore, a multifaceted strategy to reduce poverty and provide social services by NGOs is still required in order to protect the country from those natural disasters and their severe consequences, which create distress and pain for the people of Bangladesh. Bangladesh, a country with a majority of Muslims, needs to create Islamic ethical value-based NGOs to support the development of human well-being and achievement in both this earthly life and the afterlife. Salehin (2016) examines Bangladesh's "Islamic NGOs"—Muslim Aid, the Islami Bank Foundation, and the Masjid Council of Community Progress (MACCA). It tries to improve knowledge of the compatibility of religion, development, and Islamic religious practise with neoliberal governmentality. The empirical data examines secular and religious NGOs' self-representations, control and supervision, and gender relations. Salehin's research of 'secular' and 'Islamic' NGOs reveals that they are comparable in their program designs, specific operations, organizational structures, and positions as a vehicle for neoliberal governmentality'. Yet, Islamic NGOs' peculiarity is restricted to a focus on Islamic norms, values, and symbols, the refusal of loan interest, and morality instruction. Women favor Islamic Organizations because they want to follow *purdah* (Islamic veiling system for women) and see secular NGOs as "illmannered and Demonic". Salehin (2016) indicates that Islamic NGOs provide better service and are less coercive than secular NGOs, but that other faith-based Organizations share similar traits. This would have

prevented the author from becoming mired in the polarizing argument over whether Islamic NGOs are compatible with advancement and instead encouraged a more thorough investigation of how Islamic NGOs are socially ingrained and what their position might reveal about "modernity" discourses, larger power structures, and the (inter)national politics of which they are a part.

Islam & Ali (2010) look at the organizational structures and operations of Islamic NGOs in Bangladesh, with a particular emphasis on their historical development, goals, frameworks, and management, as well as their roles, Islamic principles and values, challenges and roadblocks, current operations, management, and operations. They also outlined some effective recommendations for improved management of Islamic NGOs in Bangladesh.

However, in the 1990s, Islamic NGOs in Bangladesh joined the development discourse after a catastrophic hurricane that struck the Bangladeshi coast. Initially, the majority of Islamic NGOs in Bangladesh were engaged in relief and humanitarian work and played a role in service delivery, such as offering microcredit and education in the aftermath of the tragedy. This study defines as Islamic NGOs whose mission, vision, and activities are inspired and guided by the teachings of Islam, including any branch of Islamic teachings. This is despite the fact that the use of the terms religious or faith-based as a prefix to any NGO is contested (Clarke and Jennings 2008:5). Clarke (2008:25) believes, however, that there is a wide variety of organization types within the faith-based sector, including representative or apex bodies, charity or development organizations, missionary groups, and extreme, illegal, or terrorist groups.

It is observed that the vast majority of national and international Islamic Organizations disregard microcredit or microfinance initiatives and social business development programs. This study examines how Islamic non-governmental organizations (NGOs) have contributed to the establishment of social businesses aimed at achieving a society free of poverty. In contrast to secular NGOs in Bangladesh, this article highlights their limits, obstacles, and future potential for promoting social business. This article concludes with some suggestions for Islamic NGOs about the formulation of a sustainable model for social business.

2. Research Methodology

This study is mainly qualitative research using literature reviews. We mostly used a library research approach to gather information about Islamic NGO ideas, Social Business, Role of Islamic NGOs, and so on. Furthermore, information is accumulated and analyzed using a step-by-step process from different types of documents, including articles from reputed journals, books, websites, newspapers, etc. In addition to literature reviews and scholarly arguments, the current researcher conducted an in-depth interview of three high officials and used their experiences and observations to find problems with the Islamic NGOs and make suggestions for how to fix them. One of three interviewees is former Bangladesh country director of Muslim Aid UK, one is a professor of economics and banking at a private university

in Chittagong and another is one of the high officials of AMWAB. All of them have been serving at the said organization for 5-10 years.

3. A Brief Overview of Islamic NGOs in Bangladesh

As a newly independent country following the liberation period in 1971, the country received an enormous amount of international, unilateral, and non-government help in an effort to restructure and grow various sectors. Additionally, several non-governmental humanitarian groups were started locally soon after liberation to reduce poverty by providing care for widows and orphans as well as housing and shelter for a large number of refugees. Following the liberation struggle in 1971, a large number of non-governmental organizations have been founded internationally and locally. These organizations have been focused on relief and rehabilitation efforts and have successfully overcome a wide range of challenges, including natural disasters and tragedies. In fact, International and local NGOs turned their efforts to longer term development on behalf of the government to change the situations of the people in Bangladesh. By the mid-1980s, NGOs became more active and participate to various important sectors such as education, hospitals and social services while the country was facing challenges and shortage of equipment, instruments and facilities in rapid development. In the 1990s, the non-governmental organization (NGO) sector in Bangladesh established economic techniques to offer beneficiaries with outlets and give professional services to its "target groups." Local revenue has become an increasingly vital component of companies' sustainability plans. Certain non-governmental organizations (NGOs) have become the major suppliers of a variety of services in Bangladesh, raising questions about their impact on the country's poor, businesses, and government.

Despite Bangladesh's status as the world's most populated nation, the government has mostly failed to provide relief to the poor or eradicate poverty. As a direct reaction to this issue, the number of national and international Islamic non-governmental organizations (NGOs) have been increased, apparently to fill the void that has been created. When 497 nongovernmental organizations were removed from the registration in Bangladesh, the overall number of NGOs remained at 2426 (NGOAB, 2015).

Non-governmental organizations (NGOs) play a vital role in Bangladesh in various fields such as poverty alleviation, healthcare, education, women empowerment, human rights, disaster management, and environmental conservation. Bangladesh is home to many NGOs, both local and international, that work towards improving the lives of the marginalized communities.

Some of the major roles of NGOs in Bangladesh are:

- a. *Poverty Alleviation:* NGOs in Bangladesh work towards reducing poverty by providing micro-credit, vocational training, and skill development programs to the poor and underprivileged sections of society. NGOs like BRAC, Grameen Bank, and ASA are some of the well-known organizations that have been successful in this field.

- b. *Healthcare*: NGOs in Bangladesh provide healthcare services to the rural and marginalized communities, where access to healthcare is limited. Organizations like the Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), CARE Bangladesh, and Save the Children have made significant contributions to improving the healthcare system in the country.
- c. *Education*: NGOs in Bangladesh work towards providing quality education to children and adults, particularly in rural areas. BRAC, Plan International, and Dhaka Ahsania Mission are some of the organizations that have made significant contributions in this field.
- d. *Women Empowerment*: NGOs in Bangladesh work towards promoting gender equality and women's empowerment. Organizations like Ain o Salish Kendra, Naripokkho, and Bangladesh Women's Health Coalition are some of the organizations that have been successful in promoting women's rights.
- e. *Disaster Management*: NGOs in Bangladesh play a critical role in providing relief and support during natural disasters. Organizations like the Bangladesh Red Crescent Society, Oxfam, and Save the Children work towards providing emergency relief and rehabilitation services.
- f. *Environmental Conservation*: NGOs in Bangladesh work towards protecting the environment and promoting sustainable development. Organizations like the Centre for Sustainable Development, Bangladesh Centre for Advanced Studies, and Coastal Association for Social Transformation Trust work towards promoting environmental conservation.

4. Types of NGOs in Bangladesh

There are varieties of Non-Governmental Organizations (NGOs) operating in Bangladesh. These NGOs can be classified based on their objectives and activities. Some of the most common types of NGOs in Bangladesh include:

- a. *Development NGOs*: These are organizations that mainly focus on development activities in the country, such as health, education, microfinance, and poverty alleviation.
- b. *Human Rights NGOs*: These NGOs focus on defending and promoting human rights in Bangladesh, such as the rights to freedom of speech, the right to a safe and healthy environment, and the right to access essential services.
- c. *Women's Rights NGOs*: These organizations mainly focus on empowering women and girls in Bangladesh and advocating for their equal rights.
- d. *Advocacy NGOs*: These NGOs focus on raising awareness and advocating for different causes, such as the environment, healthcare, and education.
- e. *Relief and Disaster Management NGOs*: These organizations are mainly focused on providing aid and assistance to people affected by natural disasters, such as floods and cyclones.

- f. *Research NGOs*: These organizations focus on conducting research and producing evidence-based reports on different issues facing the country.

For above typologies we can say that the NGOs have been operating in Bangladesh can be roughly divided into two categories: secular based NGOs and Islam value based NGOs.

4.1 Secular Based NGOs

Secular-based non-governmental organizations (NGOs) in Bangladesh are those that are not affiliated with any religious or political group and focus on addressing social, economic, and environmental issues without any bias towards a particular faith or ideology. These organizations work towards promoting equality, human rights, and social justice, and often collaborate with the government and other stakeholders to achieve their objectives. Some of the prominent secular-based NGOs in Bangladesh include BRAC (formerly known as Bangladesh Rural Advancement Committee), ASA (Association for Social Advancement), CARE Bangladesh, and Action Aid Bangladesh. These organizations operate in various fields, such as poverty reduction, health and education, gender equality, climate change, and disaster relief. BRAC, for example, is the largest non-governmental development organization in the world, with a focus on empowering marginalized communities through programs that provide access to education, healthcare, and financial services. ASA, on the other hand, works towards reducing poverty and empowering women through microfinance and livelihood programs. CARE Bangladesh works on women's empowerment, food security, and disaster management, while Action Aid Bangladesh focuses on promoting human rights and social justice. (Islam & Ali, 2010)

Secular-based NGOs in Bangladesh play a crucial role in the development of the country, particularly in addressing the needs of the most vulnerable and marginalized communities.

4.2 Islamic Value Based NGO

The concept of Islamic NGOs from an Islamic perspective is based on the principles and values of Islam, including compassion, justice, and social responsibility. In Islamic teachings, the concept of charity (Zakat) and voluntary giving (Sadaqah) is highly emphasized as a way of fulfilling one's obligations towards society and helping those in need. (Islam & Ali, 2010)

Islamic NGOs are based on the same principles, aiming to serve the needs of the people and promote social welfare, particularly among the less privileged communities. They work towards addressing various socio-economic issues such as poverty, healthcare, education, and disaster relief, and other humanitarian needs. The ultimate goal of Islamic NGOs is to serve humanity and bring about positive change in society, in line with the teachings of Islam. Islamic NGOs also promote the concept of social entrepreneurship, where the focus is on creating sustainable development models that can generate long-term benefits for the community. This is in line with the Islamic principle of Tawhid (Oneness of God), where everything is

interconnected, and the well-being of the community is linked to the well-being of individuals. (Islam & Ali, 2010)

Furthermore, Islamic NGOs are often guided by the Islamic concept of *Maqasid al-Shariah*, which refers to the objectives of Islamic law. These objectives include protecting the lives, property, and dignity of people, promoting justice and equity, and preserving the environment. Islamic NGOs work towards fulfilling these objectives by addressing various social issues and promoting the well-being of the people.

As Salehin, (2011) argues, however, Islamic NGOs work to accomplish economic, social, and other developmental objectives for their target beneficiaries in such a manner that the Islamic ideal of achieving earthly well-being coincides with the fulfillment of worldly responsibilities and obligations. Emphasis is placed on the Islamic doctrines of compassion, kindness, and altruism in their efforts to emancipate the poor classes. Islamic NGOs have empowered and pious people in rural places, changing their ideologies. The NGOs have successfully mobilized women to feel shame or sin over interest charges by non-Islamic NGOs' microcrediting initiatives and promoted an Islamic version of female empowerment by increasing their religious knowledge. Unlike liberal, secular NGOs, Muslim women's religion is crucial to creating "good women." This guides their public behaviour and social mobility efforts (Salehin, 2011).

In addition to the numerous secular based NGOs operating in Bangladesh, the Social Welfare Department has registered a small number of local and foreign Islamic NGOs that are working to eradicate poverty and provide social services in accordance with Islamic principles and values. A total of 233 international NGOs from 27 different countries have been operating in Bangladesh, according to the Dhaka Tribune (June 19, 2014). Of them, the USA-based belongs NGOs are the highest number at 70 while UK 36, Japan 19 and South Korea 11; Australia, Norway and Netherlands respectively 10; Switzerland based 9; Canada and France each 8; Sweden and Germany each 6. Of the states, there are 9 middle-eastern countries. From 34 foreign funded major Islamic NGOs 15 are very active NGO's back in year 2005 (William Gomes, 2009). They are: "Isra Islamic Foundation", "Islahul Muslimin", "Rabita Al-Alam Al-Islami", "Society of Social Reforms", "Qatar Charitable Society", "Islamic Relief Agency", "Al-Forkan Foundation", "International Relief Organization", "Kuwait Joint Relief Committee", "Al-Muntada Al-Islami", "Muslim Aid Bangladesh", "Dar Al-Khair", "Hayatul Igachha", "Tawheed-e-Noor", "Al Markajul Islami", "Al Maghrib Eye Hospital", "Islami Bank Bangladesh limited" and some other welfare and financial institutions. The most foreign Islamic NGOs took part in relief operation and other charitable activities like building shelters and houses, providing pure drinking water, establishing free treatment hospitals, improving sanitation, mother and child healthcare and establishing religious educational institutions. From them only a few like Muslim Aid UK and Islamic Relief Bangladesh played significant role in social business development through microfinance program. On the other hand how many national Islamic NGOs are working in Bangladesh is unmentioned. However,

according to AMWAB (Association of Muslim Welfare Agencies in Bangladesh), the total number of Islamic NGO-IMFIs in Bangladesh is 150 NGOs. From them only MRA (Microcredit Regulatory Authority) license holder NGO-MFIs are – 20 NGOs. Among others at least 20 NGO-IMFIs are awaiting for MRA licenses. The rest of the NGOs of AMWAB are doing other social development programs. The total member NGOs of AMWAB are 320s. The MRA license holder NGOs are: *AFAUS (Al-Falah Aam Unnyan Sangstha)*, Dinajpur Sadar Dinajpur, *RESCU (Rural Economic Support and Care for the Under Privileged)*, Alhaznagar (Dorshona More), Rangpur, *ASEAB (Association for Socio-Economic Advancement in Bangladesh)*, Ananta, Sujanagar Road Pabna, *NOBLE (Noble education and Literary Society)*, Chandanbaisha Road, Naruli, Bogra, *UJAN*, Khalishpur, Khulna, *Tamanna Foundation*, Paltan, Dhaka-1000, *DISA Bangladesh*, Barisal, *Focus Society*, Gabtali, Bogra-5820, *Association of Social Development (ASD)*, Manikganj, *ALOW-Access Toward Livelihood and Welfare Obsession*, Natore-6400, *BAIYS-Bangladesh Youth Ignite Society*, Chapainawabgonj, *Nobo Jibon*, Satkhira, *TYDA-Taltala Youth Development Association*, Bogra, *Nowabenki Gonomukhi Foundation (NGF)*, Shyamnagar, Satkhira, *Jamuna Social Foundation*, Bera, Pabna, *Isamati Samaj Unnayan Sangstha (ISUS)*, Bera, Pabna, *Bakergonj Forum*, VGF Center, Bakergonj, Barisal, *RISDA Bangladesh*, A-Block, 6-Section, Mirpur, *AMWAB (Association of Muslim Welfare Agencies in Bangladesh)*, Katabon, Dhaka

5. Social Business Development Projects of Selected Islamic NGOs of Bangladesh

In response of secular based NGOs, the number of Islamic NGOs is very few. Besides the most Foreign Islamic NGOs have been playing important role in socio-economic, cultural and political development in the country.

Some have the certain programs to assist and develop the status of Rohingya and Bihari. The Foreign Islamic NGOs have invested billion Dollars in order to execute their programs. For examples, the total investment in different programs of Al-Haramine Islamic Foundation is TK. 32 crores from 1993 to 2001 (Prospectus, 2001). Most of Foreign Islamic Foreign NGOs have not any profound program in social business development. Furthermore, their activities are not creative and productive as well as not long-term sustainable project to eradicate social problems especially poverty. Similarly, there are many local Islamic NGOs that have been contributing in Islamic sociocultural and political development. They established many *Majasid* (Mosques), *Madaris* (Islamic Educational Institutes). They also have distributing *Qurbani* meat, *Iftari* etc. Nevertheless, they ignore social business promoting programs, although they have been contributing crores and crores such as Markazul Islami's annual expenditure in Tk. 2 billion (Bangladeshi currency). (Prospectus, 2001)

In contrast, social business differs from nonprofit organizations such as NGOs, although NGOs can have the social business programs. Like with any other company, a social business is self-sufficient and does not rely on sponsorships or private or governmental funds for its survival and operation. It is also unlike a company that maximizes profits. In addition, business owners do not get any

dividends from the company's income, if any. Social Business is founded on what Yunus views as the two fundamental human motivations: selfishness and selflessness. Yunus (2013) defines a Social Business as a non-loss, non-dividend company that was founded to solve a social problem. It is financially self-sufficient, and revenues are reinvested in the company (or used to launch additional social businesses) in order to increase social impact, such as by extending the company's reach, enhancing its goods or services, or financing its social goal in other ways. Its primary purpose is to eliminate poverty or one or more issues (such as education, health, access to technology, and the environment) that harm individuals and society. Another kind of social enterprise that helps reduce poverty is microfinance. Healthcare is a potential industry for launching a social enterprise.

On the other hand, Islamic social business is a business model that is based on Islamic principles and ethics. It combines the principles of social business, which aims to address social and environmental problems through sustainable enterprises, with the values of Islam, which emphasize social justice, equality, and ethical business practices. In Islamic social business, the enterprise is structured in a way that ensures that it is socially responsible and benefits the community, while also generating income for the investors. The enterprise is expected to operate in a transparent and ethical manner, and to comply with Islamic principles such as fairness, accountability, and responsibility. (Chowdhury & Ayoungman, 2021)

According to Aydin (2015), Yunus acknowledged the value of charitable endeavors but advocated for the development of social business as a practical approach to resolving social issues, contending that "business has a greater capacity than charity to innovate, to expand, and to reach more and more people through the power of the free market." The world will be a far better place if the effectiveness, competitiveness, and dynamism of business can be used to address certain social issues (Yunus, 2009, p. 8). Instead of providing one-time assistance, he advocated channeling charity funds toward social businesses since "the money would then be recycled again and again, and the social impact could be that much more powerful" (Yunus, 2009, p. 10). In his book, "Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity's Most Pressing Needs" (2010), Yunus documented the evolution of social business from an idea to a reality accepted by large corporations, social activists, and many entrepreneurs.

On the other hand, the social business model, according to Aydin (2015), has a great chance of succeeding in an Islamic economic system because it is consistent with the Islamic worldview. In particular, certain economic axioms within Tawhidi anthropology, teleology, and axiology provide intrinsic reasons for adopting such a business strategy. Tawhidi anthropology's understanding of the multifaceted character of people lays the fundamental groundwork for a social business. The social business model has been used in the Muslim world for centuries, despite the fact that it is new to the West. *Awaf*, *Zakat*, *sadaqah*, and *qardhasan*, *mudharabah*, *musharakah*, *murabahah*, *ijarah* and some other Islamic finance instruments can be used to support social business.

From this social business perspective, there are a few national and International NGOs that they have been contributing in social business development. From them Muslim Aid UK Bangladesh Field Office, AMWAB conducted national level NGOs and TMSS are noteworthy. This study discusses how these three NGOs contributing to social business development and identifies their limitations and obstacles in promoting their program through a series of sustainable and long term programs.

6.1 Muslim Aid UK Bangladesh Field Office

Muslim Aid UK is a charitable organization that works to provide humanitarian relief and development aid to people in need around the world. One of the areas where Muslim Aid has been particularly active is in microfinance in Bangladesh. Muslim Aid UK has made significant contributions to social business development in Bangladesh through its various programs and initiatives. Some of the key contributions include:

- a. *Providing access to finance:* Muslim Aid UK has provided small loans and other financial services to entrepreneurs in rural areas of Bangladesh, which has helped them to start and grow their own businesses. This has contributed to the growth of social businesses in Bangladesh and has helped to reduce poverty in the country. (Muslim Aid UK web)
- b. *Capacity building:* Muslim Aid UK has provided training and other support services to entrepreneurs to help them build their businesses and manage their finances. This has helped to build the capacity of social businesses in Bangladesh and has contributed to their sustainability. (Muslim Aid UK web)
- c. *Empowering women:* Muslim Aid UK's microfinance programs have focused on empowering women by providing them with the tools and resources they need to become successful entrepreneurs. This has helped to promote gender equality and women's empowerment in Bangladesh. (Muslim Aid UK web)
- d. *Promoting sustainable development through Microfinance programs:* Muslim Aid UK's focus on microfinance and social business development in Bangladesh has contributed to sustainable development in the country. By promoting small-scale, locally-owned businesses, Muslim Aid UK has helped to create jobs, support local economies, and reduce poverty. In 1993, Muslim Aid launched its Micro Credit Program. It expanded operations via small and medium companies, agro-based Microfinance, and a specific Microfinance programme for the most impoverished individuals. The Microfinance (MF) initiative of Muslim Aid-UK Bangladesh Field Office (MABFO) helps reduce poverty in Bangladesh. Muslim Aid operates an MF program in accordance with Islamic shariah and without interest. Yet, the Muslim Help Micro Credit program has particular characteristics, some of which are shared with other organizations and some of which are notably unique. It included 45 upazilas and 28 districts via 47 branches. There are 213 devoted employees operating in the field. Muslim Aid UK runs a Microfinance and SME (Small and Medium Enterprise) Program in Bangladesh to help alleviate poverty and promote economic empowerment among the disadvantaged and marginalized communities. This program aims to

provide financial support to individuals and small businesses, especially women entrepreneurs, who are often excluded from the mainstream financial sector. Through its Microfinance and SME Program, Muslim Aid UK in Bangladesh has helped thousands of individuals and small businesses access financial services and promote economic empowerment. The program has also helped to create employment opportunities, reduce poverty, and promote social and economic development in the communities where it operates. Some examples of Microfinance programs of Muslim Aid UK are Hardcore Poor Programme (HPP), Agro Based Micro Credit (The FaelKhair Programme), Small and Medium Enterprise (SME), Samity and capacity building, Weekly Personal Savings and Risk Fund etc. (Muslim Aid UK web)

- e. *Providing humanitarian assistance:* Muslim Aid UK Bangladesh Field Office works to provide humanitarian assistance to people affected by natural disasters such as floods, cyclones, and earthquakes, as well as those affected by conflict and displacement. They provide emergency relief, shelter, food, and water, and other basic necessities to affected communities. (Muslim Aid UK web)
- f. *Promoting education:* Muslim Aid UK Bangladesh Field Office works towards promoting education by establishing schools, providing scholarships, and supporting students who are unable to continue their education due to financial difficulties. (Muslim Aid UK web)
- g. *Supporting healthcare:* Muslim Aid UK Bangladesh Field Office supports healthcare initiatives by establishing medical clinics, providing medical supplies, and conducting health awareness campaigns in remote and underprivileged areas of Bangladesh. (Muslim Aid UK web)
- h. *Promoting sustainable livelihoods:* Muslim Aid UK Bangladesh Field Office promotes sustainable livelihoods by supporting farmers with training and agricultural inputs, and by establishing small businesses and providing entrepreneurial skills training to individuals. (Muslim Aid UK web)

6.2 TMSS (Thengamara Mohila Sabuj Sangha)

TMSS (Thengamara Mohila Sabuj Sangha) is a non-governmental organization (NGO) in Bangladesh that has been playing a significant role in the country's development since its inception in 1980. TMSS works in various sectors such as education, health, agriculture, women's empowerment, poverty alleviation, disaster management, and environmental protection.

The following are some of the key roles played by TMSS in the development of Bangladesh:

- a. *Education:* TMSS has been working to improve the education system in Bangladesh by providing quality education to underprivileged children. It operates a large number of schools, colleges, and training centers across the country, providing education to thousands of students. It also provides scholarships to meritorious students from poor backgrounds to help them continue their education. They have established 19 educational institutions

which are focused on from Primary to Advanced Education along with 5 Technical and 8 Health educations. Furthermore, there are 31 training centers where 1200 trainees have been got facilities. They also extended their business by establishing furniture products, construction firm, automatic brick field, medium paper mill, etc. Besides, they established many social enterprise to solve the social problems such as TMSS Handicrafts, TMSS Women Market, TMSS Utpadon Food, TMSS Couriers Service, etc. (TMSS web)

- b. *Health*: TMSS is actively involved in providing healthcare services to the rural population of Bangladesh. It runs a large number of health clinics, hospitals, and mobile health units that provide basic health services, maternal and child healthcare, and other specialized medical services. TMSS also runs health awareness campaigns to promote healthy behaviors and prevent diseases. (TMSS web)
- c. *Women's empowerment*: TMSS has been working to empower women by providing them with education, vocational training, and access to credit. It operates several women's centers that provide a platform for women to voice their opinions and take part in decision-making processes. (TMSS web)
- d. *Comprehensive social business development programs*: TMSS works to alleviate poverty by providing micro-credit and other financial services to poor people. It also runs various income-generating activities such as poultry farming, fish farming, and handicraft production to help poor families earn a livelihood. TMSS Islamic Microfinance program is outstanding. In 2008, TMSS made the decision to undertake the Islamic Microfinance Program with the goal of creating social businesses on the basis of Shari'ah. The main purpose of this project is to create self-employment options for disadvantaged unemployed people and to contribute to growing the country's GDP. Its target beneficiaries and area: Legal Entrepreneurs/Business person to Shariah Regulations and entire Bangladesh at present covered 26 Union 06 Upazilla under Bogra district. Its core activities: selection of MC members (Male& Female), group formations, selection of ME member (Male & Female), savings collection (General, Special & TSS), loan disbursement to members, loan recovery from members, awareness rising of members on life skills, occupational skill development of members etc. (TMSS web)
- e. *Disaster management*: TMSS is actively involved in disaster management, especially in the areas prone to natural disasters such as floods and cyclones. It provides emergency relief services, including food, shelter, and medical assistance, to affected communities. (TMSS web)
- f. *Environmental protection*: TMSS is committed to protecting the environment and promoting sustainable development. It operates several environmental projects such as tree plantation, waste management, and conservation of natural resources. It is to be noted that the main reason of incorporating Bengali word "Sabuj" in the title of this organization is made from the view point of Green

Revolution of Village, per perpetuity of its soul and commitments for practicing the revolutionary deeds. (TMSS web)

6.3 AMWAB (*Association of Muslim Welfare Agencies in Bangladesh*)

The Association of Muslim Welfare Agencies in Bangladesh (AMWAB) is a non-governmental organization (NGO) in Bangladesh that works to promote the welfare and development of Muslims in the country. It was established in 1984 and has since implemented a number of programs and initiatives to support the socio-economic development of Muslim communities in Bangladesh. (AMWAB web)

AMWAB works in various areas of development, including education, healthcare, and economic empowerment. Some of its major initiatives include providing education and vocational training to underprivileged Muslim children and women, improving access to healthcare and sanitation in rural areas, and providing microcredit and other financial services to small entrepreneurs. (AMWAB web)

AMWAB is an apex body of grassroots NGOs and CBOs working in Bangladesh. Currently more than 320 NGOs are working with AMWAB membership. AMWAB provides capacity building supports to those member organizations. The capacity building programs and projects include Human Resource Development, Strategic Management Training, Networking, Funding, Dawah (Advocacy) activities, Seminar, Symposium, Workshop, Research & Publications, Logistic support etc. According to their claim, AMWAB is the largest Islamic microfinance apex body in the world. There is only Islamic microcredit or microfinance oriented apex body that is AMWAB. The major Islamic microfinance NGOs in Bangladesh are associated with the AMWAB. The total loan outstanding is around TK 20 billion (including IBBL and Muslim Aid UK, Bangladesh) and savings TK 10 billion (Source: AMWAB study). Though the amount is very poor in proportionate of conventional microfinance the demand of this system is paramount. If we like to consider Islamic Microfinance in Bangladesh then we have to consider the market volume and performance of AMWAB member NGO-IMFIs. It is established that AMWAB is the only Islamic Microfinance apex body in Bangladesh. It is also large in its number or Islamic NGOs and Islamic Micro-finance Institutes. It is working from 1993 in Bangladesh. The total direct beneficiaries of its member NGOs are 1 million. It's funded among 17 Islamic Microfinance Institutes (NGO-IMFIs) in 7 districts in Bangladesh. According to their report the total amount of Islamic Microfinance Outstanding are BDT 20 billion, total amount of Islamic Microfinance savings are BDT 10 billion, Total clients of Islamic Microfinance are BDT 2 million (beneficiaries), total loanee clients of Islamic Microfinance are BDT 1.5 million (loanee/borrower). The major players of Islamic Microfinance of Bangladesh are Islami Bank Bangladesh Limited, Muslim Aid UK, Bangladesh, AMWAB and its member NGO-MFIs, etc. Therefore, AMWAB has been contributing in a great extent to social business development of Bangladesh. (AMWAB web)

7. The Obstacles and Challenges of Islamic NGOs in Bangladesh

To identify the obstacles and challenges of Islamic NGOs in Bangladesh and to make suggestions for how to fix them, the present researcher conducted in-depth interview

with three high officials of Islamic NGOs as mentioned in the methodology section. In the present section, we have outlined the problems of Islamic NGOs and its solutions through analyzing the data collected from these three respondents. Accordingly, using their experiences and observations with supporting some relevant literature reviews one may claim that Islamic NGOs in Bangladesh face a number of challenges that can hinder their ability to effectively carry out their mission and objectives. Some of the key challenges include:

7.1 Fund Crisis

All respondents argued that limited funding is a common challenge faced by many non-governmental organizations (NGOs), including Islamic NGOs, in Bangladesh. Islamic NGOs are organizations that are based on Islamic principles and values and work towards the welfare of the community, particularly the underprivileged and marginalized segments of the population. There are several reasons why Islamic NGOs in Bangladesh struggle with limited funding. One of the main reasons is the limited availability of financial resources from donors and supporters. Many donors are often more interested in funding secular NGOs or non-religious causes, which makes it difficult for Islamic NGOs to secure the necessary funding.

Another reason why Islamic NGOs in Bangladesh face funding challenges is the lack of transparency and accountability in some organizations. Donors are often wary of supporting organizations that cannot demonstrate transparency and accountability in their financial management and project implementation. Furthermore, there is often a lack of awareness and understanding among the general public about the work of Islamic NGOs, which can make it challenging to mobilize resources and support for their programs and initiatives.

7.2 Terrorization of Islamic NGOs

One respondent argued that in some extents it became a fashion to terrorize Islamic institutes as well as Islamic NGOs over the world. Bangladesh is not an exception. According to his observation it is seen that some secularists attempt to defame the Islamic charity organizations without proper justification inspired by western globalization. They occasionally assert that the suspicion of Islamic NGOs funding terrorism in Bangladesh was held by the investigative agencies for a very long period of time. They believe that Islamic NGOs are funding militancy under the pretense of constructing mosques, opening madrasas and other educational facilities, hospitals, and healthcare facilities. According to William Gomes (2009), rumors that Islamic NGOs were funding militancy with foreign funds were rife throughout Bangladesh. Gomes also mentioned that the Daily Star said that suspected NGOs include Rabita Al-Alam Al-Islami, Al-Muntada Al-Islami, Society of Social Reforms, Qatar Charitable Society, Islamic Relief Agency, Al-Forkan Foundation, International Relief Organisation, Kuwait Joint Relief Committee, Muslim Aid Bangladesh, Dar Al-Khair, Hayatul Igachha, and Tawheed-e-Noor. Kumar (2009) also mentioned the terrorist organizations in Bangladesh have been financed by Al Haramain and other foreign Islamic NGOs.

The respondent claimed that this hypothetical disposition of terrorizing is not proved by the proper investigation. According to his argument, this tendency of terrorizing Islamic NGOs seriously interrupts in their contributing to the nation as well Muslim Ummah with a view to promoting their socio-economic and social business development.

7.3 Lack of Sufficient Trained and Experienced Manpower

All respondents argued that the traditional NGOs have a sufficient amount of qualified personnel in a variety of disciplines, including healthcare, education, and microfinance initiatives, among others. Since Bangladesh's independence, they have acquired knowledge of poverty alleviation techniques and are familiar with rural poverty. They enjoy positive contacts with donors and development organizations on a national and international level. On the other hand, Islamic NGOs are only active in a small number of locations and employ a small number of religiously motivated, highly trained, but inexperienced employees. Consequently, despite their desire, they are unable to expand their operations nationwide, particularly in the area of microfinance.

The lack of sufficient trained and experienced manpower is a common challenge faced by many non-governmental organizations (NGOs), including Islamic NGOs in Bangladesh. This can have a significant impact on the organization's ability to carry out their programs effectively and efficiently, and can also limit their ability to expand their operations.

There are several reasons why Islamic NGOs in Bangladesh may face challenges in recruiting and retaining trained and experienced staff. One reason is that the NGO sector in Bangladesh is highly competitive, with many NGOs vying for a limited pool of talented individuals. Additionally, many qualified professionals may be attracted to higher-paying jobs in the private sector, leaving NGOs with fewer options for staffing.

7.4 Lack of Creative and Productive Agenda

All respondent opined that the most of Islamic NGOs have been launching the programs which are not creative and productive as well as not sustainable. On the other hand some secular based NGOs have contributing tremendously in creating social business and social entrepreneurship development such as Grameen Bank, Brak and Asha etc. Most of Islamic NGOs only provides charity towards poor people like Qurbani meat, Iftari, etc. Similarly they establish Mosques, Madrasahs what could not contribute to social business and social entrepreneurship development.

The lack of a creative and productive agenda can indeed be a significant challenge for Islamic NGOs in Bangladesh. Without a clear and innovative strategy for achieving their goals, these organizations may struggle to stand out and make a real impact in their communities. Some of the key issues that can arise due to a lack of a productive agenda include:

- a. Lack of direction: Islamic NGOs without a clear and actionable agenda may struggle to establish priorities and make effective decisions about how to

allocate their resources. This can result in a lack of direction and a sense of disorganization within the organization.

- b. Inability to adapt to changing circumstances: Without a creative and productive agenda, Islamic NGOs may also struggle to adapt to changing circumstances and address emerging challenges. This can limit their ability to remain relevant and responsive to the needs of their community.
- c. Difficulty in attracting funding and support: Islamic NGOs that lack a clear and compelling agenda may also find it difficult to attract funding and support from donors and other stakeholders. This is because donors and supporters want to invest in organizations that have a clear vision and a track record of achieving results.

7.5 Lack of Collaboration

All respondents argued that in some cases, Islamic NGOs in Bangladesh may struggle to work together and collaborate effectively. This can result in duplication of efforts and a lack of coordinated action, which can limit their impact and effectiveness.

7.6 Limited Outreach

One respondent argued that the Islamic NGOs in Bangladesh may also struggle to reach and engage with the communities they serve. This may be due to a lack of resources, a lack of understanding of the needs and concerns of the community, or cultural barriers that make it difficult to establish trust and build relationships.

8. Conclusion

As a complete way of life, Islam promoted Muslims to manage all spheres of human life effectively and professionally according to the teachings of the Qur'an and *Sunnah*. A part of this idea, there are so many Islamic NGOs have been contributing in Bangladesh to socio-economic and religio-cultural development though they are facing many challenges and obstacles in the way of promoting their agenda. In this regard it noteworthy that most of foreign and local Islamic NGOs have not any profound program in social business and social entrepreneurship development. Furthermore, in some cases their activities are not creative and productive as well as not long term sustainable project to eradicate social problems such as problems of poverty, environment, education and health etc. They established many *Masajid* (Mosques), *Madaris* (Islamic Educational Institutes). They also have distributing *Qurbani* meat, *Iftari* etc. Nevertheless, they ignore social business promoting programs. However, Muslim Aid, AMWAB, TMSS current programs especially microfinance and vocational training programs are playing an important role in social business and social entrepreneurship development in the country. In order to run Islamic NGOs smoothly and for their more sustainable development in Bangladesh, the following suggestions are recommended by the respondents.

1. To address the limited funding challenges, Islamic NGOs in Bangladesh can take several steps, including: (a) developing effective fundraising strategies to diversify their funding sources and reach out to potential donors and supporters.

- (b) improving transparency and accountability in their financial management and project implementation to build trust among donors and supporters. (c) strengthening their outreach and communication efforts to raise awareness about their work and the impact it has on the community. And (d) collaborating with other organizations and networks to leverage resources and increase their reach and impact. Overall, while limited funding is a significant challenge for Islamic NGOs in Bangladesh, there are steps that can be taken to address this challenge and ensure that these organizations can continue to serve the community effectively.
2. Islamic movements should establish models for promoting Islamic NGOs through applying a non-violent and tolerant attitude towards society. Also, the systems should creatively and dynamically engage and negotiate with sustainable traditional NGOs in the respective societies. Islamic NGOs avoid uncreative and unproductive agenda like distributing *Iftar*, *Qurbani* meat etc. what do not play role in social business and social entrepreneurship development.
 3. It is important for the government and other stakeholders to recognize the important role that Islamic NGOs can play in addressing social issues and to create an environment that is supportive of their activities.
 4. The state also should make laws in favor of Islamic NGOs as well as Islamic banking and financial institutions. The government should adopt necessary steps to eradicate the problems related to Islamic NGOs with a view to create ample opportunities in socio-economic development of Bangladesh.
 5. The lack of sufficient trained and experienced manpower is a common challenge faced by many non-governmental organizations (NGOs), including Islamic NGOs in Bangladesh. To address this issue, Islamic NGOs in Bangladesh may need to take steps to improve their recruitment and retention strategies. This could include offering more competitive salaries and benefits, providing training and professional development opportunities, and creating a positive work environment that values and supports its staff. Another potential solution is for Islamic NGOs in Bangladesh to partner with universities and other educational institutions to develop programs that train individuals specifically for NGO work. By investing in the development of a skilled and dedicated workforce, Islamic NGOs in Bangladesh can improve their capacity to carry out their important work and make a positive impact in their communities.
 6. To address the challenge “lack of creative and productive agenda”, Islamic NGOs in Bangladesh need to develop clear, innovative, and actionable agendas that are tailored to the needs and priorities of the communities they serve. This can involve engaging with community members to understand their needs and concerns, conducting research to identify areas of greatest need, and collaborating with other organizations to leverage resources and expertise. Additionally, these organizations should prioritize capacity-building activities

- that help to develop the skills and capabilities needed to effectively implement their agenda and achieve their goals.
7. The positive campaign and demand targeting the government should be undertaken simultaneously from the officials of Islamic NGOs with a view to reduce the distance between the government and Islamic NGOs.
 8. Islamic NGOs should be in the form of introducing further but robust social justice oriented principles as in the example of social enterprise and social business. *Masjid* may also be adopted as the center for Islamic culture and social business.
 9. The motivational programs (seminar, symposium, conference, *wa'z-mahfil* and view exchange program etc.) should be arranged both in the public and private sectors with the donors in order to enlighten them about the proper Islamic understanding and faith in Islamic finance and Islamic NGO.
 10. The limitations of traditional microfinance, such as the imposition of high fixed interest rates, the problem of funds being used for purposes other than intended, limited access to credit, and non-compliance with Islamic principles, highlight the need for the development of Islamic Microfinance. This presents an opportunity for Islamic non-governmental organizations (NGOs) to expand their services and address the financial needs of disadvantaged individuals using Islamic microfinance approaches.

References

- Association of Mass Welfare Agencies in Bangladesh (AMWAB), (2023, January 20). *Home Page*. <https://www.Amwab.org>. Retrieved January 2, 2023, from <https://www.amwab.org>
- Aydin, N. (2015). Islamic social business for sustainable development and subjective wellbeing. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(4). <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMEFM-09-2014-0097/full/html>
- Chowdhury, N.H., Ayoungman, F.Z. & Tanchangya, P. (2021), Islamic social business: Choice for a Muslim Entrepreneurial career, *Revista Argentina de Clínica Psicológica* 30 (1), 919-927, <https://www.revistaclinicapsicologica.com/data-cms/articles/20210302021111pmSSCI-560.pdf>
- Clarke, G., & Jennings, M. (2008). *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular* (pp. 1-16). Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1057/9780230371262>
- Clarke, G., & Jennings, M. (2008). *Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular* (pp. 17-45). Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1057/9780230371262>
- Gomes, W. (2009, March 30). *Islamic NGOs – a shadow government in Bangladesh*. [Http://Bangladeshwatchdog.Blogspot.com](http://Bangladeshwatchdog.Blogspot.com). Retrieved February 2, 2023, from <http://bangladeshwatchdog.blogspot.com/2009/03/islamic-ngos-shadow-government-in.html>

- Kumar, A. (2009). Terror Financing in Bangladesh. *Strategic Analysis*, 33(6), 903-917.
- Hassan, A., & Forhad, A. (2013). THE ROLE OF NGOs IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BANGLADESH. *Present Environment & Sustainable Development*, 7(2).
<https://www.pesd.ro/articole/nr.7/PESDVOL7NR22013/06TRONGOSITSDIB171020135972.pdf>
- Islam, M. S. (2011). 'Minority Islam'in Muslim majority Bangladesh: The violent road to a new brand of secularism. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 31(1), 125-141.
- Islam, M. S. & Ali, M. Y (2010). Islamic NGOs in Bangladesh: Management and Functions. *International Conference on Da'wah and Islamic Management: Practices and Prospects*.
https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Islam-80/publication/344321109_Title_Islamic_NGOs_in_Bangladesh_Management_and_Functions/links/5f676f8792851c14bc899c0b/Title-Islamic-NGOs-in-Bangladesh-Management-and-Functions.pdf
- Muslim Aid UK Bangladesh (n.d.). *Home Page*. Wwww.Muslimaid.org.bd. Retrieved February 2, 2023, from <http://www.muslimaid.org.bd/>
- NGO Affairs Bureau (n.d.). *Home Page*. <http://www.Ngoab.gov.bd>. Retrieved February 2, 2023, from <http://www.ngoab.gov.bd>
- Prospectus. Rabeta Alame Islami.(2001).Dhanmondi., Dhaka
- Rafi, M., & Chowdhury, A. R. (2000). Human rights and religious backlash: The experience of a Bangladeshi NGO. *Development in Practice*, 10(1), 19-30.
- Salehin, M.M. (2011). Religion, gender relations and Islamic NGOs in rural Bangladesh. In *Australian Sociological Association (TASA) Annual Conference 2011 Proceedings: Local lives/global networks*.
- Salehin, M.M. (2016). *Islamic NGOs in Bangladesh: Development, Piety and Neoliberal governmentality* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315730356>
- Shaikh, E. H. (2014, June 18). 233 foreign NGOs working in Bangladesh. Wwww.Dhakatribune.com. Retrieved February 2, 2023, from <http://bangladeshwatchdog.blogspot.com/2009/03/islamic-ngos-shadow-government-in.html>
- TMSS (n.d.). *Home Page*. <https://Tmss-Bd.org/>. Retrieved February 2, 2023, from <https://tmss-bd.org/>
- Yunus, M., & Weber, K. (2013). *Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity's Most Pressing Needs*. Third Impression, The University Press Limited, Bangladesh
- Zohir, S. (2004). NGO Sector in Bangladesh: An Overview. *Economic and Political Weekly*, 39(36), 4109–4113. <http://www.jstor.org/stable/4415513>

Past and Present of Acquisition Laws in Bangladesh: Finding the Equity and Efficacy Consideration in Determining Compensation and Land Valuation Approaches

Nasrin Akter*

Abstract

The majority of Bangladesh's previous legislation on land acquisition, including the present one, did not effectively safeguard affected parties on several issues including compensation and land valuation approaches. This article examines existing legislation to see to what extent both the past and present acquisition legislation ensured equity and efficacy consideration in determining compensation and land valuation approaches in Bangladesh. In doing so, the article compares the contents of both past and present land acquisition law of Bangladesh and finally, it makes some suggestions for legal reform.

Keywords: Land Acquisition of Bangladesh, Compensation, Land Valuation, Equity and Efficacy, International Standards

1. Introduction

Land is an important basic asset for humankind. When the government takes private property for use in a public project, it is said to have "acquired" the property and the former owner is usually given monetary compensation in return. Bangladesh's land acquisition statutes, inherited from colonial times, were clearly biased against landowners and other land-dependent people. As a developing nation, Bangladesh focusing heavily on the infrastructure development including airports, transportation, irrigation systems, hydropower, and public town planning projects. However, enormous plots of land are needed for such endeavors. In light of this, the first step in the process of developing public infrastructure is to acquire land. Land valuation, compensation, violation of rights, loss of ownership, and livelihood of impacted individuals are all intertwined concerns during land purchase, as noted by Ghimire, Subash et al. (2017) (Ghimire, Subash et al. 169). The relocation of people from their homes, the relocation of businesses from their communities, and the relocation of farmers from their fields are all common unintended consequences of infrastructure development projects. The correct valuation of property and reimbursement for lost assets are therefore crucial in reducing land disputes with impacted peoples (Ghimire, Subash et al. 170).

Indicators of good land acquisition governance include an expedient and transparent procedure for acquiring land, land valuation and providing adequate compensation to everyone whose lives and livelihoods would be altered by such acquisition. Poorly

* Assistant Professor, Department of Land Management and Law, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

executed involuntary land acquisition may leave individuals without shelter or land, unable to provide for themselves, cut off from social networks and feeling like they've been victimized. Furthermore, insufficient compensation might encourage fast industrialization, causing social, political and economic repercussions. On the other hand, if land acquisition is carried out in a satisfactory manner, they will leave communities and individuals in conditions that are substantially equal to what they were in before while simultaneously delivering the advantages that were intended for society.

Objectives of the Study

The main objective of this paper is to evaluate how the present and former land acquisition laws of Bangladesh ensured that the equity and efficacy factors were taken into consideration when deciding compensation and land valuation while acquiring land, with the hope of drawing lessons that may be adopted into the future land acquisition laws and helping to prevent all of the adverse impact that arise as a result of such.

Data Collection and Methodology of the Study

The study is a doctrinal legal research. To be more specific, a comparative qualitative research approach has been followed to uncover potential inadequacies in both current and former land acquisition legislations, as well as areas where they deviate from international standards on compensation and land valuation provisions. The research is based on the content analysis of the current and prior land acquisition legislations, available international standards, scholarly writings (books, articles annual reports). Furthermore, in order to determine the implications of the compensation and land valuation in the actual world, site visitation and semi-structured interviews with a small group of impacted parties including 16 participants (all are major) were carried out. The participants were landowners whose properties had been taken over by the government. The following set of questions was posed to participants so that it could be determined whether or not they had been provided with adequate compensation and whether or not their land had been properly valued:

- a. What kind of losses have you incurred as a result of the land acquisition?
- b. Is the compensation money you received from the government sufficient to compensate you for all of the losses you have suffered?
- c. What losses have you received compensated for and what losses have you not received compensation for?
- d. Is the land valuation done by the government accurate and reasonable?
- e. What are the other difficulties you have encountered while finally receiving compensation and land valuation, or while going through the land acquisition process?

Scope and Limitation of the Study

The lack of adequate legal protection for land acquisition has caused a lot of problems that need more research. However, this study only looked at the Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance 1982 (hereafter, ARIPO 1982), the Acquisition and Requisition of Immovable Property Act 2017 (hereafter, ARIPA 2017) (excluding the issue of requisition under these laws) and how they deal with compensation and the valuation of land.

Importance of the Study

In the year 2020, the government began working on a new land legislation that would be implemented across the nation. It is anticipated that the consolidated Land Act would resolve the many current legal challenges pertaining to land. Land Acquisition is a significant component of land law; thus, it requires a more in-depth investigation, alongside its predecessor, in order to garner valuable insights that may be used when designing the land acquisition provisions of the new land act. This research aims to give insight on the legislative requirements governing compensation and land valuation.

Layout of the Study

Following the introduction part, the next section provides a description of the historical context of the land acquisition policy as well as the existing legal regime of land acquisition in this territory. The third portion went into discuss about the equity and efficacy consideration in determining compensation and land valuation. The fourth section explores the international standards as well as areas where domestic provisions fall short. A summary of the findings from interviews with affected individuals whose land has been acquired is included in section five. The sixth section contains suggestions and concluding remarks.

Land Acquisition Laws in Bangladesh: Past and Present

For this jurisdiction, article 42 of the Constitution grants the government the authority to wield eminent domain power, therefore permitting the compulsory acquisition, nationalization, or requisition of privately owned property. The constitutional provision also includes enacting legislation for acquisition, nationalization, or requisition with compensation and fixing the amount or specifying the principles and method of compensation assessment and payment. On the other hand, the constitutional clause stipulated that such a legislation could not be challenged in any court on the grounds that any provision of the law with relation to such compensation was inadequate. The state ultimately has the last say on what constitutes adequate and equitable compensation (Shamim par. 3). In this territory, the legislation that governs the acquisition of land has a historical basis. The first piece of legislation that dealt with the acquisition of land was enacted in 1824, then 1870, the Land Acquisition Act (Atahar 308). In 1885, the Land Acquisition Act was amended to cover mines. In 1894, a more inclusive land acquisition act was enacted (Atahar 308). The legislations that have been enacted to regulate the acquisition of land in Bangladesh are laid forth in chronological order in fig. 1 below.

Year of Enactment	Legislations
1824	Bengal Regulation I
1850	Act I
1870	Act X
1894	Land Acquisition Act I
1917	Executive Instruction of Bengal Government
1947	Executive Instruction (Bengal Ordinance No. 5)
1947	East Bengal Emergency Requisition of Property Ordinance, promulgated on July 14 for a short period
1948	(Emergency) Requisition of Property Act (Act XIII of 1948)
1948	Cantonments (Requisitioning of Immovable Property) Ordinance
1950	Acquisition of Waste Land Act, (East Bengal Act XIX of 1950)
1953	Town Improvement Act
1958	Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation
1959	Hats and Bazaars (Establishment and Acquisition) Ordinance
1956	Rehabilitation Act
1982	Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, (Ordinance II of 1982); Act I of 1894 repealed, and Act XIII of 1948 rescinded
1982	Acquisition of Immovable Property Rules (1982)
1982	Requisition of Immovable Property Rules (1982)
1987	Requisition of Movable Property Ordinance
1989	Acquisition of Property on Emergency Basis Act (Act IX of 1989) (Promulgated for a temporary period of five years)
1994	Acquisition and Requisition of Immovable Property Act
1995	Jamuna Multipurpose Bridge Project (Land Acquisition) Act
2007	Padma Multipurpose Bridge Project (Land Acquisition) Act
2011	Dhaka Elevated Expressway Project (Land Acquisition) Act (Act No 11 of 2011)
2016	Payra Port Project (Land Acquisition) Act (Act No. 06 of 2016)
2017	The Acquisition and requisition of Immovable Property Act (Act No 21 of 2017)
2018	Chittagong Development Authority Act (Act No 31 of 2018)
2018	Khulna Development Authority Act (Act No 32 of 2018)

Fig. 1. Land Acquisition Legislation and Policy Timeline (From 1824 to Present). The author made the list of laws after studying the relevant laws from the year 1824 to present.

The most up-to-date land acquisition law is the Acquisition and Requisition of Immovable Property Act (ARIPA 2017), which replaced the earlier Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance (Ordinance II of 1982) (ARIPO 1982). The current statute authorizes both the permanent and temporary acquisition of immovable property for any public purpose or in the interest of the public just like the previous one. However, neither the term "public purpose" nor the scope of

"public purpose" were specified in both legislations. According to the 2017 Act's definition of the word "acquisition," this refers to "acquiring ownership and possession of any immovable property for any requiring person or organization in exchange for compensation or rehabilitation, or both" (ARIPA s 2.1). In addition, the legislation includes provisions for preliminary notice (section 4), objections against acquisition (section 5), final decision about acquisition (section 6), notification to people interested (section 7), award of compensation (section 8), matters to be considered and not to be considered in calculating compensation (sections 9 & 10), payment of compensation (section 11), payment of compensation to bargadar (section 12), acquisition and possession (section 13), and abatement or revocation of acquisition procedures (section 14), use of acquired property (s. 19), arbitration and arbitration appellate tribunal (s. 29-37).

Equity and Efficacy Consideration in determining Compensation and Land Valuation: Comparison of Current and Previous Land Acquisition Laws

Both the current land acquisition legislation in Bangladesh (ARIPA 2017) and the previous land acquisition legislation in Bangladesh (ARIPO 1982) only give the acquiring authority the power to acquire land for a public purpose. However, these pieces of legislation do not ensure that the acquisition of land is carried out in a manner that respects the rights of the parties who are affected by it. A significant portion of the blame can be placed on the provisions of these legislations. The ARIPO 1982 did not adequately protect the rights of impacted parties, particularly in the areas of compensation, land valuation and so on. As a result, it was expected that the act that was subsequently passed in 2017 would be a much more pro-people statute that would guarantee the rights of those who were impacted and solve the considerable challenges involved with land acquisition in accordance with international norms. Having said that, the truth is that it is rather disappointing. When contrasting the provisions of the old legislation with those of the new law, there is not much of a difference to be seen. Instead of a significant legal development, what has occurred is better defined as the re-enactment of old laws under the cover of new ones (Zaman par. 3). A comparison of the ARIPA 2017 and ARIPO 1982 is shown in Table 1 below, which details compensation, land valuation provisions in addition to other aspects of the two laws.

Table 1 Comparison between ARIPA 2017 and ARIPO 1982

Issues	ARIPO 1982	ARIPA 2017
1. Method of acquiring land	Only one mechanism of acquiring land is being followed in Bangladesh, namely the acquisition and requisition and made no other alternative accessible.	Same as ARIPO 1982
2. Compulsory acquisition basis	Any property can be acquired if it is or is likely to be needed for any public purpose or public interest. There is no clear definition of "public purpose or public interest" in the ARIPO 1982, nor is there a	Same as ARIPO 1982

Issues	ARIPO 1982	ARIPO 2017
	mechanism specified for deciding whether or not a particular purpose of acquisition is in the "public purpose or public interest."	
3. Affected Persons	Only protects landowners and provides for the compensation to be paid to bargadar for standing crops. No compensation is provided for any affected person without titles or ownership records.	Same as ARIPO 1982
4. Right to Participate in the Acquisition Process	The right of the affected persons to participate in the acquisition process or take into account their views during the process were not guaranteed.	Same as ARIPO 1982
5. Advice and Assistance	No provision in law ensuring aid, specially to the poor, women, or young people to engage effectively in the process or to provide them with the appropriate opportunities, advice, assistance.	Same as ARIPO 1982
6. Land Valuation	The market value of the property at the date of publication of notice, based on the average value of nearby properties of comparable description and characteristics during the twelve months before the publication of notice.	Same as ARIPO 1982
7. Valuation Standards and Authority	The valuation and valuation processes do not adhere to any recognized valuation standards. According to Acquisition Instructions, valuation is entrusted to a number of government departments, for example, • Residential property valuation was carried out in consultation with the Department of Public Works. • Valuation of trees by the Forest Department; valuation of standing crops by the Department of Agricultural Extension	Same as ARIPO 1982
8. Inaccuracy of the valuation	The law does not have a provision to consider the inaccuracy of the valuation when calculating	Same as ARIPO 1982

Issues	ARIPO 1982	ARIPA 2017
	compensation, so that the expropriator bears the risk of inaccuracy.	
9. Compensation	In addition to the market value of the property, in every instances payment equal to 50% on market value in consideration of the involuntary nature of the acquisition	If the government acquires land, the affected persons are compensated at 200% of the market price. However, the compensation will be 300% if the government acquires land for non-governmental person or organization. In the event of damage, severance of property, lost income or damage to other property, relocation of homes or sites of business, further compensation of 100 per cent will be provided.
10. Compensation for uncertain losses which cannot be assessed during acquisition process	Matters that are considered for compensation are fixed. There is no provision in the law for compensation for unlikely or unpredictable losses or damages.	Same as ARIPO 1982
11. Tax Neutrality	The persons who are affected by land acquisition are not within the ambit of the tax exemption.	Same as ARIPO 1982
12. Profit Sharing Principles	There is no provision in the law regarding profit sharing. In fact, the requiring person or organization has no higher responsibility than making payments on time.	Same as ARIPO 1982
13. Restitution of Acquired Property	If the purpose of land acquisition is cancelled, abandoned, rights are lost due to the expiration of a time limit, the law left no scope for restitution. Property may only be returned if it was requisitioned.	Same as ARIPO 1982

Issues	ARIPO 1982	ARIPA 2017
14. Requirement of professional and technical competence	Not impose any professional requirements on the individuals in charge of carrying out the acquisition process.	Same as ARIPO 1982
15. Code of Conduct	No code of conduct was prescribed.	As of yet, no code of conduct has been developed as well under ARIPA 2017.

Source: The author prepared the aforementioned table after comparing ARIPO 1982 and ARIPA 2017

The language settings of the prior legislation and the law that is currently in effect are generally identical to one another, with the exception of the clauses dealing with compensation. Under ARIPA, the compensation was increased to be equal to 200 percent of the property's market value, whereas under ARIPO, the compensation was only equal to 50 percent of the property's market value. To a similar extent, these two pieces of legislation clarified the criteria for determining compensation (shown in fig. 3 below)

List of Factors Considered in Determining Compensation	List of Factors not Considered in Determining Compensation
a. The property's market value at the time of the publication of preliminary notice (PN) of acquisition.	a. The degree of urgency prompting the acquisition.
b. Damage suffered because of the removal of any trees or standing crops.	b. Any reluctance of the interested person to part with the acquired property.
c. Damage sustained due to the property being separated from other property.	c. Any injury suffered if inflicted by a private individual, which would not make that person responsible to a lawsuit.
d. Loss suffered as a result of the acquisition adversely impacting other moveable or immovable property, or earnings.	d. Any expected harm to the property caused by or because of the use to which it would be placed after the publication of PN.
e. The reasonable expenditures and incidental expenditures if the person interested is forced to relocate his place of business or residence.	e. Any increase to the value of the property after the PN to persons interested.
	f. Any change, improvement, or dispose of the property made or executed after the publication of the PN without the permission of the DC.

Fig. 3. Factors Considered in Determining Compensation.

People whose financial situations have been negatively impacted as a direct result of the land acquisition ought to be compensated, but neither of the legislation took into consideration this issue. In spite of the fact that they do not legally possess any rights to the land, there are a number of people whose means of subsistence and their dwellings are intrinsically linked to the land. Even though the compensation was enhanced under the new law, the fixed greater compensation might not be helpful to everyone because different people lose different things associated to land, such as the real property, the feelings surrounding the land, the environment that surrounds the land, and so on. Land undervaluing exacerbates the misery as well. Most of the time, affected individuals do not obtain the appropriate value for their land because there is no dedicated institution that is responsible for solely looking after the land valuation procedures. Because there is no digital record of the updated value of the property on the market, it is difficult for those who are affected to verify whether or not the valuation of their land is accurate. Because these problems have not been resolved, the legislation that has been passed in the past and that is being enforceable today have not been successful in ensuring equity and efficiency in determining compensation and land valuation.

International Standards on Land Acquisition Compensation and Land Valuation

Land acquisition norms have not been the subject of an international legal instrument to date. In spite of this, the issue of land acquisition and resettlement are covered by a number of international standards. These include the World Bank Involuntary Resettlement Policy, the EBRD Performance Requirement 5 Land Acquisition, Involuntary Resettlement, the IFC Performance Standard 5 Land Acquisition and Involuntary Resettlement and Economic Displacement, Asian Development Bank, and Inter American Development Bank standards, excluding any legally binding international agreements or treaties in this subject. In this regard, the publication "Compulsory Purchase and Compensation, Recommendation for Good Practice" published by the International Federation of Surveyors (Commonly known as FIG) contains useful and informative guidelines for the proper structure of a land acquisition law. The framework of recommendations on compulsory purchase as well as compensation is laid forth by the FIG in the form of five parts: general principles (r 1-8), compulsory purchase basis (r 9-13), proceeding of demarcation and registration (r 14-18), proceeding for determining compensations (r 19-36) and lastly, restitution (r 37). In terms of compensation and the valuation of land, the FIG recommendations include detailed standards that are suitable for assessing compensation and land valuation, and these provisions are presented below (see fig. 4).

Compensation	a. Compensation should not impair the afflicted party's finances. Equity and equivalence should guide compensation to compensate them for their losses (r 19). b. Just compensation and compensation for any losses that naturally and fairly result from acquisition and development are guaranteed by law (r 22). c. Compensation must be determined such that the affected party's finances are not harmed by taxes. (r 24) d. If losses are uncertain, improbable, or cannot be determined at the time of the proceedings, they may be compensated if materialized later. (r 25) e. The impact of the project or compulsory acquisition is included into the evaluation of the value of the object (r 26). f. Profit-sharing principles should be set by law and enforced by the competent authorities, particularly in the case of compulsory acquisition for a non-public institution (r 27). g. Those whose economic standing is negatively impacted by the compulsory purchase should get compensation. (r 31). h. Payment of compensation is to be made in a one-time, final payment (r 34). i. From the date of valuation or the date of possession, whichever is earlier, until the date of complete payment, interest must be paid on all outstanding compensation. (r 35). j. Compensations should be paid in due time (r 36).
Land Valuation	a. Compensation for the object should be determined based on its market value, or its fair value if market value cannot be determined (r 28). b. International Valuation Standards (IVS) or other recognized valuation standards must be used for the valuation process and valuations (r 29). c. Inaccuracy of the value must be considered in calculating compensation, with the expropriator bearing the risk of inaccuracy (r 30).

Fig. 4. Highlights of FIG Recommendations on Compensation and Land Valuation. International Federation of Surveyors (FIG), "Compulsory Purchase and Compensation, Recommendation for Good Practice" (2010) Copenhagen, Denmark <https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub54/figpub54.pdf>

Note: The author summarized the FIG recommendations on compensation and land valuation, which are shown in the figure above.

Equity and Efficacy Consideration: The Reality

In light of the deficiency of adequate national legal protection with regard to compensation and land valuation, as well as the context of international standards, the author conducted interviews with those who had been adversely affected in order to get a sense of what the situation is like in Bangladesh. During the course of the research, the author went to a location that had been acquired by the government and conducted interviews with persons whose lives had been impacted as a result of this land acquisition. Those who participated in the interview were locals of the village of Charsahapur, Ishwardi. The government had acquired their land in order to make

room for new fire stations. A semi-structured interview was conducted with each of the participants, both male and female. However, the number of female participants is significantly lower because women are less likely to discuss openly.

During the course of the interview, respondents were questioned on a variety of issues, including compensation, land valuation, obstacles encountered during the land acquisition process. The findings of the interview unearthed shocking details, which demonstrate that the legislation governing the acquisition of land is not being implemented effectively. The participants were unanimous in their assertion that the land valuation was inaccurate. They might have gotten a better price for their land if they had sold it to another party. There are some people, who are dubious about whether or not the government is paying them the adequate amount for the property. They were in a position socially that prevented them from having access to any means of verification. According to their opinion, the government did not pay the proper amount of compensation that it should have. They do not have enough money to purchase a new house property at this time. There have been multiple individuals, who have reported that they have not received any compensation for their land, homes, gardens, or trees. As a direct consequence of this, they are enduring a challenging life. They did not get compensation, and consequently, their remaining goods are not stored in a secure location because they were unable to find a safe place to reside. The results of the interview are outlined in Table 2 below.

Table 2 Summary of the Findings of the Interview

Actual losses suffered due to land acquisition	• Loss of ancestral property • Loss of fruit tree and open air environment, loss of pathway • Became homeless as a result of not being able to purchase adequate land with the compensation money • The absence of their children's former playmates • Loss of their kinship with relatives • Lost their previous job as a farmer • Mill workers lost their jobs • The severing of social bonds
Losses for which compensation is received	• Land • Houses • Trees
Land valuation accuracy and reasonableness	• Incorrect valuation • A decrease in the house property's estimated market value
Whether the compensation is enough compared to the losses	• Compensation not adequate
Difficulties encountered during receiving compensation, land value, and overall acquisition process	• Physical and emotional Pressure • Loss of Agricultural Activity and Production • The demise of sources of food for

	domesticated animals
•	Losing local entertainment like boatman tunes
•	The rudeness or attitude of land officials when receiving the cheque
•	Delay in issuing the cheque for payment
•	A holdup in obtaining the signature of the local government, ex. Chairman
•	Misbehavior of local government
•	Compelled to pay a bribe in order to receive compensatory money

The legislative provisions were not sufficient to guarantee equity and efficacy in the process of assessing compensation and the value of the land. As a result of the challenges outlined above, the lives of those affected by land acquisition were made more difficult.

Conclusion and Suggestions

Without a doubt, the preexisting rules needed to be revised to restore a sense of fairness between the state's power to acquire private property for public purpose and the responsibility of compensating all affected individuals for their losses and assuring accurate land valuation. Many countries have revised their land valuation systems to guarantee that properties are valued accurately in the event of land acquisition by the government. In the context of Bangladesh, there is a need for a specialized valuation agency in order to ascertain the monetary worth of property. In light of this, the author proposes a number of reforms to the provisions in the legislation that deal with land valuation and compensation, which are as follows:

- I. Unlike section 9 of the ARIPA 2017, which states that only certain losses are compensable, compensation provisions shall take into account all of the damages that the affected parties have suffered. The legislation governing the acquisition of land needs to account for all possible forms of damage arising out of land acquisition.
- II. In determining compensation, certain concepts, such as profit-sharing and tax neutrality, should be included to guarantee that the position of the affected party is not worsened by additional financial burdens.
- III. Although the ARIPA 2017 specifies market value as the exclusive method by which land value is calculated, other means, such as fair value, should also be specified.
- IV. The process of land valuation need to be open and public, with the information being made available to those who are directly impacted, and it ought to be governed regulated by the effective agency. The International Valuation Standards Committee (IVSC), the European Group of Valuers'Associations, and the Appraisers Association of Turkey are among the most prominent of specialized organizations on land valuation. In addition to promoting

information interchange, Bangladesh should create a professional body to develop and conform with international valuation standards to assure the reliability and transparency of the land valuation process in the country.

Works cited

- Atahar, Syed Al. "Development Project, Land Acquisition and Resettlement in Bangladesh; A Quest for Well Formulated National Resettlement and Rehabilitation Policy." *International Journal of Humanities and Social Science* vol. 3, No. 7, April 2013.
- Shamim, Shakhawat Hossain. "Right to land: Is a fundamental right!." *The Daily Star*, 4 Mar 2014, <https://www.thedailystar.net/right-to-land-is-a-fundamental-right-13906>
- Subash Ghimire, Arbind Tuladhar, Sagar Raj Sharma. "Governance in Land Acquisition and Compensation for Infrastructure Development". *American Journal of Civil Engineering* Vol. 5, No. 3, 2017, pp. 169-178. doi: 10.11648/j.ajce.20170503.17 https://www.researchgate.net/publication/320424520_Governance_in_Land_Acquisition_and_Compensation_for_Infrastructure_Development
- The International Federation of Surveyors (FIG). "*Compulsory Purchase and Compensation Recommendations for Good Practice*." FIG: 2010.
- Zaman, Mohammad. "Land acquisition & resettlement: Ending double standards." *The Financial Express*, 15 November 2017, <https://thefinancialexpress.com.bd/views/land-acquisition-resettlement-ending-double-standards-1510753443>

Enactments

- Acquisition and Requisition of Immovable Property Act 2017.
- Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance 1982.
- Acquisition Instructions, Rule 29 (2a), pp. 260.
- The Constitution of the People's Republic of Bangladesh 1972.

Date of Submission : 22.02.2023

Date of Acceptance : 15.06.2023

The Transformation in Rural Power Structure and Justice (*Shalish*) Delivery System: A Study of Two Villages in Bangladesh

Nurunnahar Mazumder*

Azmira Sultana**

Mohammed Moniruzzaman Khan***

Abstract

Transformation of rural power structure refers to the changes of existing dynamics and mechanisms of the power system including factors that matter for rural power structure, leadership, justice system, politics, etc. The changes of rural power structure in contemporary rural areas happens with infrastructural development, technological advancement, expansion of education, women empowerment etc. Broadly this paper analyzes the traditional mechanisms and recent changes in rural power structure. Specifically this paper focuses on how the local leadership (*matabbar*) and justice system (*shalish*) function in the rural area. In other way, this paper analyzes the mechanisms and dynamics of rural power structure, leadership, politics and justice system and changes in it. To explore both broad and specific objectives, a methodological triangulation i.e. mix of both quantitative and qualitative method have been used in this study, where a total of 120 respondents were interviewed face to face with a semi-structured questionnaire for collecting quantitative data and ten key informants interview (KII) were conducted for qualitative data. The findings of the study show that the traditional rural power structure, rural leadership, justice system (arbitration and village court) are getting changed due to easy accessibility and availability to information and communication technology of the rural people which makes them updated about the outer world. It shows that rural power structure, rural leadership, village justice system are not only confined to lineage and land ownership rather education, political power, and party affiliation matters in contemporary rural society.

Keywords: Bangladesh, rural, power structure, justice system, village court

1. Introduction

Power structure both institutional and non-institutional is a key aspect of rural studies in Bangladesh. Institutional power is directly related with administration and government which introduced power as structural. And the non-institutional power is not directly related with administration of the state. In nature, rural power structure belongs within these both formations (Habib & Mijan, 2016). In rural Bangladesh access to and control over land determines access to and control over rural power structure and justices system and landownership in regard to this is the most important power source in the rural areas (Jahangir, 1982). In rural Bangladesh social status depends on economic power and consolidation of economic power

* Associate Professor, Department of Law, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

** Lecturer, Department of Sociology and Anthropology, Green University, Dhaka, Bangladesh

*** Associate Professor, IDMSV, University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh

legitimizes the social status overtime. Families which have high status are the biggest landowners and land ownership is a basis of respect, so of power (Jahangir, 1982). Khan (2003) argued that control over land greatly controls the rural power structure. Power, is considered as a crucial force of interpersonal relationships and person's power vary on situation that person can be influential in one situation at the same time not in another (Goodyear-Smith & Buetow, 2001). Power is conventionally considered as being possessed by individuals, groups or classes which is neither negative nor constraining. Knight and Wilmot (1999) argue that power is something in which the actions of some people have an effect on the actions of others.

In rural power structure, power plays a key role to determine how resources will be allocated, shared and distributed among members of society which has been argued by Laswell (2007) as power is at the heart of the question about who gets what, when and why. Marxist notion argued for power structure based on economic force such as land ownership and class position (Habib & Mizan, 2016). Whereas Weberian (1978) notion considered power as an important factor of the analysis of social stratification. Power as a force-hegemony allowed the state and/or a popular majority to dominate society (Gramsci, 1988) but Foucault refers power as multidimensional, strategic and constant processes of discipline and persuasion. So it shows power is not only set in structural relations rather it is constituted through language and everyday practices (Mozumdar, Ali, Farid & Kabir, 2008). In line with this argument, the patron-client relations for example are the substance of founded relationship in rural society where a significant number of members in rural society are peasants or landless those are depended on patrons where land is the most important factor (Weber, 1962).

On the other hand in rural Bangladesh, justice system, arbitration or village court system has a long eventful history and there exists three ways of dispute resolution mechanisms such as traditional *shalish*, NGO-*shalish* and village court. *Shalish* is an informal meeting to resolve disputes (Hasan, Rose and Khair, 2015). *Shalish* has advantages such as easier accessibility, low cost, amicable manner and quick disposal (Islam, 2011). Despite these advantages Ahmed and Islam (2013) has identified that *shalish* is undemocratic and not properly participatory. For example rural women, girls and landless are deprived from getting fair justice. So with an aim to resolve small disputes and ensuring access to justice with affordable cost and fewer administrative complications, participatory than formal court (Mattsson and Mobarok, 2020) the Government of Bangladesh creates Village Court (a semi-formal system of justice in rural area) Act 2006 replacing Village Court Ordinance 1976. The *shalish* system and village court both are formal and informal dispute resolution mechanisms of the rural area are administered by Union Parishad, local leaders and local elite (Moran, 2015). Based on this background this study focuses broadly on the causal mechanisms of transformation of conventional rural power structure and justice system. Specifically it explores other than land ownership, whether political ideology, political affiliation, advancement of technology, access to technology, women's empowerment, rate of girls education etc. matters or not to determine rural power structure, rural leadership, rural elitism and justice system. This paper also

explores pathways of changes of rural power structure, leadership, politics and justice system.

2. Methodology and sources of data

2.1 Study area, sample and methods of data collection

The study was conducted in two villages namely Uttar Makimabad and Purba Kazirgaon of Hajiganj Upzila, Chandpur. In Uttar Makimabad the total population is 6462 and total households' number is 1179 and in Purba Kazirgaon the total population is 2320 and total households' number is 469 (BBS, 2014). The study was conducted by following a methodological triangulation with an aim to get an insight about mechanism of rural power structure, rural leadership and rural justice system and their changes in the conventional forms. The quantitative data sampling method for this research was random and all the respondents were above 30 years. It is apprehended by the researcher that respondents who are 30 years old, have experienced and will be able to share their experiences that they have observed in regard to the transformation and changes of rural power structure and justice system over the years. A total number of 120 respondents were chosen from two different study villages with various kinds of professions who belonged to different age, social, religious and political groups and had been born and brought up in the study area. All of them were interviewed face to face following a survey method with a semi-structured questionnaire where few questions were unstructured and open ended. In this study each household was considered as a sample unit and from each household only one respondent was interviewed. For the qualitative data, a total of ten key informants interviews (KII) were conducted purposively to understand why and how rural power structure, leadership and justice system have changed as well as to know the kind of changes have taken place in rural power structure and justice system through unstructured interview.

2.2 Data analysis techniques

The structured questions for face to face interview were pre-coded and the answers to open-ended questions were coded at the end of the field research. All open-ended answers have been written separately against each question and consequently the answers had been sorted out and matched with the different categories of answers. Once different categories of answers for open-ended questions were sorted out then coding of the answers has been done as the basis of the interpretation. To analyse and interpret the coded quantitative data IBM Statistical Package for Social Sciences 20.0 (SPSS) has been used in this study. On the other hand, in this study axial coding has been used for qualitative data analysis since it helped to condense voluminous qualitative data (Corbin & Strauss, 2008). Moreover, some of the qualitative data is presented in descriptive mode as quotations in this study. Based on the written transcripts from audio recordings, seven broad categories in light of the research questions and subcategories were generated. To present processed data appropriate graphs like pie chart, column have been used. Moreover, both frequency tables and figures have been utilized in order to analyze the data.

2.3 Conceptual Framework

Based on relevant literature, the changing nature of rural power structure,rural leadership, and traditional justice system of rural Bangladesh over the time the following a conceptual framework has been developed by this empirical study:

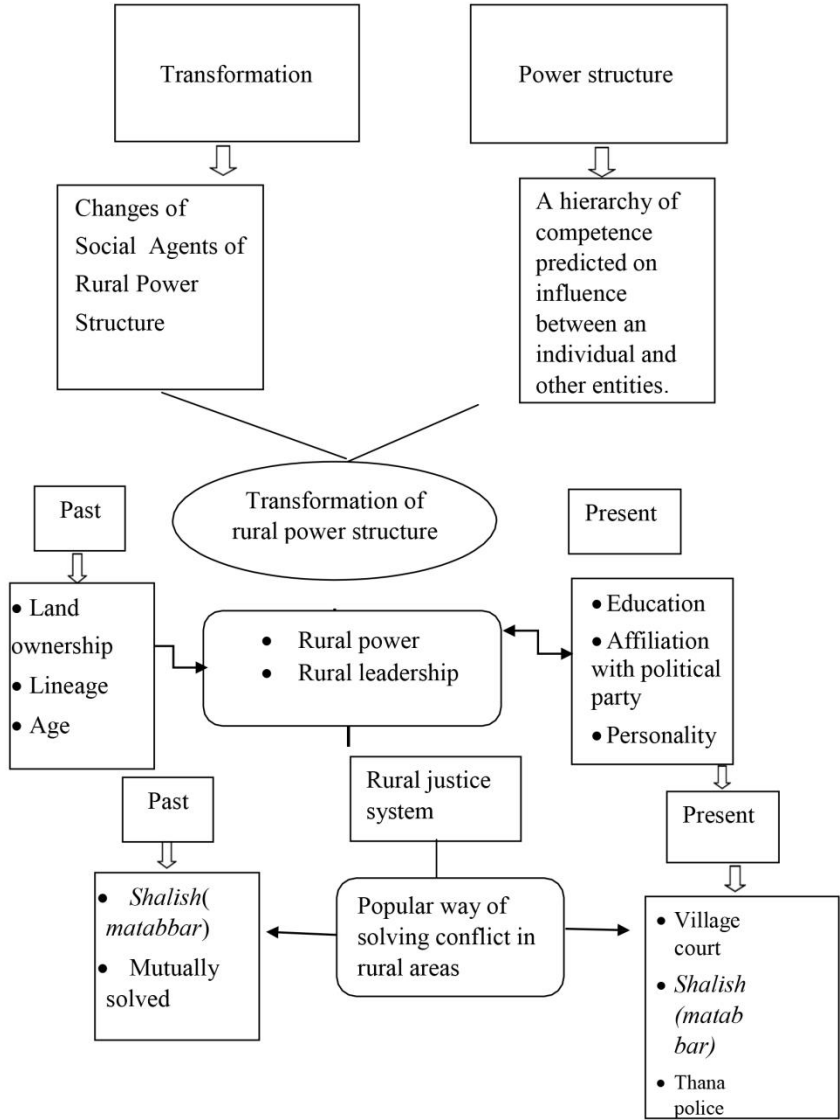


Figure 1: Conceptual framework (Developed based on the findings of the study)

3. Results and discussion

3.1 Changes of power structure

Rural power structure in Bangladesh usually depends on land ownership, traditional lineages, prestige or being the leader of a *Samaj*. In other word the power structure of the rural society and control over power is determined by access to and control over land ownership, therefore landholding in the rural areas is reckoned as the most important factor of power structure (Jahangir, 1982). In regard to the nexus between land ownership and holding rural power Ahmed (1979) observed that ownership of land is the main correlate of power in the villages and the central positions in the power structure is occupied by the big landlords. Apart from land ownership each village administration is controlled by Union Parishad and however, villagers select the chairman from wealthy farmers (Ahmed, 1979). The form of rural politics and the heart of rural politics is the patron-client relationships (Faroqi, 2006). Patron client is the substance of founded relationship in rural society and a significant number of members in rural society are peasants or landless who are dependent on patrons.

This means rural power structure is defined by the landholding structure that person who have large amount of land considered as source of power. In response to the question how does the rural power structure and land ownership of land function? It is revealed in this study that ownership of land (42.1%) and lineage or family status (38.4%) mattered for defining and to be included in power structure in the past but at now a days ownership of land (3.6%) and lineage or family status is not the only determinants and determining factor of rural power in the study villages In line with this Hossain (2006) states that rural traditional power structure is reconfiguring with the new emerging generation of powerful group in rural social life. Through education and wealth generation from the service sector, non-farm activities new generation of powerful groups are achieving social and economic power. In regard of reconfiguring, changing and transforming of traditional rural power structure the findings of this study illustrate that education (26.3%) and economic power (9%) are important factor to hold power as well as to be part of power structure in contemporary rural area whereas in the past education (1.2%) and economic power (3%) were less important in rural power structure.

In the process of reconfiguration of the power structure what matters in contemporary society. In response to the question the respondents of the study villages opined that in the rural power structure at recent time what matters before anything is political power and political ideology and partisan and whether party in power or not (43.1%). In line with this argument a male participant described, *people who are involved in politics and have membership in dominant political parties or parties in power are the powerful. Especially rural Mastans are more powerful than anyone.* (65, higher secondary, Business). Another male respondent said, *at present wealthy people are powerful. Some are politically powerful as well as some are powerful by wealth. Hence, powerful people are involved in politics while powerful people have wealth as well.* (55, Illiterate, Farmer).

On the other hand occupations and age to some extent matters to be included in rural power structure. This study revealed that in contemporary rural society occupations (7.2%) are identified as more important factor to be included in the rural power structure by the respondents compared to occupation (3.7%) in the past. Rest of the respondents mentioned that personality of an individual (9.6%) now-a- days is seen as an important factor to be considered in the power structure in rural area which was not at all an important factor for rural power, defined by the respondents. How personality was an important factor of rural power, a male participant explained, *I think personality is now one of the most important factors for being powerful. Because a person who has good character is trustworthy and has acceptance among people. If someone is multimillionaire but not a person of good character*

has no acceptance among people. People are now more prone to judge power according to personality more than having wealth. (60, Primary, Matabbar).

Table1: Determinants and comparison between past and present rural power (multiple responses)

	Past power		Present power	
	Frequency	Percentage	Frequency	Percentage
Land	69	42.1%	6	3.6%
Lineage	63	38.4%	0	0
Education	1	1.2%	44	26.3%
Economic power	5	3%	15	9%
Political power	8	4.9%	72	43.1%
Occupation	6	3.7%	12	7.2%
Age	5	3%	2	1.2%
Personality	6	3.7%	16	9.6%
Total		100%		100%

Source: Field Survey, 2021

4.2 Changes of rural leadership

Traditionally the local leadership and *matabbarship* were determined by land ownership (Rahman, 1981) which has been transformed due to the development intervention in rural areas (Karim, 1990). In regard to the transformation Karim (1990) also argues in rural area those who hold position in local administration or who have connection with local administration they are powerful in the rural area. In response to the question does it mean there is influence of lineage for holding local leadership? Participants of the study replied that there is influence of kinship and lineage with leadership but financial status, link with local administration and non-farm activities are three important determinants of leadership and *matabbarship*. Traditional system of leadership in contemporary rural society is flexible and a crucial change has undergone in the dominating institution of traditional power structure *samaj* (Hossain, 2006; Rahman, 1981; Karim, 1990). This study revealed lineage (45.8%) was the main determinant to define rural leadership in the past compared to political power (53.4%) at present. In line with this connection Mazumder et al., (2008) argues people who hold rural leadership nowadays have strong involvement with the party in power which has been reflected in this study. A participant argued *people who are involved in politics, have membership, or a post in dominant political parties, good understanding with ruling party MP and Upazila Chairman, Union Parishad Chairman are the powerful in the rural area in the past which was not as dominant as it is now.*

Note to worthy that political involvement and power land (31.5%) is a determinant factor along with education (20.2%) which has been revealed also in Hossain (2006) where it is argued that education and land ownership are often interrelated and education is now the force of attaining rural leadership. Table 2: Basis and comparison of rural leadership in past and at present (multiple responses)

	Past basis of Leadership		Present basis of Leadership	
	Frequency	Percentage	Frequency	Percentage
Education	9	5.16%	33	20.2%
Political power	7	4.2%	87	53.4%
Personality	6	3.6%	27	16.6%
Land	53	31.5%	4	2.5%
Lineage	77	45.8%	0	0
Economic power	9	5.4%	12	7.4%
Total		100%		100%

Source: Field Survey, 2021

In response to the question what matters to change the system of traditional *matabbar* over the period of time in rural leadership this study reveals that *matabbar* system still exists although in a small range but the factors of selecting a *matabbar* have been changed from traditional system. In regard to what factors determine, this study identified in the past higher lineage (42.3%) such as Talukder, Khan, Chowdhury, Miaji, amount of land (23.8%) and generations/family legacy (*bongshoporompura*) (23.2%), business (2.4%), economic power (4.2%), personality (3%), education (1.2%) more or less function as an indicator of selecting *matabbar* in the past.

Table 3: Basis of selection of *Matabbar* in past

Basis of <i>Matabbar</i> selection in past	Frequency	Percentage
High lineage	71	42.3%
Land	40	23.8%
Generations/family legacy	39	23.2%
Business	4	2.4%
Economic Power	7	4.2%
Personality	5	3%
Education	2	1.2%
Total		100%

Source: Field Survey, 2021

How does *matabbarship* and their selection process function in the rural area in contemporary society? In response to this question this study finds that in contemporary changing rural society the major determinant of *matabbar* selection is political power (52.5%). The people who have political relation with the ruling party even if they come from a lower strata, get the position of rural *matabbar* along with education (23.1%) and personality (18.1%) matters to become *matabbar*. But the amount of land (1.9%), economic power (3.8%) of a person and high lineage (0.6%) have been identified by the respondents as less important and less determining factors for *matabbar* selection that reflect changes in the process and mechanism of selecting *matabbar*. A male participant explained that in his time *matabbars* used to be aged and people respect them a lot. People knew everyone and showed respect to each other. But now-a-days people who are even coming from lower strata or even young are occupying political position and they are indifferent to show respect. Time and society are changing now (50, Higher Secondary, Business).

Table 4: Factors of selection of *matabbar* at present

Factors of <i>matabbar</i> selection	Frequency	Percentage
Political Power	84	52.5%
Education	37	23.1%
Personality	29	18.1%
Land	3	1.9%
Economic power	6	3.8%
High lineage	1	0.6%
Total		100%

Source: Field Survey, 2021

4.3 Rural Politics and its Mechanisms

Foucault (1998) argues that power is not fixed to a definite place, it is in everywhere and comes from everywhere. And in line with a connection with Foucauldian argument this study reveals that power tends to change for socio-economic and political conditions over a period of time. For example after national elections or changes in the national politics sometimes determine the power of a Union Parishad chairman. He or she may lose his/her powerful position that depends on his/her links, connection/understanding with local Members of Parliament (MP). The allocation of development resources to the Union Parishad tend to decrease when the MP and chairman are not from same political parties or if they are not having good relation (Bode, 2004).

A change in national politics with the change of time affects the rural politics. This study shows that 96% (Figure: 2) of the respondents agree that the rural politics is changing with the change of national politics. National politics influences rural politics (41%) referred as the reason of rural political change. At the same time expansion of education (23.1%), technological advancement (24.4%) and women's empowerment (11.5%) has been identified as the determining factor of rural political change with the national change. What's about family legacy, family status and lineage or *bongshoporompura*? This study reveals to some extent it matters but not so strongly as it was traditionally like people who belong to high lineage and having wealth get the opportunity to participate in rural politics and leader selection. In response to the question related to local political mechanisms, the findings of the study presents that majority of the respondents (53.3%) believe that from all steps of the society people have access to rural politics and rest of the respondents (46.7%) opined that people from all level do not have access to rural politics.

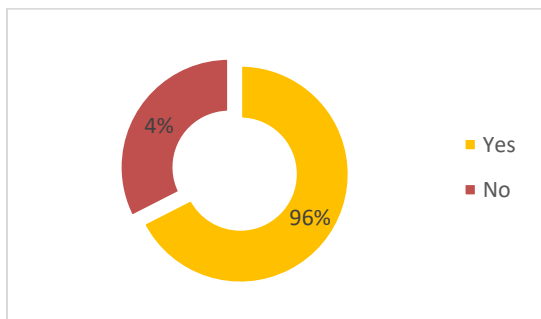


Figure 2: Opinion regarding changes in rural politics for national political change

Table 5: Reasons of influence of national politics on rural politics (multiple responses)

Reasons	Frequency	Percentage
National and world politics	64	41.0%
Education	36	23.1%
Advancement of technology/internet	38	24.4%
Women empowerment	18	11.5%
Total		100%

Source: Field Survey, 2021

With regard to not having access in rural politics this study has identified (multiple responses) a major reason is political power (59.5%) that persons who have no political power and have no affiliation with ruling party cannot be part of rural power and leadership. For example a local man, who has warm relations with party leaders and MP exercises more power than the UP chairman, if he or she is not having warm relation with MP or if he or she is from opposition party. Though educational qualifications (23%) and wealth (16.2%)also function as a factor to participate into local politics yet involvement with party in the power or MP is a key force to participate into rural politics at present

Table 6: Access of rural people to politics and reasons of not having access

	Frequency	Percentage
Access to politics		
Yes	64	53.3
No	56	46.7
Total	120	100
Reasons (N= 56)		
Political power	44	59.5%
Educational quality	17	23.0%
Economic power	12	16.2%
Lineage	1	1.4%
Total		100%

Source: Field Survey, 2021

4.4 Rural justice system and dispute resolution mechanisms

Justice system interprets and implements law as well as ensures the rule of law that justice is accessible to all citizens. One of the most common justice systems and dispute resolution mechanisms in rural area is *shalish* which is typically formed by powerful rural leaders from the same village (Mattsson & Mobarok, 2020). Mattsson & Mobarok (2020) have showed that 68% of the disputes are resolved in rural *shalish*. How does this rural *shalish* operate in the study area? This study reveals that 78.3% disputes were resolved by *shalish* in the study area in the past which has been decreased to 27.5% in recent times. In the study villages people rely more on village court (52.5%), a semi-formal system of justice in rural area functioned by Union Parishad to resolve petty criminal and civil disputes along with thana police (14.2%) to resolve local problems and local conflict. In the study area in the past, they were more likely to solve problems by mutual understanding (20.8%) as they considered that going to *shalish* or village court to solve problems will harm their dignity. Solving conflict through mutual resolution (2.5%) has declined drastically which is very rare and insignificant as well. A male participant explained the mechanism of solving conflict as *village shalish was a way of getting fair justice but now a day it's not any more fair and partisan. People now occasionally seek a solution from shalish as the village court has become the center of conflict resolution. This study finds that the village court (52.5%) gets the priorities at present to resolve conflict compared to the past (0.8%).. Why do people go to the thana police to resolve their conflict when they have village court? This study reveals rural people sometimes go to thana police because of better transport, better communication, and easy access to police as well as sometimes they don't keep trust on UP chairman if he or she is from a different ideology. A female participant explained the mechanism of dispute resolution, if there is any conflict firstly, people try to solve through shalish, if shalish fails to reconcile then people go to Village Court if Village Court again fails to reconcile then people go to Thana police. But now in most of the cases people go to Village Court.* (35, Honors, teacher).

Table 7: Comparison between ways of solving conflict in the past and at present (multiple responses)

	Way of solving conflict in the past		Way of solving conflict in the present	
	Frequency	Percentage	Frequency	Percentage
Salish (<i>matabbbar</i>)	94	78.3	33	27.5
Mutually solved	25	20.8	3	2.5
Village Court	1	.8	63	52.5
Thana Police	0	0	17	14.2
Upzila Parishad	0	0	4	3.3
Total	120	100%	120	100%

Source: Field Survey, 2021

In response to the question of which one is a better option, the respondents replied that among village court, Thana Police and arbitration (*shalish*), the most common way of solving conflict is village court (40%) and then Thana Police (33.3%). In response to the question why do village people prefer village court, the majority (37.5%) of the respondents said it is easy to reach the Union Parishad and 34.7% of the respondents said that the justice is fair. Islam (2018) illustrated that case filing in village court is less costly and situated in a short distance from communities which can save rural people transport cost. Respondents also mentioned that it is less costly (15.3%) to get justice with less harassment (12.5%). A male participant said, *Union parishad is an easy way to get fair justice. Matabbars are also present in the Union Adalat. Up chairman, members and Matabbars make mutual solution.* (55, Secondary, Shopkeeper).

Table 8: Comparisons of reasons of choosing Village Court, Thana Police and *Shalish* (Arbitration) for resolving conflict

	Frequency	Percentage
Village Court		
Fair justice	25	34.7%
Easy to reach	27	37.5%
Less cost	11	15.3%
Less harassment	9	12.5%
Total		100%
Thana Police		
Security	9	18.4%
Effective	23	46.9%
Respectful to law	8	16.3%
Nepotism free	9	18.4%
Total		100%
Shalish(arbitration)		
Mutual solution	22	42.3%
Save dignity	13	25.0%
Less cost	7	13.5%
Fair justice	10	19.2%
Total		100%

Source: Field Survey, 2021

5. Conclusion

Power is the ability to force and power structure is an overall system of influence between any individual and every other individual within any selected group of people. Both traditional and modern power structure has been found in the study area and the recently transformed leadership process differs from traditional power structure and leadership. Traditionally in rural Bangladesh rural power was determined largely by land ownership, family status, lineage, family legacy (*bongshoporompora*) etc. But the situation has been changing over time and land ownership, lineage and wealth are no longer the determinant of power in the study area. The elements of rural power structure have been changed through social

change. Yes land ownership was an issue and is an issue but influence is declining. New components has been added to contemporary rural power structure

For example, contemporary time education is the priority for being powerful in the rural power structure. Educated professionals are influential in modern rural power structure. In recent time those who own or know the use of information and technology in rural area have also taken place/part in the rural power structure. Even if someone gives enough information or has access to information, rural people value him. Knowledge and fluent use of technology are considered as influential. On the other hand, links with powerful political groups play a vital role for being powerful in the study villages. Involvement with political party, party in power, post and position in the party also matters in the rural power structure along with *matabbars*, moneylenders, fatwa providing people, NGO workers. Though several factors influence rural power structure, education, personal qualities and more importantly affiliation with political parties is a big issue in the study villages.

Naturally with the changes of power holding pattern and leadership pattern of rural area has also changed. Traditional *matabbar*, *shalish* and rural justice system has been modified. People now rely more on village courts, a semi-formal dispute resolution mechanism due to easy access and affordability. Village court is a different judicial and dispute resolution system apart from informal *shalish* and formal judicial structure which has become a popular way of justice system in the study villages. Rural people now rely more on village courts for resolving their disputes and conflicts. Village Courts become the popular means of dispute resolution mechanism in rural area which provides faster and cheaper justice to rural people and also increases communal harmony and safety in rural area. A new pattern of rural power structure has emerged which can influence a group of people through their political power, knowledge on technology, educational qualification and personalities. For example, *matabbar* was a powerful traditional leadership position in rural area and the way of *matabbar* selection has changed that political power, education and personality is more considerable than traditional family legacy, high lineage, land ownership etc.

References

- Ahmed, A. (1979). *Rural Life in Bangladesh: A Study of Five Selected Villages* (2nd Ed.). Dhaka: Nowroze Kitabistan.
- Ahmed, B. & Islam, M. T. (2013). The Role of Union Parishad in Rural Dispute Resolution in Bangladesh: An Evaluation in the light of People's Perception. *Studies on Asia*. 3, 188-210.
- Bangladesh Bureau of Statistics.(2014). *Bangladesh Population and Housing Census*2011.
- Bode, B. (2004). *In Pursuit of Power: Local Elites and Union-level Governance in Rural Northwestern Bangladesh*. Dhaka: Care Bangladesh.
- Corbin, L.,& Strauss, A., (2008). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. Los Angeles: Sage.
- Farooqi, G. (2006). *Social Structure*. Retrieved January 14, 2012.
- Foucault, Michel (1998). *The History of Sexuality: The Will to Knowledge*, London, Penguin.

- Goodyear-Smith, F. & Buetow, S. (2001). Power Issues in the Doctor-patient Relationship. *Health Care Analysis*, 9(4), 449-462.
- Gramsci, A. 1988. *The Antonio Gramsci Reader: Selected Readings, 1916–1935*. London: Lawrence and Wishart.
- Habib, A. & Mizan, S.A.S. (2016). Current Notion of Rural Power Structure: An Analysis of Bangladesh Village. *Jahangirnagar University Journal of Government and Politics*.35, 135-143.
- Hossain, A. (2006). The Changing Local Rural Power Structure: The Elite and NGOs in Bangladesh. *Journal of Health Management*, 6,229-250.
- Islam, M. S. (2011). Efficiency and Effectiveness of Alternative Dispute Resolution Schemes towards the Promotion of Access to Justice in Bangladesh. *IIUC Studies*.8 (1813-7733)
- Islam, S.M. (2018). Access to Justice in Rural Bangladesh: A Review on Village Court and its Effectiveness. *Asian Studies: Jahangirnagar University Journal of Government and Politics*. 37. 31-44.
- Jahangir. B.K. (1982). *Rural Society, Power Structure and Class Practice*. Dacca University: Centre for Social Studies
- Karim, A. H. M. Z. (1990). *The Pattern of Rural Leadership in an Agrarian Society: A Case Study of the Changing Power structure in Bangladesh*. New Delhi: Northern BookCentre.
- Khan, M.I. (2003). *Peasant Society of Bangladesh*. Dhaka: Dibboyo Prakash.
- Knights, D., & Wilmot, H. (1999). *Management lives: Power and Identity in Work Organizations*. London: Sage Publications.
- Laverack, G. (2009). *Public Health: Power, Empowerment and Professional Practice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mattsson, M. and Mobarok, A.M. (2020). Rural Institutional Innovation: Can Village Courts in Bangladesh Accelerate Access to Justice and Improve Socio-economic Outcomes? *International Initiatives for Impact evaluation*.
- Moran, G. (2015). Access to Justice in Bangladesh - Situation Analysis. *Summary Report, May 2015. Submitted by Data Management Aid to UNDP Bangladesh/Justice Sector Facility*.
- Mozumdar, L., Ali, R. N., Farid, K.S. and Kabir, M.S. (2008). Changing Leadership and Rural Power Structure. *Journal of Bangladesh Agriculture University*, 6(2), 429-436.
- Rahman, A. (1981). *Rural Power Structure: A Study of the Local Level Leaders in Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh Books International.
- Schaefer, R. T. (2007). *Sociology*. Boston: McGraw-Hill Companies Inc.
- Weber, M. (1962). *An Intellectual Portrait*. London: London University Press.

Date of Submission : 14.11.2022

Date of Acceptance : 31.07.2023

Women's Agency Regarding Choice to Work: The Lived Experience of Women Garment Workers in Bangladesh

Shamali Shill*

Abstract

This study critically evaluates women's empowerment through employment in the garment factories in Bangladesh focusing on the circumstances that influence the decision to join the factory by the women. Guided by Kabeer's notion of empowerment, choice, and agency, this study highlights whether the decision to join the factory represents women's freedom of choice and agency, which is crucial to evaluate women's empowerment. Followed by the qualitative research approach, data were collected from twenty female garment workers through in-depth interviews, and a thematic approach to data analysis was used. The findings indicate that acute poverty and diverse vulnerability within family patriarchy like oppression, violence, divorce, and abandonment push women to the factory gate for earnings. Male heads (father/husband) directly or indirectly make women feel obligated to join work and earn. Besides, women feel distressed and disrespected by the low wage, excessive workload, and abusive regulation in the workplace, however, they are helpless to quit their job as employment opportunities for poor women are limited. Thus, women's decision to work in the factory is constrained by poverty and their social vulnerability and therefore, does not represent a meaningful choice and women's agency. This study concludes that if a standard living wage, reasonable workload, and violence-free workplace are ensured, work in the garment factory would be a favorable choice for women and would have a real contribution towards women's empowerment.

Keywords: Women's Empowerment, Choice, Agency, Garment Work, Bangladesh

Introduction

In a patriarchal cultural context, Bangladeshi women are mostly dependent housewives. There is limited access to income-earning opportunities for women, especially those who are poor, less educated, and live in rural areas. The female labor force participation rate in Bangladesh is only 36.4%. (The World Bank Data, 2019). The majority of the women labor force is employed in the agricultural sector (ILO, 2019), dominated by rural women with less education who perform low-paying and unpaid labor on family farms; thus their employment does not typically translate into financial autonomy (Raihan & Bidisha, 2018). In this context, the export-based garment industry in Bangladesh has remained a major source of formal employment for women from disadvantaged socioeconomic and educational backgrounds.

Bangladesh experienced tremendous growth of export-based garment industries since the 1980s, indicating an advance from fifty garment factories with a few thousand workers in 1980 to three thousand factories with 1.8 million workers in 2000 (Kabeer & Mahmud, 2004b) and 5876 factories in 2012-2013 with 4 million

* Associate Professor, Department of Sociology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

workers (BGMEA, 2016). After the Rana Plaza Building collapse in 2013, the RMG sector of Bangladesh faced a significant setback to its overall profitability and growth. However, the sector recovered in a short time and made Bangladesh keep its position as the second-largest readymade garment (RMG) manufacturing country in the world and the primary source of foreign exchange earnings for the country (Nadiruzzaman et al., 2021; Swazan & Das, 2022; Zaman, 2021). Since its inception, the garment industry in Bangladesh has employed predominantly women as a cheap labor force source. During 2012-2013, the BGMEA reported 80% of the workers in its member factories are female. However, a recent ILO survey (Matsura & Teng, 2020) indicates that 60.5% of RMG workers are women indicating the decline is a result of technological advancements in the women-concentrated production sections of RMG sectors. Considering the huge gender gap in labor force participation, this proportion of women in the RMG workforce still bears immense significance.

The earnings through garment employment have enabled rural poor women to deal with household poverty by ensuring their survival and contributing to family expenditure and welfare (Anwary, 2017; Billah & Manik, 2017; Kabeer & Mahmud, 2004a; Khan, Anker, Aeron, & Rob, 2014; Khosla, 2009; Sharmin & Khanam, 2017). The economic independence of the women has led to respect for them within the family and decision-making power by them regarding various household affairs and their own lives (Anwary, 2017; Billah & Manik, 2017; Sharmin & Khanam, 2017). Overall, the researchers treat these changes as the economic agency of the women and an indication of women's empowerment. However, women's earning role does not always translate into the agency by the women within the household; in most cases, women struggle to secure control over their income in male-dominated power relations within the family (Ahmed, 2004; Kibria, 1995). In many cases, women face violence on the issue of handing over their income and of the transgression of gender norms that women's work and mobility led to, including control of their sexuality (Naved, Rahman, Willan, Jewkes, & Gibbs, 2018).

Besides, these employments for women have been criticized for the low wage they are paid, poor and unsafe working conditions, and rights violations of the women workers. Bangladeshi garment workers get least wages compared to the workers in other developing countries; the average monthly wage of garment workers in Turkey, China, Vietnam, and Bangladesh is US\$340, US\$326, US\$180, and US\$95, respectively (McCarthy, 2019). The wage is below the local living wage (Butler, 2019), resulting in malnutrition and illness among garment workers and their children and unsanitary accommodation (Bhuiyan, 2012; Choudhury, Luthfa, & Gayen, 2016; Sikdar, Sarkar, & Sadeka, 2014). Many contemporary studies have placed a serious concern on women's economic achievements at the expense of their severe physical and mental health vulnerabilities resulting from the stress of working in a poor and unhealthy factory environment (Akhter, Rutherford, & Chu, 2019; Kabir, Maple, Usher, & Islam, 2019). Women are exposed to workplace violence, including verbal abuse, physical assault, mental harassment, and sexual assault (Matsura & Teng, 2020; Naved et al., 2018; Siddiqi, 2003).

The overall journey of women workers depicted above indicates that though earnings through employment in the RMG sector bear some positive changes for women within the household, these do not necessarily indicate their agency and empowerment in all aspects. Empowerment denotes the ability to make fundamental choices in life and such choices must be made on the ground of the availability of alternative choices (Kabeer, 1999). Therefore, an important aspect of women's empowerment through employment in RMG sectors in Bangladesh is to evaluate whether the choice to join the factory is free or forced, which is not adequately addressed in current studies on garment workers in Bangladesh.

Research Objectives

This study critically addresses the issue of women's empowerment through garment employment in Bangladesh from a theoretical viewpoint of whether the choice to join the factory represents women's agency or not. Therefore, this study focuses on two objectives: a) to explore the factors that make women join the factory and b) to understand the perception of women regarding their status as workers.

Theoretical Approach

This study focuses on the theoretical approach to women's empowerment. The idea of empowerment is related to the word power. According to Muni (2006:25), "...empowerment is derived from the word 'empower' meaning to give or to acquire power or to increase power...". Relating to the notion of empowerment, women's empowerment then indicates gaining power and authority by women. In a comprehensive view, "...empowerment is the expansion of freedom of choice and action. It means increasing one's authority and control over the resources and decisions that affect one's life" (World Bank, 2002:11, cited in Habib, 2014).

In sociological research, Kabeer's (1999, 2008) conceptualization of women's empowerment is recurrently used, which is also the guideline for this study. As per Kabeer, empowerment is connected to the conditions of disempowerment, and therefore, power denotes "the ability to make choices" by the disempowered who lack this ability (Kabeer, 1999). However, not all choices are of equal value to signify empowerment; Kabeer (1999) distinguishes between first-order and second-order life choices. She mostly emphasizes on first-order life choices which she termed "strategic choices" i.e., which are the basis for individual lives, like the choice of livelihood, marriage, whether to have children, the number of children, freedom of movement, and so on (Kabeer, 1999). Thus, she defines empowerment as the "expansion in the ability to make strategic choices by those who have been denied this ability" (Kabeer, 2008:19).

Empowerment is a process of three interconnected dimensions: resources, agency, and achievement (Kabeer, 1999). Resources are the prerequisites that enable people to pursue their objectives. Agency denotes "the ability to define one's goals and act upon them" (Kabeer, 1999:438), which is measured by decision-making or bargaining power (Kabeer, 2008). The capacity for decision making depends on the possession of diverse material, human and social resources by individuals (Kabeer, 2008). The interconnection of resources and agency determines the potential for

achieving a lifestyle people desire (Kabeer, 1999). Following this articulation, Kabeer defines women's empowerment "as the process through which women gained the capacity for exercising strategic forms of agency in relation to their own lives as well as in relation to larger structure of constraint that positioned them as subordinate to men" (Kabeer, 2012:7).

Kabeer signifies empowerment as the ability to decide fundamental choices in life. Nevertheless, choice necessitates the existence of alternatives, the capacity to have chosen otherwise (Kabeer, 1999:437). This denotes the importance of free choices rather than the choices made under constraints and the necessity of the existence of alternative choices of which individual can choose their desired one. Women in Bangladesh face barriers from patriarchal families and communities regarding their engagement in paid employment. In such a context, women's presence as the chief labour force in the RMG sector in Bangladesh is perceived as women's empowerment. However, women's presence in the factory does not essentially imply their free will regarding their work decision, particularly in a context where numerous studies depicted the vulnerable status of women workers in the RMG workplace. Therefore, this research identifies the necessity to explore the circumstances that make women join work and sustain it, from a viewpoint of choice and agency which is an important component of empowerment.

Research Methods and Materials

The study was guided by the qualitative research method to gather holistic and in-depth information from the experiences of women garment workers (WGWs) in Bangladesh. The qualitative researcher endeavors to discover what is significant or relevant to the people and how they experience daily life in a particular social setting; they seek to comprehend the social setting from the perspective of the people by engaging with them in great depth (Neuman, 2011). This study aimed to cover the lived experience of WGWs in Bangladesh to address the issue of why women choose to work in the factory and how they perceive their status as workers and thus, chose the qualitative method as appropriate.

Women workers of the non-EPZ (Export Processing Zone) garment factories located in the greater Dhaka division were the research participants. The study area included three major industrial sites: Savar, Ashulia, and Mirpur of the greater Dhaka division, which is one of the major garment industrial hubs in Bangladesh, and the workers' residential areas. Altogether twenty (N=20) WGWs (sewing operators and helpers) were selected purposively who work in twenty different garment factories. At least two years of work experience was another inclusion criterion. Variations in age, marital status, and service length were considered to ensure variation in the sample (Neuman, 2011).

The fieldwork continued from July 2018 to January 2019. The data collection technique included in-depth interviews with the WGWs using an open-ended unstructured question guide. Interviews based on prior appointments with the WGWs were conducted in their own houses during the weekends. Before conducting the interview, the participants were informed of the purpose of the study so that they can

give their consent regarding the interview. The participants signed an informed consent form indicating their willingness to participate in the research. The interviews were recorded based on consent from the participants. All the participants were given pseudonyms to maintain the confidentiality and anonymity of their identities. Besides the interviews, informal time spent with the family members of the WGWs, many other workers, and locals gave me the scope of close observation of the workers' daily lives. Notes were kept on observations and other experiences during the fieldwork. Numerous secondary data sources also supplemented and supported the data.

Data were analyzed using the thematic approach of qualitative data analysis. I used the computer-assisted qualitative data analysis program NVivo (version 10) to organize and analyze the data effectively. The recorded interviews were transcribed and translated and then exported to the NVivo software for coding and memo writing. The interview transcripts were read and reread carefully to code the data (Saldaña, 2009). The next phase followed organizing and grouping the coded data into categories and subcategories based on common characteristics or patterns and generating major themes (Saldaña, 2009). From coding to the development of themes, I was guided by the research objectives and theoretical approach of this study. In the results section, categories and themes were explained by providing examples from the data and citing respondent narratives.

Results and Discussion

Demographic Profile of the Research Participants

The demographic profile of the research participants provided in Table 1 demonstrates that the majority of the female workers were between the ages of 15 and 29; fewer workers were older than 34 years old. Most of them had only primary education (levels 3-5), except for one case who reached level 8. Four of the respondents were single, ten were married, four were divorced, and two were separated; the average number of children among the ever-married women was one or two (two of them had no children). Among them, four were helpers and sixteen were operators on the sewing and finishing assembly line, each with between two and twelve years of experience. The minimum monthly income for a helper could be 5300Tk as per rules, which was up to 6600Tk for one helper in this study. However, one of the helpers reported earning less than 5300Tk per month. A worker's monthly wage as an operator depended on her proficiency, type of sewing process, and length of service in a single factory. Workers skilled in multiple swing processes were compensated at a higher rate than standard operators. Moreover, women who worked in a single factory for an extended period (eight to ten years without a break) were eligible for a slightly higher wage per year than others. In this study sample, the minimum monthly wage of an operator was found 7200Tk, while the maximum was 9300Tk. Considering the majority of the research participants, the average monthly wage of operators was between 7000Tk and 8500Tk; this is the fixed income, and the overtime pay is not included as it varies.

Table 1: Demographic Profile of the Research Participants

<i>Characteristics</i>	<i>Category</i>	<i>Number</i>
Age	15-19	5
	20-24	5
	25-29	6
	30-34	2
	35-39	2
Education	Level 3	5
	Level 4	3
	Level 5	11
	Level 5+	1
Marital Status	Unmarried	4
	Married	10
	Divorced	4
	Separated	2
Number of Children	No Children	2
	One	9
	Two	4
	Three	1
Job Position	Operator	16
	Helper	4
Length of Service in the RMG Sector (Year)	2-4	5
	5-7	8
	8-10	4
	11 or more	3
Wage per Month (BDT)	Below 5300	1
	5300-6600	3
	7000-7500	5
	7600-7900	4
	8000-8500	4
	8600-9000	2
	9000+	1

Source: Fieldwork 2018-19

Reason to Join the Factory

It is revealed from the lived experiences of the workers that poverty and patriarchy interacted in multiple ways that compelled women to join the factory. In the patriarchal cultural context of Bangladesh, women are mostly housewives and dependent on male household heads for their survival. Women within poorer households face severe hardship, miseries, and vulnerability compared to male members for this dependent status. This dependence also creates unequal power relations between males and females in the family (males as providers and women as

subordinates) and women face diverse forms of oppression and violence particularly in married life. The participants in this study were mostly from rural areas and came from extremely disadvantaged socioeconomic backgrounds. They narrated their hardship in childhood, married life as well as other vulnerabilities, particularly the domestic violence that made them go for a decision to work.

While describing their journey of work, women mostly cited their struggle to overcome poverty in the family and ensure basic survival as the cheap reason to join the factory. This research reveals that women workers faced extreme hardship in their lives either as the father/elder brother/husband lacked sufficient earnings, had a physical disability, remarried, was a drug addict, or was irresponsible to support the family. In such a context, women were compelled to find means of their survival and join the factory following the footsteps of many other women known to them. Numerous studies have also mentioned economic hardship or poverty within households, such as business losses, unemployment, and illness or death of male heads, which have compelled women to work in garment factories to supplement family income (Habib, 2014; Kibria, 1998; Paul-Majumder & Begum, 2006).

Poverty and Start Work at a Very Young Age

Many women in this study faced acute hardship in their childhood and were compelled to join the factory even when they were too young to start a job. Romela, Shabana, Runu, Pakhi, Borsha, Koli, and Bobita all began working when they were between the ages of twelve and thirteen. Romela's story illuminates the vicious cycle of dependence on male providers and girls' vulnerability in the context of household poverty. Romela had a total of six brothers and sisters, and Romela was the third oldest. Her father owned a small amount of cultivable land, which served as the primary source of income for the family. However, he had a physical impairment; an accident had severely injured his leg. Due to his disability, he was unable to work continuously for several hours. Thus, Romela with her other siblings endured a difficult childhood. Their grandfather and maternal uncle provided financial assistance for their upkeep. Her elder sister was married off at a very young age in the context of severe hardship. After a couple of years, however, her grandfather passed away and her maternal uncle moved abroad, leaving them in dire straits. During that time, Romela frequently assisted her father in farming after school; her older brother was resistant to family obligations and preoccupied with bad friends. Her uncle later took her brother to Dhaka and gave him a job as a television workshop mechanic. Thus, he began financing the family, and they began to anticipate better times. However, after his marriage, her brother stopped supporting the family and there were no adult male providers to take responsibility for family maintenance.

This financial security was short-lived. My brother married and established a family unit with his wife. He ceased financially supporting my parents and other siblings. In this context, I wanted to accept the challenge of contributing financially to my family... I was approximately thirteen years old when I moved from the countryside to Dhaka in search of employment in a garment factory (Romela, Operator, Age: 19, Unmarried).

Parents Sent Daughters to Factory to Earn

It is revealed that in many cases, it is the male head's (father's) decision to employ the daughter's labor to ensure that she contributes to the family income. Even the girls are sent to the factory before the legal age of work. Parents in some cases attempt to inflate their daughter's ages on their birth certificates by bribing the relevant office. For example, while interviewing, Borsha (Operator, Unmarried, 19 years old) mentioned her age is nineteen. But when I checked her national identity (NID) card for some other basic information, I noticed that her age would be twenty-eight as per the date of birth mentioned in the NID. It left me somewhat perplexed, and when I inquired further, she responded with a sheepish smile that she was only thirteen years old when she first started the job and submitting the NID card was mandatory to be recruited. Therefore, her father managed the false age listed on the NID card.

Though the Bangladesh Labor Act 2006, prohibits hiring children and adolescents, sometimes employers hire minors, as in many cases, they can be hired with a lower wage and are easily subdued. However, employers have to conceal the fact from the buyers.

We (father, mother, and three sisters) all moved to Dhaka so that we could earn together a handsome amount...My older sister joined a factory, and my father wanted me too to try for the same job, but many factories turned me down because I was so young. In the end, one factory hired me as a helper at a wage that was less than the exact wage paid to an adult helper. However, child labor was illegal, and the supervisor used to hide me in case the buyer unexpectedly visited the factory (Pakhi, Helper, Age: 18, Unmarried).

Started Work to Support Parents and Continued to Support Husband

The story of Borsha and Pakhi disclosed that women are required to join factories even when they are far beyond the age of deciding on this issue. In some cases, women start working in their youth to support their parents and they feel obligated to continue the job even after marriage to provide financial assistance to their husbands. Shabana was compelled to leave school and join the factory when she was too young. While working in the factory, Shabana tied the knot. She anticipated quitting her job and becoming a devoted housewife. However, it did not happen.

When I began working in the factory, I was nearly a child. My father was a mason, but he was a drug addict and was reluctant to earn sufficient for our maintenance. Occasionally, my father would leave the house for a couple of months without notice, requiring my mother to continue his income-generating duties. It was so difficult for her, as she also had to care for us and do the housework.... Several garment factories were located near our home at the time, and many children worked as a helper in these factories. I believed that if I joined the factory, my mother would be relieved of her extreme workload and mental stress.... Even after my marriage, I have continued my employment. When I gave birth to my two children, I simply rested for a while. In the latter case, I returned to work around two months after the birth of my child... There is no way to quit, as my husband's income is insufficient to support the family (Shabana, Operator, Age:28, Married).

Poverty in Married Life and Decision to Work

In the context of poverty, many parents in the rural area married off their daughters at a very young age in a hope that their maintenance will be secured by their husbands. This study also revealed the cases of child marriage faced by some participants in this study. However, these women stated that the marriage did not secure their upkeep, rather they faced diverse forms of deprivation, negligence, and poverty in their in-law's homes which prompted them to find a job in the factory.

I was married off when I was just twelve years old. However, marriage does not secure happiness for me. When we were in the village, my husband did not have any regular source of income. His father and brothers were the chief breadwinners. Thus, I was severely devalued, mistreated, and denied proper nutrition and upkeep...After many years of struggle, my husband planned with me to move to Dhaka to earn together with a plan that I would join the factory (Tania, Operator, Age:30, Married).

Not Acute Poverty, Work to Improve Family Income

Though poverty mostly pushes women to work in the garment factory, for few women a job scope in the factory functioned as a pull factor. Only one woman in in-depth interviews mentioned that working in the factory is not a necessity for her, she works to add more to the family income.

I came to Dhaka to assist my pregnant sister. When she recovered from the acute stage of pregnancy and maternity, I just joined the factory out of curiosity to use the scope to earn. I continued for a few years and then left... After five years of my marriage, I joined the factory again. If I get tired, then I will stop again (Ishita, Operator, Age: 25, Married).

Oppression in Marital Life and Decision to Work

Several studies indicated that various vulnerabilities in married life like oppression, abandonment, and divorce push women to migrate to cities and search for jobs in the garment factory to secure their survival (Habib, 2014; Kabeer, 2004; Kibria, 1998). This study also discloses various miseries after marriage as one of the chief causes that compel women to enter the factory for earnings. These miseries include husband's polygyny, extramarital affairs, second marriage, mental and physical violence, torture for dowry; oppression by in-laws, and in acute cases, divorce, and abandonment.

Women who went through an oppressive conjugal life expressed how they felt depressed, distressed, and disrespected as they met with negligence and violence by their husbands. In such an oppressive condition, women were deprived of proper caring and even of fundamental sustenance that eventually pushed them to the factory gate.

My father married me off to an elderly man with multiple wives. He was unconcerned about how depressed I was to marry such a groom. My husband did not even provide me with adequate nutrition and clothing. He occasionally beat me severely for trivial housekeeping errors. In the interim, I gave birth to a daughter, which added to my woes... Sometimes I felt insane for wanting to leave that

miserable existence... When my daughter turned four, I decided to leave the village (Nahar, Operator, Age: 30, Married).

My in-laws asked for a big amount of dowry which my parents could not provide. Therefore, my in-laws deprived me of sufficient food and clothing... Due to an improper diet, I became extremely ill during my first pregnancy. In addition to food deprivation, I was frequently beaten by my husband... I endured approximately nine years of this oppressive condition... At the time, my younger sister began working in a Dhaka garment factory. She convinced me to join her in an attempt to earn money (Poly, Helper, Age: 24, Married).

Husbands/In-laws Forced Women to Work

In some cases, husbands or other in-laws force women to join factories as an available earning source. Sumona started job as a garment worker in her childhood. At the age of twenty-two she got married and left the job. She chose to focus on her beloved family rather continue the job. However, her in-laws were very greedy and wanted her to rejoin the factory to earn for the family. Eventually, she was forced to join work, and she had to give up her wage to her husband.

My daughter was still breastfeeding age. My in-laws decided that I worked in a factory and earned. I had no say on the issue as my husband also supported their decision... They were always rude to me. Even after giving them my whole income, they mistreated me in many ways. In case of protest on these issues, my husband assaulted me physically... I endured it for a long time and finally, decided to stay separate (Sumona, Operator, Age: 35, Separated).

Divorce, Insecurity, and Need Earnings

Divorced or abandoned women with a poor socio-economic background face diverse financial and social vulnerabilities in the countryside. This study also discloses the cases of marriage dismissal where the women were either abandoned by their husbands or they decided to divorce/stay separate from their husbands after enduring long-term oppression and violence. In such a case, the father denied taking the responsibilities of kids and therefore, the mother was required to ensure the kid's upkeep and search for a job.

My husband was not happy with my physical beauty. He was engaged with another lady... My in-laws treated me as their housemaid. I was even deprived of three meals a day. After three years of my marriage, I gave birth to my son and struggled for enough diet during maternity... The miseries amplified when my husband remarried a few months after my childbirth... My brother advised me to divorce my husband and claim for the kid's upkeep through lawsuits. However, my husband escaped appearing in court... Later, I moved to Dhaka and start a job in the factory to ensure our food and clothing (Hasna, Operator, Age: 27, Divorced).

Women's Perception of their Status as Workers

The above-depicted life stories of women indicate how women's miseries in poor households and oppressive conditions in married life push women to the factory gate. Therefore, women's satisfaction with their work is crucial to determine whether their

decision to work reflects their agency or not. Numerous studies highlighted women's vulnerable status as workers where women bear excessive workloads with inhumane wages and face various forms of harassment (Alamgir & Banerjee, 2019; Bhuiyan, 2012; Naved et al., 2018). Women in this study also frequently cited about laborious nature of work for which they get exhausted and suffer from health hazards. Besides, male managers' behaviour towards women is very offensive.

Laborious Work

In the factory, women have to work 10-12 hours a day on average. Besides the long working hour, women struggle to meet per-hour production target which is excessive. During shipment, they are required to work on the weekend and do the night shift. Women mentioned that they give maximum effort to meet the production goal and even can't manage time for urinating; thus, they typically consume less water or no water during the work time so that they feel less pressure to urinate. For extreme workload in an overcrowded and unhealthy (fabric dust, insufficient electric fans) work environment women always endure some common diseases which are also disclosed in other studies (Akhter et al., 2019). In some cases, they face acute illness including difficulty to access sick leave entitlement. The extreme workload is not compensated with a standard living wage, and eventually, an extreme workload with a poverty wage cause malnutrition. Many women mentioned their weight loss after long-term working in the factory in a context of extreme workload and lack of proper diet. Though they need earnings, women expressed distress about the overall workload, however, they have no alternative choices. If they want to quit the garment job, the only substitute work choice will be the work as a housemaid which is not a respectful job, as women shared.

The workload is extreme. I wake up at 5 am in the morning, prepare meal for me and for my family. I have to reach the factory by 8 am. Till then I run the machine until 7 pm or sometimes more than this or even until 10 pm. I just get a little break at lunchtime. Sometimes, we have to work on Friday... I feel very exhausted... even can't spend enough time with my little kid. It's so miserable, but I have to work to support my family (Tania, Operator, Age: 30, Married).

Verbal Abuse and Humiliation

The management intimidates the women workers rudely to meet higher productivity. Male supervisors use abusive, vulgar language and sexualized threats to regulate women's work which is humiliating for women. Women mentioned that foremen address them as a slut, daughter of a bitch, daughter of a pig and so on when they daunt them to meet production targets. Though use of violence to discipline workers is common in Bangladesh (Siddiqi, 2003), in the context of the majority of workers in the garment factories being women and foremen being men, the sexualized nature of violence is evident (Naved et al., 2018).

I did a mistake in stitching a piece. I pleaded with the supervisor not to scold me. He became angry, "Wow! You are begging not to daunt you... should I kiss you! I will enter the whole damage piece inside your vagina (Romela, Operator, Unmarried, Age 19).

Women in this study expressed that they feel embarrassed, humiliated, and disrespected when they face vulgar and sexually explicit threats from male supervisors. They feel desperate to leave the factory rather face vulgarism, however, they are helpless.

If my parents were well-off, I could complete better education and have a good job or I could have a well-off, well-mannered husband, rather than work in the factory and endure indecent behavior. But I am not so fortunate. I struggled for food and clothing in my childhood. After marriage, I face mistreatment and violence in my husband's house. Now I endure indecent rebuke from the factory managers; this is my fate (Hasna, Operator, Age: 27, Divorced).

Don't Want to Continue Work for Long Run

When the women were asked about their future plans regarding the continuation of work in the factory, they shared that they have no intention of carrying on work over a long period of time. Though factory work secures an income that is essential for them, the wage is low with very laborious work, as mentioned by the women.

Because there are garment factories, divorced women like me can survive with their kids. However, we earn at the expense of our health (Rimi, Operator, Age: 28, Divorced).

Women mostly mentioned that if they can save some money, they will return to the village and will try either to buy a small amount of land, build a house or start any kind of small business like tailoring, poultry farming, and so on. Women who have spent almost ten years in the factory felt the urge to take rest. Besides, women are particularly emotional about the indecent behavior from managers and supervisors that humiliate their self-dignity. Even the relatives and neighbors in their village perceive work in the factory as 'bad' because of women's presence in public spaces with men. Women are also influenced by this opinion and feel bad. Therefore, women mostly prefer to stay home rather work in the factory, however, they are required to work.

Sometimes I feel the agony that I had to come outside of the home for work and I can't maintain purdah. My relatives talk badly about me. I have been in the factory for seven years. If I can save some more, I will go back to the village. I will initiate small poultry farming and stay decently at home (Bithi, Operator, Age: 27, Married).

Conclusion

Having a source of earnings is among the fundamental needs of individual life. While explaining women's agency, Kabeer (1999) highlighted the ability to make fundamental choices in life and act upon fulfilling those choices. Kabeer's notion apparently signifies the freedom of choice and actions. In the context of women's less participation in the formal labor market, their employment in garment industries seems to empower women. However, this research reveals that women's decision to join the factory does not indicate their freedom of choice. Except for a few cases, women are mostly compelled to join the factory in a context of severe poverty and struggle for survival. They become bound to work with low wages because there are few job opportunities for poor women with a minimum level of education. Kabeer

(1999) also argues that poverty constrains poor individuals to have limited choices, therefore, have meaningful choices. Thus, the decision to work, where poverty literally pushes the women into the factory gate does not imply a meaningful decision and women's agency. This study reveals that in many cases women were required to work when they were too young to exercise freedom of work decision. The parents, particularly the father took the decision to send the daughter to the factory for earnings. Married women who joined the factory to support their husbands, frequently mentioned their preference to stay home, maintain a good family and keep their decency. However, they were compelled to work as the husband was not in a well-off economic condition. In some cases, even, husbands and in-laws forced women to join the factory and earn. Besides, the vulnerability of divorced and abandoned life compelled women to work as they were bound to shoulder the upkeep of the kids which their husbands escaped. This study concludes that women work either for necessity in a context of acute poverty or they are forced to work, their work decision does not represent their free choice and agency which is also revealed in another study (Habib, 2014).

Regarding agency of choice, Kabeer (1999) highlighted the availability of alternative choices as an important factor. This study reveals that women are not satisfied with the laborious nature of work which is also poorly compensated. They also feel humiliated and disrespected regarding the work regulation where they frequently face sexually offensive behavior from male managers. Besides, local people hold bad perceptions about women who work in the factory. Thus, working in a factory is not a good choice for women in terms of wages, decent work conditions, and self-dignity. However, women have very few alternatives; in most cases, the alternative is to work as a domestic worker, which is not also a respectful job in society. Therefore, this study comes to end that, the decision to join the factory does not signify women's agency.

This study recommended that to be a better alternative, the work in the garment factory should fulfill all the decent working conditions which include a standard living wage for women, reasonable work hours and production goals, a healthy work environment as well as a workplace free of violence and sexualized offense. If decent work conditions are fulfilled the choice to work in the factory would be a better choice for women. The findings of the study would significantly add to the theoretical understanding of women's agency regarding the choice of work, particularly women's agency and empowerment through garment employment in Bangladesh. The findings would also contribute to the policy implications concerning work conditions in the factory as well as an overall change in the family and community's patriarchal culture that constraints women's meaningful choices regarding work decisions.

References:

- Ahmed, F. E. (2004). The rise of the Bangladesh garment industry: Globalization, women workers, and voice. *NWSA Journal*, 16(2), 34-45.
- Akhter, S., Rutherford, S., & Chu, C. (2019). Sewing shirts with injured fingers and tears: exploring the experience of female garment workers health problems in Bangladesh. *BMC International Health and Human Rights*, 19(2), 1-9.
- Alamgir, F., & Banerjee, S. B. (2019). Contested compliance regimes in global production networks: Insights from the Bangladesh garment industry. *Human Relations*, 72(2), 272-297.
- Anwary, A. (2017). Globalization, women factory workers of Bangladesh and their autonomy. *Multidisciplinary Journal of Gender Studies*, 6(3), 1389-1413.
- Bhuiyan, Z. A. (2012). Present status of garment workers in Bangladesh: An analysis. *IOSR Journal of Business and Management*, 3(5), 38-44.
- Billah, M. M., & Manik, M. R. I. (2017). Ready Made Garments'(RMG) Contribution in Women Empowerment: A Study on Bangladesh Perspective. *European Scientific Journal*, 13(29), 1857-7881.
- Butler, S. (2019). Why are wages so low for garment workers in Bangladesh? *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/business/2019/jan/21/low-wages-garment-workers-bangladesh-analysis> (accessed on 17.03.2023)
- Choudhury, Z. A., Luthfa, S., & Gayen, K. (2016). *Vulnerable empowerment: Capabilities and vulnerabilities of female garments workers in Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh Mahila Parishad.
- Habib, M. A. (2014). Women in the garment industry of Bangladesh; a paradox of women empowerment and transformation of structural violence. Master's Thesis, The Arctic University of Norway, Norway.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and change*, 30(3), 435-464.
- Kabeer, N. (2004). Globalization, labor standards, and women's rights: Dilemmas of collective (in) action in an interdependent world. *Feminist Economics*, 10(1), 3-35.
- Kabeer, N. (2008). Paid work, women's empowerment and gender justice: critical pathways of social change. Retrived from https://eprints.lse.ac.uk/53077/1/Kabeer_Paid-work_Published.pdf (accessed on 17.03.2023).
- Kabeer, N. (2012). Women's economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development. CDPR & SOAS, London, UK. Discussion Paper 29/12
- Kabeer, N., & Mahmud, S. (2004a). Globalization, gender and poverty: Bangladeshi women workers in export and local markets. *Journal of International Development*, 16(1), 93-109.
- Kabeer, N., & Mahmud, S. (2004b). Rags, riches and women workers: Export-oriented garment manufacturing in Bangladesh. In *Chains of fortune: Linking women producers and workers with global markets* (pp. 133-164). United Kingdom: Commonwealth Secretariat, Marlborough House.
- Kabir, H., Maple, M., Usher, K., & Islam, M. S. (2019). Health vulnerabilities of readymade garment (RMG) workers: a systematic review. *BMC Public Health*, 19(70), 1-20.

- Khan, M., Anker, R., Aeron, A., & Rob, U. (2014). Socio-economic and sexual security of young women garment workers: A case study of Bangladesh. In M. E. Khan, J. W. Townsend, & P. J. Relto (Eds.), *Sexuality, gender roles, and domestic violence in South Asia* (pp. 55-84). New York: Population Council.
- Khosla, N. (2009). The ready-made garments industry in Bangladesh: A means to reducing gender-based social exclusion of women? *Journal of International Women's Studies*, 11(1), 289-303.
- Kibria, N. (1995). Culture, social class, and income control in the lives of women garment workers in Bangladesh. *Gender & Society*, 9(3), 289-309.
- Kibria, N. (1998). Becoming a garments worker: The mobilization of women into the garments factories of Bangladesh. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development. Occasional Paper 9, pp. 1-22
- Matsura, A., & Teng, C. (2020). Understanding the Gender Composition and Experience of Ready-Made Garment (RMG) Workers in Bangladesh. International Labour Organization.
- McCarthy, N. (2019). Where pay Is lowest for cheap clothing production. Retrieved from <https://www.statista.com/chart/17903/monthly-minimum-wage-in-the-global-garment-industry/> (accessed on 07.05.2019)
- Muni, N. (2006). Women empowerment: Dynamics and dimensions. In D. B. & R. L. Panigrahy (Eds.), *Women Empowerment* (pp. 24-30). New Dehli: Discovery Publishing House.
- Nadiruzzaman, M., Rahman, M., Pal, U., Croxton, S., Rashid, M. B., Bahadur, A., & Huq, S. (2021). Impact of climate change on cotton production in Bangladesh. *Sustainability*, 13(2), 574.
- Naved, R., Rahman, T., Willan, S., Jewkes, R., & Gibbs, A. (2018). Female garment workers' experiences of violence in their homes and workplaces in Bangladesh: A qualitative study. *Social Science & Medicine*, 196, 150-157.
- Neuman, W. L. (2011). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Essex: Pearson Education Limited.
- Paul-Majumder, P., & Begum, A. (2006). *Engendering Garment Industry: The Bangladesh Context*. Dhaka: The University Press Limited.
- Raihan, S., & Bidisha, S. H. (2018). Female employment stagnation in Bangladesh. ODI, The Asia Foundation & ukaid, Research Paper.
- Saldaña, J. (2009). *The coding manual for qualitative researchers*. London: Sage.
- Sharmin, N., & Khanam, D. (2017). Role of readymade garment sector in changing the livelihood pattern of rural women: An analysis of garment workers in Bangladesh. *IMPACT: International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences*, 5(11), 27-36.
- Siddiqi, D. M. (2003). The sexual harassment of industrial workers: Strategies for intervention in the workplace and beyond. CPD & UNFPA. Paper 26.

- Sikdar, M. M. H., Sarkar, M. S. K., & Sadeka, S. (2014). Socio-economic conditions of the female garment workers in the capital city of Bangladesh. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(3), 173-179.
- Swazan, I. S., & Das, D. (2022). Bangladesh's emergence as a ready-made garment export leader: an examination of the competitive advantages of the garment industry. *International Journal of Global Business and Competitiveness*, 17(2), 162-174.
- World Bank (2002). Empowerment and Poverty Reduction: A Source Book.
- Zaman, S. (2021). Researching the garment sector in Bangladesh: fieldwork challenges and responses. In *Field Guide for Research in Community Settings* (pp. 75-84): Edward Elgar Publishing.

Date of Submission : 21.03.2023

Date of Acceptance : 04.06.2023

A Contextual Analysis of Financial Social Work in the Light of Islam

Tareq Muhammad Shamsul Arefin*
Mohammad Sajjad Hossain**

Abstract

Within the contemporary neo-liberal society, mainly in the western world, various unresolved social frictions pave the way for a new specialized social work discipline of Financial Social Work (FSW). The unresolved social frictions stem from the structural impediments that lie within the prevailing western economic system of modern capitalism. The nature of the friction is increasingly becoming large and expected to become a social problem as the extent of the inequality in terms of economic opportunity, resource utilization becomes more skewed in favor of fewer people than to majority. Thus, the newly emerged FSW, in its infancy, finds it very hard to make an impact. In this regard, the current paper showed that the basis of social work in Islam is always deeply rooted in financial policy and circulation. So FSW is not a new phenomenon to Islam; rather, from its beginning, Islam recommended unique FSW through Zakat (mandatory alm tax) and Waqf (charity endowment) to deal with the persistent nature of societal inequality in terms of economic and resource utilization. The paper recommends that the emerging FSW discipline should adopt the FSW principle revealed in Islam to successfully deal with the arising social problems related to financial disparities. In this regard, scholars should become more enthusiastic and open-minded to keep behind the egoistic thoughts that may arise as historically, the developing world tends to imitate the perceived superior western social work model despite those being alien to the local society.

Keywords: Financial Social Work, Islamic Finance, waqf

1. Introduction

In the 1940s, Social work was introduced to achieve social change and reform in underdeveloped countries, which sought to emulate developed nations. At that time, American social work was seen as the most advanced, and local social work educators embraced the American model (Ragab, 2016). However, the socioeconomic problems of pre-industrializing countries were vastly dissimilar to those of post-industrialized countries (Szirmai, 2005; Ragab, 2016). Furthermore, the incongruencies between the basic assumptions of the imported model and local cultural and religious beliefs became evident, but only some questioned the appropriateness of applying the American model (Gray & Coates, 2010). The indigenization of the social work movement emerged in the 1970s as a solution to the issue of incongruity between the imported model and local conditions. However, it suffered from shortcomings, such as assuming the transplanted model was

* Associate Professor, Department of Economics, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

** Associate Professor, Department of Social Work, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh

basically sound and did not subsume any specific procedure for identifying aspects of the imported model that conflict with local realities (Gray & Coates, 2010; Ragab, 2016). Today, after more than three decades of doubts and expressions of dissatisfaction, the need for a more radical rethinking of the whole issue of indigenization is almost universally recognized (Ragab, 2016). Despite that, in recent times, globalization has significantly impacted the world, causing most underdeveloped countries to prioritize economic development as their most crucial social policy (Rudra & Haggard, 2016). Consequently, as a by product of imitating the western economic model, the inconsistent social work model of America and other developed countries has become prevalent in underdeveloped nations across the globe.

In the meantime, within the developed world social systems, various social frictions have emerged and remained unsolved. These frictions stem from the view of economic opportunity and the fairness of resource utilization that is considered the basis of the social system in developed countries. Consequently, inequality is gradually increasing within those societies mainly based on capitalism (Jodhka , Rehbein, & Jessé , 2017). Moreover, the increasing frequency and reoccurring crises within the financial system have resulted consistency in social problems centred around income and wealth inequality. In response, Financial Social Work (FSW) has emerged as a modern social work discipline (Delavega & Cordero, 2019). However, under capitalism, FSW faces several challenges and problems. The pursuit of profit often takes precedence over the well-being of people, leading to social and economic inequalities, poverty, and exclusion (Jodhka , Rehbein, & Jessé , 2017; Delavega & Cordero, 2019). Social workers may find themselves working within a system that perpetuates these problems rather than addressing their underlying causes (Silverman, 2018). They may also face pressure to prioritize cost-effectiveness and efficiency over the needs of their clients (Silverman, 2018).

Furthermore, capitalism often fosters a culture of individualism and self-reliance, which can undermine the collective responsibility and community support that are essential to social work (Jodhka , Rehbein, & Jessé , 2017). The emphasis on competition and market-driven solutions can also limit the scope of social work interventions and neglect the systemic and structural issues that perpetuate social problems. To address these challenges, social workers may need to challenge the status quo and advocate for systemic change. This may involve working with grassroots movements, promoting alternative economic models, and advocating for policies that prioritize the well-being of people over profit (Delavega & Cordero, 2019). It also requires a critical reflection on the role of social work within capitalist societies and a commitment to social justice and empowerment for all.

Above this backdrop, the present paper lays bare the fact that in the context of the inherent problems of capitalist society, the newly emerged FSW is very old from the Islamic perspective. Islamic principle for FSW has been in vogue since the advent of Islam. This paper recommends that contemporary FSW should not adhere to a Nineteenth-century positivist/empiricist epistemology; rather, it should include religious concepts in professional practice through the theoretical breakthroughs of

the Islamization of knowledge movement and spirituality in the social work movement.

This article uses a consequential thematic inquiry; first, the underlying reasons for the emergence of the financial social work discipline in contemporary times and the effectiveness of its contemporary application are reviewed. Second, the evaluation from the review is compared with the Islamic basis of social work. In view of the comparison, the position and nature of financial social work on the basis of Islam have been identified. On this basis, the paper is structured in the following way, the evolution of FSW in the field of social work today is reviewed in Section 2. Subsequent to Section 2, Section 3 covered the theoretical underpinnings of the social work discipline in light of Islam. The relevance of FSW in the application of this theoretical underpinning for practice is then examined in section 4. In the end, section 5 concludes.

2. Evolution of Financial Social Work (FSW)

Social workers have a strong commitment to enhancing the well-being of individuals and advocating for the fulfillment of their basic needs (National Association of Social Workers [NASW], 2017). There are a variety of avenues that social workers can pursue in order to accomplish this goal, including the fields of criminal justice, educational social work, and mental health practice.

Over the course of the past two decades, one strategy known as financial social work (FSW) has garnered an increasing amount of interest. Financial social work is a specialized area of social work that focuses on building financial capability and well-being for individuals, families, and communities to broaden the quality of life (Sherraden, Frey, & Birkenmaier, 2016; Sherraden & Huang, 2019). Every person and family, at some point in their lives, is influenced by economic factors, and the degree to which individuals and families within a community are able to meet their financial obligations is an essential component of overall human well-being. Within the modern capitalist system, many people remain in vulnerable and marginalized positions solely measured in terms of financial well-being, and the main reason for that is directly related to their financial capability (Sherraden & Huang, 2019). Even though many social workers deal with money problems, they usually do so along with other problems. Whereas the practice of FSW places a primary emphasis on economically disadvantaged communities and populations. This includes individuals and families with low incomes and low wealth, ethnic and racial minorities, children and youth, older adults, and people living with disabilities (Birkenmaier, Sherraden, & Curley, 2013; Frey, Svoboda, Sander, Osteen, Callahan, & Elkinson 2015; Morrow-Howell & Sherraden, 2015; Frey, Sherraden, Birk, & Callahan, 2017).

The removal of structural barriers and an increase in access to safe financial services, opportunities to build assets, household financial policies, as well as financial education and guidance for low- and moderate-income families and vulnerable populations are among the goals of the FSW (Frey, Sherraden, Birk, & Callahan, 2017). The person-in-environment perspective, which is the foundation of social work, is the source of this approach's attention on the structural, social, and

institutional factors that determine a person's financial well-being (Kondrat, 2013). According to the International Federation of Social Workers, FSW is practiced, researched, and legislated by social workers in accordance with "principles of social equity, human rights, collective responsibility, and respect for diversities," all of which are grounded in social science theory (International Federation of Social Workers, 2023). The ethical obligations of social workers to alleviate oppression and human hardship, including economic suffering, are aided by FSW (NASW, 2017).

Initially, FSW focuses almost exclusively on the psychosocial aspects of financial behavioural change. That change required understanding the thoughts, feelings, attitudes, and behaviours which determine an individual's relationship with money and himself (Silverman, 2018). However, over the course of the twenty-plus years spent creating FSW, the world has grown more complex, and so has personal finance. To keep pace, FSW has continued to broaden the model, still, financial behaviour remains a core component of FSW and financial health (Delavega & Cordero, 2019).

Within recent approach focus on FSW in the domain of Macro social work. As FSW is a specialized field of social work that focuses on addressing large-scale social issues and systems that impact individuals, families, and communities (Birkenmaier, Kennedy, Kunz, Sander, & Horwitz, 2013). The application of FSW is more concerned with understanding and changing social policies, institutions, and communities to promote social justice, equity, and empowerment. Examples of FSW's macro social work practice can be clear as it includes working to improve access to affordable housing, developing and implementing policies that promote economic justice and address poverty, and advocating for legislative changes that benefit marginalized or oppressed populations to specific social Safety Net programs (Birkenmaier, Kennedy, Kunz, Sander, & Horwitz, 2013). Thus, the contemporary way of defining FSW is that it is an interactive and introspective, multidisciplinary approach with a holistic view.

3. Theoretical Underpinning of Social Work in Islam

We discuss the theoretical basis of social work in Islam from the context where the principles and values of Islam integrate into social work practice. Understanding such a basis is important because, from a theoretical point of view, there are some similarities between the principles of Islam and core values in social work, such as human dignity, social justice, helping those in need, and integrity. Simultaneously, there are also significant differences between the Islamic perspective and the mainstream approach to professional social work (Ragab, 2016; Isgandarova, 2022). These differences can be seen in the areas of epistemology, ontology, and cosmology, as well as in spirituality, a hierarchy of human needs, a source of help, and an approach to solving problems (Isgandarova, 2022). How these differences confine the concept of society in Islam and, thus, the basis of social work is briefly elaborated in the following of this section.

3.1 Tawhid the epistemological and ontological basis of social work

Islamic epistemology identifies the source of knowledge needed to operationalize social work from an Islamic standpoint. Thus, it is necessary to have a thorough understanding of Islamic epistemology, which includes revealed knowledge and acquired knowledge. The former is derived from the Qur'an and Prophet Mohammad's (PBUH) traditions, while the latter is based on human interaction with the surroundings. This implies that, in practice, both types of knowledge can be utilized by clients and social workers to address needs and problems (Barise, 2005).

Moreover, understanding Islamic ontology is crucial for those operating within an Islamic framework, as it involves recognizing the two domains of reality, the seen and the unseen (Barise, 2005; Hussain, 2021). The former can be known through acquired knowledge, while the latter is only accessible through a revealed knowledge. In Islam, all creatures coexist according to God's will, and accepting Islam means becoming part of this harmonious coexistence (Hussain, 2021). This unique conception of human ecology emphasizes the importance of achieving internal and external harmony and peace, which is a fundamental concept in Islam (Choudhury, 2019). This fundamental concept, which is known as Tawhid, is the basis of the society in Islam.

The concept of Tawhid, the belief in the Oneness of God, is the keystone that implies that all people are equal in the eye of Allah, regardless of their race, ethnicity, or social status. This idea of equality forms the interrelations among society members, which emphasizes the importance of social justice and the well-being of the community (Choudhury, 2019). Thus, the concept of Tawhid determines the individual's role and obligation and extends their interdependence within society. For instance, individuals are responsible not only for their own spiritual well-being but also for the well-being of the community (Huda, Sudrajat, Muhamat, Teh, & Jalal, 2019). Muslims are encouraged to work for the common good and to show compassion and generosity towards others (Isgandarova, 2022). Thus, a sense of responsibility and social obligation, and the importance of cooperation and mutual support within the Islamic concept of society, is solely derived from the principle of Tawhid, the belief in the Oneness of God. Furthermore, the concept of Tawhid encourages Muslims to recognize the interconnectedness of all things and to view the natural world as a manifestation of Allah's divine plan (Choudhury, 2019). This worldview emphasizes the importance of preserving the environment and using resources in a responsible and sustainable way for the benefit of current and future generations (Hussain, 2021).

In a nutshell, Tawhid contemplates the interconnectedness of all creation in society. This emphasizes the importance of recognizing the inherent dignity and worth of all individuals and working to build strong, supportive communities within the context of social work in Islam.

3.2 Social Justice by the principle of Adl ensures social cohesion

Adl, which means justice, is one of the fundamental principles of Islam. It is considered a core value of Islam and is deeply rooted in the belief in Tawhid, the

oneness of God. The concept of justice is undoubtedly significant in Islam, as it is considered one of God's names mentioned in the Quran (Mughal, 2015). Tawhid is the central concept of Islamic theology, and it refers to the belief in the unity and oneness of God in all aspects of existence. This belief in the oneness of God has profound implications for the understanding of justice in Islamic theology (Smirnov, 1996). According to the Islamic understanding of Tawhid, God (Allah Subhanatala) is the ultimate source of all existence and the ultimate authority over all aspects of creation, including human beings. As such, God is considered the ultimate arbiter of justice (Mughal, 2015). This means that the concept of justice in Islam is not limited to human-made laws or social customs but is derived from divine will.

The belief in Tawhid also implies that all human beings are equal before God. There is no distinction between people based on race, ethnicity, or social status. All human beings are considered equal in the eyes of God, and justice demands that they be treated equitably. In Islamic theology, the concept of justice is inseparable from the concept of Tawhid, as justice is an essential part of God's nature and an integral aspect of the oneness of God. Moreover, the Islamic understanding of Tawhid emphasizes the interconnectedness of all things. All creation is interconnected and interdependent, and justice demands that all beings be treated with respect and dignity (Mughal, 2015; Choudhury, 2019). In Islamic thought, injustice is considered a violation of the balance and harmony of the universe which God has created (Smirnov, 1996). This is why the principle of Adl, or justice, is considered a central aspect of the Islamic worldview.

In a nutshell, the concept of Adl, or justice, can be derived from the belief in Tawhid, the oneness of God. The Islamic understanding of Tawhid emphasizes the unity and interconnectedness of all things and the need to treat all beings with respect and dignity. Justice is an integral aspect of the oneness of God, and it demands that all beings be treated equitably. Therefore, the principle of Adl is deeply rooted in the Islamic belief in Tawhid and reflects the faith's deep commitment to social justice and the well-being of all human beings.

Adl is also seen as the foundation of social harmony, ensuring that individuals and communities are treated equitably and that disputes are resolved fairly (Ismail, n.d.; Mughal, 2015). The Quran repeatedly emphasizes the importance of justice in human affairs. According to the Al Quran, Allah Subhanatala created the universe with order and justice, and human beings have a responsibility to maintain that order by establishing just societies (Mughal, 2015). In Islamic society, the principle of adl plays a vital role in shaping the social and political order. It establishes a moral framework for human behavior, guiding individuals to act with fairness and compassion towards others (Ismail, n.d.). The principle of adl is reflected in Islamic law, which seeks to ensure that justice is upheld in all areas of society. Islamic law includes detailed provisions for criminal justice, contract law, property rights, and other areas of social life (Mughal, 2015). These laws are designed to protect the rights of individuals and to ensure that disputes are resolved in a fair and equitable manner. Adl also plays a crucial role in promoting social cohesion and stability. By upholding the principle of justice, Islamic society seeks to create a harmonious

environment in which individuals can flourish, and communities can thrive. Adl encourages individuals to work together for the common good and to establish social institutions that promote justice and equality (Mughal, 2015).

In synthesis, the principle of Adl is an essential element of Islamic society, shaping its moral, legal, and social order. Adl plays a critical role in promoting social harmony, ensuring that individuals and communities are treated equitably, and creating a just and compassionate society. As such, it is a core value of Islamic civilization, reflecting the faith's deep commitment to social justice and the well-being of all human beings.

3.3 Islam's theological foundation for social work: Khidmah

What would be the extent of social work within the Islamic framework has been identified by the concept of Khidmah. Khidmah is defined as doing good deeds for the sake of God, mankind, and the environment. A "Khadim" is someone who provides this type of assistance. In the Quran (2:30, Oxford World's Classics translation), Khulafa al-Ard (or vicegerent of the Earth) are held to a high standard for those who aspire to the position of Khadim. In other words, Khadim is a person of exceptional virtue, goodness, and love who is committed to the highest principles and works to make the world a place where everyone can thrive. Khidmah deeds are distinguished by their special capacity to leave a sweet flavor in the minds of their recipients. Promoting peace, bettering circumstances, and holding people accountable all require good goals, accuracy, truthfulness, selflessness, and sincerity (Al-WifaqUlm, 2017).

Hussain (2017) explains that the Khadim understands "preserving peace" to mean working toward reconciliation between groups of people who have been wronged or oppressed through means of supporting justice, diplomacy, and healing. To the Khadim, "improvement" means giving people the resources they need to satisfy their own needs and overcome obstacles of any kind. To "hold individuals to account," you should give them constructive criticism without being hostile. The Khadim's eloquence (adab) and insight (hikmah) soften the blow of the truth when it is presented.

Thus, social work from an Islamic perspective aims to help the client achieve a state of total emancipation, except for subservience to God, by meeting their lawful needs and promoting internal and external harmony (Hussain, 2017). It is grounded in the belief that all individuals have inherent dignity and worth and that social work practice should be informed by Islamic ethics and values (Hussain, 2017; Hussain, 2021; Isgandarova, 2022).

From the above discourse, it is clear that the Islamic perspective on social work differs significantly from the mainstream (conventional) approach in various aspects. Understanding Islamic epistemology and ontology, as well as the concept of human ecology, is crucial to operating within an Islamic framework and providing effective social work services to clients.

4. How has Islam incorporated financial social work?

4.1 The Basis for Social Justice

Financial social work within Islam is based on the principles of social justice, charity, and compassion toward those in need (Barise, 2005). In particular, the concept of social justice gets more emphasis. The term "social justice" emerged in political discourse in the early 19th century and was popularized by political thinkers such as John Stuart Mill (Brodie, 2007). It denotes the notion that the distribution of resources in a society should align with principles of justice. Two major conceptions of social justice have been proposed: one based on merit and desert and the other on need and equality (Brodie, 2007).

While the ideal of social justice in Islam promotes the distribution of resources and opportunities to all individuals, regardless of their social status, race, or gender (Hassan & Kayed, 2009). Islam recognizes that humans are born with varying gifts, both physical and mental, which are shaped by their environment, circumstances, and hereditary traits. As a result, it is natural that economic inequalities exist among people (Hasan, 1971; Barise, 2005; Dhar, 2013). Islam allows for individual initiative in wealth creation and private ownership of property, which further contribute to such disparities. Moreover, economic and social inequalities are part of the Divine scheme through which God tests and distinguishes between the good and the bad (Choudhury, 2019).

Thus, the Islamic economic system is designed to ensure that basic human needs are guaranteed to all citizens of the Islamic state. Islam obligates the affluent to provide for the poor and destitute, as per the Quranic verse, "And in whose wealth there is a right acknowledged for the poor beggar and the destitute" (Quran 70:24-25, Oxford World's Classics edition). When asked about the appropriate amount of wealth to be spent for the welfare of the needy, the Quran advises that one should spend beyond their needs (Quran 70:24-25, Oxford World's Classics edition). Therefore, the Islamic scripture expects the wealthy to utilize their surplus wealth for the betterment of their less fortunate brethren whenever the situation requires it.

Islam acknowledges that unequal distribution of wealth is part of the Divine Scheme, but it discourages wide disparities. Unfair distribution can cause conflict and threaten social peace, which goes against Islam's message of fraternity and brotherhood (Hassan & Kayed, 2009). Therefore, Islam promotes fair distribution of income and wealth among its followers for their well-being. That is why a fundamental tenet of Islamic social justice is the eradication of economic exploitation perpetrated by the powerful against the vulnerable (Hasan, 1971; Isgandarova, 2022). Islam has undertaken various measures to achieve this end. The repudiation of 'Riba', or usury, a pernicious tool of human exploitation, is one such step that has been fully implemented. Other instruments of human exploitation, including bribery, gambling, speculative transactions, fraudulent practices, prostitution, and embezzlement, have also been categorically prohibited in Islamic society (Arefin, Nurullah, & Senghore, 2022). In addition, Islam has established comprehensive legislation to safeguard the

interests of weaker segments of society, such as women, orphans, slaves, laborers, tenants, and consumers (Hasan, 1971).

In this context, the practice of zakat and waqf has been instrumental in promoting financial social work within Islam. They have played a vital role in addressing poverty, inequality, and other social issues within Muslim communities. By promoting the principles of social justice, charity, and compassion, zakat, and waqf have helped to foster a culture of giving and generosity within Muslim communities. In the following subsections, we discuss their essence and roles in the context of social work.

4.2 Zakat

Zakat, the third pillar of Islam, is an obligatory charitable donation that Muslims are required to give every year. It is based on the principle of wealth redistribution. It is defined as a specific amount from a particular wealth for the benefit of those entitled to receive it, as listed in the Quran. Zakat is calculated at 2.5% of a person's wealth and is given to the poor, needy, and other deserving individuals in society (Dhar, 2013). Zakat funds can be used for a wide range of purposes, including providing food, clothing, shelter, healthcare, education, and other basic needs. It is a significant financial resource for wealth circulation within the economy and maintaining social cohesion (Malik, 2016). Serving mankind is essential in Islam, and Zakat is a foundation of the Islamic economy based on social welfare and fair wealth distribution to the needy (Ibrahim, 2015).

Analyzing the payment of zakat through the theoretical basis of social work according to Islam —Tawhid, Adl, and Khidmah— revealed it is the application of mandatory social work within the religion. For instance, Zakat in Islam expresses the concept of Tawhid, or the belief in Allah's oneness, in several ways. Firstly, it acknowledges Allah's ownership of all wealth and possessions and emphasizes that humans are merely caretakers of these resources. By paying zakat, Muslims express their gratitude for Allah's blessings and recognize His ownership of their wealth. Secondly, zakat strengthens community ties by promoting the well-being of fellow Muslims and showing compassion towards the less fortunate (Ibrahim, 2015). This fosters a sense of unity and harmony within the community. Thirdly, zakat is seen as a means of purifying one's wealth and possessions from greed and selfishness, cultivating a spirit of generosity and altruism, and reinforcing the idea that wealth is a means of serving Allah and humanity (Barise, 2005; Huda, Sudrajat, Muhamat, Teh, & Jalal, 2019).

In addition to reflecting the idea of Tawhid, zakat also embodies the principles of justice and fairness. Firstly, it is a means of redistributing wealth from the rich to the poor and ensuring that all members of society have access to basic needs (Dhar, 2013). This helps to prevent marginalization and ensure equal opportunities for all. Secondly, zakat promotes compassion and empathy among Muslims and encourages them to help others in need. It also encourages accountability and transparency in the distribution of wealth, promoting a sense of responsibility and preventing corruption and abuse of power (Ibrahim, 2015).

Lastly, zakat reflects the idea of *Khidmah* (service) in Islam. Firstly, it serves the poor and needy by providing financial support to those struggling to meet their basic needs. Secondly, paying zakat is considered a religious obligation in Islam and a means of fulfilling one's duty to Allah. Thirdly, zakat encourages generosity and selflessness among Muslims, reinforcing the idea that serving others is a noble and virtuous act (Huda, Sudrajat, Muhamat, Teh, & Jalal, 2019). Finally, it strengthens community ties by contributing to the well-being of fellow believers and promoting a sense of unity and harmony within the Muslim community.

Besides, zakat is also intended to reconcile hearts and enhance social cohesion in a multicultural society (Muhfeeth, 2021). It has been practiced since the early days of Islam, and even Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) disbursed Zakat funds to non-Muslims (Muhfeeth, 2021). Some scholars of Islam believe that Zakat funds may be distributed to non-Muslims to bring them closer to Islam and promote Islamic ethics and way of life. Distributing Zakat funds to non-Muslims can serve a broad purpose, including promoting prophetic mercy and love and eventually convincing them to be part of the community. The goal is to enhance social cohesion in a multicultural society (Muhfeeth, 2021). Excessive wealth disparities in any society can threaten social cohesion, and ethnic and cultural diversity can either enrich or divide a community. Managing diversity through Zakat is critical to prevent hate, intolerance, and violence in multi-cultural, multi-ethnic, and multi-religious societies.

4.3 Waqf

Waqf is a concept that involves the endowment of property or money for charitable purposes. The property or money is donated in perpetuity, and the income generated from the endowment is used to support various social and religious causes (Hoexter, 1998). Waqf can be used to support a wide range of activities, such as building schools, hospitals, and other infrastructure, as well as supporting the poor, orphans, and widows (Hoexter, 1998).

The concept of waqf is based on the religious tenet that man is merely the administrator of God's kindness, and that God is the true possessor of all (Kahf, 2003). Within the sphere of humanity, the idea of waqf represents the divine qualities of justice, kindness, and caring (Kahf, 2003). The religiously inspired concept of waqf sees itself as an ideal principle for peace in society, in contrast to the social question that arose in Europe after industrialization (Hoexter, 1998). Social justice is a fundamental religious obligation in Islam. A prophetic saying found in Muslim *Ṣaḥīḥ* (Hadith No. 1631), claims that after death, a person's capacity for good deeds expires. Nonetheless, some socially beneficial behaviors might continue to be advantageous to society long after a person has passed away. Three examples were provided by the Prophet: the perpetually productive fundraising activities, the sharing and sustaining of knowledge, and the prayer of a well-educated individual for their parents, leading to an increase in their good deeds. The concept of waqf is founded on the principle of continuous and productive fundraising activities, reflecting the belief that good deeds can have an everlasting impact.

The roots of waqf as a means of promoting social welfare can be traced back to Prophet Mohammad's (PBUH) practice of establishing a shelter for the socially disadvantaged and needy, known as *ahlu-ṣ-ṣuffa* (Sadeq, 2002). The *ahlu-ṣ-ṣuffa* personified the Islamic concept of oneness (Kahf, 2003). The majority of the shelter's residents were impoverished and defenceless people who had fled to Medina in search of protection from the Prophet. People who had recently fled Mecca sought refuge there until they could make local connections. Many people in Medina did not know anyone else who lived there, and they lacked the means to support themselves. Those who were social outcasts in Medina ended up calling the *ṣuffa* their constant residence. The impoverished people of the *ṣuffa* were always important to the Prophet, so he charged his closest companions and his daughter Fatima with levying the alms tax and distributing the money to the *ṣuffa*'s needy residents (Sadeq, 2002; Kahf, 2003). The *ṣuffa* was the first organization of its kind in Islamic history, providing aid to those in need.

When Medina was in existence, the original refuge developed into a community of learning through the social financial institution: Waqf. Living in poverty and being dependent on others for financial support eventually resulted in the formation of an ascetic community with an important social purpose centred on education. The residents of this community were tasked with the responsibility of looking after and educating young Muslims. Uthman ibn Affan, a companion of the Prophet and his brother-in-law, purchased a well with his own money and made it available to all the people living in Medina as a "public water dispenser" (Al-Tirmidhi: Jami' al-Sahih, Hadith No. 3703). This public good financed by Waqf paved the way for the Muslims to integrate themselves into the society of Medina. There are accounts that are very similar to this one that concerns Umar ibn al-Khattab, the second caliph. He was instrumental in the establishment of waqf as a state-run organization (*diwan*) (Bukhari: Sahih, Hadith No. 2737; Muslim: Sahih, Hadith No. 1632). His property was no longer eligible for sale, inheritance, or charitable contribution. God is the one who will receive the offering forever, but those in need will share in the proceeds.

Waqf has been a continuous factor in enhancing social welfare in Islamic civilization. In his significant travel journal, "ar-Rihla," Moroccan traveller Ibn Baṭṭūṭa praised the effectiveness of waqf in Damascus, particularly the 'public foundation for the protection of the household' (Badawia, 2022). In his view, waqf exemplified the virtues of unity and social bonds. Ibn Jubayr shared this view, arguing that strangers' generosity and the services provided by public charities are indispensable to the well-being of travellers (Badawia, 2022). Researchers from Egypt's Ministry of Endowments looked back at waqf's long history of service as a provider of public good to determine its impact on modern society. A wives' house in Cairo shields women during divorce or family disputes; a foundation in Fes helps the visually impaired; a facility in Beirut distributes daily bread; and these are just a few of the many examples of Islamic social welfare highlighted in the study (Badawia, 2022). Besides the well-known mosques, clinics, and universities, these are also important institutions.

The waqf concept reflects the basic social work principles of Islam. For instance, Tawhid is expressed through waqf as it is seen as an act of devotion and charity to God, who is the ultimate beneficiary of the endowment. The purpose of waqf is to serve the needs of the community, which is also an expression of Tawhid. Additionally, the perpetual nature of waqf reflects the eternal nature of God, who is seen as the Everlasting, the Eternal, and the Absolute.

The principle of Adl is also expressed through waqf in several ways. Waqf is an act of charity that seeks to address the needs of the less fortunate members of society. It can also be used to promote economic and social justice in society by ensuring that the benefits of wealth and services are shared more widely across society. The perpetuity of waqf ensures that the benefits of the endowment continue to accrue to the community over time, reflecting the idea of fairness and equity in the distribution of resources and opportunities over time.

The concept of Khidmah is expressed through waqf in several ways as well. Creating a waqf is an act of service to the community, fulfilling the donor's responsibility to the community and expressing their commitment to the principle of Khidmah. Additionally, waqf can be used to provide essential services to the community, and the perpetuity of waqf ensures that the act of Khidmah continues long after the donor's lifetime. The management of waqf assets also requires a high degree of diligence, responsibility, and accountability, which reflects the principle of Khidmah in the management of resources.

In brief, through waqf, Muslims can fulfill their religious obligation to serve the needs of the community, promote economic and social justice, and provide essential services to members of society. The perpetuity of waqf ensures that the benefits of the endowment continue to serve the community for generations to come, reflecting the Islamic principles of fairness, equity, and sustainable social service.

The contemporary uses of waqf for social welfare are mainly through either private foundation (*al-waqf al-ahlī* or *al-dhurī*) or public foundations (*waqf khayrī*). Private foundations are established for a specific purpose within an extended family, while public foundations are dedicated to a specific purpose for the common good (Badawia, 2022). Other examples of social welfare foundations are donation stations for clothing, milk, and baby food, accommodation for strangers and passersby, public dining facilities, and public cleaning services for clothes, blankets, and household equipment. There are also foundations dedicated to the establishment of public drinking water donors and irrigation channels.

Thus, it is evident that waqf is a fundamental aspect of Islamic practical theology that demonstrates a tangible expression of faith and devotion to Allah. It reflects the concept of sadaqah (charity) in Islam as a way to attain closeness to Allah and receive rewards in the hereafter. Moreover, waqf serves as a powerful example of how Islamic practical theology can promote social justice and contribute to the betterment of society. Through establishing waqf, individuals can play an active role in creating a more compassionate and equitable world. Additionally, waqf has provided support to marginalized groups such as the poor, widows, and orphans,

further promoting social justice in Islamic societies. Waqf is one of the better methods of financial social work that can help promote social justice by enabling individuals to establish waqf to support marginalized communities and address financial challenges. Financial social workers can work with individuals to identify the most effective ways to establish waqf, such as identifying the most pressing needs of the community and determining the appropriate type of waqf to establish. This approach can enable individuals to actively participate in creating a more equitable and just society while also addressing the financial needs of their communities.

5. Conclusion

Drawing on the evolution of FSW and the challenges faced by professional social workers in both developed and developing nations, this article argues that contemporary financial social work could not be able to succeed because of the prevailing economic system that is based on capitalism—it prioritizes profit over the well-being of people. This system is bound to leading social and economic inequalities, poverty, and exclusion. Though FSW has emerged as a response to these challenges, unfortunately, it is by default limited by the capitalist system. This paper suggests that an Islamic perspective can provide a solution to these problems, as Islamic principles for social work have existed since the advent of Islam.

The discussions in the paper revealed that the theoretical basis of social work in Islam is deeply rooted in the principles and values of the religion, which emphasize the importance of recognizing the inherent worth and dignity of all individuals and building strong, supportive communities. The concept of tawhid, which is the belief in the oneness of God, forms the foundation of society in Islam and is inseparable from the principle of justice (Adl). The interconnectedness of all things is also emphasized in Islamic theology, highlighting the importance of achieving internal and external harmony and peace. Khidmah is the theological foundation for social work, defined as doing good deeds for God, mankind, and the environment, and Khulafa al-Ard are held to a high standard as Khadim, persons of exceptional virtue, goodness, and love who work to make the world a better place. Social work, from an Islamic perspective, aims to promote total emancipation except for subservience to God by meeting clients' lawful needs and promoting internal and external harmony. Thus, FSW within Islam is rooted in social justice, charity, and compassion towards those in need, promoting the fair distribution of resources and opportunities to all individuals, regardless of their social status, race, or gender. Through establishing waqf and managing diversity through zakat, individuals can contribute to the betterment of society and promote social cohesion and harmony. It is evident from this article that understanding Islamic epistemology and ontology, as well as the concept of human ecology, is essential to providing effective social work services to clients. Therefore, the article recommends that contemporary FSW should not adhere to a Nineteenth-century positivist/empiricist epistemology but should include religious concepts in professional practice through the theoretical breakthroughs of the Islamization of knowledge movement and spirituality in the social work movement.

Reference:

- Arefin, T. M., Nurullah, M., & Senghore, S. (2022). Why Islamic Finance is Panacea for Addressing Crisis in Financial Markets. *Jagannath University Journal of Arts*, 12(2).
- Badawia, T. (2022). Islamic Practical Theology: waqf and zakāt as Theological Foundations. In H. Schmid , & A. Sheikhzadegan (Eds.), *Exploring Islamic Social Work : Between Community and the Common Good* (pp. 151-164). Springer.
- Barise, A. (2005). Social Work with Muslims: Insights from the Teachings of Islam. Retrieved January 24, 2023, from <https://ojs.uwindsor.ca/index.php/csw/article/download/5660/4627?inline=1>
- Birkenmaier, J., Curley, J., & Sherraden, M. (Eds.). (2013). *Financial education and capability: Research, education, policy, and practice*. Oxford University Press.
- Birkenmaier, J., Kennedy, T., Kunz, J., Sander, R., & Horwitz, S. (2013). The Role of Social Work in Financial Capability: Shaping Curricular Approaches. In J. Birkenmaier, J. Curly, & M. Sherraden (Eds.), *Financial Capability and Asset Development: Research, Education, Policy, and Practice* (pp. 278-301).
- Brodie, J. M. (2007). Reforming Social Justice in Neoliberal Times. *Studies in Social Justice*, 1(2).
- Choudhury, M. A. (2019). *Meta-Science of Tawhid : A Theory of Oneness*. Springer.
- Delavega, E., & Cordero, K. R. (2019). The Ethics of Financial Social Work. *Journal of Social Work Values and Ethics*, 16(2).
- Dhar, P. (2013). Zakat as a Measure of Social Justice in Islamic Finance : An Accountant's Overview. *Journal of Emerging Economics and Islamic RResearch*, 1(1), 1-11.
- Frey, J. J., Sherraden, M., Birk, J., & Callahan, C. (2017). Financial Capability and Asset Building in Social Work Education. *Journal of Social Work Education*, 53(1), 79-83.
- Frey, J. J., Svoboda, D., Sander, R. L., Osteen, P. J., Callahan, C., & Elkinson, A. (2015). Evaluation of a continuing education training on client financial capability. *Journal of Social Work Education*, 51(3), 439-456.
- Gray, M., & Coates, J. (2010). 'Indigenization' and knowledge development: Extending the debate. *International Social Work*, 53(5). doi:10.1177/0020872810372160
- Hasan, A. (1971). Social Justice in Islam. *Islamic Studies*, 10(3), 209-219.
- Hassan, M. K., & Kayed, R. N. (2009). The Global Financial Crisis, Risk Management and Social Justice in Islamic Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1(1).
- Hoexter, M. (1998). Waqf Studies in the Twentieth Century: The State of the Art. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 41(4), 474-495.
- Huda, M., Sudrajat, A., Muhamat, R., Teh, K. S., & Jalal, B. (2019). Strengthening divine values for self-regulation in religiosity: insights from Tawakkul (trust in God). *International Journal of Ethics and Systems*, 35(3), 323-344.

- Hussain, A. (2017). Islam in the 21st century: Challenges and opportunities for social work with Muslims. *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought*, 36(1-2).
- Hussain, T. (2021). Reimagining Social Work From an Islamci Worldview. 1-89. Retrieved January 19, 2023, from https://macsphere.mcmaster.ca/bitstream/11375/27078/4/Hussain_Tajseem_FinalSubmission2021October_M.S.W.pdf
- Ibrahim, S. M. (2015). The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 3(1), 437-441.
- Ifsw.org. (2023). Global Definition of Social Work – International Federation of Social Workers.
- [online] Available at: <<https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/>> [Accessed 29 January 2023].
- Isgandarova, N. (2022). An ‘Epistemic Weight’ of Islamic Practical Theology in Contemporary Islamic Social Work. In H. Schmid, & A. Sheikhzadegan (Eds.), *Exploring Islamic Social Work : Between Community and the Common Good* (pp. 165-177).
- Ismail, K. B. (n.d.). Islam and the Concept of Justice. Centre For Islamic Thought and Understanding, Universiti Teknologi MARA Perlis. Retrieved January 21, 2023, from <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/32047/1/32047.pdf>
- Jodhka , S. S., Rehbein, B., & Jessé , S. (2017). *Inequality in Capitalist Societies*. London: Routledge.
- Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. *International Seminar on " Waqf as a Private Legal Body"*. Medan, Indonesia: Islamic University of South Sumatra.
- Kamla, R., & Rammal, H. G. (2013). Social reporting by Islamic banks: does social justice matter? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(6), 911-945.
- Kondrat, M.E. (2013), Person-in-Environment. *Encyclopedia of Social Work*, National Association of Social Workers and Oxford University Press, Oxford.
- Malik, B. A. (2016). Philanthropy in Practice: Role of Zakat in the Realization of Justice and Economic Growth. *International Journal of Zakat*, 1(1), 64-77.
- Mughal, M. A. (2015). Concept of Dignity and Justice in Islam. SSRN. Retrieved January 21, 2023, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2643212
- Muhfeeth, L. (2021, November 12). *Social Cohesion Through Zakat*. Retrieved February 3, 2023, from Ethis: <https://ethis.co/blog/social-cohesion-through-zakat/#:~:text=Zakat%20is%20one%20of%20the,the%20social%20fabric%20of%20society.>
- Musari, K. (2016). WAQF-SUKUK, ENHANCING THE ISLA Waqf-Sukuk, Enhancing the Islamic Finance for Economic Sustainability in Higher Education Institutions. *WICULS 2016*. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) and the Higher Education Leadership Academic (AKEPT), Negeri Sembilan, Malaysia. .

- National Association of Social Workers. (2017). NASW code of ethics. Retrieved February, 15, 2023, from <https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English>
- Ragab, I. A. (2016). The Islamic Perspective on Social Work : A Conceptual Framework. *International Social Work*, 59(3). doi:10.1177/0020872815627120
- Rudra , N., & Haggard, S. (2016). Globalization, Democracy, and Effective Welfare Spending in the Developing World. *Comparative Political Studies*, 38(9). doi:10.1177/0010414005279258
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135-151.
- Sherraden, M., & Huang, J. (2019) Financial Social Work. Encyclopedia of Social Work. Retrieved 25 Feb. 2023, from <https://oxfordre.com/socialwork/view/10.1093/acrefore/9780199975839.001.0001/acrefore-9780199975839-e-923>.
- Sherraden, M. S., Frey, J. J., & Birkenmaier, J. (2016). Financial social work. In J. J. Xiao (Ed.), *Handbook of consumer finance research* (pp. 115–127). New York, NY: Springer International Publishing.
- Sherraden, M. S., & Morrow-Howell, N. (Eds.). (2015). *Financial capability and asset holding in later life: A life course perspective*. Oxford University Press, USA.
- Silverman, Y. “. (2018). Financial Social Work: A Growing Specialty in Clinical Social Work. *Practice Perspectives*(Summer), 1-4.
- Smirnov, A. (1996). Understanding Justice in an Islamic Context: Some Points of Contrast with Western Theories. *Philosophy East and West*, 46(3), 337-350.
- Szirmai, A. (2005). *The Dynamics of Socio-Economic Development: An Introduction*. Cambridge, London: Cambridge University Press.
- Wifaqul Ulama. (2017, January 12). *Service to Others*. Retrieved from <https://www.wifaqululama.co.uk/>: <https://www.wifaqululama.co.uk/service/#fnref-958-2>

Date of Submission : 23.02.2023

Date of Acceptance : 26.07.2023
